

পশ্চিমবঙ্গ

হুগলি জেলা সংখ্যা

১৪০৩ বঙ্গাব্দ



তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ

বর্ষ ২৯ ❁ সংখ্যা ৩৮-৪৩

৫, ১২, ১৯, ২৬ এপ্রিল এবং ৩ ও ১০ মে, ১৯৯৬

প্রধান সম্পাদক : তরুণ ভট্টাচার্য

সম্পাদক : দিব্যজ্যোতি মজুমদার

সহযোগী সম্পাদক : মুকুলেশ বিশ্বাস

সহকারী সম্পাদক

অনুশীলা দাশগুপ্ত ● মন্দিরা ঘোষাল ● উৎপলেন্দু মণ্ডল

প্রচ্ছদ : অবসর ॥ শিল্পী—গোবর্ধন আশ

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : অশ্বারোহী ॥ রামসীতা মন্দির ॥ কাঁকড়াখুলি
ছবি : প্রভাস পাল

তৃতীয় প্রচ্ছদ : মন্দির-গাত্রে পোড়ামাটির ভাস্কর্য ॥ আঁটপুর
ছবি : প্রভাস পাল

চতুর্থ প্রচ্ছদ : মন্দির-গাত্রে পোড়ামাটির ভাস্কর্য ॥ দশঘরা
ছবি : প্রভাস পাল

আলোকচিত্র

প্রভাস পাল ◆ অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় ◆ অপূর্ব আশ ◆ শুভেন্দু মুখোপাধ্যায় ও সোমা স্টুডিও

অলঙ্করণ

প্রতাপ সিংহ ● তুলসীদাস বসাক ● রামচন্দ্র পণ্ডিত ● শ্যাম রুদ্র ● নিতাই গোড়ে ● জয়দেব পাল

প্রকাশক

তথ্য অধিকর্তা

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুদ্রক

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড

১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট

কলকাতা-৭০০ ০১২

দাম : দশ টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা

বিপুল চৌধুরী, তথ্য আধিকারিক

বিতরণ শাখা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৬ কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট ● কলকাতা-৭০০ ০০১

দূরভাষ : ২২১-৪২৯৫

বিষয়সূচি

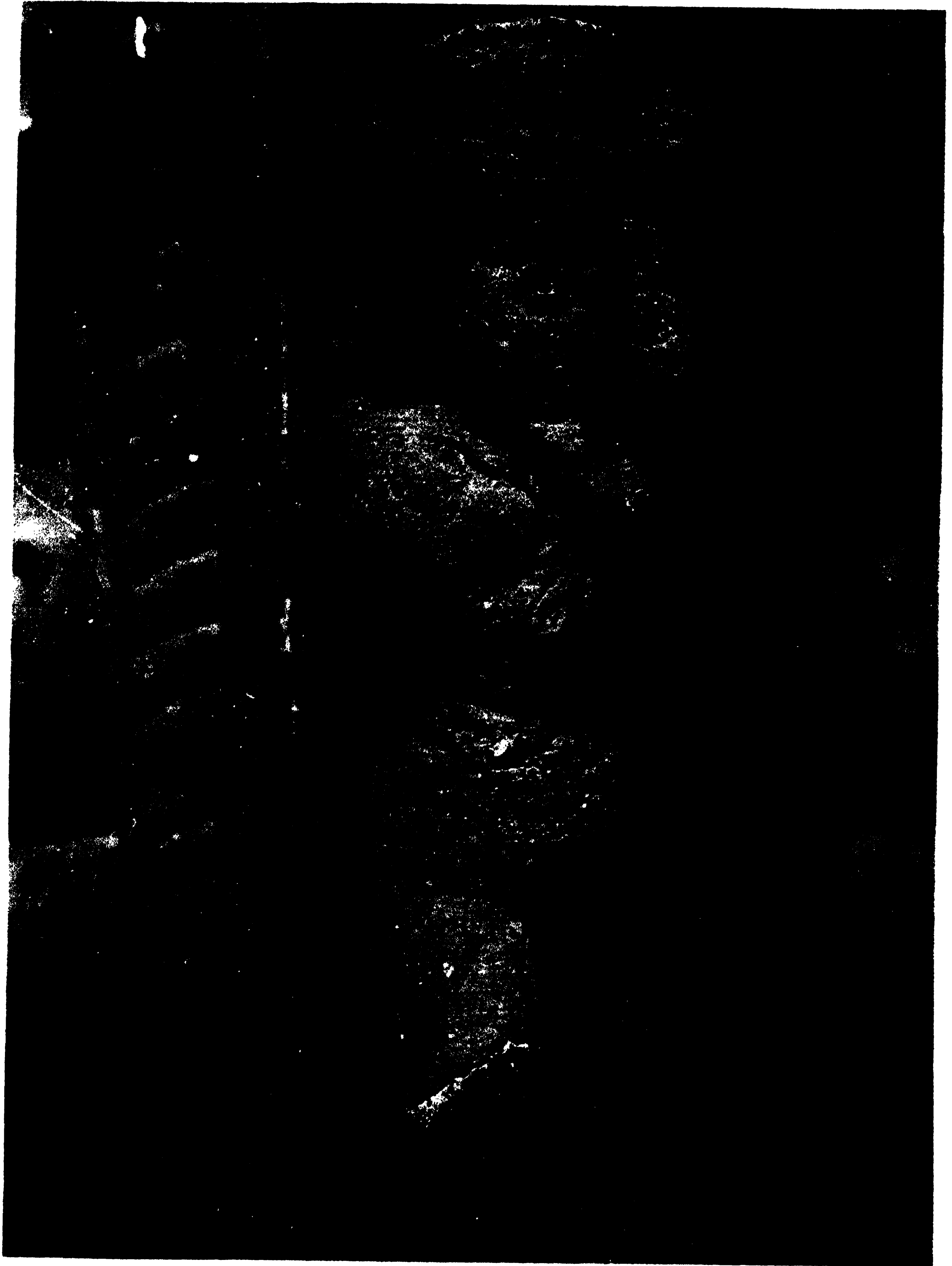
সম্পাদকীয়

কিছুদিন আগে আমাদের বিভাগ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলাকে কেন্দ্র করে 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার বিশেষ 'জেলা পরিচিতি সংখ্যা' প্রকাশ করা হবে। শুধুমাত্র জেলার পুরাকীর্তি, প্রাচীন ঐতিহ্য, তথ্যভিত্তিক ইতিহাস ও লৌকিক সংস্কৃতি নয়, সাম্প্রতিককালে জেলার শিল্প, কৃষি, সেচ, বিদ্যুৎ, পরিবহণ, সড়ক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, সুস্থ সংস্কৃতি, ক্রীড়া প্রভৃতি বিষয়ে যেসব উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড প্রসারিত হয়েছে সেসবের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও তথ্য থাকবে। আর এসব বিষয়ে যেসব নিবন্ধ প্রকাশিত হবে সেগুলি লিখবেন সেই বিশেষ বিশেষ জেলার স্থায়ী অধিবাসী বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, নৃবিজ্ঞানী, সাংসদ, সমাজকর্মী, চিকিৎসক, প্রযুক্তিবিদ, ঐতিহাসিক এমন সব ব্যক্তিত্ব। সেই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম জেলা পরিচিতি সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হল 'হুগলি জেলা সংখ্যা'। এর পর থেকে কিছুকাল অন্তর অন্তর অন্য জেলা বিষয়েও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে।



পুরাকীর্তি সংস্কৃতি শিক্ষা ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে হুগলি জেলার মহান ঐতিহ্য রয়েছে। পর্তুগীজ ডাচ ফরাসি সংস্কৃতি ও ভাস্কর্যের অপরূপ নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে এই জেলায়। একটি ধানের শিষের উপরে শিশিরবিন্দুর উজ্জ্বল উপস্থিতি অনুভব করা যায় এখানকার গাঙ্গেয় পরিবেশে। গত দুই দশকে জেলার সার্বিক উন্নয়নও অভূতপূর্ব। এসব তথ্যই রয়েছে বর্তমান সংখ্যায়। অসামান্য পুরাকীর্তির নিদর্শন ও তার ইতিহাস, জেলার দু'শো বছরের আর্থ-সামাজিক মূল্যায়ন এবং শিল্প-কৃষি-পঞ্চায়েত-বিদ্যুৎ-স্বাস্থ্য-শিক্ষা-সাক্ষরতার সাম্প্রতিক অগ্রগতি ও প্রসার নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধাদি লিখেছেন জেলার খ্যাতনামা বাসিন্দাগণ। এঁরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই যোগ্য ও প্রতিষ্ঠিত।

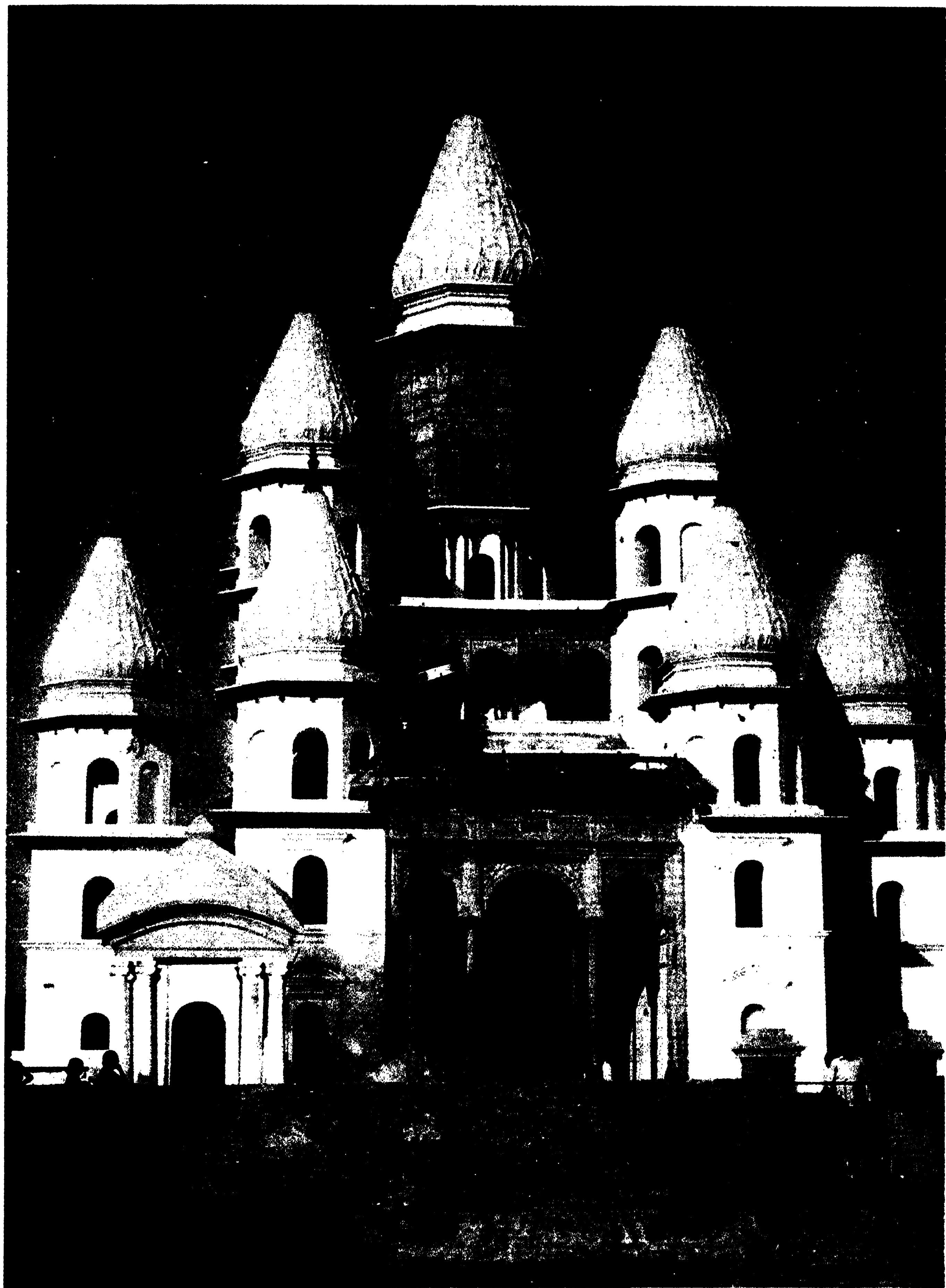
এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে হুগলি জেলা পরিষদ, জেলাশাসক ও মহকুমা শাসকের কার্যালয়, জেলা এবং মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ-এর আন্তরিক ও পরিশ্রমসাধ্য সহযোগিতা এবং সহায়তা পেয়েছি। আশা করি, বর্তমান সংখ্যায় হুগলি জেলার ব্যাপক পরিচয় লাভ করে পাঠকবর্গ উপকৃত ও সমৃদ্ধ হবেন।



পোড়ামাটির ভাস্কর্য ॥ দশঘরা



চণ্ডীমণ্ডপ ॥ কাঁঠাল কাঠের তৈরি ॥ আঁটপুর



হংসেশ্বরী মন্দির ॥ বাঁশবেড়িয়া



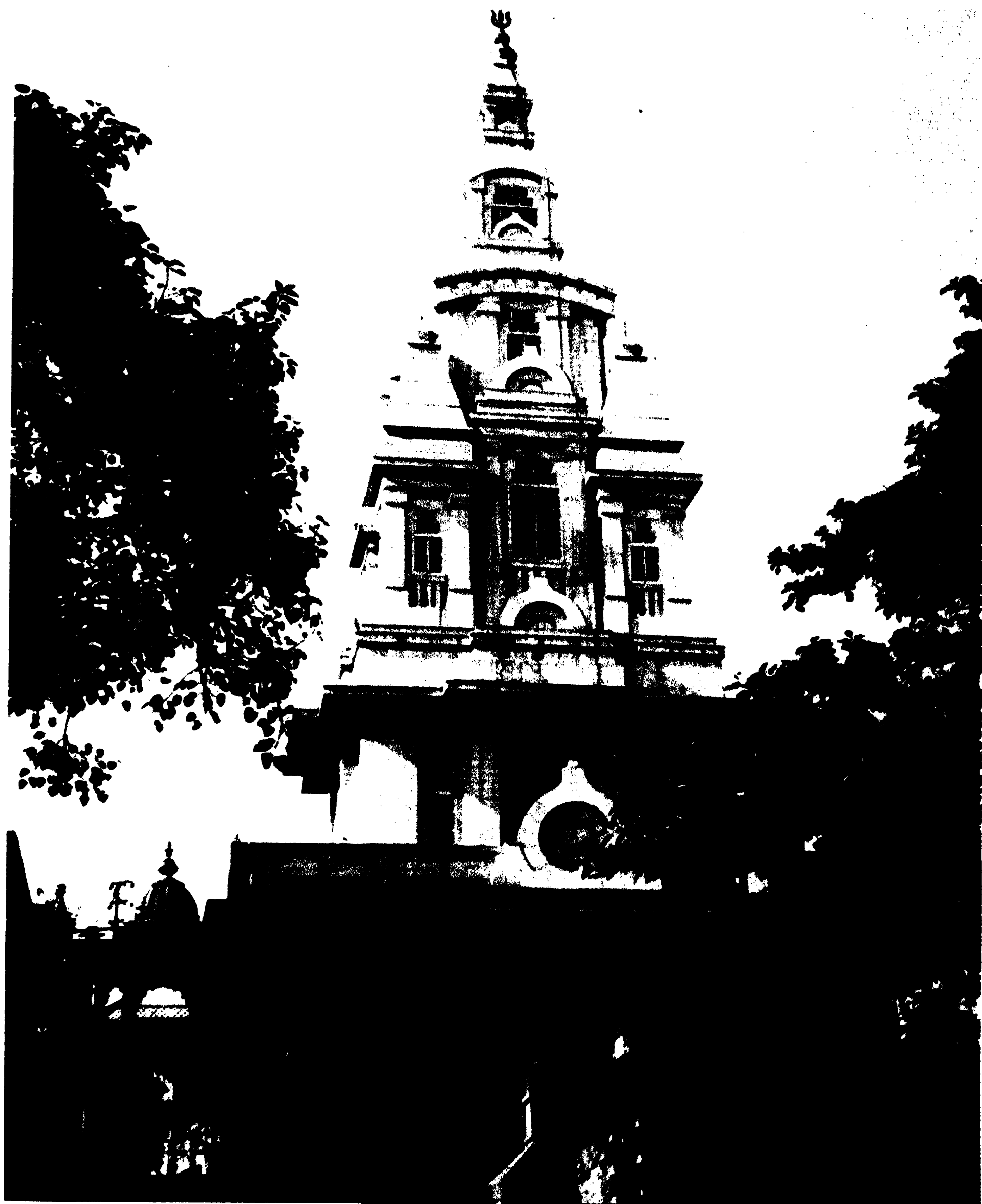
নৌকাবিহার ॥ ধনিয়াখালি



পোর্তুগিজ গির্জা ।। ব্যাণ্ডেল



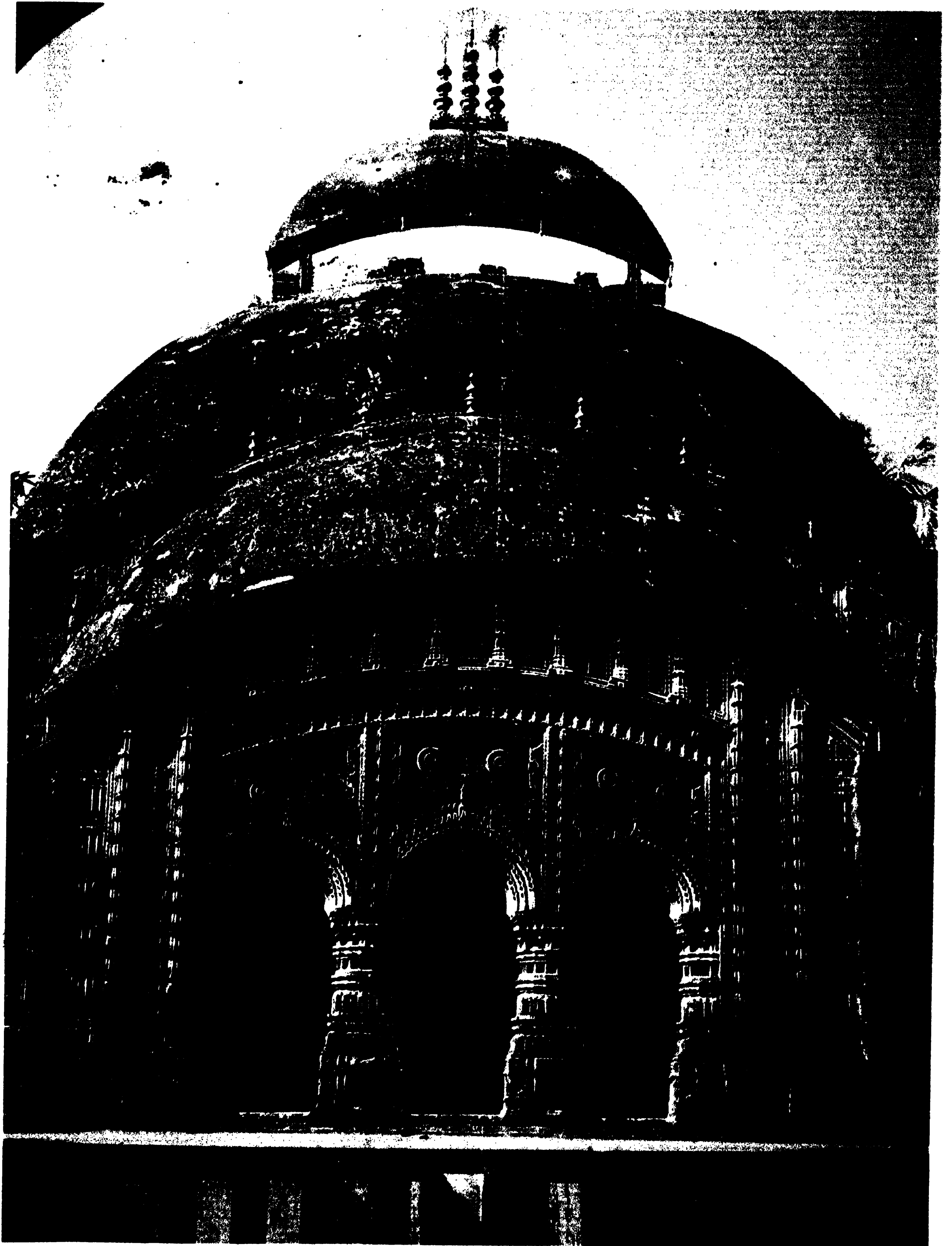
বাইশ দরওয়াজা ॥ পাণ্ডুয়া



যণ্ডেশ্বরের মন্দির ॥ চুঁচুড়া



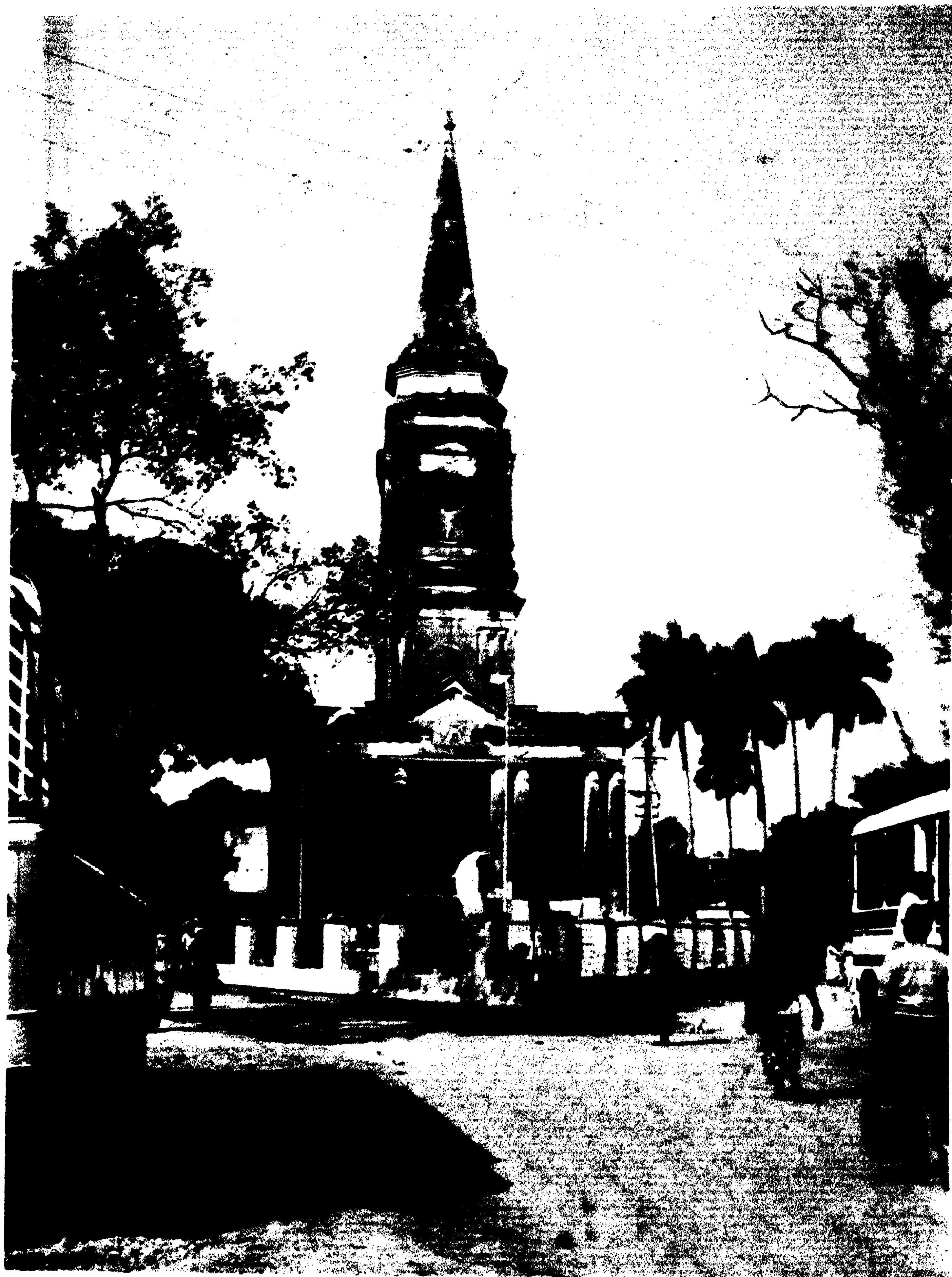
ফুরফুরা শরিফ ॥ জাঙ্গিপাড়া



রাধাগোবিন্দ মন্দির ॥ আঁটপুর



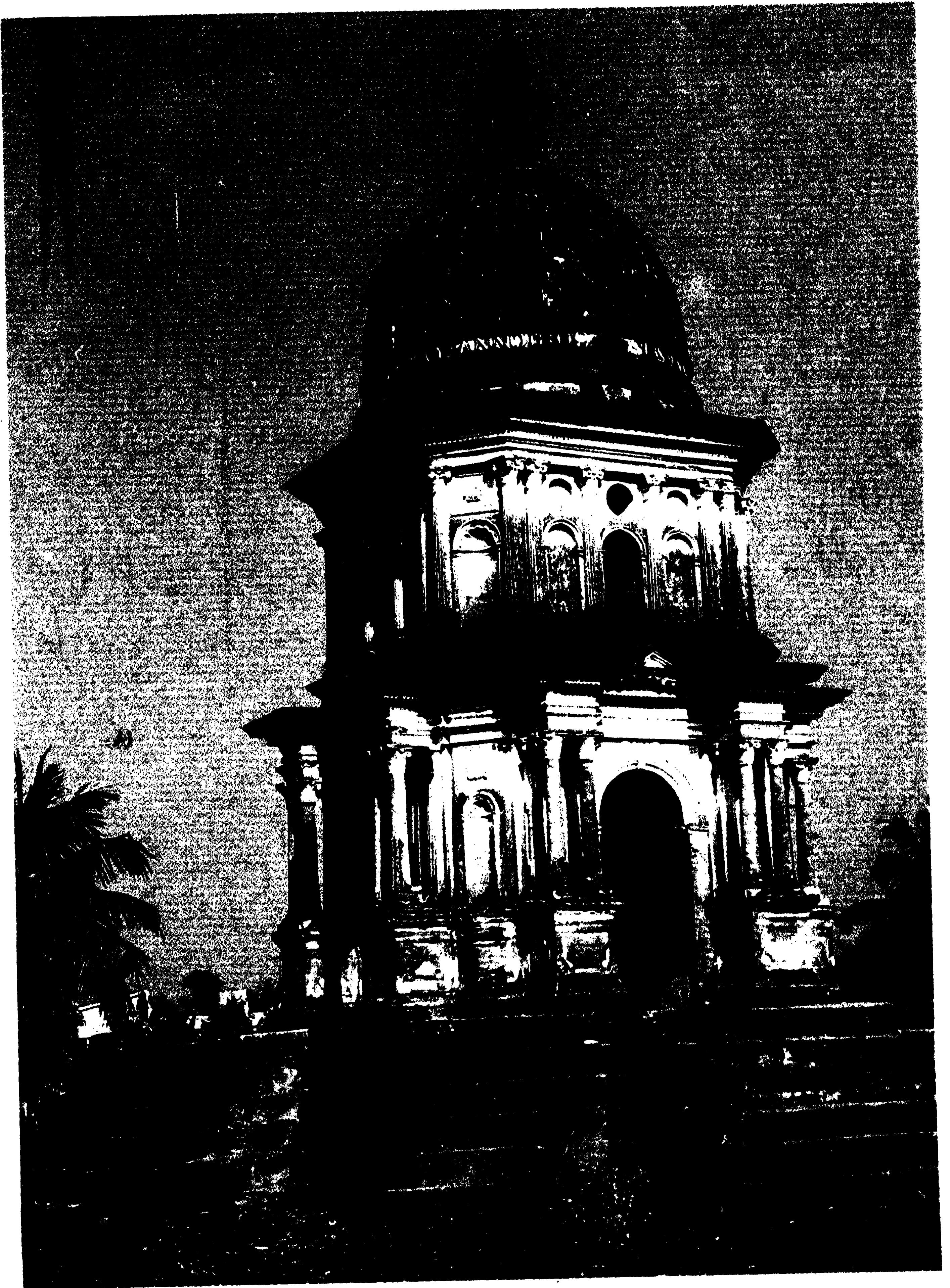
জেলাশাসকের কার্যালয় ॥ পূর্বতন ডাচ্ শাসকের বাসভবন ॥ চুঁচুড়া



সেন্ট ও লাফ গির্জা ॥ শ্রীরামপুর



ইসমাইল গাজির সমাধি ॥ গড় মান্দারণ



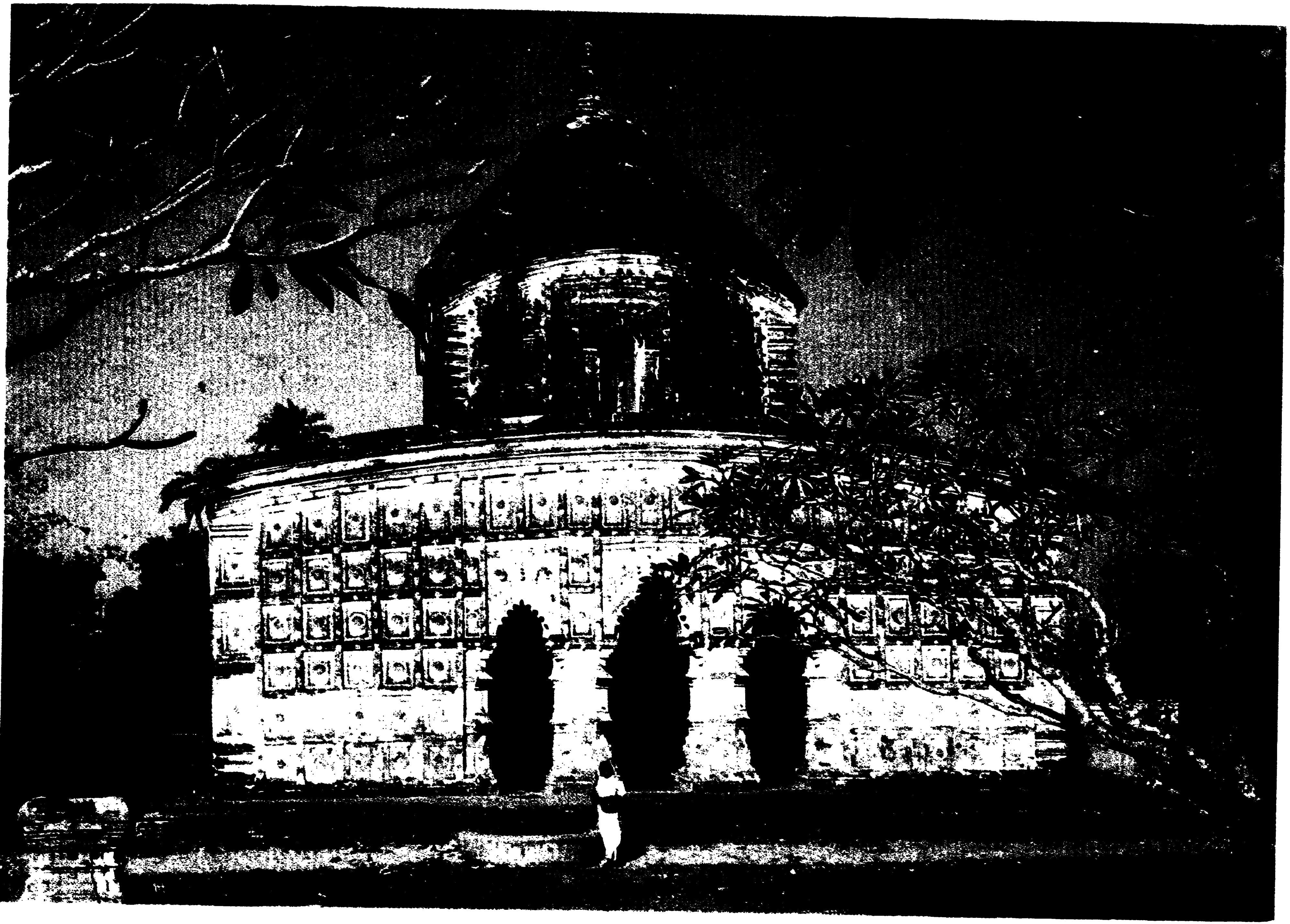
সুসানা আন্না মারিয়া সমাধি ॥ চুঁচুড়া



মুরলীধর ও দেবদাসী ॥ দশঘড়া



ইমামবাড়া ॥ হুগলি



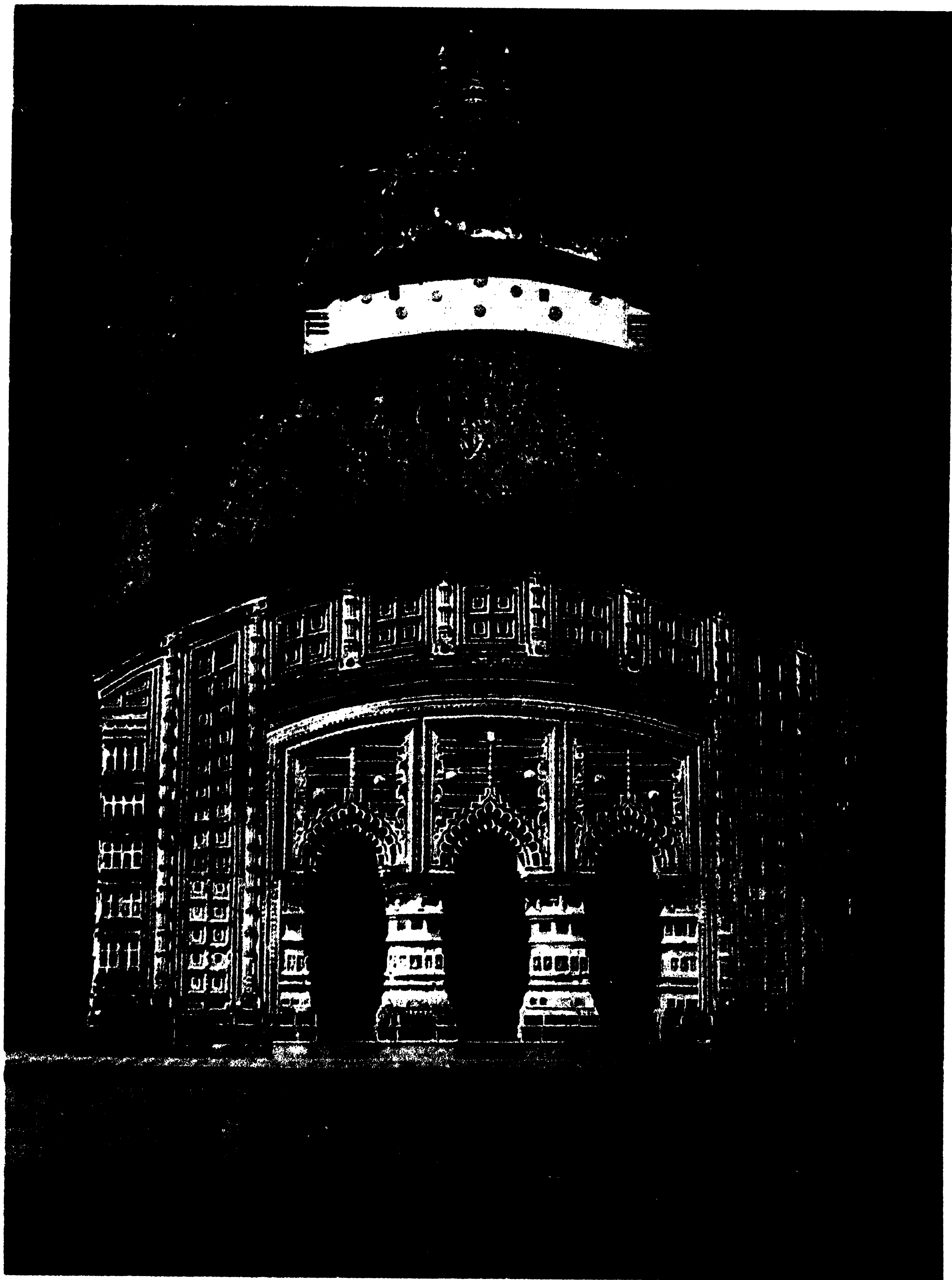
রাধাবল্লভ মন্দির ॥ রাধানগর



বিজয়স্তম্ভ ॥ পাণ্ডুয়া



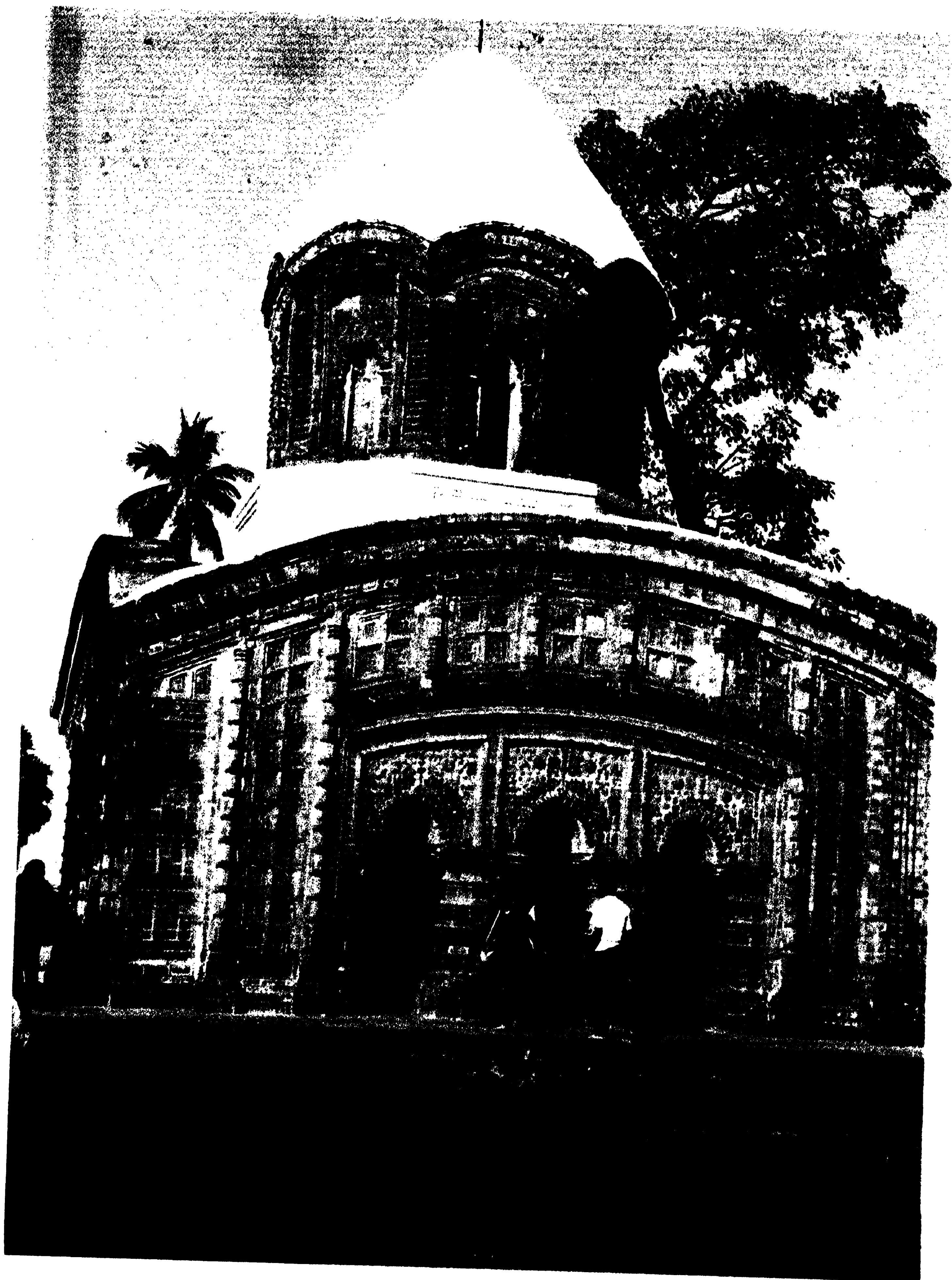
আনন্দময়ী মন্দির ॥ বলাগড়



রাধামাধব মন্দির ॥ রাজবলহাট

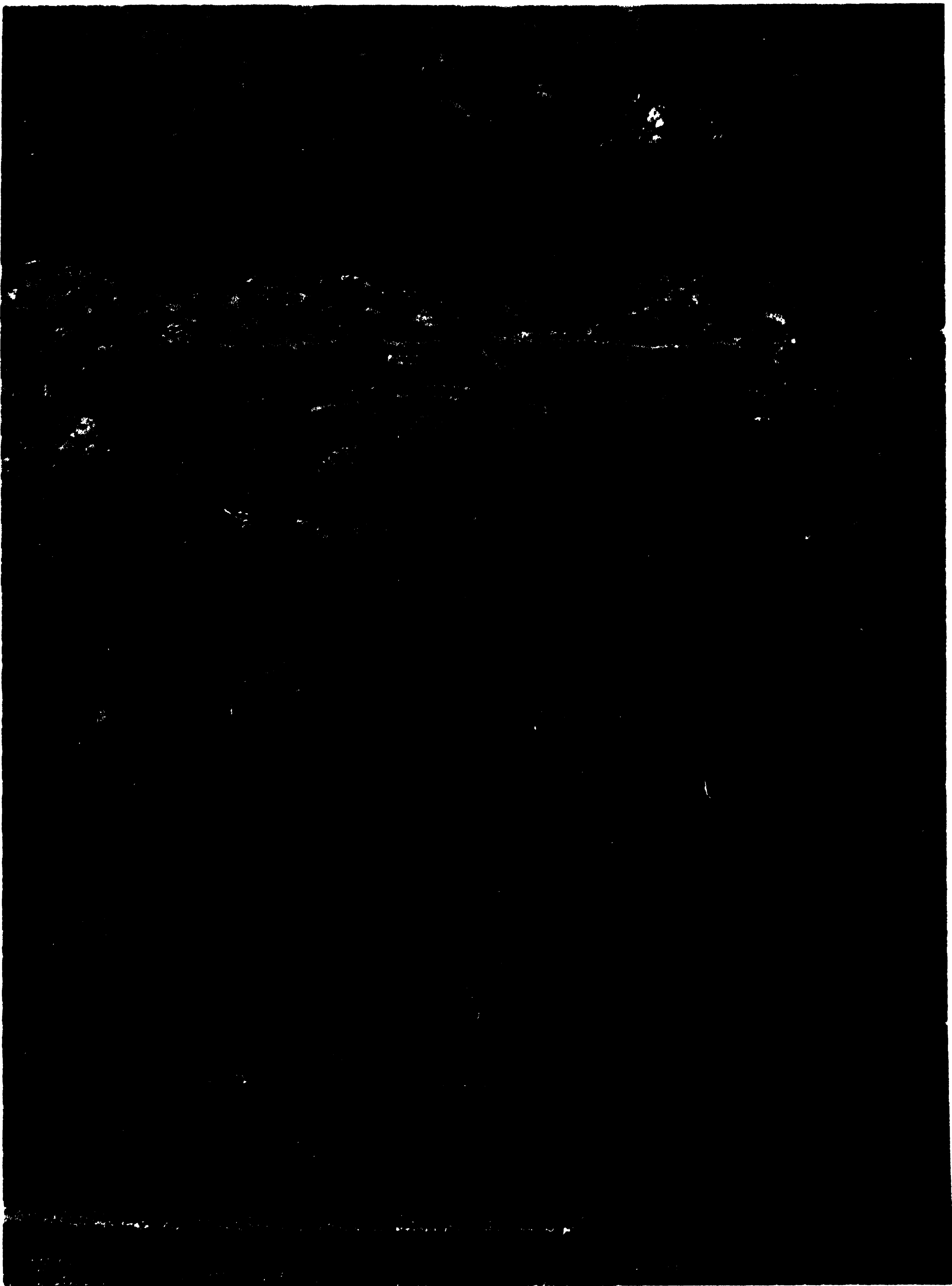


দোল উৎসব :: আঁটপুর



অনন্তদেবের মন্দির ॥ বাঁশবেড়িয়া

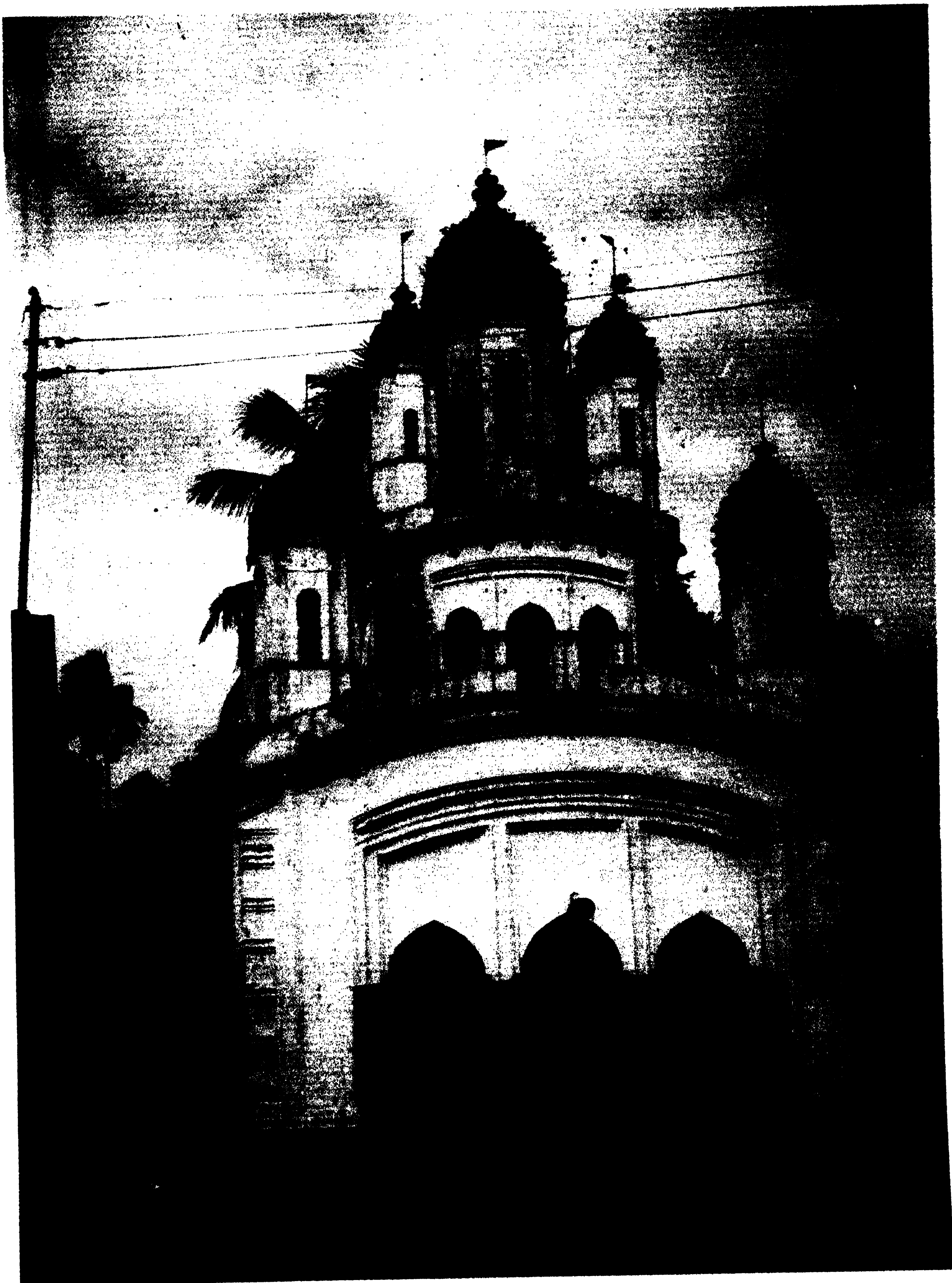
দ্বন্দ্বযুদ্ধ ॥ বিশালাক্ষী মন্দির ॥ কোতুলপুর



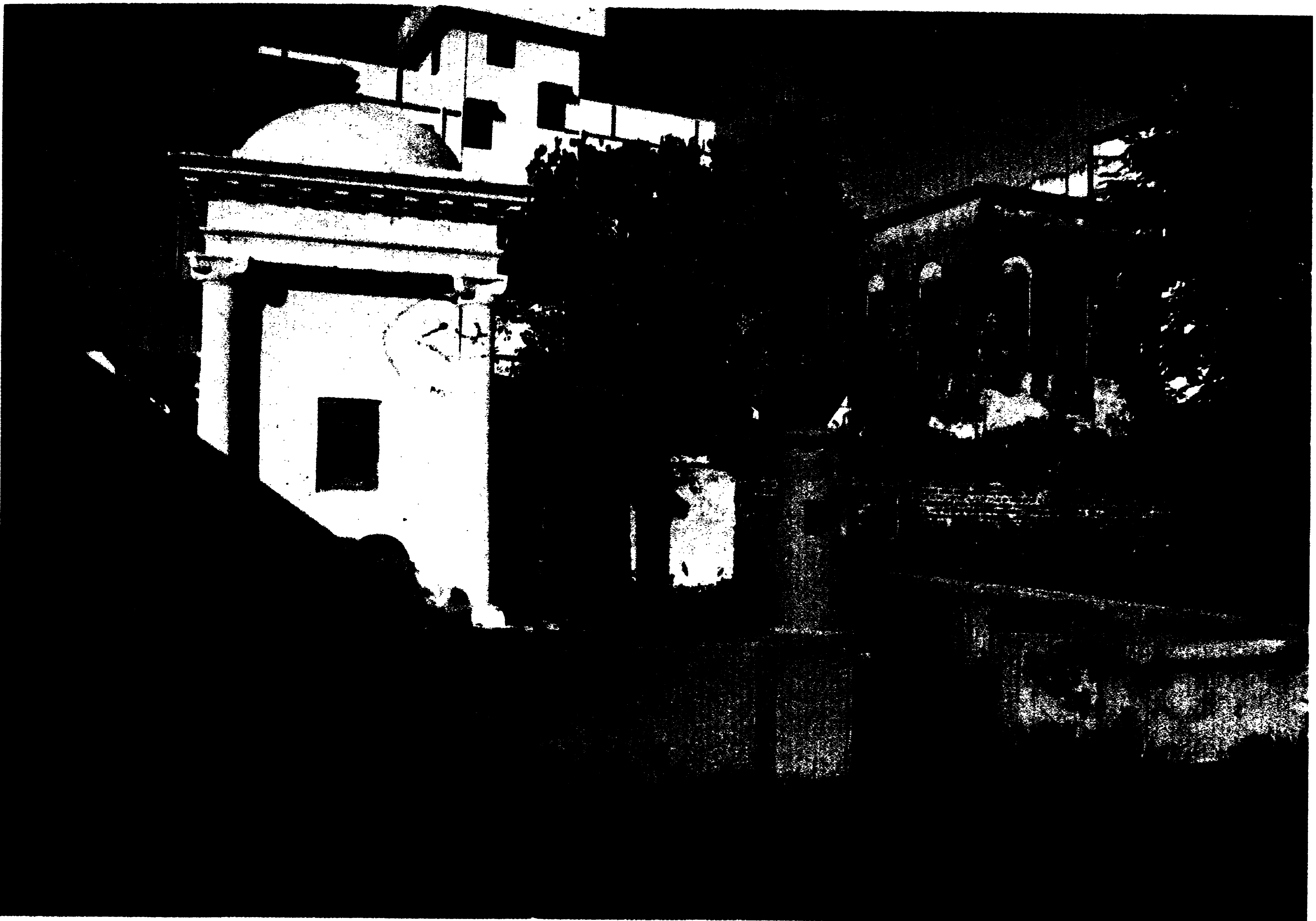
শকুন্তলা ও মৃগশিশু ॥ কোতুলপুর



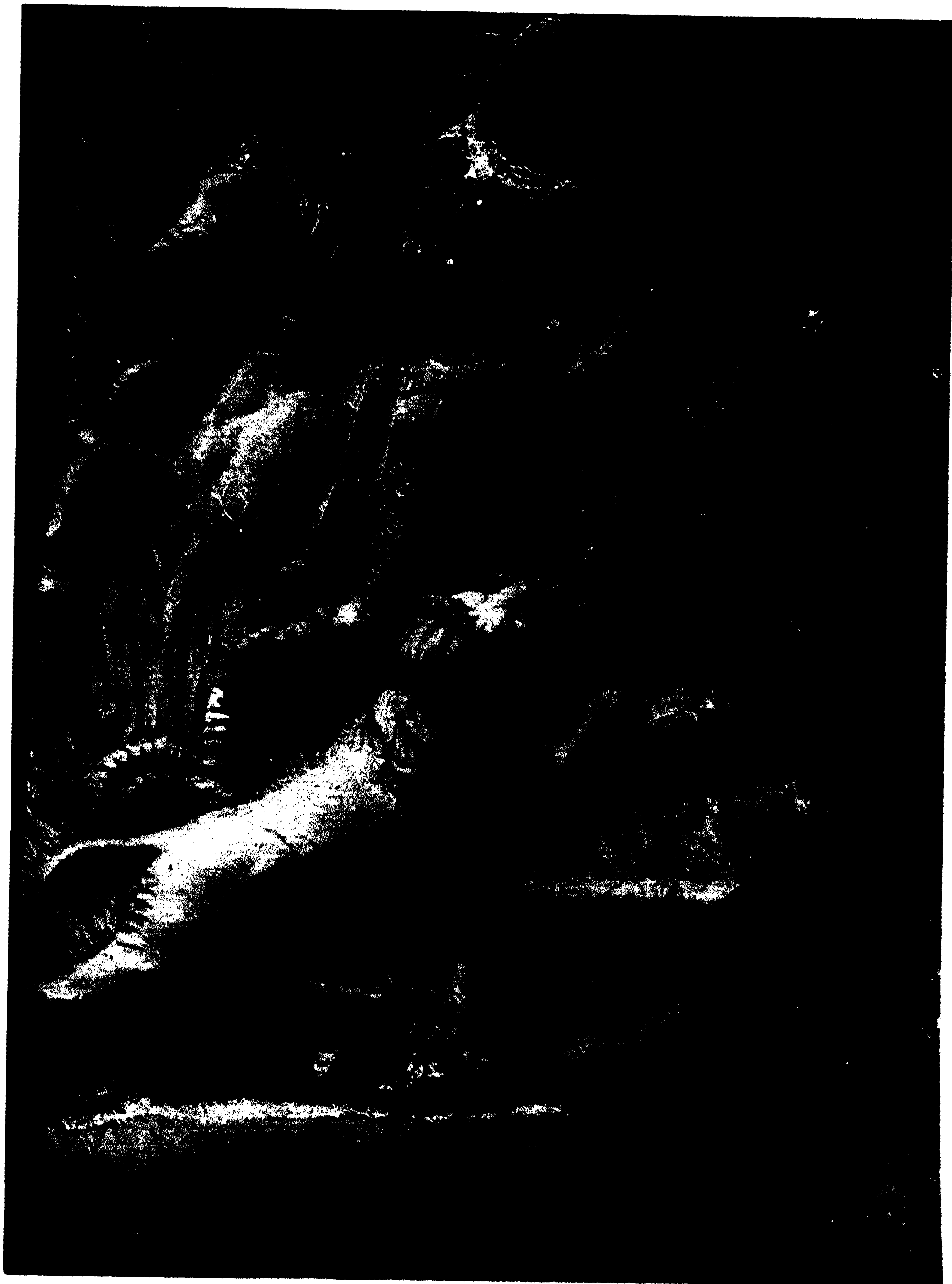
মিশন কলেজ ॥ শ্রীরামপুর



রঘুনাথজির মন্দির ॥ বাক্‌সা, চণ্ডীতলা



ডেনীয় সমাধিস্থান ॥ শ্রীরামপুর



যুদ্ধজয় ॥ রাধামন্দির ॥ দশঘরা

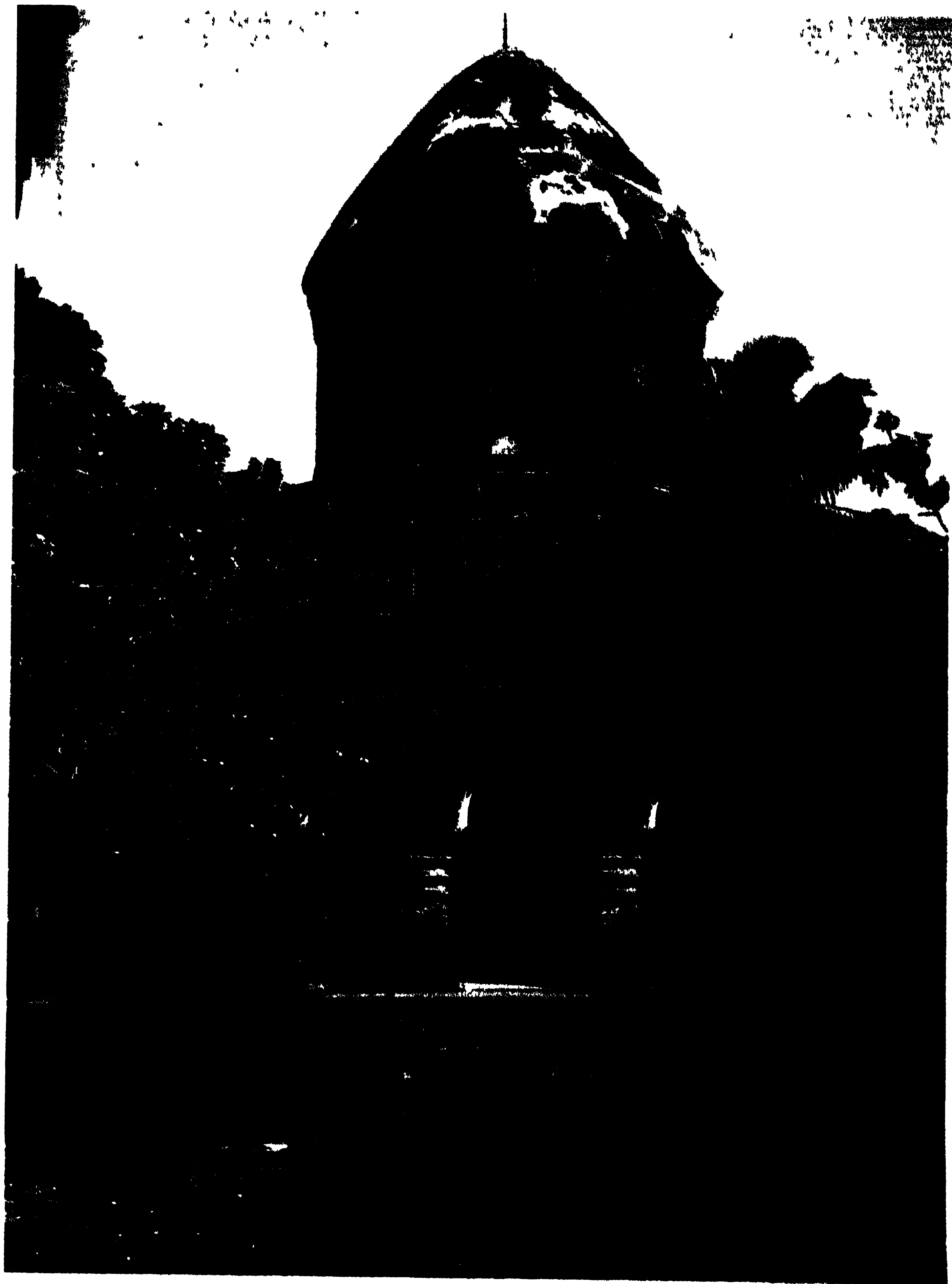
তীরন্দাজ ॥ রামসীতা মন্দির ॥ কাঁকড়াকুলি



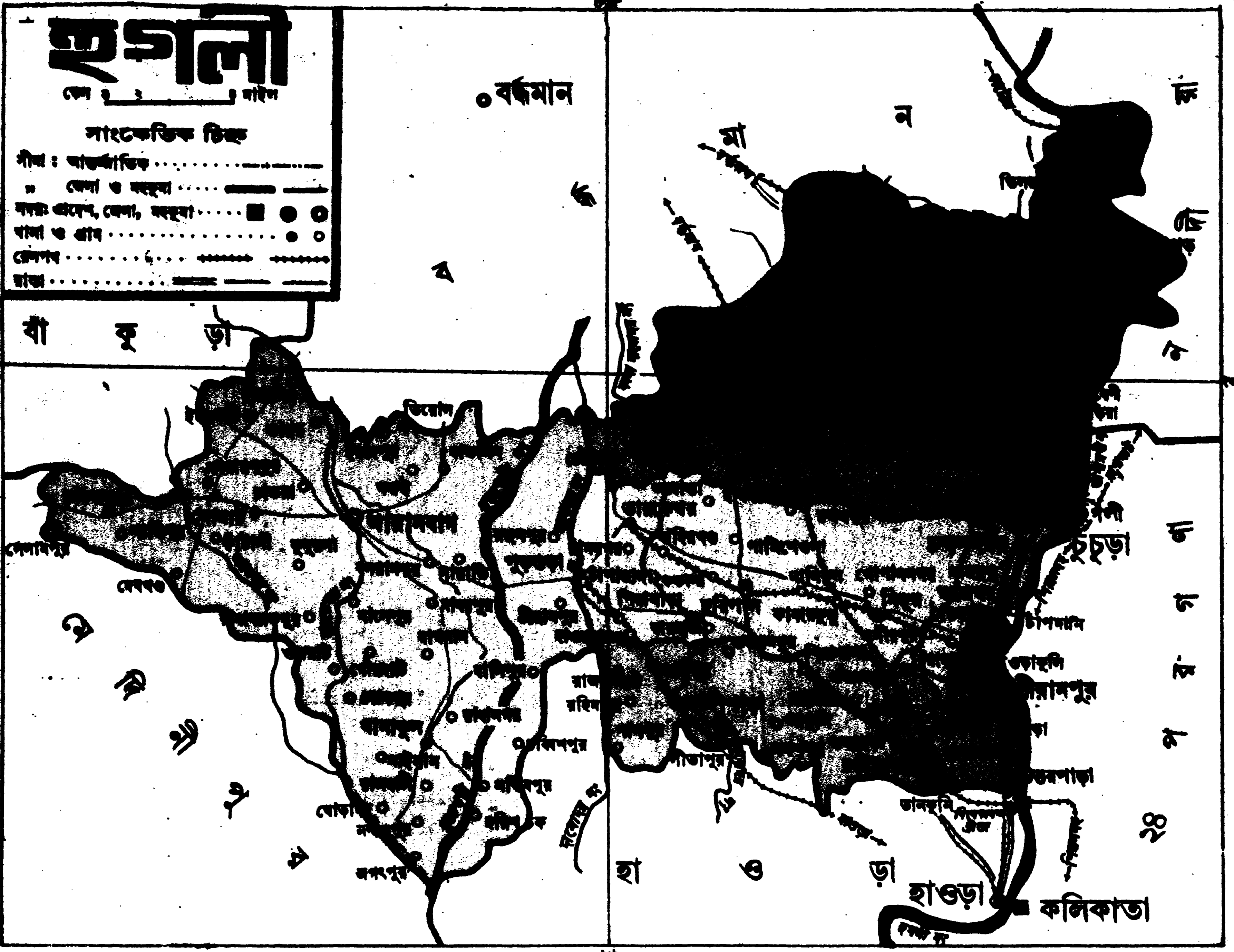
বড়াহমূর্তি : মহানাদ



কেরী মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের বাসভবন :: শ্রীরামপুর



শ্রীরামচন্দ্র মন্দির ॥ গুপ্তিপাড়া


হুগলী
সাংকেতিক চিহ্ন
বর্দ্ধমান
বাঁকুড়া
হাওড়া
কলিকাতা
চুঁচুড়া
শ্রীরামপুর

একনজরে হুগলি জেলা

তথ্য সংগ্রহে :

শ্রীঅঞ্জন বড়ুয়া, শ্রীনিমাই ঘোষ, শ্রীনারায়ণ মণ্ডল ও শ্রীহিমাংশু মণ্ডল

হুগলি জেলার চতুঃসীমা :

উত্তরে বাঁকুড়া ও বর্ধমান, পূর্বে নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণে হাওড়া এবং পশ্চিমে মেদিনীপুর জেলা।

প্রধান রেলপথ :

(ক) পূর্ব রেলের হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইন
(খ) হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইন
(গ) হাওড়া-তারকেশ্বর লাইন
(ঘ) ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া রেলপথ

প্রধান সড়ক :

(১) গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড
(২) দিল্লি রোড
(৩) দুর্গাপুর এক্সপ্রেস রোড (নির্মীয়মাণ)

একনজরে হুগলি জেলা

(১) মোট আয়তন : ৩১৪৯ বর্গ কি. মি.

(২) (ক) মহকুমা : ৪টি
(খ) থানা : ২১টি
(গ) ব্লক : ১৮টি
(ঘ) গ্রাম পঞ্চায়েত : ২১১টি
(ঙ) পঞ্চায়েত সমিতি : ১৮টি
(চ) পৌরসভা : ১১টি
(ছ) পৌরনিগম : ১টি

(৩) জনসংখ্যা : ৪৩,৫৫,২৩০ জন
(ক) পুরুষ : ২২,৭১,৭৯২
(খ) মহিলা : ২০,৮৩,৪৩৮
(গ) তফসিলি জাতি : ১০,৫০,২৮০
(ঘ) তফসিলি উপজাতি : ১,৭৬,৪০১

(৪) গ্রামীণ জনসংখ্যা
মোট : ২৯,৯৬,৯৭৯
পুরুষ : ১৫,৪০,৬১৬
মহিলা : ১৪,৫৬,৩৬৩

শহরের জনসংখ্যা
মোট : ১৩,৫৮,২৫১
পুরুষ : ৭,৩১,১৭৬
মহিলা : ৬,২৭,০৭৫

(৫) পত্রিকা
সাপ্তাহিক : ১১
পাক্ষিক : ১৭
মাসিক : ৫
অন্যান্য : ৩

(৬) সাক্ষরতা
(ক) পুরুষ : ৭৫.৭৭ (শতকরা)
(খ) মহিলা : ৫৬.৯০ (শতকরা)

(৭) সিনেমা হল : ৬৬

(৮) স্বাস্থ্য
(ক) হাসপাতাল : ২২টি গ্রামীণ হাসপাতাল সহ
(খ) স্বাস্থ্যকেন্দ্র : ৭৭টি

(৯) উৎপন্ন শস্য : ধান, গম, পাট, আখ, আলু ও সরষে

(১০) হিমঘরের সংখ্যা : ১০৪

(১১) সেচভুক্ত জমি : ২৬৪.৩৪ (সেক্টর)

(১২) শিক্ষা
- (ক) প্রাইমারি : ২,৯৯৩
- (খ) নিম্নমাধ্যমিক : ২০৩
- (গ) মাধ্যমিক : ৩২১
- (ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক : ১১৫
- (ঙ) মহাবিদ্যালয় : ২১
- (চ) কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা—স্কুল-কলেজ : ৭
- (ছ) বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্র : ১৬
- (জ) অন্যান্য : ১৮
- (ঝ) গ্রন্থাগার : ১৫৮

(১৪) কলকারখানা
- (ক) শিল্পপ্রতিষ্ঠান : ৮০০
- (খ) ক্ষুদ্রশিল্প : ২৪,৫৩০

(১৫) পোস্ট অফিস : ৪৯৭

(১৬) বিধানসভার আসন : ১৯
লোকসভার আসন : ৪

(১৭) জেলার দর্শনীয় স্থান : হংসেশ্বরী মন্দির, ব্যাণ্ডেল চার্চ, ইমামবাড়া, সাণ্ডেশ্বর মন্দির, নন্দদুলাল মন্দির, চন্দননগর মিউজিয়াম, কামারপুকুর, তারকেশ্বর, গড়মান্দারণ, আঁটপুর, আদিসপ্তগ্রাম, বলাগড়, সবুজদ্বীপ, মাহেশরথ।

সূত্র : জেলা পরিসংখ্যান বিভাগ—১৯৯৪

হুগলি জেলার সার্কিট হাউস, ডাকবাংলো ও গেস্ট হাউসের তালিকা

দপ্তরের নাম	সার্কিট হাউস, ডাকবাংলো ও গেস্ট হাউসের অবস্থান	সংরক্ষণের স্থান	যাতায়াতের ব্যবস্থা	বুকিংয়ের ফোন নম্বর
জেলাশাসকের দপ্তর, হুগলি	(ক) সার্কিট হাউস নং-১। কলেজ রোড, চুঁচুড়া, হুগলি (খ) সার্কিট হাউস নং-২। পিপুলপাতি, চুঁচুড়া, হুগলি	এন ডি সি জেলা জেলাশাসকের দপ্তর, হুগলি	হাওড়া ও শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে, চুঁচুড়া থেকে বাসে	৮০-২১২২ (ক) ৮০-২৮৫২ (খ) ৮০-২৮৫৪
জেলা পরিষদ, হুগলি	(১) আরামবাগ (২) কামারপুকুর (৩) পুরশুড়া (৪) খানাকুল (৫) জাঙ্গিপাড়া (৬) চণ্ডীতলা (৭) ধনিয়াখালি (৮) হরিপাল	জেলা পরিষদ হুগলি, জেলা বাস্তুকার	তারকেশ্বর থেকে বাস ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ট্রেনে হাওড়া-তারকেশ্বর	৮০-২১৩৯
বন বিভাগ, হুগলি	(১) আরামবাগ	ডি এম ও হাওড়া ডালমিয়া পার্ক	বাস হাওড়া থেকে চুঁচুড়া।	৬৬০১১৩৭২
কৃষিযান্ত্রিক	(১) রবীন্দ্রনগর চুঁচুড়া, হুগলি	কৃষিযান্ত্রিক দপ্তর, চুঁচুড়া, হুগলি		৮০-৩৮৫৩
সেচ ও জলপথ দপ্তর	(১) আরামবাগ	নির্বাহী বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর	চুঁচুড়া থেকে বাস	৮০-২৭৩৫
পি ডব্লু (রোডস)	(১) আরামবাগ	পিয়ারাবাগান, চুঁচুড়া, হুগলি। নির্বাহী বাস্তুকার রোডস (পি ডব্লু) পিপুলপাতি, হুগলি হাইওয়ে ডিভিসন	ঐ	৮০-২৩০৩

দপ্তরের নাম	সার্কিট হাউস, ডাকবাংলো ও গেস্ট হাউসের অবস্থান	সংরক্ষণের স্থান	যাতায়াতের ব্যবস্থা	বুকিংয়ের ফোন নম্বর
মীনভবন রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া	রবীন্দ্রনগর, মীনভবন, চুঁচুড়া	সি ই ও, হুগলি এফ্ এফ্ ডি এ মীনভবন	হাওড়া থেকে ট্রেনে চুঁচুড়া, চুঁচুড়া থেকে বাস	৮০-২৬৯২
হুগলি চুঁচুড়া পৌরসভা	গেস্ট হাউস, চুঁচুড়া বাস স্ট্যাণ্ড	হুগলি চুঁচুড়া পৌরসভা, পিপুলপাতি, হুগলি	চুঁচুড়া স্টেশন হইতে বাসে বাসস্ট্যাণ্ড	৮০-২৮৭৭
পি ডব্লু ডি হুগলি ডিভিসন অফিস, চকবাজার হুগলি	(১) পাণ্ডুয়া (২) বালিগুড়ি রেস্টশেড (মালিয়া পার্কের নিকটে)	নির্বাহী বাস্তুকার পি ডব্লু ডি হুগলি ডিভিসন, চকবাজার, হুগলি	হাওড়া থেকে ট্রেনে ও বাসে মালিয়া স্টেশন থেকে রিক্শা	৮০-২৩০৫
বাঁশবেড়িয়া পৌরসভা	ত্রিবেণী গেস্ট হাউস বৃন্দাবন, ত্রিবেণী-স্নানের ঘাট	বাঁশবেড়িয়া পৌরসভা	বাস	৮৪-৬৩২৪

হুগলি জেলার নদ-নদী ও খাল

নদ-নদী	খাল
(১) ভাগীরথী	(১) দেব খাল
(২) দামোদর	(২) তারাজলি খাল
(৩) সরস্বতী	(৩) বেনিয়া খাল
(৪) ঘিয়া	(৪) কানা দ্বারকেশ্বর খাল
(৫) কানানদী	(৫) মজা দামোদর খাল
(৬) কৌশিকী	(৬) হরিণখালি খাল
(৭) বেহুলা	(৭) কানারিয়া খাল
(৮) কাড়ুল	(৮) বৈদ্যবাটি খাল
(৯) বাঁশনদী	(৯) বালি খাল
(১০) রূপনারায়ণ	
(১১) দ্বারকেশ্বর	
(১২) কানা দ্বারকেশ্বর	
(১৩) আমোদর	
(১৪) কাকীনদী	
(১৫) ঝুমঝুমি	

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হুগলি জেলার মন্ত্রিদ্বয়

(১) নরেন্দ্রনাথ দে, মন্ত্রী, খাদ্য সরবরাহ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

(২) প্রবীর সেনগুপ্ত, মন্ত্রী, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

হুগলি জেলা পরিষদের পরিচালকমণ্ডলী

(১) শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সভাধিপতি এবং কর্মাধ্যক্ষ, অর্থ-সংস্থা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি।

(২) বলাই সাঁবুই, সহকারী সভাধিপতি এবং কর্মাধ্যক্ষ, কৃষিসেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতি এবং ভারপ্রাপ্ত বন ও ভূমিসংস্কার স্থায়ী সমিতি।

(৩) অজয় বেরা, কর্মাধ্যক্ষ পূর্তকার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতি।

(৪) কাশীনাথ সামন্ত, কর্মাধ্যক্ষ, খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতি।

(৫) জয়কুমার ঘোষ, কর্মাধ্যক্ষ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি।

(৬) জীবন মণ্ডল কর্মাধ্যক্ষ ক্ষুদ্রশিল্প, ত্রাণ ও জনকল্যাণ স্থায়ী সমিতি।

(৭) শ্রীমতী অর্চনা মণ্ডল, কর্মাধ্যক্ষ, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি।

(৮) শ্রীমতী আরতি সাঁতরা, কর্মাধ্যক্ষ, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতি।

(৯) সৈয়দ মহম্মদ ইয়াসীন, কর্মাধ্যক্ষ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি।

হুগলি জেলা পরিষদের সদস্যসংখ্যা : ৩৬

হুগলি জেলার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিবৃন্দ

(১) প্রভাত সরকার, সভাপতি, চুঁচুড়া-মগরা
(২) কালীকিঙ্কর দত্ত, সভাপতি, পাণ্ডুয়া
(৩) পরিতোষ ঘোষ, সভাপতি, বলাগড়
(৪) শৈলেন পণ্ডিত, সভাপতি, পোলবা-দাদপুর
(৫) অরুণ মুখার্জি, সভাপতি, ধনিয়াখালি
(৬) সুহৃদবরণ দত্ত, সভাপতি, সিঙ্গুর
(৭) বিশ্বনাথ অধিকারী, সভাপতি, হরিপাল
(৮) নিশীথ বালি, সভাপতি, তারকেশ্বর
(৯) খগেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, সভাপতি, শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া
(১০) গোকুল চট্টোপাধ্যায়, সভাপতি, চণ্ডীতলা-১
(১১) অসিত মুখোপাধ্যায়, সভাপতি, চণ্ডীতলা-২
(১২) শ্রীমতী মায়া জানা, সভাপতি, জাঙ্গিপাড়া
(১৩) পতিতপাবন জানা, সভাপতি, পুরশুড়া
(১৪) সেখ মোজাম্মেল হোসেন,সভাপতি, আরামবাগ

(১৫) ভাস্কর রায়, সভাপতি, গোঘাট-১
(১৬) নিতাই মণ্ডল, সভাপতি, গোঘাট-২
(১৭) ভজহরি ভুঁইয়া, সভাপতি, খানাকুল-১
(১৮) শিপ্রা মাইতি, সভাপতি, খানাকুল-২

হুগলি জেলার বিধায়ক ও সাংসদগণ

(১) মণীন্দ্রনাথ জানা, - বিধায়ক
(২) মলিন ঘোষ, ”
(৩) শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায়, ”
(৪) বিদ্যুৎ দাস, ”
(৫) আব্দুল মান্নান, ”
(৬) শ্রীমতী সন্ধ্যা চ্যাটার্জি, ”
(৭) কালীপ্রসাদ বিশ্বাস, ”
(৮) শ্রীমতী শান্তি চ্যাটার্জি, ”
(৯) নরেন্দ্রনাথ দে, মন্ত্রী খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
(১০) প্রবীর সেনগুপ্ত, মন্ত্রী, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
(১১) অবিনাশ প্রামাণিক, বিধায়ক
(১২) দেবনারায়ণ চক্রবর্তী, ”
(১৩) ব্রজগোপাল নিয়োগী, ”
(১৪) কৃপাসিন্ধু সাহা, ”
(১৫) বিষ্ণুপদ বেরা, ”
(১৬) শচীন্দ্রনাথ হাজরা, ”
(১৭) বিনোদ দাস, ”
(১৮) শিবপ্রসাদ মালিক, ”
(১৯) জ্যোতি চৌধুরী, ”
(২০) রূপচাঁদ পাল, সাংসদ
(২১) অনিল বসু, ”
(২২) সুদর্শন রায়চৌধুরী, ”
(২৩) সইফুদ্দিন চৌধুরী, ”

হুগলি জেলার হিমঘরের বিবরণ

চুঁচুড়া-মগড়া	—	১
পাণ্ডুয়া	—	১৩
ধনিয়াখালি	—	১৮
পোলবা-দাদপুর	—	৫
সিঙ্গুর	—	৪
হরিপাল	—	১৩
তারকেশ্বর	—	১৫
শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া	—	৪
জাঙ্গিপাড়া	—	৫
চণ্ডীতলা	—	২
পুরশুড়া	—	১০
আরামবাগ	—	১০
গোঘাট-১	—	১
গোঘাট-২	—	২
খানাকুল	—	১
		মোট ১০৪টি

হুগলি জেলার বিশেষ বিশেষ কারখানার নাম ও ঠিকানা

শ্রীরামপুর

১। হুগলি মিল কোং লিমিটেড
পো : শ্রীরামপুর
জেলা : হুগলি।

২। চাঁপদানি জুট ইন্ডাস্ট্রিজ
(ওয়েলিংটন জুট মিল)
পো : রিষড়া
জেলা : হুগলি।

৩। হেস্টিং জুট মিল লিমিটেড
পো : রিষড়া
জেলা : হুগলি।

৪। লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিল
পো : রিষড়া
জেলা : হুগলি।

৫। জয়শ্রী টেক্সটাইল লিমিটেড
পো : রিষড়া
জেলা : হুগলি।

৬। আই সি আই ইন্ডিয়া লিমিটেড
পো : রিষড়া
জেলা : হুগলি।

৭। ফস্‌ফেট কোং লিমিটেড
পো : রিষড়া
জেলা : হুগলি।

৮। কুসুম প্রডাক্টস লিমিটেড
পো : রিষড়া
জেলা : হুগলি।

৯। হিন্দুস্তান ন্যাশনাল গ্লাস ইণ্ডিয়া লিমিটেড
পো : রিষড়া
জেলা : হুগলি।

১০। ফোর্ট উইলিয়াম কোঃ লিমিটেড
পো : কোন্নগর, থানা : উত্তরপাড়া
জেলা : হুগলি।

১১। বেঙ্গল ফায়ার
পো : কোন্নগর
জেলা : হুগলি।

১২। উয়েলক্সিস লিমিটেড
পো : কোন্নগর
জেলা : হুগলি।

১৩। শ'ওয়ালেস কোঃ লিমিটেড
পো : উত্তরপাড়া
জেলা : হুগলি।

১৪। শালিমার ওয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ
পো : উত্তরপাড়া
জেলা : হুগলি।

১৫। **নেলকো কেমিক্যাল**
পো : কোন্নগর
জেলা : হুগলি।

১৬। **বি অ্যান্ড এম কেমিক্যাল**
পো : রিষড়া
জেলা : হুগলি।

১৭। **হিন্দুস্তান ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন লিমিটেড**
দিল্লি রোড
পো : রিষড়া
জেলা : হুগলি।

১৮। **মাদার ডেয়ারি, কলকাতা**
পো : ডানকুনি
জেলা : হুগলি।

১৯। **হিন্দুস্তান মোটর লিমিটেড**
পো : হিন্দমোটর
জেলা : হুগলি।

২০। **গোবিন্দ স্টিল লিমিটেড**
পো : রিষড়া
জেলা : হুগলি।

২১। **রামপুরিয়া কটন মিলস**
পো : মাহেশ, শ্রীরামপুর
জেলা : হুগলি।

২২। **বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস**
পো : মাহেশ, শ্রীরামপুর
জেলা : হুগলি।

২৩। **শ্রীরামপুর ডিস্টিলারি কোঃ লিমিটেড**
পো : শ্রীরামপুর
জেলা : হুগলি।

২৪। **জয়শ্রী ইন্ডাস্ট্রিজ**
পো : রিষড়া
জেলা : হুগলি।

২৫। **আগরওয়াল স্টিল কমপ্লেক্স**
দিল্লি রোড
পো : শ্রীরামপুর
জেলা : হুগলি।

২৬। **কারুস্ ফারমাসিউটিক্যাল**
পো : শ্রীরামপুর
জেলা : হুগলি।

২৭। **মাদুরা কোটস্**
পো : শ্রীরামপুর
জেলা : হুগলি।

২৮। **ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ**
স্টিপিনিং মিলস্
পো : শ্রীরামপুর
জেলা : হুগলি।

২৯। **নেপস্ স্টিল**
দিল্লি রোড
পো : শ্রীরামপুর
জেলা : হুগলি।

৩০। **স্টান্ডার্ড ফারমাসিউটিক্যাল**
পো : শ্রীরামপুর
জেলা : হুগলি।

৩১। **শ্রীরামপুর ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাইভেট) লিমিটেড**
পো : শ্রীরামপুর
জেলা : হুগলি।

৩২। **ক্যালকাটা সফ্ট ড্রিঙ্ক**
পো : ডানকুনি
জেলা : হুগলি।

৩৩। **ইন্ডিয়া বেলটিং অ্যান্ড কটন মিলস**
পো : শ্রীরামপুর
জেলা : হুগলি।

৩৪। **শ্রীরামপুর বেলটিং**
পো : শ্রীরামপুর
জেলা : হুগলি।

৩৫। **ইস্টার্ন বেলটিং অ্যান্ড কটন মিল (প্রাইভেট) লিমিটেড**
পো : শ্রীরামপুর
জেলা : হুগলি।

৩৬। **ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স**
পো : জনাই রোড, ডানকুনি
জেলা : হুগলি।

৩৭। **সুপার ফরগেনিং অ্যান্ড স্টিল লিমিটেড**
পো : শ্রীরামপুর
জেলা : হুগলি।

হুগলি সদর

১। **গ্যাঞ্জেস জুট মিল লিমিটেড**
বাঁশবেড়িয়া, হুগলি।

২। **ডানলপ ইন্ডিয়া লিমিটেড**
সাহাগঞ্জ, হুগলি।

৩। **ব্যান্ডেল থারমাল পাওয়ার প্লান্ট**
(ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড)
ত্রিবেণী, হুগলি।

৪। **ত্রিবেণী টিসু লিমিটেড**
ত্রিবেণী, হুগলি।

৫। **সেনকো বিস্কুট লিমিটেড**
বালীমোড়, হুগলি।

৬। **কেশোরাম স্পান পাইপ অ্যান্ড ফাউন্ডারি**
আদিসপ্তগ্রাম, হুগলি।

৭। **কেশোরাম রেয়ন**
ত্রিবেণী, হুগলি।

চন্দননগর

১। নর্থ ব্রুক জুট কোঃ লিমিটেড
চাঁপদানি, হুগলি।

২। ডালহৌসী জুট মিল
চাঁপদানি, হুগলি।

৩। ব্রেথওয়েট অ্যান্ড কোং
অ্যাঙ্গাস, হুগলি।

৪। গোন্দলপাড়া জুট কোঃ
গোন্দলপাড়া
চন্দননগর, হুগলি।

৫। ভিক্টোরিয়া জুট মিল
তেলিনীপাড়া
ভদ্রেশ্বর, হুগলি।

৬। বেলিয়াস ইন্ডিয়া লিমিটেড
জি টি রোড
ভদ্রেশ্বর, হুগলি।

৭। অ্যাঙ্গাস জুট ওয়ার্কার্স
অ্যাঙ্গাস, হুগলি।

৮। লগন জুট মেশিনারি লিমিটেড
অ্যাঙ্গাস, হুগলি।

৯। নর্থ শ্যামনগর জুট মিল লিমিটেড
ভদ্রেশ্বর, হুগলি।

১০। বেলিস ইন্ডিয়া লিমিটেড
ভদ্রেশ্বর, হুগলি।

হুগলি জেলার বিশেষ বিশেষ অফিস ও টেলিফোন নম্বর

		এস টি ডি	অফিস	রেসিডেন্ট
১।	কমিশনার বর্ধমান বিভাগ		৮০-২৭৪১	
২।	জেলা শাসক হুগলি		৮০-২০৪০/ ৮০-২০৪৪	
	ঐ বাংলো		৮০-২০৪০	
৩।	এ ডি এম (জি), হুগলি		৮০-২০৪৩	
৪।	কোর্ট এক্সচেঞ্জ, হুগলি		৮০-২১২৩/ ৮০-২১২২ ৮০-৩১০০	
৫।	সভাধিপতি, হুগলি	(০৩২১৩)	৬৬৫০৪	৮০-২২২৫
৬।	এ ই ও		৮০-৩২৬৬	৫৫১-৭৫৮৪ ৫৫১-৯১৩৮
৭।	সেক্রেটারি	(০৩২১৩)	৮০-৩২৬৭	৬৬৪৯৮
৮।	ডি ই চন্দননগর		৮৩-৫২৭২	
৯।	ডি ই শ্রীরামপুর		৬২-২৮৩০	
১০।	এস ই ডবলু বি এস ই বি		৮৩-৫৪৮৭	
১১।	এস ডি ও আরামবাগ	(০৩২১১)	৫৫০৪১	
১২।	এস ডি ও সদর		৮০-২৫৩৫	
১৩।	এস ডি ও চন্দননগর		৮৩-৫৩২৪	
১৪।	জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিক		৮০-২২৮৮	
১৫।	আর টি ও হুগলি		৮০-২৪১১	
১৬।	পি ও (ডি আর ডি এ)		৮০-২৭৯৬/ ৩৮১৩	
১৭।	পি ও (আই টি ডি পি)		৮০-২৭২৩	
১৮।	পি এ ও হুগলি		৮০-২৪০৫/ ৮০-২৭৫৯	
১৯।	স্পেশাল অফিসার (এস টি/এস সি)		৮০-২৪৩২	
২০।	ফিনান্স করপোরেশন		৮০-২৩৫৪	
২১।	ডবলু বি এস এস সি লিমিটেড		৮০-২২০২	
২২।	সি এম ও এইচ হুগলি		৮০-২১৩৮	৮০-২৩৭৮
২৩।	ডি এম ও এইচ হুগলি		৮০-২২৯৩	
২৪।	ডি ভি ও হুগলি		৮০-২৪৭৪	
২৫।	ডি এইচ ও হুগলি		৮০-২৫০৫	
২৬।	আয়কর দপ্তর হুগলি		৮০-২২৫৭	

	এস টি ডি	অফিস	রেসিডেন্ট
২৭। এ আর সি এস		৮০-২২৯০	
২৮। বার লাইব্রেরি		৮০-২১৯৫	
২৯। স্টেট ব্যাঙ্ক হুগলি		৮০-২১১৬/ ৮০-২৮০৭	
৩০। ইউ সি ব্যাঙ্ক		৮০-৩১৮৭	
৩১। ইউ বি আই		৮০-২৩০২	
৩২। ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক		৮০-২৬১২	
৩৩। ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক		৮০-২১৩১	
৩৪। এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক		৮০-২৫৮৩	
৩৫। সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ		৮০-২৪০৩	
৩৬। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক		৮০-২৬১১	
৩৭। স্টেট ব্যাঙ্ক (এ ডি বি)		৮০-২৬৮৩	
৩৮। চুঁচুড়া হোলসেল		৮০-২৫৩৭/ ৮০-২৪৩৩	
৩৯। এগ্রিকালচার মারকেটিং		৮০-২৩৭৫	
৪০। জেলা গ্রন্থাগার		৮০-২৩৬২	
৪১। জে সি আই শেওড়াফুলি		৬২-১০৪১	
৪২। ডেপুটি ডাইরেক্টর এমপ্লয়মেন্ট		৮৩-৫৮০৫	
৪৩। এ ই (আর ডবলু এস)		৮০-২৪৮০	
৪৪। এ ই (ইরিগেশান)		৮৩-৫৮৭৪	
৪৫। জেলা যুব আধিকারিক		৮০-২২৯৮	
৪৬। এফ এফ ডি এ		৮০-৬২৯২	
৪৭। এ ডি এফ ও		৮০-২৩৯৬	
৪৮। ডি আই প্রাইমারি		৮০-৩১৭২	
৪৯। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক হুগলি		৮০-২৩৩৮	
৫০। সেটেলমেন্ট		৮০-২০৯৭/ ৮০-২০৯৮	
৫১। ডি আই প্রাইমারি		৮০-২৫৮১	
৫২। প্রেসিডেন্ট ডি এস বি		৮০-২৩৭০	
৫৩। ডি এস ই ও		৮০-২৪৭৩	
৫৪। ড়ি আই সি		৮০-২০৮৯/ ৮০-২০৫৫	
৫৫। হ্যান্ডলুম		৮০-২৫১১	
৫৬। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ		৮০-২৫১৯	
৫৭। ই ই এগ্রি। ইরিগেশন		৮০-২৫০০	
৫৮। ই ই এগ্রি। ম্যাক্‌		৮০-২৪২৯	
৫৯। ই ই পি ডবলু ডি		৮০-২৩০৫/ ৮০-২৮৫৫	
৬০। এ ই কনস্ট্রাকশান		৮০-২৬৩৩	
৬১। ই ই পি ডবলু (রোডস) হুগলি হাইওয়ে ডিভিশন		৮০-২৩০৩	
৬২। এ ই (রোডস)		৮০-২৪০৭	
৬৩। ই ই রেসিডেন্স		৮০-২৭৩৫/ ৮০-২০৩৯	
৬৪। এম সি এফ এস		৮০-২৩৩৪	
৬৫। ডি সি এফ এস		৮০-৩০৩৪	
৬৬। ফুড করপোরেশন		৮০-২৩২৯	
৬৭। ইলেকট্রিক সাপ্লাই		৮০-২২৬১	
৬৮। এল আই ও		৮০-২৩৩৯	
৬৯। ডি এল ও		৮০-২৪৭৩	
৭০। অ্যানিমেল হাজবেনডারি		৮৩-৫১৭৪	
৭১। এ ই ইলেকট্রিক্যাল		৮০-২০৩৫	
৭২। ইলেকট্রিক কো-অপারেটিভ		৬২-২৩১২/ ৬২-২৭৪০	
৭৩। খলিসানি কলেজ		৮৩-৫৫৩০	
৭৪। এ ই (আর ডবলু) রোড শ্রীরামপুর		৬২-২০৭৭	
৭৫। দামোদর মিল্ক		৮০-২৯২৭	
৭৬। কলেজিয়েট স্কুল		৮০-২৫১০	
৭৭। চুঁচুড়া রেল স্টেশন		৮৩-৬৩৬৬	
৭৮। চুঁচুড়া পোস্ট অফিস		৮০-২৩০০	
৭৯। মহসীন কলেজ		৮০-২২৫২	
৮০। হুগলি জেলা মহিলা মহাবিদ্যালয়		৮০-২৩৩৫	
৮১। স্মল সেভিংস (ক্ষুদ্র সঞ্চয়)		৮০-২৭৫৮	
৮২। এইচ আই টি হুগলি		৮০-২০৬৫	
৮৩। উইমেন্স পলেটেকনিক চন্দননগর		৮৩-৭৭৯১	
৮৪। আই টি আই ব্যাণ্ডেল		৮০-২৩২৭	
৮৫। ব্যাণ্ডেল সার্ভে ইনস্টিটিউট		৮০-২৩৪৭	
৮৬। পি আর ও		৮০-২৬৪৫	
৮৭। ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন		৮০-২৫০৯	
৮৮। ফায়ার স্টেশন (Fire Station)		৮০-২৩০৯	
৮৯। পুলিশ স্টেশন (এক্সচেঞ্জ)		৮০-২৩৮১	
৯০। এস ই (এস ই বি)		৮৩-৩৯৫৬	
৯১। আর ই (এস ই বি)		৮৩-৫২৭২	



কালো পাথরের মূর্তি ।। দ্বাদশ শতাব্দী ।। ত্রিবেণী

হুগলি জেলার পুরাকীর্তি

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

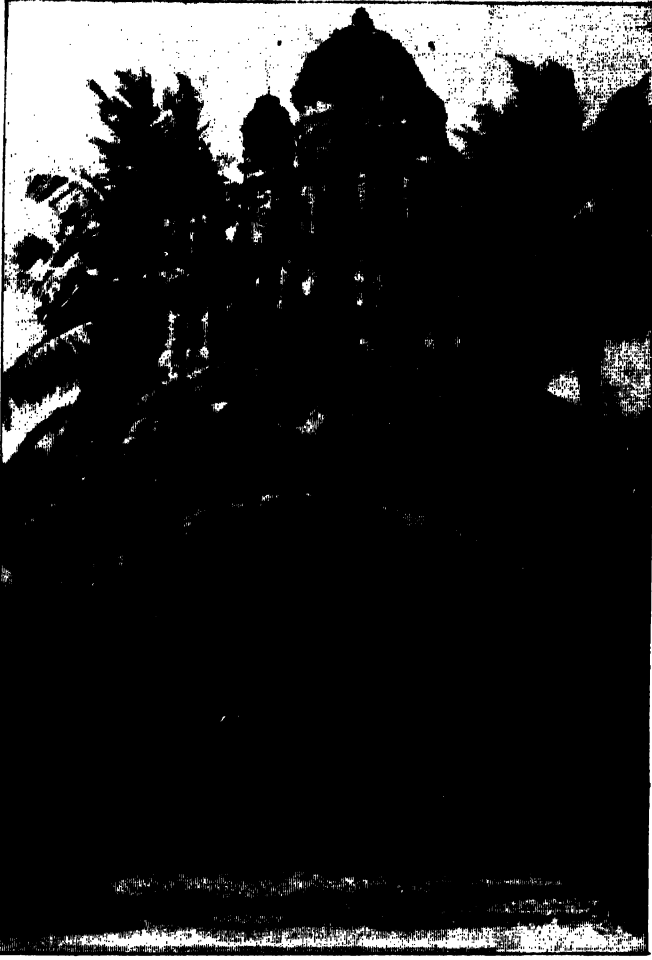
সহকারী : জিয়াউল হক, শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়



'হুগলি জেলার পুরাকীর্তি' অধিকাংশই অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকের। এর পূর্ববর্তী নিদর্শন খুবই কম পাওয়া যায়। কারণ, সে কালের স্থাপত্য তৈরির ভঙ্গুর উপাদান, নদীসমূহের বারবার গতিপরিবর্তন এবং বন্যার প্রকোপে বহু প্রাচীন ও মধ্যযুগের পুরাকীর্তি অবলুপ্ত হয়ে গেছে। মূলত ভঙ্গুর উপাদানে গঠিত বলেই পুরাকীর্তিগুলিও বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। এই সব প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও হুগলি জেলার পুরাকীর্তির ঐতিহ্য প্রায় সর্বত্রই কম-বেশি লক্ষ করা যায়।

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে ভি বল গোঘাট থানার অন্তর্গত 'কুনকুন' নামক গ্রামে একটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের আয়ুধ পেয়েছিলেন। গঙ্গা-দামোদর ও তাদের উপ-শাখানদীগুলির ঘন ঘন গতিপরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট যে পলি সঞ্চয়ের উপর হুগলি জেলার যে সমভূমি গড়ে উঠেছে সেখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন পাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় প্রত্ন-পর্যবেক্ষণের পূর্বশাখার তৎকালীন অধ্যক্ষ ননীগোপাল মজুমদারের নেতৃত্বে একমাত্র মহানাদে খননকার্য পরিচালিত হয়; এই খননকার্যে প্রাচীনযুগের স্মারক হিসাবে গুপ্ত আমলের একটি ইঁটের দেওয়াল স্টুকো (৫ম-৬ষ্ঠ শতক) কিছু



দুর্গামন্দির ॥ বালি-দেওয়ানগঞ্জ   ছবি শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়

মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ, কূপ (২'৯"ব্যাস) ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ছাড়া ওই অঞ্চল অনুসন্ধান করে আবিষ্কৃত একটি পুরুষমূর্তি (উচ্চতা ৪ $\frac{১}{২}$") বর্তমানে ভারতীয় যাদুঘরে (কলকাতা) সংরক্ষিত রয়েছে। এ ছাড়াও কুষাণ ও গুপ্তযুগের (২ খ্রি.-৬ষ্ঠ/৭ম খ্রি.) মুদ্রা, পালযুগের প্রস্তর নির্মিত বিষ্ণুমূর্তি, হরপার্বতীর মূর্তি (খ্রি. সপ্তম শতক) ইত্যাদি প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে।

হুগলি জেলার মন্দির স্থাপত্যরীতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ করলে প্রধানত—রেখ মন্দির, চালা, দালান প্রভৃতি ধরনের মন্দিরের আধিক্য চোখে পড়ে। এই জেলার রেখ ধরনের মন্দিরের সংখ্যা খুবই কম। খানাকুল থানার অন্তর্গত সেনহাটে এবং বৈঁচীগ্রামে কিছু এই ধরনের মন্দির বর্তমান। রেখ বা শিখর দেউলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—গর্ভগৃহের ছাদ ঈষৎ বক্র রেখার শিখর আকৃতি হয়ে সোজা উপরের দিকে উঠে যায় এবং শিখরের উপরিভাগে 'আমলক' বসানো থাকে।

হুগলি জেলার অধিকাংশ স্থানে চালা ধরনের মন্দির বর্তমান। এর মধ্যে চিরপরিচিত দোচালা, চারচালা, আটচালা ঘরের গঠন প্রণালীতে সেগুলি নির্মিত। এই গঠন প্রকৃতি ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে 'গৌড়ীয়' বা 'বাংলারীতি' নামে পরিচিত। এই শ্রেণীর মন্দিরের বৈশিষ্ট্য হল ইঁটের তৈরি চালাগুলির উর্ধ্বে একটি মিলন রেখা এবং কারনিসগুলি ঘরের মতোই বাঁকানো। দোচালার মন্দিরগুলি হুগলিতে খুব বেশি পাওয়া যায় না। চন্দননগরের বোস পাড়ায় নন্দনন্দন মন্দির এবং আঁটপুর ও শ্রীপুরে দুটি কাঠ নির্মিত চণ্ডীমণ্ডপ লক্ষ করা যায়।

'জোড় বাংলা' অর্থাৎ দোচালা মিলিয়ে তৈরি। দশঘরা এবং মহানাদে পুরনো ধরনের জোড়বাংলা দেখা যায়। তাছাড়া দাদপুর থানার অন্তর্গত সিনেটের বিশালাক্ষী মন্দির ও গুপ্তিপাড়ার চৈতন্যমন্দির—জেলার অন্যতম নিদর্শন। কখনও কখনও জোড়বাংলা মন্দিরের উপর চারচালা এবং আটচালা ধরনের শিখর বসানো হয়। গোঘাট থানার অন্তর্গত বালি-দেওয়ানগঞ্জের দুর্গামন্দির জোড়বাংলার উপর নবরত্নযুক্ত একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

'চারচালা' ধরনের মন্দির গোঘাট থানার অন্তর্গত সেলানপুর, শ্যামবাজার, পুরশুড়া থানার অন্তর্গত বাখরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে লক্ষ করা যায়। এই মন্দিরগুলি চারচালা ঘরের মতোই চারটি দেওয়ালের উপর ত্রিভুজের ন্যায় আকার বিশিষ্ট চারটি সংলগ্ন চালার সহযোগে গঠিত। এই চালা চারটি একটি সরল বা বক্র সংযোগরেখা বা বিন্দুতে মিলেছে। বহুক্ষেত্রে চালা চারটির ঢাল অনেকটা কমিয়ে কেন্দ্রে একটি শিখর স্থাপন করা হয়। অনেকক্ষেত্রে আটচালা মন্দিরের 'নাটমণ্ডপ' হিসাবে চারচালার ব্যবহার করা হয়। আরামবাগ মহকুমার পারুল, রাজহাটিতে এই মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায়।

'আটচালা' মন্দির অর্থাৎ একটি চারচালার উপর আর একটি চারচালা বসিয়ে তৈরি করা হয়। হুগলি জেলায় এই ধরনের মন্দিরের সংখ্যা অজস্র, প্রথাগত আটচালা মন্দিরের ছাদের কর্ণিকা বাঁকানো অথবা কোথাও কোথাও সমান। এর কিছুটা নীচে এক বা একাধিক খিলানের বক্রবেষ্টনী, তার নিচে বক্ররেখা অথবা ক্ষেত্রবিশেষে সমরেখা দ্বারকাঠামো; মন্দির বড় হলে গর্ভগৃহের সম্মুখবর্তী স্থানটিকে 'অলিন্দ', যা সাধারণত স্তম্ভের উপর গঠিত তিনটি পলকাটা বা সাধারণ খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার বিশিষ্ট হয়। অনেকক্ষেত্রে গর্ভগৃহের দুইদিকে পার্শ্বশালা থাকে, প্রবেশদ্বার একটি ও চারদিকে কৌণিক স্তম্ভ খাঁজকাটা ও বেষ্টনীযুক্ত হয়। কিছু কিছু অলংকরণ সামনের দিকে লক্ষ করা যায়। অতিবৃহৎ আটচালা মন্দিরের মধ্যে মাহেশের রাধাবল্লভ, শ্রীরামপুরের হেনরি মার্টিনের প্যাগোডা ও গুপ্তিপাড়ার কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির উল্লেখযোগ্য।

ডেভিড ম্যাকাচ্চন আটচালা মন্দিরসমূহকে ছাদের গড়ন ও বক্রতার ভিত্তিতে দুভাগে ভাগ করেছেন, যথা—অষ্টাদশ শতকের হুগলি-বর্ধমান ধরন এবং উনবিংশ শতকের মেদিনীপুর ধরন। প্রথম ধরনের মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়—হরিপাল, দ্বারহাট্টা, বোড়াগড়ি, গোবিন্দপুর, কাঁকড়াকুলি, গুড়াপ, হমীরবাটি, বাহিরগড়, রাজবলহাট, ভালিয়া, খেদাইল, পারুল, কৃষ্ণপুর, কালিকাপুর, আটপুর, এলোমা, জয়নগর, রামনগর, পুরশুড়া, জঙ্গলপাড়া, মণ্ডলাই, মালঞ্চ প্রভৃতি স্থানে, দ্বিতীয় ধরনটি পাওয়া যায় বালি, ডিহিবায়ড়া, পারুল, কৃষ্ণগঞ্জ, রাজহাটি, সেলানপুর প্রভৃতি স্থানে। সেলানপুরের দামোদর মন্দিরটি সোজা কারনিসযুক্ত। ছোট মন্দিরের ক্ষেত্রে প্রথম ধরনটির সন্ধান পাওয়া যায়—সাহাগঞ্জ, বৈঁচীগ্রাম,

হরিরামপুর, মহেশপুর, কোন্নগর, উত্তরপাড়া, ভাঙ্গামোড়া, নিত্যানন্দপুর, গৌরহাটি প্রভৃতি স্থানে।

'বারোচালা' ধরনের মন্দির আটচালা মন্দিরেরই বর্ধিতরূপ। পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত ইলছোবার শিবমন্দির ও আরামবাগ থানার অন্তর্গত সেনহাটে লক্ষ করা যায়।

'শিখর' বিশিষ্ট মন্দিরকে বলা হয় 'রত্নমন্দির'। 'একচূড়াযুক্ত মন্দির'গুলিকে বলা হয় 'একরত্ন', চারচালা মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে একটি বৃহৎ শিখর এবং কারনিসের প্রতিকোণে একটি করে ক্ষুদ্রতর শিখর সংযুক্ত মন্দির হল 'পঞ্চরত্ন', মন্দিরটি দোতলা বা আটচালা হলে কেন্দ্রস্থ শিখর, একতলার চারকোণে চারটি এবং দোতলার চারকোণে চারটি শিখর নিয়ে গঠিত মন্দির 'নবরত্ন'। মন্দিরটি ত্রিতল হলে প্রতিটি তলে চারটি করে শিখর নিয়ে ত্রয়োদশরত্ন এবং এইভাবে তলের সংখ্যা বৃদ্ধি করে বহুরত্নযুক্ত মন্দির তৈরি করা যেতে পারে।

হুগলি জেলায় 'একরত্ন' মন্দিরের সংখ্যা বেশ কম। গোঘাট থানার অন্তর্গত উদয়রাজপুরে একরত্ন মন্দিরের শিখর দেশে রেখ দেউল ধরনের খাঁজকাটা লক্ষ করা যায়। খানাকুল থানার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের রাধাবল্লভ মন্দিরটি একরত্ন ও শিখরটি চারচালা। বাঁশবেড়িয়ার অনন্তবাসুদেব মন্দির, গুপ্তিপাড়ার রামচন্দ্রমন্দির—শিখরগুলি অষ্টকোণযুক্ত। আরামবাগ থানার অন্তর্গত কানপুরের কনকেশ্বর মন্দিরটি একরত্ন; চারদিকেই খোলা খিলান এবং শিখর উপরে।

তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার এবং খাঁজকাটা রেখ ধরনের শিখরবিশিষ্ট পঞ্চরত্নমন্দির গোঘাট থানার অন্তর্গত মেমানপুর, বালী, কয়াপাট, মাসুদপুর; চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত বৈজহাটি; দাদপুর থানার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর প্রভৃতি অঞ্চলে দেখা যায়। আবার একটি মাত্র খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার ও খাঁজকাটা রেখ ধরনের শিখর বিশিষ্ট পঞ্চরত্ন ডিহিবাতপুর, উত্তরপাড়া, হরিপাল, দ্বারহাট্টা, ভাঙামোড়া, গুড়াপ, বড়াগড়ি, শ্রীপুর প্রভৃতি স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। খানাকুল থানার অন্তর্গত সেনহাট এবং আরামবাগ থানার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুরে দুটি পঞ্চরত্ন মন্দির আছে, যেগুলি শিখর রেখ ধরনের হলেও খাঁজকাটা নয়, মসৃণ এবং শিখরের কারনিস যথেষ্ট বাঁকানো।

তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার বিশিষ্ট সমান খাঁজকাটা রেখ ধরনের শিখর-সহ 'নবরত্ন' মন্দিরের পরিচয় পাওয়া যায়—খানাকুল, মগরা থানার অন্তর্গত দিগসুই, পুরশুড়া থানার অন্তর্গত সুন্দুরুস, গোঘাট থানার অন্তর্গত বদনগঞ্জ ও কয়াপাট প্রভৃতি স্থানে। বাঁকানো খাঁজকাটা রেখ ধরনের শিখরের পরিচয় পাওয়া যায় খানাকুল থানার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের গোপীনাথ মন্দিরের ক্ষেত্রে লম্বা ও সরু খাঁজকাটা রেখ ধরনের শিখর, চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত বাকসার রঘুনাথ মন্দির এবং পুরশুড়া থানার অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুরের শ্রীধর মন্দিরের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়।

গোঘাট থানার অন্তর্গত হাজিপুরের লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরটি নবরত্ন হলেও দ্বিতল নয়। সোমড়ার নিস্তারিণী ও হরসুন্দরী কালী মন্দিরের শিখরগুলি সমান কারনিসের উপর বসানো।

'ত্রয়োদশরত্ন' মন্দিরের সংখ্যা হুগলি জেলাতে নেই বললেই চলে। গোঘাট থানার অন্তর্গত বালির মঙ্গলচণ্ডী মন্দিরটি ত্রয়োদশরত্ন বলে কথিত। বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দিরটি তেরটি শিখরযুক্ত হলেও এটি নিয়ম বহির্ভূত এক অপূর্ব মন্দির। পঞ্চবিংশতিরত্ন মন্দিরের নিদর্শন হুগলি জেলায় সুখাড়িয়ার আনন্দভৈরবী মন্দিরের ক্ষেত্রে। এই মন্দিরের একতলার ছাদের চারকোণে তিনটি করে বারোটি, দ্বিতীয় তলের চারকোণের শিখর নিয়ে মোট পঁচিশটি শিখর বর্তমান।

এ ছাড়া এই জেলায় কয়েকটি অষ্টকোণ শিখর বিশিষ্ট মন্দির এবং সমতল ছাদ বিশিষ্ট দালান ধরনের মন্দির আছে। শেষোক্ত ধরনের মন্দিরের মধ্যে সালেপুর ও হরিণখালির ধর্মমন্দির, সেলানপুরের দামোদর মন্দির, কামারপুরের বিষ্ণুমন্দির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অনেকক্ষেত্রে মূল মন্দিরের সামনে দালান বা দোচালা বা চারচালা ধরনের 'মণ্ডপ' বা 'নাটমন্দির' থাকে। মন্দির ছাড়াও



পোড়ামাটির কাজ ॥ আঁটপুর *ছবি শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়*

হুগলি জেলায় প্রচুর 'রাসমঞ্চ' বা 'দোলমঞ্চ' আছে। এগুলি মূলত খিলান স্তম্ভ ও শিখর দিয়ে রচিত। সাধারণত রাসমঞ্চ অষ্টকোণ ভিত্তির উপর এবং দোলমঞ্চ চতুষ্কোণ ভিত্তির উপর নির্মিত হয়।

ইটের মন্দিরের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টেরাকোটার (Terracotta অলংকরণ অত্যন্ত লক্ষণীয়। বিষয়বস্তু প্রধানত দেবদেবী, রামায়ণের কাহিনী, কৃষ্ণলীলা, পশুপক্ষী, রেখচিত্র ও উদ্ভিজধর্মী চিত্র ইত্যাদি।

হুগলি জেলায় মসজিদ বা সমাধিক্ষেত্রের সংখ্যাও কম নয় মসজিদ বা সমাধিভবন সমূহকে মোটামুটি চারটি শ্রেণীতে ভাগ কর যায়। যথা—(১) সমচতুষ্কোণ একটি গম্বুজওয়ালা কক্ষ; কারনিসের উপর চারকোণে চারটি অষ্টকোণযুক্ত শিখর এবং সম্মুখে অলিন্দ হুগলি জেলার অধিকাংশ ছোট ও মাঝারি আকারের মসজিদ এই পর্যায়ভুক্ত। (২) দ্বিতীয় ধরন প্রায় প্রথমটার মতন। কিন্তু সম্মুখে অলিন্দের পরিবর্তে তিনদিকে অলিন্দ। অনেক জায়গায় একটি গম্বুজের স্থলে তিনটি গম্বুজও ব্যবহৃত হয়। (৩) বেশি লম্বা ও ক চওড়া একটি বৃহৎ ও উচ্চ কেন্দ্রশালা, যার উপরে খিলানের ছা এবং দুই পাশে তুলনামূলকভাবে অল্প উচ্চতা বিশিষ্ট দুটি পার্শ্বশাল



অনন্ত বাসুদেব মন্দির ॥ বাঁশবেড়িয়া *ছবি শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়*

পার্শ্বশালার উপর গম্বুজ; অভ্যন্তর ভাগ স্তম্ভ এবং খিলানের দ্বারা লম্বালম্বি ও পাশাপাশি অনেকগুলি কক্ষায় বিভক্ত। (৪) বেশি লম্বা, কম চওড়া একটি বৃহৎ কক্ষায়, বহুসংখ্যক গম্বুজ, অভ্যন্তরে স্তম্ভ দ্বারা অনেকগুলি কক্ষায় বিভক্ত। প্রতিটি লম্বালম্বি কক্ষায় পশ্চিমপ্রান্তে একটি মিহরাব এবং পূর্বপ্রান্তে অর্থাৎ সম্মুখদিকে ঠিক সেই বরাবর একটি খিলান; ছাদে বহুসংখ্যক গম্বুজের খিলানগুলি স্তম্ভশ্রেণীর শীর্ষদেশে প্রতিষ্ঠিত।

বড় মসজিদের ক্ষেত্রে প্রাঙ্গণে তিনদিকে বেষ্টন করে থাকে প্রাচীর এবং কুঠুরির সারি—যাকে বলা হয় রিওয়াক। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে অথবা কোনও উপযুক্ত জায়গায় জল সংরক্ষণ থাকে—যা উজুর জন্য ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমদিকে থাকে লিওয়ান বা স্তম্ভ সমন্বিত দরদালান। দরদালানের পশ্চিমদিকের দেওয়ালে থাকে তোরণযুক্ত অথবা বাঁকানো খিলানের দ্বারা গঠিত মিহরাব। এরই অদূরে বেদী বা মিম্বার। মসজিদের দেওয়ালের ভিতর ও বাইরে লতাপাতার ও জ্যামিতিক নক্শা বিদ্যমান। এ ছাড়া নানা রঙের ও নানা প্রকৃতির মিনা করা কাচ, টাইল ও ইটের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। পাণ্ডুয়ার 'বাইশ দরওয়াজা' মসজিদের গম্বুজের সংখ্যা ৬৩টি; শাহসুফি (১৩৪০ খ্রি.) কর্তৃক নির্মিত। এ ছাড়া পাণ্ডুয়ার বোসপাড়ায় অবস্থিত কুতুবশাহি মসজিদ, ফিরুজমিনার (গোলাকার ভিত্তির উপর নির্মিত পাঁচতলা এবং তার তলগুলির পরিমাপ সমান নয়, ভিত্তিমূলক পরিধি ৬০ ফুট এবং উচ্চতা ভূমি থেকে ১২৫ ফুট) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ত্রিবেণীর কোয়াদি অল নাসির মুহম্মদ কর্তৃক নির্মিত মাদ্রাসা জাফর খান গাজির মসজিদ ও দরগা সর্বাপেক্ষা পুরাতন (১২৯৮ খ্রি.) এই জেলার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। জাঙ্গিপাড়া থানার অন্তর্গত ফুরফুরা শরিফ (১৩৭৫ খ্রি. মুশকিল খান কর্তৃক নির্মিত), হজরত মহম্মদ কবীর সাহেবের সমাধি ইত্যাদি লক্ষণীয়। এ ছাড়া ফুরফুরা ও সীতাপুরে এবং পোলবা থানার অন্তর্গত কাশোয়ারায় পঞ্চদশ শতকের মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসা, সপ্তগ্রামে পুরাকীর্তির একটি নিদর্শন ছাদহীন টেরাকোটা অলংকৃত ভাঙা মসজিদ (৯৩৬ হিজিরায় রমজান মাসে আমুলের আবুল সৈয়দ ফকরুদ্দীন কর্তৃক নির্মিত), গোঘাট থানার অন্তর্গত বাজুয়ার মসজিদ (১৫২৫ খ্রি.) এই জেলার অন্যতম পুরাকীর্তি। হুগলি ও চুঁচুড়া শহরাঞ্চলে অবস্থিত ইমামবাড়ি পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম দর্শনীয় সৌধ।

হুগলি জেলা বঙ্গদেশের খ্রিস্টান মিশনারিদের সর্বপ্রধান কেন্দ্র ছিল। ফলে তারা এখানেই বসবাস করত এবং স্বাভাবিকভাবে খ্রিস্টীয় পুরাকীর্তি সম্পদে হুগলি জেলা বিশেষভাবে ধনী। গীর্জার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল—আয়তকার প্রার্থনা হলের দুদিকে স্তম্ভযুক্ত বারান্দা, সুউচ্চ শিখর বা স্টিপল, এর একাধিক তল বিশিষ্ট পিরামিডাকৃতি বা মোচাকৃতি চূড়াকে বলা হয়—'স্পায়ার'। হুগলি জেলার সর্বাপেক্ষা দর্শনীয় স্থান হল ব্যান্ডেল গীর্জা (১৫৯৯ খ্রি.)। তাছাড়া আর্মেনীয় গীর্জা চুঁচুড়ার ওলন্দাজদের প্রোটেস্টান গীর্জা (১৭৬৪ খ্রি.) লুথারীয়দের সেন্ট ওলাফ গীর্জা (১৮০৫ খ্রি.) এবং আরও অন্যান্য কিছু ছোট গীর্জা এই জেলার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি।

১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলা ইতিহাস অনুশীলন কেন্দ্রের উদ্যোগে ত্রিশবিঘা, ডিঙ্গলহাট, মহানাদ, সুদর্শন, কৃষ্ণপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ইঁটের প্রাচীর, বিভিন্ন ধরনের মাটির প্রদীপ, পোড়ামাটির ফলক, মৃৎপাত্র, মাটির খেলনা, পোড়ামাটির গোলক, কড়ি, শঙ্খ, অলঙ্কারযুক্ত ইটের অংশ, চীনামাটির পাত্রের ভগ্নাংশ, পোড়ামাটির ছাঁচ, প্রস্তরস্তম্ভ (১১'৪"), প্রস্তরমূর্তির ভগ্নাংশ, অলঙ্করণযুক্ত খিলান, বিষ্ণুমূর্তি ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে।

এ ছাড়া প্রাচীন অট্টালিকাসমূহ পুরাকীর্তির মধ্যে গণ্য। হুগলি জেলার অধিকাংশ সুবৃহৎ প্রাচীন অট্টালিকা যেগুলি মূলত বিদ্যায়তন, সভাগৃহ ও নানাবিধ সামাজিক কাজের জন্য উনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল এবং সে আমলের কিছু ধনী ব্যক্তির দ্বারা নির্মিত অট্টালিকা বা প্রাসাদ, মূলত, ইউরোপীয় ধারা অনুসারে যেখানে 'গথিক' ধরনের স্তম্ভ, গৃহশীর্ষে ত্রিকোণাকৃতি অথবা অর্ধচন্দ্রাকৃতি পেডিমেন্ট প্রভৃতি লক্ষ করা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে হুগলি জেলার সকল স্থাপত্যকীর্তি (মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, ঐতিহাসিক অট্টালিকা এবং সমাধি) ভারতীয় সাংস্কৃতিক নিধি (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রাস্ট ফর আর্ট অ্যান্ড কালচারাল হেরিটেজ) কর্তৃক বিস্তৃত বিবরণ ও চিত্রসহ তালিকাভুক্ত এবং কম্পিউটারায়িত করা হয়েছে। এর ফলে যে কোনও গবেষক যে কোনও পুরাকীর্তি সম্পর্কে মুহূর্তেই সকল সংবাদ পেতে পারেন। এটা একমাত্র হুগলি জেলার ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়েছে।

দ্বিশত বর্ষ-পূর্তির আলোকে হুগলি জেলা

ডঃ বসন্তকুমার সামন্ত



হুগলি শহর এখন হুগলি জেলার বেশ কয়েকটি জনবহুল জনপদের একটি। অতীতে হুগলি বন্দর শহর ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পর্তুগীজদের হাতে এটি বন্দর হিসাবে গড়ে উঠেছিল প্রায় চার শত বৎসর পূর্বে। আর শাসনের সুবিধার জন্য ইংরেজ কোম্পানি—সরকারের তৈরি হুগলি জেলার বয়স এখন ঠিক দুই শত বর্ষ অতিক্রম করল। জেলাকে পিতা ধরে তার যে কোনও জনপদকে সন্তান ভাবলে এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে 'সন্তান'-হুগলি 'পিতা'-হুগলির দ্বিগুণ বয়সী। কাজেই সন্তানের কথা আলোচনা করে তার পিতার কথায় আসতে হবে ইতিহাসের ক্রমিকতা মেনে নিয়ে।

সময়ের হাত ধরে পাঁচ শ' বছর পিছিয়ে গেলে দেখা যাবে, ইউরোপের পর্তুগাল রাজ্য সে-দেশ থেকে সমুদ্রপথে সরাসরি সোনার ভারতে পৌঁছানোর জন্য প্রয়াস চালাচ্ছিল। অবশেষে দুঃসাহসী নাবিক ভাস্কো ডা গামা (Vasco da Gama) ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে যাত্রা শুরু করে পরের বৎসর আগস্টে দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে হাজির হয়েছিলেন। তাঁর সাফল্য ভারতে পর্তুগীজ বাণিজ্যের বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। পর্তুগীজ শক্তি ব্যবসায়িক প্রয়োজনে প্রথম বঙ্গদেশে এসেছিল ১৫১৭ সালে। ভাস্কো ডা গামা এ-দেশ সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করে জানিয়েছিলেন, "*Benguala* has a Moorish king

and a mixed population of Christians and Moors. Its army may be about twentyfour thousand strong, ten thousand being cavalry, the rest infantry, with four hundred war elephants. The country could export quantities of wheat and very valuable cotton goods. Cloths which sell on the spot for twenty-two shillings and six pence fetch ninety shillings in Calicut. It abounds in silver."[১]

এ-দেশের শাসকশক্তির কাছে অনুমতি সংগ্রহ করে ক্রমে পর্তুগীজেরা চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রাম বন্দরে বাণিজ্য শুরু করেছিল এবং গুরুত্বের নিরিখে তারা চট্টগ্রাম বন্দরকে বলত Porto Grande (বড় বন্দর), আর সপ্তগ্রাম ছিল তাদের Porto Pequeno (ছোট বন্দর)। বহু বৎসর ধরে ভাগীরথী নদীর মূল ধারা সরস্বতী নদীর খাত বরাবর প্রবাহিত হয়ে আবার সাঁকরাইলের কাছে ভাগীরথীতে পড়ত। ফলে সরস্বতী ছিল পোত চলাচলের উপযোগী এবং তার তীরবর্তী সপ্তগ্রাম হয়েছিল বিখ্যাত নদী-বন্দর। ডি. ব্যারোজ (De Barros)-এর আনুমানিক ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে আঁকা বাংলার মানচিত্রে সাতগাঁ অর্থাৎ সপ্তগ্রামের উল্লেখ আছে।

সপ্তগ্রাম বন্দরে যাতায়াতের পথে পর্তুগীজেরা ভাগীরথী-তীরস্থ একটি গ্রাম্য জনপদ দেখেছিল, যেখানে নদীর ধারে প্রচুর 'হোগলা' গাছ (elephant grass) জন্মেছিল। নদীপথে যাওয়ার সময় পাশের গ্রামের নাম জানতে চেয়েছিল হয়তো কোনও পর্তুগীজ নাবিক। সাহেব নদীতীরে হয়ে-থাকা গাছের নাম জানতে চাইছে—এমন ধারণা নিয়ে উত্তর দেওয়া হয়েছিল 'হোগলা'। এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেছিল কিনা তা অবশ্য জানা নেই। তবে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের পুরাতন বইপত্রে, হেজের ডায়েরি (Hedge's Diary) ইত্যাদিতে সেই গ্রামকে চিহ্নিত করা হয়েছিল ওগোলি, ওগলি, হিউগলি, গোলিন, গোলি ইত্যাদি নামে, যেগুলি হোগলা থেকে এসেছিল বলা হয়। এত বিভিন্নভাবে উচ্চারিত নামগুলির নির্যাস হিসাবে 'হুগলি' সেই জনপদের নাম বলে স্বীকৃত হয়েছিল।

'হুগলি' নামের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় একটি মত প্রচলিত আছে। পর্তুগীজেরা ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে গোলঘাট অঞ্চলে (বর্তমান হুগলি জেল খানা এলাকায়) একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিল। পর্তুগীজ ভাষায় 'গোলা' শব্দের অর্থ দুর্গপ্রাচীরের বহির্দেশের উপর দিকের অংশ। সেদিক থেকে দুর্গ হওয়ার জন্য গোলঘাট নামও হতে পারে। হুগলি জেলার ইতিহাস-রচয়িতাদের অন্যতম ডি জি ক্রফোর্ড (D. G. Crawford)-এর মতে গোলাঘাট থেকে 'হুগলি' এসেছে। আবার, পর্তুগীজ বণিকেরা পণ্য মজুত করার জন্য যে সকল গুদাম বা গোলা তৈরি করেছিল তা থেকে 'হুগলী' নামটি আসতে পারে। যদুনাথ সরকারের মতে পর্তুগীজদের মুখের ভাষায় যা 'ও-গোলিম' বা 'ও-গোলি' বাঙালি জিভে তা 'হুগলী' হয়েছে। তবে এ-মতের সমর্থন অনেকেই করেন না। কারণ, গোলঘাট, গোল বা গোলা থেকে 'হুগলী'তে উত্তরণ সহজ ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নয়; বরং এর বিপরীত প্রক্রিয়া স্বাভাবিক।

তবে লক্ষণীয়, মুসলমান লেখকগণ বরাবরই এই প্রাচীন জনপদের নাম 'হুগলী' লিখেছিলেন। ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে 'হুগলী' নাম স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। ১৬৩২-এ আবদুল হামিদ লাহোরী 'হুগলী' বন্দরের কথা বলে সেখানে পর্তুগীজ প্রাধান্যের উল্লেখ করেছেন। অথচ, আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের অল্পদিন পরে রচিত পর্তুগীজ লেখক ফারিয়া সোউজা (Faria Souza)-র পুস্তকে 'গোলিন' নামটি, ১৬২০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে লেখা হিউগেস (Hughes) ও পার্কার (Parker)-এর পত্রাবলীতে 'গোল্লিন' এমনকি ফরাসি পর্যটক বার্ণিয়ের (Bernier)-এর ১৯৯৬ সালে লেখা কাহিনীতে 'ও গোলি' ব্যবহৃত হয়েছে। এসব থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে প্রচলিত 'হুগলী' নাম থেকেই উচ্চারণ বিকৃতির জোরে বিদেশিদের লেখায় গোলিন, গোল্লিন বা ওগোলি এসেছিল।

কাজেই 'হুগলী' কোনও বিদেশিদের দেওয়া নাম নয়। Hooghly Past and Present পুস্তকের লেখক শম্ভুচন্দ্র দে এই মত পোষণ করেন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ-বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন—"Hooghly was even before the settlement of the Portuguese, a place of some importance...Bipradas who writes before the arrival of the Portuguese in India mentions it by the proper name Hughly."[২] কবি বিপ্রদাস তাঁর মনসার ভাসান সম্পর্কিত পুঁথিতে (এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত) হুগলির কথা বলেছিলেন। এই গ্রন্থ রচনার তারিখ হিসাবে নাম সংখ্যার সাহায্যে লেখা হয়েছে—

'সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হোসেন শাহ গৌড়ে সুলক্ষণ।।'

সিন্ধু ৭, ইন্দু ১, বেদ ৪, মহী ১; 'অঙ্কের বাম দিকে গতি' সূত্র ধরে নাম সংখ্যা থেকে পাওয়া গেল ১৪১৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দ। বিপ্রদাস পূর্বোক্ত পুস্তক লিখেছিলেন পর্তুগীজদের বঙ্গদেশে আসার ২২ বৎসর পূর্বে। কাজেই হুগলি একটি প্রাচীন জনপদ এবং তার নামকরণের মধ্যে পর্তুগীজদের কোনও ভূমিকা ছিল না। তবে এই জনপদের গুরুত্ব বেড়েছিল যখন পর্তুগীজ-শক্তি ব্যবসা প্রসঙ্গে সপ্তগ্রাম ছেড়ে হুগলিতে এসেছিল এবং এটি হয়েছিল তাদের নূতন 'পোর্টো পিকুইনো'।

ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি থেকে সরস্বতী নদীতে পলি জমার ফলে এর নাব্যতা নষ্ট হয়েছিল এবং মূল জলপ্রবাহ সরস্বতীর বদলে ভাগীরথী দিয়ে বহমান হওয়ার ফলে তার বর্তমান ধারাটি পুষ্টিলাভ করেছিল। ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে সুলতান মাহমুদ শাহের প্রদত্ত সনদের বলে পর্তুগীজেরা সপ্তগ্রামে ব্যবসা শুরু করেছিল। পলি জমার ফলে সেই বন্দরের পতন সমাসন্ন বুঝে তারা ভাগীরথী-তীরস্থ হুগলিতে এসেছিল এবং এটিকে নদী-বন্দর হিসাবে গড়ে তুলেছিল।

এ বিষয়ে তাদের সহায়ক হয়েছিল সম্রাট আকবরের দেওয়া ফরমান। পেড্রো ট্যাভারেস (Pedro Tavares) নামে রাজনীতিতে অভিজ্ঞ এক পর্তুগীজ ক্যাপ্টেন আগ্রায় সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাঁর প্রীতি উৎপাদনে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে ১৫৭৯-৮০ সালে আকবর পেড্রো ট্যাভারেসকে একটি ফরমান প্রদান করেছিলেন "permitting him to build a city in Bengal wherever he liked. He granted the Portuguese full religious liberty with leave to preach their religion

and build churches and even baptize the gentiles with their consent. Besides the Mughal officers were ordered to help the Portuguese with all materials necessary for the construction of their houses."*

এই ফরমানের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে অচিরেই পর্তুগীজশক্তি হুগলিতে তাদের কুঠি, বসতি ও ঘাঁটি স্থাপন করেছিল, যার ফলশ্রুতিতে হুগলি নদী বন্দর বঙ্গের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। পর্তুগীজদের শক্তি সম্পর্কে এমনই বিশ্বাস ছিল যে ১৫৮০ সালে আকবরের সপ্তগ্রামস্থ ফৌজদার মীর্জা নজৎ খাঁ ওড়িশা থেকে আগত আফগানদের হাতে পরাজিত হয়ে হুগলির পর্তুগীজ গভর্নর পেড্রো ট্যাভারেস্-এর কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বণিকনেতা রালফ ফিচ (Ralph Fitch) হুগলিতে এসে সমগ্র হুগলি শহরকে পর্তুগীজ অধিকারে দেখেছিলেন। ১৫৯৯ সালে পর্তুগীজ-বন্দর হুগলিতে কনভেন্ট ও তৎসংলগ্ন একটি গীর্জা নির্মিত হয়েছিল।

কিন্তু আকবরের দেওয়া ফরমান-এর অপব্যবহার করে ক্রমে পর্তুগীজেরা বাণিজ্যের প্রচলিত বিধানগুলি মানত না, বাণিজ্যের নামে তারা দস্যুবৃত্তি, লুঠতরাজ ও দাস-ব্যবসা চালাত, জনগণকে বলপূর্বক খ্রিস্টান করত এবং স্থানীয় অঞ্চলে প্রচুর জমি ইজারা নিয়ে জমিদারি শাসন ও শোষণ চালাত। এমন কি, এক সময়ে তারা মুঘলদের প্রাপ্য রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করেছিল। শেষ পর্যন্ত সম্রাট শাহজাহানের নির্দেশে বাংলার তদানীন্তন শাসনকর্তা কাশিম খাঁ জুইনি ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুন হুগলি শহর অবরোধ করলেন। এই যুদ্ধ হুগলি বালি অঞ্চলে হয়েছিল এবং মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে চলেছিল সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। যুদ্ধের ফলে পর্তুগীজদের ঘরবাড়ি, কনভেন্ট, গীর্জা, দুর্গ* সবই ধ্বংস হয়েছিল। যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে, ভারতের মাটিতে হুগলিতেই প্রথম ইউরোপীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে ভারতীয়েরা জয়লাভ করেছিল। অতঃপর বঙ্গদেশে পর্তুগীজ ঘাঁটির অবসান হয়েছিল।

তবে বিশেষ কোনও ঘটনার জেরে সম্রাট শাহজাহান ১৬৩৩-এর জুলাই-এ পর্তুগীজদের বসবাসের জন্য ব্যান্ডেল অঞ্চলে ৭৭৭ (মতান্তরে ৭৭১) বিঘা নিষ্কর জমি দিয়েছিলেন। অবশ্য এই জমির অর্ধেকের বেশি বেহাত হয়ে গিয়েছিল। অবশিষ্ট জমিতে পর্তুগীজেরা বসতি স্থাপন করেছিল এবং সেখানে ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে গোমেশ ডে সোটো (Gomes de Soito) নামে এক ধনী পর্তুগীজ বণিকের চেষ্টায় কনভেন্ট ও গীর্জা পুনর্নির্মিত হয়েছিল। আর একটি কথা মনে রাখা দরকার, বঙ্গে পর্তুগীজ-শক্তির আর মাথা তোলার অবকাশ না



সেন্ট জোসেফ কনভেন্ট // চন্দননগর

থাকলেও বহুদিন পর্যন্ত তাদের ভাষা এখানে আগত অন্য ইউরোপীয়দের কথ্য ভাষা হিসাবে বজায় ছিল।

বিদেশি শক্তিদের মধ্যে ওলন্দাজ ও ইংরেজ যথাক্রমে ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে ও ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহানের আমলে ফরমান· সংগ্রহ করে হুগলি বন্দরে ব্যবসা শুরু করেছিল। পরে ১৬৩৮-এ ওলন্দাজ শক্তি সম্রাটের সনদ লাভ করে হুগলি ছেড়ে পার্শ্ববর্তী চুঁচুড়ায় মনোনিবেশ করেছিল। পরবর্তীকালে বাংলার নবাবদের আনুকূল্যে ওলন্দাজেরা চুঁচুড়ায় প্রকৃত ভৌম অধিকার লাভ করে তৎকালীন রাষ্ট্রীয় অরাজকতার কারণ দেখিয়ে এখানে একটি দুর্গ নির্মাণের ব্যবস্থা নিয়েছিল। সেই দুর্গের নাম গুস্তাভ (Gustavus) এবং এর অবস্থান ছিল গঙ্গার ধারে উত্তরে কাছারি ঘাট থেকে দক্ষিণে দত্ত ঘাট পর্যন্ত। মাঝে ওলন্দাজ শহর চুঁচুড়া ইংরেজদের হাতে ছিল ১৭৯৫-এর ২৮ জুলাই থেকে ১৮১৭-এর ২০ নভেম্বর পর্যন্ত। পরে ১৭.৩.১৮২৪-এ স্বাক্ষরিত এক চুক্তি বলে সুমাত্রার বদলে ১৮২৫ সালের ৭ মে তারিখে স্থায়ীভাবে চুঁচুড়া ইংরেজের অধিকারে এসেছিল। এই বৎসরেই গুস্তাভ দুর্গটি ভাঙা হয়েছিল। এইভাবে এদেশে ওলন্দাজ শক্তির সমাপ্তি ঘটেছিল।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হুগলি বন্দরকে অবলম্বন করে ব্যবসা বৃদ্ধির চেষ্টা করেছিল। ১৬৪০ থেকে ১৬৯০-এর মধ্যে কোম্পানির তেরজন এজেন্ট হুগলিতে কাজ করেছিলেন। ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর স্ট্রেনসাম মাস্টার (Streynsham Master) হুগলি বন্দরের গুরুত্ব সম্পর্কে খোঁজ নিতে এখানে এসেছিলেন। এ

---

*এখনকার হুগলি শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অবস্থান থেকে জুবিলি ব্রিজ এলাকার মধ্যে ভাগীরথীর তীরে পর্তগীজদের হুগলী দুর্গটি নির্মিত হয়েছিল বলা হয়। রেভাঃ লঙ্ (Rev. Long)-১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে এই দুর্গ নির্মাণের কথা বললেও মুঘলশক্তির হুগলি অবরোধ ও যুদ্ধে পর্তুগীজ শক্তির পরাজয়-প্রসঙ্গে মানরিক (Manrique) ও কেব্রেল (Cabrel) এমন কোনও দুর্গের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিলেন। তবে একথা জানা যায়। পর্তুগীজদের শক্তিবৃদ্ধি লক্ষ করে হুগলিতে একটি মুঘল দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছিল। কাজেই এমনও হতে পারে এই মুঘল দুর্গ অন্তত সাময়িকভাবে অধিকৃত হয়ে পর্তুগীজদের হাতে ছিল।



ডাচ সমাধিক্ষেত্র ।। চুঁচুড়া

বিষয়ে জানা যায়— "Streynsham Master who was sent out from England to reorganize the Bengal Settlements, reached Hooghly on 13th September 1676, ... He decided and very properly, that Hooghly should be the chief factory in Bengal."[৮] হুগলি বন্দরের ত্রয়োদশতম এজেন্ট ছিলেন বিখ্যাত জব চার্ণক (Job Charnock), যিনি ঘটনা-সংঘাতে ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ আগস্ট সুতানুটিতে নেমেছিলেন এবং সেদিন কলিকাতা শহরের সূচনা হয়েছিল।

চুঁচুড়ার পার্শ্ববর্তী চন্দননগরে ফরাসিরা ১৬৭৪ সালে একটি ছোট বাণিজ্য বসতি স্থাপন করেছিল। পরে ফরাসি কোম্পানির প্রথম অধিনায়ক দেলান্দ (Deslande) এখানে একটি বৃহৎ বাণিজ্যকুঠি গড়ে তুলেছিলেন। তখনকার অরাজক পরিস্থিতির সুযোগে নবাব সরকারের কাছে অনুমতি নিয়ে ফরাসি শক্তি চন্দননগরের গঙ্গাতীরে অর্লিয়াঁ দুর্গ (Fort de Orleans) নির্মাণ করেছিল। এর পরের ইতিহাস তাদের বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের এবং ইংরেজ-ফরাসি বিরোধের জেরে চন্দননগরের মালিকানা বেশ কয়েকবার (১৭৫৭-৬৫, ১৭৭৮-৮৩, ১৭৯৩-১৮০২, ১৮০২-১৬) ইংরেজের হাতে চলে যায়। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে চন্দননগর নিরবচ্ছিন্নভাবে ফরাসিদের হাতে ছিল। পরে স্বাধীন ভারতে ১৯৫০-এর ২ মে এই শহর ভারত সরকারের হাতে এসেছিল।

চন্দননগরের পার্শ্ববর্তী ভদ্রেশ্বর অঞ্চলে তিনটি বিদেশি শক্তি— দিনেমার, বেলজিয়ান ও জার্মানরা হাজির হয়েছিল। দিনেমারদের বসতিটি এখনও দিনেমারডাঙ্গা নামে পরিচিত। তবে পরে তারা এখান থেকে শ্রীরামপুরে চলে গিয়েছিল এবং ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে জমি সংগ্রহ করে সেখানে ফ্রেডেরিকনগর নামে শহর গড়ে তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত ১৮৪৫ সালে ১১ অক্টোবর ডেনমার্ক সরকার শ্রীরামপুর শহরটি ইংরেজ কোম্পানি-সরকারকে বিক্রয় করেছিল।

বেলজিয়ানরা ১৭২৩ খ্রিস্টাব্দে ভদ্রেশ্বরে বসতি করলেও ভাগীরথীর অপর পারে বাঁকিবাজারে তাদের কুঠি ছিল। জার্মানদের অস্টেন্ড কোম্পানি ভদ্রেশ্বর অঞ্চলে ভালভাবে ব্যবসা শুরু করেছিল। তবে ইউরোপের এই শক্তি দুটি নানা কারণে দীর্ঘদিন বঙ্গদেশে বাণিজ্য করতে পারেনি। লক্ষণীয়, একমাত্র বাঁকিবাজার ছাড়া অন্য সব জনপদগুলি ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে অবস্থিত ছিল এবং পরে হুগলি জেলার অংশ হয়েছিল। এগুলির পরিপ্রেক্ষিতে হুগলি বন্দরের বিশেষ অবস্থান ও গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে—"In Indo-European history, there is not, undoubtedly, a more interesting Indian town than Hooghly; because there, within a range of a few miles, seven European nations fought for supremacy : the Portuguese, the Dutch, the English, the Danes, the French, the Flemish, and the Prussians.*"[৯]

এ ছাড়া, শ্রীরামপুরের পার্শ্ববর্তী রিষড়ায় গ্রীক ও তার পাশের জনপদ কোন্নগরে আর্মেনীয় বণিকদের উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে।

এই সব বিদেশি শক্তির মধ্যে ইংরেজ ছাড়াও পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসি ও দিনেমার এ দেশের শিক্ষা সংস্কৃতিতে স্থায়ী কিছু ছাপ রেখেছিল। শেষোক্ত চারটি শক্তির কথা অন্নদাশঙ্কর রায় লিখিত 'কোতরং' নামের এক মজার ছড়ায় আছে :

"হাঁসের প্রিয় গুগ্‌লি,
পোর্তুগীজের হুগলী।
গুণীর প্রিয় তানপুরা,
ওলন্দাজের চিনসুরা।
চোরের প্রিয় আঁধার ঘর,
ফরাসীদের চন্নগর।
শিশুর প্রিয় চানাচুর,
দিনেমারের সিরামপুর।
লোকের প্রিয় ভোট রং,
পিতৃকুলের কোতরং।"

---

*বেলজিয়ান ও জার্মানদের কুঠির অবস্থান নিয়ে মতদ্বৈধ আছে। এ বিষয়ে দুটি মত উল্লিখিত হচ্ছে : "O'Malley, Hooghly Gazettear p. 87-91 understands that Bankibazar was a Flemish and not Prussian settlement and that the Ostend Company which settled there was a Flemish and not Prussian Company. Hill in his *Bengal in 1756-57* enters Bankibazar as a Prussian settlement in the Index, though he says it was held by the Ostend Company. Sir W. Hunter also calls Bankipur (Bankibazar) a Prussian settlement understanding the Ostend Company to have been the Prussian Company, *Vide, India of the Queen and other Essays*, pp. 201-2." এখানে উল্লিখিত বাঁকিবাজার ভদ্রেশ্বরের বিপরীতে গঙ্গার অপর পারে; বর্তমানে গাড়ুলিয়ায়।

সুধীরকুমার মিত্রের 'হুগলি জেলার ইতিহাস'-এ (পৃঃ ৯১৭) কোন্নগরে 'অস্ট্রিয়ানদের' কথা বলা আছে।

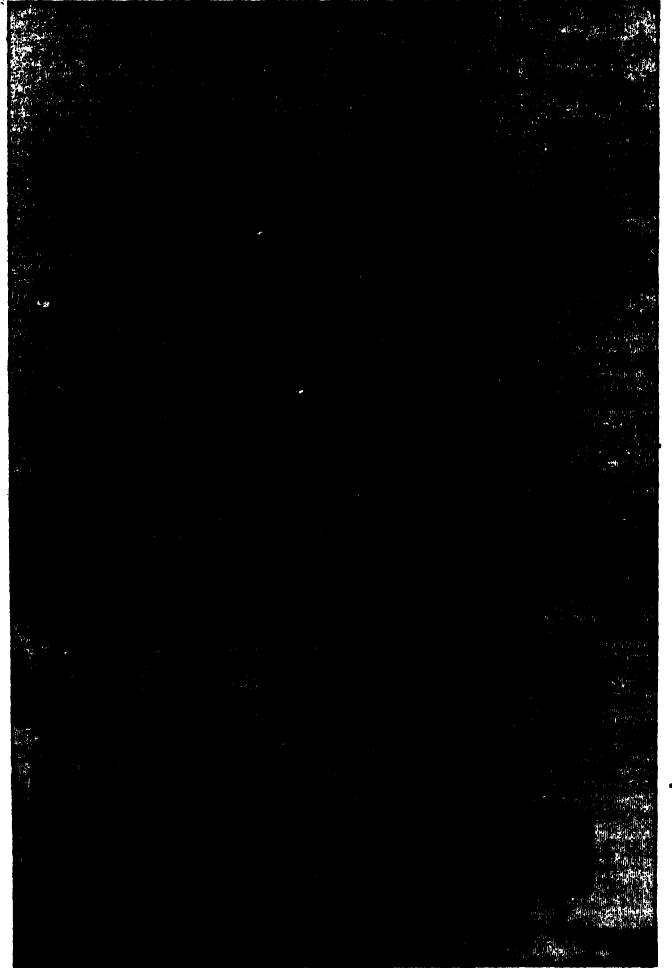
এখন হুগলি বন্দর ও ইংরেজ কোম্পানির কথায় ফিরে আসা যাক। প্রথম বাংলা সাময়িকী 'দিগ্‌দর্শন'-এর ১৮১৮ সালের আগস্ট সংখ্যায় লেখা হয়েছিল, "হুগলী শহর ক্ষুদ্র কিন্তু প্রাচীন পূর্ব্বে অতি বড় ছিল এখন তাহার প্রায় কিছুই নাই। পূর্বে সে একটা বড় বন্দর ছিল এবং ইউরোপীয় বাণিজ্যের তাবৎ হাঁসিল সেখানে দাখিল হইত এবং ইংলণ্ডীয়েদের বাণিজ্যের স্থান সেই স্থানে ছিল, পরে সেখান হইতে কলিকাতা হইল। ইংলণ্ডীয়েরা এ দেশের বিবরণ কিছু জানিতেন না। তাহাতে গঙ্গানদীর নাম হুগলী নদী কহিতেন।"* অর্থাৎ হুগলির পার্শ্ববর্তী ভাগীরথী (যেটি ছিল গঙ্গার শাখা নদী) বিদেশিদের কাছে চিহ্নিত হয়েছিল 'হুগলী-নদী' নামে।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পর ইংরেজরা 'নবাব' নামধারী কয়েকজন সাক্ষীগোপাল দেশীয় শাসককে সামনে রেখে প্রকৃত পক্ষে বাংলা ও বিহার দুই প্রদেশ শাসন ও শোষণ চালাতে থাকে।*

মীরজাফরকে সরিয়ে তার জামাতা মীরকাশিমকে নবাব করার বিনিময়ে ইংরেজ কোম্পানি ১৭৬০ সালের ১৫ অক্টোবর চাকলা, বর্ধমান, চাকলা মেদিনীপুর ও চাকলা ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম)-এর সনদ পেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্ট দিল্লির বাদশাহ শাহ আলম ইংরেজদের আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানী প্রদান করেছিলেন। এইভাবে তাদের প্রভাবাধীন এলাকা ও শক্তি বাড়লেও হুগলি শহরের গুরুত্ব কমেনি। হুগলির এই গুরুত্বের কারণে ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের XXXVI বা ৩৬নং রেগুলেশন অনুসারে জেলা বর্ধমানের** দক্ষিণাংশ নিয়ে যে নতুন জেলা ইংরেজের শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল, তার নাম হল হুগলি জেলা এবং তার কেন্দ্র শহর হল হুগলি।

নবগঠিত সেই জেলা আয়তনে বেশ বড় ছিল। মহকুমার ধারণা তখনও আসেনি। তখন জেলা ছিল কতকগুলি থানার সমষ্টি। নতুন হুগলি জেলায় প্রথমে ছিল ১৩টি থানা—হুগলি, বাঁশবেড়িয়া, পাণ্ডুয়া, বেণীপুর, ধনিয়াখালি, হরিপাল, রাজবলহাট, জাহানাবাদ, দেওয়ানগঞ্জ, চন্দ্রকোণা, ঘাটাল, বাগনান ও আমতা। এই ঘাটাল থানার মধ্যে ছিল বীরসিংহ গ্রাম যেখানে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন।

পরে ১৮১৪ সালে ২৪ পরগনা থেকে হুগলি জেলায় এসেছিল রাজাপুর ও বৈদ্যবাটি থানা। ১৮১৯-এ জেলায় যুক্ত হয়েছিল কোটরা ও উলুবেড়িয়া থানা। ওলন্দাজদের থেকে চুঁচুড়া ইংরেজদের হাতে এলে ১৮৩১-এ চুঁচুড়া থানাও যোগ করা হলে সেই বৃহৎ হুগলি জেলায় থানার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৮। এবার একটা বড় বিয়োগের পালা এসেছিল। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি ২৬৮ নং সরকারি নির্দেশবলে হুগলি জেলার দক্ষিণাংশ নিয়ে হাওড়া জেলা গঠিত হয়েছিল এবং পূর্বোক্ত থানাগুলির মধ্যে বাগনান, আমতা, রাজাপুর, কোটরা ও উলুবেড়িয়া তার অংশীভূত হয়েছিল। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, বেশ কয়েকটি থানার নাম বা এলাকা বদল হয়েছিল; বন্ধনীর মধ্যে নতুন নামগুলি দেওয়া হল : বাঁশবেড়িয়া (মগরা), বেণীপুর (বলাগড়), রাজবলহাট (জাঙ্গিপাড়া), দেওয়ানগঞ্জ (গোঘাট), বৈদ্যবাটি (এলাকা বদল হয়ে সিঙ্গুর) ও কোটরা (শ্যামপুর) ১৮৪৫-এ দিনেমারের শ্রীরামপুর ইংরেজ অধিকারে আসায় হুগলি জেলার অংশ হয়েছিল।



ইমামবাড়া ॥ হুগলি — *ছবি শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়*

এর পরে ১৮৭২ সালের ১৭ জুন চন্দ্রকোণা ও ঘাটাল থানা মেদিনীপুর জেলায় গিয়েছিল। ফলে বিদ্যাসাগরের ৫২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বীরসিংহ গ্রাম মেদিনীপুর জেলার অংশীভূত হয়েছিল। ঐ একই তারিখে জাহানাবাদ ও গোঘাট থানা বর্ধমান জেলায় গিয়েছিল এবং এ দুটি থানা হুগলি জেলায় পুনরায় ফিরে এসেছিল ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪-এ জেলায় সিংটে আউটপোস্ট অঞ্চল ৪২টি গ্রামসহ শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে হাওড়া জেলায় গিয়েছিল। স্বাধীন ভারতে ১৯৫০ সালের ২ মে ফরাসি

---

*এর পাশাপাশি বেআইনি ঘুষের কারবারও চলেছিল। ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট দ্বারা নিযুক্ত অনুসন্ধান কমিটি যে হিসাব করেছিলেন তাতে জানা যায় যে, ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ পর্যন্ত সময়ে ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলা ও বিহার থেকে মোট ৬০ লক্ষ পাউন্ড অর্থাৎ নয় কোটি টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেছিল।

** ক্লাইভের আমলে বাংলা ও বিহারকে ছটি জেলায় এবং পরে ১৭৭৪ সালে বঙ্গদেশকে ১৪টি জেলায় ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম ভাগের সময়ই বর্ধমান জেলা তৈরি হয়েছিল।

চন্দননগর ভারতে এলেও সেটি আইনগতভাবে পশ্চিমবঙ্গের তথা হুগলি জেলার অংশ হয়েছিল ১৯৫৪-র ২ অক্টোবর তারিখে। জেলার এলাকার শেষ পরিবর্তন হয়েছে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাইয়ে যখন বর্ধমান জেলার রায়না থানার শাহলালপুর হুগলি জেলায় এসেছিল।

নতুন এই জেলা যে ভূভাগ নিয়ে গঠিত হয়েছিল প্রাচীনকালে সেটি সুহ্ম বা দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল। 'সিংহলী মহাবংশ ও দীপবংশে বলা হয়েছে যে, বিজয়সিংহের পিতা সীহবাহু লাঢ় বা লাট বা রাঢ় দেশের অধিপতি ছিলেন এবং তাঁর রাজধানী ছিল সীহপুর বা সিংহপুর।' এই সিংহপুর যদি হুগলি জেলার সিঙ্গুর হয়, তবে সীহবাহু অর্থাৎ সিংহবাহু অবশ্যই খ্রিস্টপূর্ব সাত শতকে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন।

আলেকজান্ডারের আমলে গাঙ্গেয় এই অঞ্চলকে গঙ্গারিডেই (Gangaridae) বলা হত। ('গঙ্গা-হৃদয়' কি এইভাবে উচ্চারিত হয়েছিল?) টলেমি (Ptolemy) ও Periplus of the Erythraean Sea গ্রন্থের লেখক 'গাঙ্গে' (*Gange*) নামে যে ব্যবসা কেন্দ্রের উল্লেখ করেছিলেন সেটি সম্ভবত সপ্তগ্রাম। হুগলি জেলা সম্পর্কে পরবর্তীকালে বলা হয়েছিল—"This district undoubtedly played an important part in the Mauryan civilization. It is Satagaon (*Ganga*) that is probably described by Ptolemy as the capital of Gangaridae, Saraswati being the *Ganges Regia*."[১]

১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে আকবরের রাজস্বমন্ত্রী টোডরমল বঙ্গদেশে যে জরিপ করেছিলেন তার নাম 'আসলি জমা তুমহার'। জরিপের পর বাংলাকে মোট ১৯টি 'সরকার'-এ ভাগ করা হয়েছিল; তাতে পরগনা ছিল ৬৮২টি, হুগলি জেলা ও তৎসংলগ্ন কিছু অঞ্চলকে নিয়ে সে সময়ে যে তিনটি 'সরকার' ছিল তারা হল—সাতগাঁও, সুলেমানাবাদ ও মান্দারণ। এদের মধ্যে সরকার সাতগাঁও-এ ৪১টি পরগনা (Administrative Unit) ও ৫৩টি মহল (Fiscal Unit) ছিল। হুগলি-চুঁচুড়া শহর ছিল সাতগাঁও-এর 'আরসা' পরগনায়। ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ যে জরিপ করেছিলেন তার নাম 'জমা-ই-কামিল তুমহার'। তখন সুবে বাংলাকে ১৩টি 'চাকলা' ও ১৬৬০টি পরগনায় ভাগ করা হয়েছিল। তার মধ্যে সপ্তগ্রাম চাকলায় ছিল ১১৩টি পরগনা।

১৭৯৫ সালে মূলত বর্ধমান জেলার অঙ্গচ্ছেদ করে হুগলি জেলা গঠিত হলেও রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেকদিন পর্যন্ত নতুন এই জেলা বর্ধমান কালেক্টরের অধীন ছিল। পরে ১৮২২-এর মে মাসে হুগলি জেলার নিজস্ব কালেক্টরেট হয়েছিল। আগে এক জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের শাসনাধীন এলাকা জেলা বলে পরিগণিত হত। নবগঠিত হুগলি জেলার প্রথম জজ-ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন সি এ ব্রুস (C.A. Bruce) এবং পৃথক কালেক্টরেট স্থাপিত হওয়ার পর প্রথম কালেক্টর ছিলেন উইলিয়াম বেলী (William Belli)। ১৮২৯ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর হুগলি জেলায় জজের পৃথক অফিস হয়েছিল এবং এখানে প্রথম জজ হলেন ডি সি স্মিথ (D. C. Smyth)*।

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে জেলার রাস্তাঘাট নির্মাণ, স্বাস্থ্যোন্নতি, শিক্ষা, পানীয় জল সরবরাহ প্রভৃতি জনহিতকর কাজ করার জন্য হুগলি জেলা বোর্ড গঠিত হয়েছিল। জেলা বোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান হয়েছিলেন জি টয়েনবি (G. Toynbee); এঁর লেখা A sketch of the Administration of the Hooghly District জেলার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এক মূল্যবান দলিল।

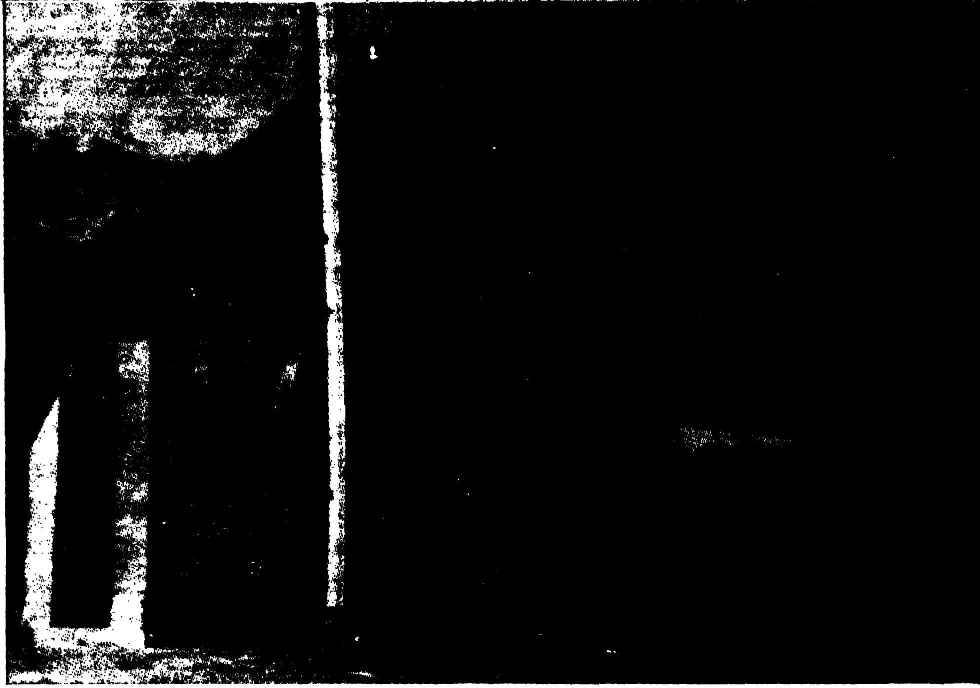
থানাগুলি যোগ-বিয়োগের পর ১৮৭২ সালে তদানীন্তন হুগলি জেলায় দশটি থানা ছিল। তখন হুগলি সদর মহকুমায় ছিল হুগলি, বাঁশবেড়িয়া, বলাগড়, পাণ্ডুয়া ও ধনিয়াখালি—এই পাঁচটি থানা। বাকি পাঁচটি থানা—শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটি, হরিপাল, কৃষ্ণনগর ও চণ্ডীতলা ছিল শ্রীরামপুর মহকুমায়। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে জাহানাবাদ, গোঘাট ও খানাকুল থানা নিয়ে জেলার তৃতীয় মহকুমা জাহানাবাদ গঠিত হয়েছিল। কিন্তু বিহারের গয়া জেলায় আর একটি জাহানাবাদ থাকার কারণে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ এপ্রিলের গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুসারে জাহানাবাদের বদলে নাম হল আরামবাগ। জেলার চতুর্থ মহকুমা হিসাবে চন্দননগর মহকুমা তৈরি হয়েছিল ১৯৫৪ সালের শেষ দিকে চন্দননগর থানা ও শ্রীরামপুর মহকুমার ভদ্রেশ্বর, সিঙ্গুর, হরিপাল ও তারকেশ্বর থানা নিয়ে।

এখন পুরাতন দিনের বিশেষ কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। ১৮২৬ সালে চুঁচুড়া থেকে কলিকাতা পর্যন্ত স্টিমার যাতায়াত করত। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ভারতে প্রথম লোকগণনা (Census) শুরু হলেও ১৮৩৭ সালে হুগলির তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট ই. এ. স্যামুয়েলস (E. A. Samuells) এই জেলায় লোকগণনা করিয়েছিলেন। তিনি ১৮৪০-এর ৫ জুন তারিখে হুগলি, চুঁচুড়া ও ব্রিটিশ চন্দননগরের অধিবাসীদের এক সভা হুগলিতে আহ্বান করেছিলেন এবং তিনটি অঞ্চল থেকে তিনজন হিসাবে মোট ন'জনের একটি মিউনিসিপ্যাল কমিটি তৈরি করার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন সৈয়দ কেরামত আলি এবং সম্পাদক ছিলেন ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পৌর শাসনব্যবস্থার এটি ছিল অঙ্কুর। পরে কেরামত আলির স্থলে সভাপতি হয়েছিলেন মৌলভী আকবর শাস। ১৮৪৬ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু ছিল। ১৮৩০ সালে মিঃ অলিভারের (Oliver) নেতৃত্বে একটি বিশেষ জরিপ** হুগলি জেলায় শুরু হয়েছিল। এ জাতীয় জরিপে সমগ্র অঞ্চলকে ত্রিভুজে ভাগ করা হল ফলে ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য কমপক্ষে ৮ মাইল ছিল। এর জন্য বেশ কিছু স্টেশন (৮১ ফুট উঁচু সিমেন্টের স্তম্ভ) তৈরি করা হয়েছিল। সেই জরিপের প্রথম স্তম্ভটি এখনও হুগলি কলেজ ভবনের উপর বর্তমান আছে। কামারকুণ্ডু স্টেশন থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে ভোলা গ্রামে এরূপ একটি জরিপ স্তম্ভ দেখা যায়; অবশ্য ভুলক্রমে এটিকে 'ভোলার গীর্জা' বলা হয়। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত রেলগাড়ি চলেছিল; ১ সেপ্টেম্বর থেকে গাড়ি চলেছিল পাণ্ডুয়া পর্যন্ত। অবশ্য বঙ্গদেশে প্রথম এই রেলযাত্রার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চালানো হয়েছিল ২৮ জুন, ১৮৫৪।

পাশ্চাত্য ভাবনায় জেলাতে ব্যাপকভাবে শিক্ষাদান কার্য শুরু করেছিলেন রবার্ট মে নামক লন্ডন মিশনারি সোসাইটির এক যাজক। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি চুঁচুড়ায় নিজের বাসভবনে বালকদের জন্য

---

*তিনি দ্বিতীয় দফায় ১৮২৬ থেকে হুগলি জেলায় জজ ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ১৮২৯ থেকে কেবল জজ হলেন।



ডাচ গির্জা ॥ চুঁচুড়া

একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তী চার বৎসরে তাঁর প্রথম বিদ্যালয়টিকে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় হিসাবে রেখে তিনি বিভিন্ন স্থানে ৩৬টি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এ কথা মনে রাখা দরকার, বিদেশি এই মানুষের বিদ্যালয়গুলিতে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হত এবং এগুলি ছিল অবৈতনিক। ১৮১৮ সালে মে সাহেব ১৪টি ছাত্রী নিয়ে চুঁচুড়ায় যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, সেটি বঙ্গের, সম্ভবত ভারতেরও প্রথম স্বতন্ত্র বালিকা বিদ্যালয়। অবশ্য মে'র অকাল মৃত্যুর পর লন্ডন মিশনারি সোসাইটি বঙ্গদেশের এই প্রথম বালিকা বিদ্যালয়টি বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

মুদ্রণ যন্ত্র শিক্ষা তথা সভ্যতার এক অসাধারণ বাহন। এ দেশে বাংলা অক্ষর-সমন্বিত প্রথম প্রিন্টিং প্রেস স্থাপিত হয়েছিল হুগলি জনপদে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে। প্রেসের নাম ছিল এ্যানড্রুস প্রেস। এখানে উইলকিন্‌স সাহেবের তত্ত্বাবধানে বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত ব্যাকরণ ন্যাথানিয়েল ব্রাসী হ্যালহেড লিখিত 'A grammer of the Bengal language' মুদ্রিত হয়েছিল।

১৮০০ সাল থেকে কেরী সাহেবের শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ছাপার কাজ শুরু হলে সেখান থেকে ১৮০১-এ বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম জীবনীগ্রন্থ 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' মুদ্রিত হয়; লেখক কেরী সাহেবের মুন্সী রামরাম বসু চুঁচুড়ার কনকশালির বাসিন্দা ছিলেন।

বাঙালি সম্পাদিত প্রথম সংবাদপত্র 'বাঙ্গাল গেজেটি' ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল; সম্পাদক ছিলেন হুগলি জেলার বড়াগ্রাম নিবাসী গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। এই বৎসরেই শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশনের উদ্যোগে প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র 'দিগ্‌দর্শন', বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ', ও ইংরেজি সংবাদপত্র 'Friend of India'-র প্রকাশ ঘটেছিল। বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম বিজ্ঞানগ্রন্থ 'বিদ্যাহারাবলী' ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয়েছিল। লেখক উইলিয়ম কেরীর পুত্র ফেলিক্স কেরী। শ্রীরামপুরে ১৮০৯ সালে কেরী সাহেব যে কাগজের কল স্থাপন করেছিলেন তাতে স্টিম ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়েছিল। এটাই ভারতে, সম্ভবত এশিয়াতেও স্টিম ইঞ্জিনের প্রথম ব্যবহার। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর কলেজ খ্রিস্টীয় ধর্মশাস্ত্র পড়াশুনার ক্ষেত্রে স্নাতক ডিগ্রি প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিল; সে দিক থেকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়।

বৈদ্যবাটির মধুসূদন গুপ্ত হুগলি জেলাকে দুটি সম্মান এনে দিয়েছিলেন। ১৮৩৬ সালে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় প্রথম চিকিৎসা পুস্তক 'ভেষজ বিজ্ঞান' তাঁর লেখা। তিনিই এই বৎসরে ১০ জানুয়ারি তারিখে শব ব্যবচ্ছেদ করে এ বিষয়ে বাঙালিদের মধ্যে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন।

ভারতের প্রথম কৃষি বিদ্যালয় Peasant Boy's school উত্তরপাড়া হিতকরী সভার উদ্যোগে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে উত্তরপাড়ার পার্শ্ববর্তী মাখলা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিধবা বিবাহ সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের জন্য ভারত সরকারকে যে আবেদন বিদ্যাসাগর পাঠিয়েছিলেন, তাতে প্রথম স্বাক্ষরকারী ছিলেন উত্তরপাড়ার বিদ্যোৎসাহী জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ভারতে প্রথম নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার গৌরব তাঁরই। তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রথম দাতা।

প্রথম বাংলা-হিন্দি দ্বিভাষী পত্রিকা 'ধর্মপ্রচারক' গুপ্তিপাড়ার কৃষ্ণানন্দ সেন সম্পাদিত হয়ে ১৮৭৭-এর অক্টোবরে প্রকাশিত হয়েছিল। গুপ্তিপাড়ার ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলি সাবস্ক্রিপশন স্কুলের প্রধান হিসাবে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালি প্রধান শিক্ষক এবং কলেজে ইংরেজি ভাষার প্রথম বাঙালি অধ্যাপক। ইনিই হুগলি কলেজে স্বনামখ্যাত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শিক্ষক ছিলেন।

সম্মোহন বিদ্যা প্রয়োগে ভারতে প্রথম শল্য চিকিৎসা প্রবর্তন করেছিলেন হুগলির সিভিল সার্জন ও হুগলি কলেজের অধ্যক্ষ ডা. জেমস এসডেল ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে।

বঙ্গ মহিলা লিখিত প্রথম মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থ 'চিত্তবিলাসিনী'র (১৮৫৬) লেখিকা কৃষ্ণকামিনী দাসী বলাগড় থানার সুখাড়িয়া গ্রামের মিত্র মুস্তৌফী বংশের গৃহবধূ ছিলেন। ১২৭৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখের প্রথম দিনে প্রকাশিত বাঙালি মহিলা সম্পাদিত প্রথম পাক্ষিক সাময়িক পত্র 'বঙ্গ মহিলা'র সম্পাদিকা মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় হুগলি জেলার। তাঁর ভ্রাতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি। উত্তরপাড়ার বিপ্লবী অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পিসিমা ননীবালা দেবী ছিলেন বঙ্গের প্রথম স্বীকৃত মহিলা রাজবন্দি।

হুগলি জেলা বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির জন্মস্থান। তাঁরা হলেন—রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, রঘুনাথ দাসগোস্বামী, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, হাজী মহম্মদ মহসীন, দাতা গৌরী সেন, উদ্ধারন দত্ত, রামগতি ন্যায়রত্ন, যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, তারকনাথ পালিত, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাচরণ সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, রানী রাসমণি, দ্রবময়ী দেবী, রামনিধি গুপ্ত, দিগম্বর মিত্র, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র রায়, দ্বারকানাথ মিত্র, মতিলাল রায়, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ আমির আলি, রামগোপাল ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, কানাইলাল দত্ত, গোপীনাথ সাহা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ড. সহায়রাম বসু, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ডা. উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, নন্দলাল বসু, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ।

এ ছাড়া পূর্বপুরুষের আদি নিবাস সূত্রে বা কর্মসূত্রে হুগলি জেলার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, শ্রীঅরবিন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

হুগলি জেলার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনার কথা ও স্বনামখ্যাত মানুষদের কাহিনী আরও বেশি সংখ্যায় উপস্থিত করা যেতে পারে। কিন্তু প্রবন্ধের সীমাবদ্ধ পরিসরে পূর্ণ আলোচনা সম্ভব নয়।

পরিশেষে একথা বলা যায়, দেশের অন্য অংশের মতো হুগলি জেলারও ইতিহাস ছিল ইংরেজ ও তার লুণ্ঠনের অংশীদার জমিদার, মহাজন, বেনিয়ান ইত্যাদির শোষণে সর্বস্বান্ত, উৎপীড়নের শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং বহুবিধ অত্যাচারে মুমূর্ষু কৃষকের তথা জনসাধারণের রক্তরঞ্জিত ইতিহাস। অবশেষে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট দেশ স্বাধীন হল দেশভাগের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে। বহু নতুন সমস্যা দেখা দিল; জোড়াতালি দিয়ে কোনওরকমে সেগুলির সমাধানের চেষ্টাও হল। স্বাধীন ভারতে কৃষি-শিল্প-শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সুযোগ-সুবিধাগুলি এল, তা প্রধানত সুযোগ-সন্ধানী ও সুবিধাভোগী সম্প্রদায়েরই কাজে লাগল। বঞ্চিত কৃষক-শ্রমিক ও অন্য অবহেলিত শ্রেণীর জীবনে তেমন উন্নতি দেখা গেল না। দেশের এ ছবি হুগলি জেলারও।

পরে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে পশ্চিমবঙ্গে যে ত্রিস্তর গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়েছে, তার মাধ্যমে জনসাধারণকে জড়িত করে কর্মযজ্ঞ শুরু করা গিয়েছে। হুগলি জেলাতেও বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে শুভকর পরিবর্তন আনা সম্ভব হচ্ছে। 'পঞ্চায়েতীরাজ প্রবর্তনের ফলে গ্রামীণ সমাজ জীবনে আধুনিকীকরণ (Modernisation) শুরু হয়েছে এবং নতুন নেতৃত্বের প্রভাবে সমস্ত বাধা দূর হয়ে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটতে চলেছে বলা যেতে পারে। স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কেও গ্রামবাসীরা অনেক সচেতন হয়েছেন এবং সমাজ-জীবনের দুর্বল শ্রেণীকে কিছু কিছু সুযোগ এনে দিয়েছে এই নতুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। তাই আশা করা যায় পঞ্চায়েতীরাজ প্রবর্তনের ফলে গ্রামীণ সমাজ-জীবনে সর্বস্তরে মানুষের কাছে আধুনিক সুসমৃদ্ধ সুন্দর জীবনের আলো পৌঁছে যাবে।'[৮]

তবে এই আশা কেবল পঞ্চায়েতীরাজের সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও পঞ্চায়েত সংগঠকদের কর্মদক্ষতার দ্বারাই বাস্তবায়িত হবে না। আমলাতান্ত্রিক নানা বাধা ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরোধিতার মুখেও পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে, তার পিছনে আছে গণতান্ত্রিক নানা আন্দোলনের, বিশেষ করে কৃষক আন্দোলনের শিক্ষা। এ-কথা মনে রেখে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্য বাস্তবায়িত করার জন্য চিন্তা ও চেতনার বিপ্লবমুখী উত্তরণ চাই। এ ক্ষেত্রে অগ্রপথিকদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার প্রয়োজনে জেলার বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাস অনুশীলন করতে হবে। হুগলি জেলার দ্বিশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ব্যাপক ও গভীর অনুসন্ধানের পর সেই সব আন্দোলনের তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার উদ্যোগ নেওয়া দরকার। এ বিষয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কাজ হলেও আন্দোলনের অনেক কথাই সেভাবে অনুশীলনের অভাবে অজানা থেকে গেছে। ফ্রেডেরিখ্ এঙ্গেলস্ (Frederick Engels)। বলেছিলেন—'জনসাধারণই তাদের ইতিহাসের স্রষ্টা'। তাই প্রয়োজন জনগণকে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে গণ-আন্দোলনগুলির যথার্থ ইতিহাস রচনা এবং তার নিরিখে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে বৈপ্লবিক সংগ্রাম।

উল্লেখপঞ্জী—

(১) History of the Portuguese in Bengal–J. J. A. Campos (1919). p 25.

(২) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, December 1892 মাসিক বসুমতী—মাঘ ১৩৪০, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'হুগলী জেলার ইতিহাস' প্রবন্ধ, পৃ. ৬১০-এ উদ্ধৃত।

(৩) History of the Portuguese in Bengal–J. J. A: campos (1919) p. 52.

(৪) Hooghly past and present–S. C. De (1906), p. 163.

(৫) History of the Portuguese in Bengal–J. J. A. campos (1919), p. 44.

(৬) হুগলী জেলার ইতিহাস—সুধীরকুমার মিত্র, প্রথম সংস্করণ, (৩০শে আশ্বিন ১৩৫৫), পৃ। ৪৫-৪৬।

(৭) History of the Portuguese in Bengal–J. J. A campos (1919) p. 22.

(৮) পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা—ড. অসিতকুমার বসু, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ. ২৬০-৬১।

স্বাধীনতা সংগ্রামে হুগলি জেলা

কমল চট্টোপাধ্যায়



ইংরেজ শাসনের বহুপূর্ব থেকেই বিদেশি শক্তি ভারতে এসে বাণিজ্যিক স্বার্থে শোষণ, অত্যাচার ও আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। বাংলাদেশে তাদের সবগুলি ঘাঁটিই প্রথমে হুগলি জেলাতে হয়েছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজরা আসে। তারপর আসে ওলন্দাজরা। দিনেমাররা আসে সপ্তদশ শতকের শেষদিকে। তারা ব্যবসায়ের প্রধান ঘাঁটি করে চন্দননগরে, এখন যাকে দিনেমারডাঙা বলা হয়, সেই অঞ্চলে। ফরাসিরা আসে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি। চন্দননগরে তাদের ঘাঁটি করে। ইংরেজরা ১৬৫৭-তে হুগলিকে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র করে।

তখন হুগলি জেলা সপ্তগ্রাম ছিল একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। বিদেশি শক্তিরা এর কাছাকাছিই তাদের ঘাঁটি করে।

বিদেশ থেকে আসা এই সব শক্তি এখানের সাধারণ মানুষের ওপর নৃশংস অত্যাচার চালাত। তাদের সর্বস্ব লুট করত, নরহত্যা করত। ইংরেজ শাসনের প্রথম পর্যায়েও ছিল বেপরোয়া লুণ্ঠন।

ইংরেজ শাসনকালে যখন শিল্পে পুঁজির নিয়োগ শুরু হল, তখন প্রথম হল চা-বাগান। তারপর হল চটকল প্রতিষ্ঠা। ১৮৫৪-তে হুগলি জেলার রিষড়াতেই প্রথম চটকল প্রতিষ্ঠা হয়। তার পরের বছরে এ জেলার শ্রীরামপুর ও চাঁপদানিতে চটকল তৈরি হয়।

রেলপথও হুগলি জেলায় ১৮৫৪-তে হাওড়া থেকে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত হয়।

চটকল শ্রমিকদের ওপর নিদারুণ শোষণ ও অত্যাচার হত। পুরুষ, নারী ও অল্প বয়স্ক শ্রমিকদের বারো থেকে তেইশ ঘণ্টা খাটান হত। কোনও দিনই ছুটি দেওয়া হত না। এই অত্যাচারের প্রতিবাদে জেলার কোনও কোনও চটকলে শ্রমিকদের সংগ্রাম হয়। ১৯৭৯-৮০ সালে চটকল শ্রমিকদের সংগ্রাম হুগলি জেলা থেকেই শুরু হয়।

জাতীয় আন্দোলনের সূচনা

উনবিংশ শতকের গোড়াতেই যে নবজাগরণের আন্দোলন বাংলায় গড়ে উঠেছিল, তাদের পুরোধা হুগলি জেলারই রাধানগর গ্রামের রামমোহন রায়। ডিরোজিওর শিষ্য ইয়ং বেঙ্গল গ্রুপের রামগোপাল ঘোষ, কবি রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র প্রমুখ জন্মেছিলেন এ জেলাতেই। উনবিংশ শতকের সমাজসংস্কার ও শিক্ষা প্রসারের জন্য উৎসর্গীকৃত যাঁর জীবন, সেই চিরস্মরণীয় বিদ্যাসাগরও এ জেলারই ছিলেন। এ সব মনীষীর চিন্তাধারা ও কাজ জাতীয়তাবাদী মানসিকতার ভিত্তি তৈরি করে দেয়।

১৮৭৬-এ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু 'ভারতসভা' গঠন করেন। হুগলি জেলার নানা স্থানে ভারতসভা প্রচার আন্দোলনে নামে। প্রজাদের উপর জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতসভা জনমত সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চালায়। এই সময় এ জেলার তারকেশ্বরে এক জনসভা হয়। সেখানে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু জমিদারদের এই অত্যাচারের প্রতিবাদ জানান। তখনকার এদেশি সংবাদপত্রগুলিও 'ভারতসভার' সমর্থনে থাকে।

ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণী উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে সম্মুখের সারিতে আসে। ১৮৫৩ সালে প্রথম সুতাকল প্রতিষ্ঠিত হয় বোম্বাইয়ে। ১৮৮০ সাল পর্যন্ত ১৫৬টি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজ সরকার ১৮৮২ সালে বিলাতি সূতিবস্ত্র, উৎপাদনকারীদের স্বার্থে আমদানি বিলাতি বস্ত্রের ওপর থেকে সকল প্রকার কর উঠিয়ে নিল। ভারতীয় বুর্জোয়াদের ওপর এই আঘাত আসার পর ইংরেজ সরকারের সঙ্গে তাদের সংঘাত শুরু হল। ফলে ১৮৮৫ সালে বোম্বাইতে 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠিত হল। হুগলি জেলার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ই তার প্রথম সভাপতি।

ওই সময় দেশের অনেক জায়গায় শোষিত, দারিদ্র্যপীড়িত ও অত্যাচারিত কৃষকদের অসন্তোষ প্রকাশ পাচ্ছিল। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ, তার আগে ও পরে কৃষকদের অনেক জঙ্গি সংগ্রাম ভারতের পরিস্থিতিকে জাতীয় আন্দোলনের অনুকূলে নিয়ে আসে। ইংরেজ সরকার এই অবস্থা লক্ষ করেই বেপরোয়া পুলিশী অত্যাচার চালাতে থাকল। সেই সঙ্গে আইন জারি করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করল। জনসভার অধিকার, মতপ্রকাশের অধিকার এবং অস্ত্র আইন চালু করে বন্যজন্তুর হাত থেকে গ্রামবাসীদের আত্মরক্ষার অধিকারও কেড়ে নিল।

এর বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রে ও বাংলায় প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিল। ইংরেজ সরকার বাংলার মানুষের এই বিক্ষোভ ও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসারকে ধ্বংস করার জন্য ১৯০৫-এ 'বঙ্গভঙ্গ'-র সিদ্ধান্ত নিল।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাংলায় এক বিপুল আন্দোলন গড়ে উঠল। হুগলি জেলার উত্তরপাড়া, চন্দননগর, চুঁচুড়ায় এই আন্দোলন ক্রমশ ব্যাপক হতে লাগল। এই সব স্থানের জনসভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আসেন। তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণে যুবসম্প্রদায় জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে।

হুগলি জেলার সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'ডন সোসাইটি' গড়েন। বিলাতি দ্রব্য বয়কট, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার—এই প্রচার ডন সোসাইটি ছাত্র-যুবকদের মধ্যে করতে থাকে। উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'ডন সোসাইটি'র সভ্য ছিলেন। তিনি ছাত্র-যুবকদের লাঠি ও ছোরা খেলা শেখানরও ব্যবস্থা করেন।

ফরাসি অধিকৃত চন্দননগরে এই স্বাদেশিকতার চেতনা যুবসমাজকে প্রভাবিত করে। এখানে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল রায় ছাত্র-যুবকদের সংগঠিত করেন। চারুচন্দ্র রায় ছিলেন এখানের এক খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব। তাঁরই ছাত্র কানাইলাল দত্ত দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে অমর শহিদ হলেন। চুঁচুড়া, হুগলিতেও বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের জোয়ার ওঠে। জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ হুগলি কলেজে অধ্যাপক এবং পরে গড়বাটী স্কুলের প্রধানশিক্ষক থাকার সময় বহু ছাত্রকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন।

জাতীয়তাবাদী মনোভাব এবং দেশের স্বাধীনতালাভের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আন্দোলন যত প্রসারিত হতে থাকে, ইংরেজ সরকার তার দমন-পীড়নকে ততই তীব্রতর করতে থাকে। এ জেলার খন্যানের ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁর 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লেখা প্রকাশ করতে থাকেন। ফলে তাঁকে রাজদ্রোহ অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারাধীন থাকার সময়ই তিনি মারা যান। ইংরেজ সরকার 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিকেও নিষিদ্ধ করে।

ইংরেজ সরকারের চরম অত্যাচার, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সভা-সমিতির অধিকার হরণ, দৈহিক নিপীড়ন—সেই সঙ্গে এই অত্যাচারী ইংরেজ সরকারের সঙ্গে তখনকার কংগ্রেসের সহযোগিতার মনোভাব—এ সবই বুদ্ধিজীবী ও যুবসম্প্রদায়কে প্রবল বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তাদের একাংশ জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী সংগ্রামের পথেই এগোতে থাকে।

জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের সংগ্রাম

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই এই সব জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীর কার্যকলাপ শুরু হয়। ব্যারিস্টার পি মিত্র 'অনুশীলন সমিতি' গঠন করেন। এই সমিতি কোনও কোনও জেলাতেও গড়ে ওঠে। সমিতির উদ্যোগে শারীরচর্চা, লাঠি ও ছোরা খেলা শেখান হত।

১৯০২ সালে অরবিন্দ ঘোষ পুণায় গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর ভাই বারীন্দ্রনাথ ঘোষকে বাংলায় পাঠান বিপ্লববাদী সংগঠন গড়ার জন্য। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বাতিলের জন্য বাংলায় গণ-আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠল। এই পরিস্থিতিতে বারীন্দ্রনাথ ঘোষ ইংরেজ সরকারের ওপর সশস্ত্র আঘাত করার

প্রচার চালাতে লাগলেন। চন্দননগরের উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ করলেন। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হন। এই পত্রিকাতেও সশস্ত্র সংগ্রামের প্রচার করা হতে থাকল।

এ জেলায় ফরাসি অধিকৃত চন্দননগর ক্রমশ জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠল। চন্দননগরের চারুচন্দ্র রায় বিপ্লববাদী চিন্তায় যুবকদের উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কানাইলাল দত্ত তাঁরই প্রেরণায় বিপ্লববাদী সংগঠনে আসেন। ১৯০৮ সালে কিংসফোর্ড হত্যা প্রচেষ্টার সূত্রে বারীন ঘোষ গ্রেপ্তার হন। চন্দননগরের উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাইলাল দত্ত গ্রেপ্তার হন। রাজসাক্ষী বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে কানাইলাল জেলের মধ্যে হত্যা করেন। চন্দননগরের বিপ্লবীরাই জেলের মধ্যে কানাইলালের কাছে রিভলবার পৌঁছে দেন।

ফরাসি চন্দননগরে প্রথমদিকে কোনও 'অস্ত্র আইন' ছিল না। সেই সুযোগে সংগ্রহ করা রিভলবার চন্দননগরেই জমা করা হত।

১৯০৭ সালে চন্দননগরের কাছে বাংলার গভর্নরের রেলগাড়ি উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হয়। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। ফরাসি সরকার যখন চন্দননগরবাসীর ওপর বাধা-নিষেধ আরোপ করে, তখন চন্দননগরের ফরাসি শাসকের ওপর আক্রমণ করার চেষ্টা হয়, কিন্তু তাও কার্যকরী হয় না।

অত্যাচারী ইংরেজ অফিসারদের হত্যা করার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে সেনা বিদ্রোহের দ্বারা প্রবল আঘাত করার পরিকল্পনা করেন চন্দননগরের বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। কিন্তু এটিও কার্যকরী হল না।

ফরাসি চন্দননগর তখন ছিল বোমা তৈরির কেন্দ্র। চন্দননগরের নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও মণীন্দ্রনাথ নায়েক ছিলেন বোমা তৈরির নায়ক। ১৯১২ সালে দিল্লিতে লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যার জন্য যে বোমাটি তৈরি হয়েছিল, সেটি মণীন্দ্রনাথ নায়েকেরই হাতে গড়া। চন্দননগরের শ্রীশচন্দ্র ঘোষও এই পরিকল্পনার প্রধান ভূমিকায় ছিলেন।

বিপ্লবীদের গোপন আশ্রয়স্থলও ছিল চন্দননগরে। ফরাসি ও ইংরেজ সরকারের মধ্যে কিছু বিরোধ ছিল। সেই কারণেই ১৯১৬ সালে চন্দননগরে আশ্রয়প্রাপ্ত বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার ও অস্ত্রশস্ত্রের গোপন ঘাঁটি উদ্ধার করার যে প্রচেষ্টা টেগার্ট করে, তা ফরাসি পুলিশ কমিশনারের বাধা দেওয়ায় কার্যকরী হয় না।

শ্রীরামপুরের জিতেন লাহিড়ী 'গদর পার্টি'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কামারকুণ্ডুর ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ভারতের বাইরে অনেক জায়গাতেই গিয়েছিলেন। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অস্ত্রবোঝাই জাহাজ 'মোভারিক' যাতে সুন্দরবনের পথে আসে, তার ব্যবস্থা করতে হুগলির ভূপতি মজুমদারের ওপর দায়িত্ব দেন।

অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ সরকারের ওপর সশস্ত্র আঘাত হানার একটি পরিকল্পনা করেন। সেটির নাম ছিল 'A plan of a rising on the Ajoy'। পুলিশ চন্দননগরের ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে এটি পায়।, জ্যোতিষচন্দ্রও গ্রেপ্তার হন।

১৯২১-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের কিছুদিন পরে শ্রীরামপুরের গোপীনাথ সাহা টেগার্টকে হত্যা করতে গিয়ে ভুল করে অন্য একজনকে হত্যা করেন। বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এ জেলার হরিনারায়ণ চন্দ ও প্রবেশ চট্টোপাধ্যায়।

চট্টগ্রামের যুববিদ্রোহের পর সেখানের বিপ্লবীদের কয়েকজনকে চন্দননগরে আশ্রয় দেন বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৩৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রে টেগার্ট সশস্ত্রবাহিনী নিয়ে সেই বাড়িতে হানা দেয়। পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবীদের গুলি বিনিময় হয়। মারা যান মাখন ঘোষাল। গ্রেপ্তার হন গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত। সেই বাড়ি যাঁদের জিম্মায় ছিল, তাঁরা—শশধন আচার্য এবং সুহাসিনী গাঙ্গুলীও গ্রেপ্তার হন। এই ঘটনার পর চন্দননগরের জনগণ উত্তাল হয়ে ওঠে।

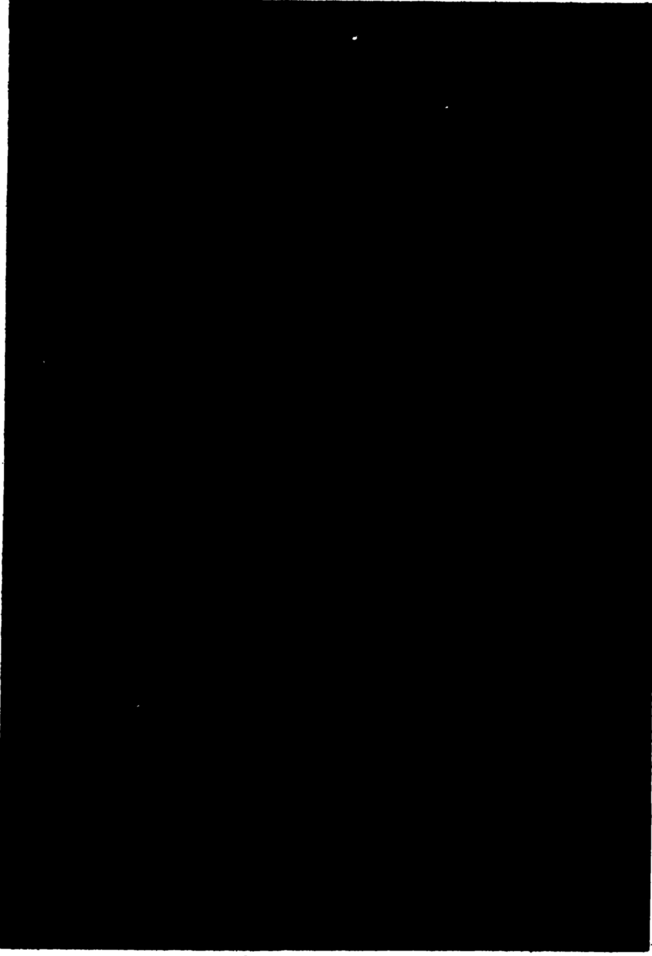
মেদিনীপুর জেল থেকে পলাতক বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার, নলিনী দাস ও শচীন করগুপ্তকে চন্দননগরে আশ্রয় দেওয়া হয়। ব্রজেন পাল কুণ্ডুঘাটে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে উঠানে কয়লার গোলা করেন। আর ভেতরে ওই তিনজনকে লুকিয়ে রাখেন। কিছুদিন পর কোনও সূত্রে খবর পেয়ে চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার কাঁ্যা সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে ওই বাড়িতে হানা দেয়। শচীন করগুপ্ত গোপনে কয়েকদিন আগে হুগলিতে গিয়েছিলেন চন্দননগরের প্রকাশ দাসের সঙ্গে। পথে তাঁরা দুজনেই ধরা পড়ে যান। ফরাসি পুলিশ ওই বাড়িতে হানা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দীনেশ মজুমদার ও নলিনী দাস রিভলবার হাতে রাস্তা দিয়ে ছুটতে থাকেন। পুলিশ কমিশনার সাইকেলে তাঁদের কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা তাকে গুলি করেন। পুলিশ কমিশনার তৎক্ষণাৎ মারা যায়, তারপর তাঁরা জেলার বাইরে চলে যান।

জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের সশস্ত্র কার্যকলাপ ১৯৩৫-এ শেষ হয়।

তখন ভারতের বিভিন্ন বন্দিশালায় এবং আন্দামানের কারাগারে যে সব জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই সমাজতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করেন এবং কারামুক্তির পর গণ-সংগ্রামেই আত্মনিয়োগ করেন। আমাদের জেলার কারামুক্ত এই বিপ্লবীদের প্রায় সকলেই শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন।

জাতীয় আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়

১৯১১-এ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর দেশে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়, সেটিকে লক্ষ্য করেই ১৯২১-২২ সালে গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন হয়। হুগলি জেলাতেও সে আন্দোলনে সাড়া পড়ে। অনেক উকিল, মোক্তার, ছাত্র-যুবক এই আন্দোলনে যোগদান করেন। অনেকে তাঁদের অর্থোপার্জনের পেশা পরিত্যাগ করে গান্ধিজীর অনুসৃত কর্মসূচির নানা কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। আইনজীবী নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গৌরহরি সোম ওকালতি ত্যাগ করলেন, সরকারি ইঞ্জিনিয়ার বিনয় মোদক তাঁর বৃত্তি ত্যাগ করলেন, অ্যাটর্নি দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডলও তাঁর পেশা থেকে সরে এলেন। ছাত্রদের মধ্যে থেকে এলেন বিজয় মোদক, সিরাজুল হক, হামিদুল হক, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকে। চৌরিচৌরার



রামমোহন রায়ের আবক্ষমূর্তি ॥ রাধানগর

ঘটনার পর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ায় অনেকেই বিক্ষুব্ধ হলেন ও পথ খুঁজতে লাগলেন।

এই সময় হুগলিতে গড়ে উঠল 'বিদ্যামন্দির'। বিদ্যামন্দির শুধু গান্ধীবাদীদেরই কেন্দ্র ছিল না, এটি ছিল তখনকার সকল রাজনৈতিক মতাবলম্বীর মিলনকেন্দ্র। গান্ধীবাদী নেতা ও কর্মীরা যেমন এখানে থাকতেন, তেমনি বিপ্লববাদী নেতা এবং তাঁদের দলভুক্ত কর্মীদেরও এটা আশ্রয়স্থল ছিল। শ্রীরামপুরের গোপীনাথ সাহা যাঁর টেগার্ট হত্যার অভিযোগে ফাঁসি হয়, তিনিও এখানে থাকতেন। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ধরণী গোস্বামী এবং গোপেন চক্রবর্তীও এখানে কিছুদিন ছিলেন।

হুগলি জেলার মানুষকে গান ও কবিতার দ্বারা যিনি উদ্বুদ্ধ করার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে গেছেন, সেই কবি নজরুলও মাঝে মাঝে বিদ্যামন্দিরে থাকতেন। পরে হুগলি জেল থেকে মুক্তির পর হুগলির একটি বাড়িতে বাস করতেন। চন্দননগরের সন্তান সংঘ ও গড়বাটীর কল্কি সংঘের অনেক অনুষ্ঠানে তিনি আবৃত্তি করতেন, গান করতেন।

১৯৩০-৩২-এর আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের পর কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে একটি অংশের একটা নতুন ভাবনা-চিন্তা দেখা দিল। অহিংস-অসহযোগ, আইন অমান্য, সত্যাগ্রহ—এই সব গান্ধীবাদী কৌশলে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে ভারতকে সম্পূর্ণ মুক্তি করা যাবে না—এই ধারণা একাংশের মধ্যে গড়ে উঠল। শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণী-সংগ্রাম তখন সংগঠিতভাবে গড়ে উঠছে। পৃথিবীর মধ্যে শ্রেণিহীন, শোষণহীন, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমশ অগ্রগতি হচ্ছে। তাই সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধেও আকর্ষণ গড়ে উঠতে থাকল। কংগ্রেসের মধ্যেই গঠিত হল 'কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল'। কমিউনিস্ট পার্টি শুরু থেকেই বেআইনি ছিল। গোপন পার্টি সংগঠনের সদস্যরা তখন সকলেই কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। এই অবস্থায় কংগ্রেসের মধ্যেই বামপন্থী কংগ্রেসি ও দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসি ভাগ হতে থাকল। আমাদের জেলায় ত্রিশের দশকের মধ্যভাগেই শ্রীরামপুর মহকুমা কংগ্রেস কমিটি ছিল বামপন্থী কংগ্রেসিদের হাতে, সদর মহকুমা কংগ্রেস কমিটিতে দুটি ভাগ হয়ে যায়, আরামবাগ মহকুমা কংগ্রেস কমিটি প্রফুল্ল সেনের নেতৃত্বে পুরো দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসিদের হাতে ছিল।

১৯৩৬-এ জওহরলালের সভাপতিত্বে ফৈজপুর কংগ্রেস অধিবেশনে ১৩ দফা কৃষি কর্মসূচি গৃহীত হয়। তাতে খাজনার হার কমান, কৃষকদের ঋণ মকুব প্রভৃতি থাকে। দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসিরা এর বিরুদ্ধে ছিলেন। তাই এই প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গেলেও, এটা যাতে কার্যকরী না হয়, তার জন্য তাঁরা প্রবল বাধা দিতে থাকেন।

১৯৩৭-এ ধনেখালিতে জেলা কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এখানে কংগ্রেসের বামপন্থী সদস্য পাঁচুগোপাল ভাদুড়ি, তুষার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন। তাঁরা কৃষিকর্মসূচি কার্যকর করার প্রস্তাব তোলেন। দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসি প্রফুল্ল সেন, অতুল্য ঘোষ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ওঁদের সংখ্যাধিক্যে প্রস্তাবটি গৃহীত হল না।

সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা ও শ্রমিক-কৃষক সংগ্রামের প্রসার

রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় ভারতেও অনেকে আকৃষ্ট হন। ভারত থেকে যাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়নে পৌঁছেছিলেন, তাঁরা সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হন এবং তাঁদের নিয়েই সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দে ১৯২০ সালে গড়ে উঠল 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'।

১৯২৮ সালে চন্দননগরে দুর্গাদাস শেঠ কলকাতা থেকে 'স্বদেশী বাজার' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তখনকার সমাজতান্ত্রিক মনোভাব-সম্পন্ন এবং শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠক অনেকেই এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। সমাজতন্ত্রবাদ, সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে নানা রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশ হতে থাকে। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর কিছুটা অংশ অনুবাদ করে এই পত্রিকায় বেরোয়। অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ জেল থেকে মুক্ত হয়ে কিছু যুবককে শ্রমিক-কৃষকদের শ্রেণী-সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য উৎসাহিত করে থাকেন। ১৯২৯ সালে চন্দননগরে 'যুব সমিতি' গঠিত হয়। তাঁর প্রধান সংগঠক ছিলেন কালীচরণ ঘোষ। 'যুব সমিতি' 'স্ফুলিঙ্গ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে। রুশ দেশে লেনিনের পরিচালিত 'ইসক্রা'র বাংলা নাম হিসেবেই 'স্ফুলিঙ্গ' নাম রাখা হয়। এটি ইংরেজশাসিত

এলাকা ভদ্রেশ্বর থেকে প্রকাশিত হত। কয়েকটি সংখ্যা বেরুনোর পর ইংরেজ সরকার এটিকে বন্ধ করে দেয়।

এই সময় অনেক সভায় নজরুলের 'সাম্যবাদী' কবিতা আবৃত্তি করা হত, ইন্টারন্যাশনাল গান গাওয়া হত। আবৃত্তি করতেন, গান গাইতেন প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, সিরাজুল হক, দয়াল কুমার। ছাত্র-যুবরা এই সব আবৃত্তি ও গানে খুবই উৎসাহিত হতেন।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত 'নবযুগ', 'লাঙল', 'গণবাণী' প্রভৃতি পত্রিকা। এই সব পত্রিকায় লাঞ্ছিত শ্রমিক-কৃষকের কথা থাকত এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গণবিপ্লবের দ্বারাই ভারতের স্বাধীনতা লাভ করা যাবে, গান্ধীবাদী বা বিপ্লববাদী পথে নয়—এই দৃষ্টিভঙ্গিই প্রচারিত হত। ১৯২৫-এ যে 'ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজান্টস পার্টি গঠিত হয়। হুগলি জেলার কালী সেন তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি তখনই চটকল শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতেন। ১৯২৭-২৮ সালে সারাবাংলায় চটকল শ্রমিকের যে বিরাট সংগ্রাম হয়, হুগলি জেলার চটকলগুলির শ্রমিকরাও তাতে যুক্ত হয়। এই বিরাট শ্রমিক আন্দোলন অনেক যুবককেও আকৃষ্ট করে। ১৯২৮-এ কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, সেখানে পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, কালী সেন প্রমুখের নেতৃত্বে মিছিল করে যায়। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি কংগ্রেস ঘোষণা করুক এবং শ্রমিকের ন্যায্য দাবি কংগ্রেসে স্বীকৃতি দেওয়া হোক—ওই শ্রমিক মিছিল থেকে এ সব অভিযোগ ওঠে। ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি এবং যতীন দাসের অনশনে মৃত্যু সারা দেশে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। আমাদের জেলাতেও ব্যাপক ছাত্র ধর্মঘট, মিছিল হয়। এই সব সভা ও মিছিলে নতুন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ যুবছাত্ররা প্রথম আওয়াজ তোলে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ'।

১৯৩১-এ সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট কিছু যুবক, যাঁদের মধ্যে ছিলেন হুগলি জেলার পাঁচুগোপাল ভাদুড়ি, নিরাপদ মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয় মোদক, কালীচরণ ঘোষ, বর্ধমানের বিনয় চৌধুরী, হরেকৃষ্ণ কোঙার—তাঁরা গঠন করেন 'Indian Proletarian Revolutionary Party (I.P.R.P.)'। এই সংগঠনের উদ্যোগে হুগলি জেলার 'গণনায়ক' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৩২-এ আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক আসায় এই সংগঠনের কয়েকজন কর্মীকে গোঘাট অঞ্চলে পাঠান হয়—সেখানে কৃষকদের মধ্যে গণবিদ্রোহ গড়ে তোলার জন্য। তাঁরা কিছুদিন সেখানে কাজ করার পরই গ্রেপ্তার হয়ে যান।

১৯৩৩-এ হুগলি জেলার প্রথম সদর মহকুমা কৃষক সম্মেলন হয় কাম্বাড়াতে। I.P.R.P-র যাঁরা কৃষক এলাকায় কাজ করেছিলেন, তাঁদেরই উদ্যোগে এই সম্মেলন হয়।

এই কৃষক সম্মেলন থেকে সদর মহকুমা কৃষক সমিতি গঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। এই প্রসঙ্গে এ কথাও বলা দরকার যে, ১৯২৮ থেকে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত হুগলি জেলার বিভিন্ন জায়গায় ঘরোয়া সভা, জনসভায় গিয়ে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার ভিত্তিতেই অনেক আলোচনা করেছেন। ফলে কিছু যুবক সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে কাজ করতে এগিয়ে আসেন।

হুগলি জেলায় তখন একমাত্র কারখানা ছিল ইংরেজ মালিকদের চটকলগুলি। আগেই বলেছি উনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকেই এই সব কারখানার শ্রমিকরা শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামে। কিন্তু তখন শ্রমিকদের সংগঠিত ইউনিয়ন ছিল না। ১৯২৭-২৮ থেকে কিছু কিছু ইউনিয়ন গঠিত হতে থাকে। এ জেলায় সব থেকে সংগঠিত ইউনিয়ন গড়ে ওঠে ১৯৩১-এ চন্দননগরের গোন্দলপাড়ার শ্রমিকদের। এখানে ইউনিয়নের সঙ্গে গড়ে তোলা হয় একটি 'শ্রমিক বিদ্যালয়'। শ্রমিকদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তে আসত। শ্রমিকদের কাছে অর্থসংগ্রহ করে বিদ্যালয়ের জন্য দুটি ঘর তৈরি হয়। এটাকেই রাত্রিবেলা ইউনিয়নের কার্যালয় হিসাবে ব্যবহার করা হত।

হুগলি জেলায় যেমন I.P.R.P. গঠিত হয়েছিল, তেমনই এই সময় অবিভক্ত বাংলায় এবং ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে ছোট ছোট কমিউনিস্ট গ্রুপ গড়ে ওঠে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কয়েকটি দলিলের ভিত্তিতে এই সব কমিউনিস্ট গ্রুপ একত্রিত হয়ে একটি কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। এ জেলাতেই I.P.R.P'র সদস্য ও কিছু কমিউনিস্ট নিয়ে ১৯৩৪ সালে গড়ে ওঠে কমিউনিস্ট পার্টির হুগলি জেলা কমিটি। জেলা কমিটির সম্পাদক হন আনন্দ পাল। তখন কমিউনিস্ট পার্টি ছিল বেআইনি। তখন ফরাসি চন্দননগরে জেলার কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

১৯৩৭-এ বাঁকুড়ার পাত্রসায়রে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সমিতির সম্মেলন থেকে ঘোষণা করা হয় : 'কৃষি বিপ্লবের সঙ্গে জাতীয় স্বাধীনতালাভের সংগ্রাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত'—এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উৎসাহের সঙ্গে জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে কৃষক সমিতি গড়ে উঠল। ভুবিরভেড়ি, বড়া-কমলাপুর, উত্তরপাড়ার পশ্চিমে মাখলা অঞ্চলে কৃষক সমিতি গড়ে উঠল। ১৯৩৮-এ বড়ায় দ্বিতীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। প্রধান আওয়াজ ছিল জমিদারি প্রথার অবসান চাই। তার সঙ্গে স্থানীয় কৃষকদের বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠতে লাগল। ইংরেজ সরকারের পুলিশী আক্রমণ, জমিদারদের আন্দোলনরত কৃষকদের ওপর পাইক, বরকন্দাজ দিয়ে অত্যাচার এবং কংগ্রেসের বিরোধিতা—এই তিন বাধাকে মোকাবিলা করেই কর্মীরা কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকেন।

সংগঠিত কৃষক আন্দোলন শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই অনেক কংগ্রেস নেতা কৃষকশ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে জমিদারদের স্বার্থের পক্ষেই ছিলেন। সে সম্পর্কে আমাদের জেলায় একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। ১৯২৭ সালে বাংলার ব্যবস্থাপকসভায় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের কিছু সংশোধন বিল আসে। কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত 'স্বরাজ্য দলের' ব্যবস্থাপকসভার সদস্যরা তার বিরোধিতা করেন। ১৯২৮ সালে হরিপালে এ জেলায় কংগ্রেসের সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলন জমিদারদের স্বার্থরক্ষার পক্ষে কংগ্রেসের উপরোক্ত ভূমিকার নিন্দা করে অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ও শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। জেলার কংগ্রেস নেতারা প্রতিনিধিদের মধ্যে আগে থেকেই নানা রকম প্রচার করে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে প্রস্তাবটিকে হারিয়ে দেন।



রাসবিহারী বসুর পৈতৃক বাসভবন ॥ চন্দননগর

১৯৩৭-এ বাংলায় যে চটকল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট হয়, তাতে এ জেলার সব চটকলের শ্রমিকরাই যোগ দেয়। চটকলগুলির ইংরেজ মালিকদের পাশে দাঁড়িয়ে ইংরেজ সরকারের পুলিশ ধর্মঘটী শ্রমিকদের নেতা ও কর্মীদের ওপর যে অত্যাচার তাকে উপেক্ষা করেই শ্রমিকদের এই সংগ্রাম চলতে থাকে।

এই সময় ছাত্র আন্দোলন এবং সংগঠনও গড়ে ওঠে। এ জেলায় ১৯২৯-এ প্রথম জেলা ছাত্র সমিতি তৈরি হয়। সম্পাদক হন তুষার চট্টোপাধ্যায়। তার বেশ কয়েক বছর পরে ১৯৩৬-এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন তৈরি হয়। হুগলি জেলায় জেলা ছাত্র ফেডারেশন হয় ১৯৩৭ সালে ফরাসি চন্দননগরে জেলা ছাত্র সম্মেলন থেকে। তখনকার জেলা ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন ভবানী মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক কমল চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রদের নিজস্ব দাবিতে স্কুল-কলেজে ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে আন্দোলন হয়। ১৯৩৮-৩৯-এ বিনা বিচারে আটক রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে এবং আন্দামানের রাজবন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবিতে এ জেলা সহ সমগ্র বাংলায় ব্যাপক ছাত্র ধর্মঘট চলতে থাকে। ইংরেজ সরকারের অত্যাচার ছাত্রদের এই আন্দোলনকে একটুও দমাতে পারেনি।

তা ছাড়াও এই সময় ছাত্র ফেডারেশন সাক্ষরতা আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্কুল-কলেজের ছুটির সময় ছাত্রকর্মীদের গ্রামাঞ্চলে পাঠান হত, ছুটির এক মাস সেখানে থেকে নৈশ বিদ্যালয় খুলে নিরক্ষর বয়স্ক কৃষকদের প্রাথমিকভাবে সাক্ষর করানর কাজ তারা করত। হুগলি জেলার রাঘবপুর গ্রামে এই কাজ খুবই সার্থকতা লাভ করে। সাক্ষর করার সঙ্গে গ্রামের মানুষকে কুসংস্কার, পশ্চাৎপদ চিন্তা থেকে মুক্ত করে সচেতন ও বিজ্ঞানমনস্ক করার জন্য ম্যাজিক ল্যাটার্নের সাহায্যে বিভিন্ন বিষয় প্রচার করা হত। শোষণ, অত্যাচার ও দেশের পরাধীনতার বিরুদ্ধে কৃষকদের জাগ্রত করার জন্য প্রয়াত দয়াল কুমারের লেখা 'মুক্তির পথে' নাটক ছাত্রকর্মীরা এই সময় গ্রামে গ্রামে অভিনয় করেছেন।

ইংরেজ সরকার ১৯৩৫ সালে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর কিছু পরিবর্তন করল। এর দুটো উল্লেখযোগ্য দিক ছিল—প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও কেন্দ্রে ফেডারেল ব্যবস্থা। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা প্রদেশে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করে প্রাদেশিক শাসন চালাতে পারবে। এই ব্যবস্থার সঙ্গে কেন্দ্রে যাতে ইংরেজ সরকারের কব্জা অটুট থাকে, ফেডারেল পরিকল্পনার দ্বারা তারও রক্ষাকবচ করা হল। কংগ্রেস ফেডারেল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করলেও কোনও আন্দোলন করতে চাইল না।

কমিউনিস্ট পার্টি তখন বেআইনি হলেও 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। তখন কমিউনিস্টরা 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট গ্রুপ' নামেই পরিচিত ছিল। এই শক্তির উদ্যোগেই তখনকার বামপন্থী দলগুলিকে নিয়ে গঠিত হল 'বামপন্থী সমন্বয় কমিটি'। এই কমিটি ফেডারেল পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক দিল। তখন কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি 'বামপন্থী সমন্বয় কমিটি'র ফেডারেল পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সমর্থন করলেন। ১৯৩৯-এর প্রথমদিকে আমাদের জেলার উত্তরপাড়ায় জেলার বামপন্থীদের আহ্বানে ফেডারেল পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এক বিশাল জনসভা হয়। কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু এই সভায় এই সংগ্রামের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন।

১৯৩৯-এর ১ সেপ্টেম্বর হিটলার পোলান্ড আক্রমণ করার পরই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। কংগ্রেস নেতৃত্ব ইংরেজ সরকারের সঙ্গে আপসের চেষ্টা চালাতে থাকল। আর কমিউনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আওয়াজ তুলল : সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে পরিণত করতে হবে। ফলে কমিউনিস্টদের ওপর ইংরেজ সরকারের কঠোর দমন-পীড়ন নেমে এল। কিন্তু

কমিউনিস্টরা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়েই তাদের প্রচার চালাতে লাগল।

এ জেলায় যুদ্ধবিরোধী প্রচারপত্র বিলি হতে থাকে। শ্রেণী-সংগ্রাম ও গণ-আন্দোলন ক্রমশ বিকশিত হতে থাকে। এ সময় হুগলি-চুঁচুড়াতে বিড়ি শ্রমিকদের খুব জোরাল সংগঠন ছিল। এই সংগঠনও যুদ্ধবিরোধী প্রচার করে। শ্রমিক অঞ্চলের মধ্যে রিষড়া, মাহেশ, তেলিনীপাড়া, গোন্দলপাড়া শ্রমিক সংগঠন আরও সংগঠিত হয়। গ্রামাঞ্চলে ডুবরিভেড়ি, বড়া-কমলাপুর, বগা, মাখলা, রাঘবপুরে কৃষক আন্দোলনের শক্ত ঘাঁটি গড়ে ওঠে। ১৯৩৯-এ বগায় যে কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে, তার ওপর পুলিশী আক্রমণ হয়। বগায় সংগ্রামী কৃষকরা পুলিশী আক্রমণকে এড়িয়ে এখানের সংগঠিত সংগ্রাম যাতে অব্যাহত থাকে, সেজন্য মাটির তলায় একটি ঘর তৈরি করেন। সংগঠনের কেন্দ্র হয় সেটাই। আত্মগোপনকারী নেতা ও কর্মীরা সেখানেই আশ্রয় নিতেন এবং সেখানেই গোপন সভা হত। স্থানীয় কৃষকনেতা ছানু মাঝি, পঞ্চু মণ্ডল, গোপাল রাউত প্রমুখ এবং বিজয় মোদক, বিনোদ দাস—এঁরাই এই সংগ্রামের পুরোভাগে ছিলেন।

এর পর পরিস্থিতির পরিবর্তন হল। ১৯৪১-এর ২২ জুন হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল। এবার যুদ্ধের রাজনৈতিক চরিত্র বদলে গেল। পৃথিবীর একমাত্র শ্রেণিহীন, শোষণহীন সমাজতন্ত্রী দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করার জন্য এবং পৃথিবীর মানুষের জঘন্যতম শত্রু ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করতে 'ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বজনগণকে যুদ্ধের আহ্বান জানান। ভারতের কমিউনিস্টরা আওয়াজ তোলে ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতা ও ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম একই সঙ্গে চলবে। কমিউনিস্ট পার্টি তখন আইনি হয়।

কংগ্রেস কমিউনিস্টদের এই আওয়াজের বিরুদ্ধে প্রচার করতে থাকে। কমিউনিস্টদের ওপর দৈহিক নিপীড়ন ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কুৎসা, অপপ্রচার কংগ্রেসের পক্ষ থেকে চলতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশের সর্বত্র কমিউনিস্টরা তাদের পথে চলতে থাকে। এ জেলায় কংগ্রেসের বিরোধিতা মোকাবিলা করেই গ্রাম ও শিল্পাঞ্চলে কমিউনিস্টরা শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকে।

এ সময় ফ্যাসিবাদ-বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ এ জেলাতেও গড়ে ওঠে। জেলার শহরে, গ্রামে নাটক, গানের মধ্য দিয়ে এই সংঘ মানুষকে সঠিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার নিরলস প্রচেষ্টা করতে থাকে।

তখন আরামবাগের লোকশিল্পী দুলাল রায় খুবই জনপ্রিয় হন। তাঁর তরজা, কীর্তন ইত্যাদি মানুষের রাজনৈতিক চেতনা ও সংগ্রামকে উদ্বুদ্ধ করত।

১৯৪৩-এ মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে এই প্রদেশের কয়েক কোটি শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষ। এদের বাঁচাবার জন্য গ্রামে-শহরে রিলিফ কমিটি গঠন করে লঙ্গরখানা খোলা হয়। এ কাজে অনেক মহিলা এগিয়ে আসেন। এই সময় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হয়। আমাদের জেলায় ১৯৩৯ সালে প্রথম মহিলা সংগঠন হয় 'চন্দননগর মহিলা সমিতি'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জেলায় যে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে ওঠে, চন্দননগর মহিলা সমিতি তার অন্তর্ভুক্ত হয়। অনাহারক্লিষ্ট মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য লঙ্গরখানার পরিচালনায় গ্রাম ও শহরে যে সব মহিলা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশ মহিলা 'আত্মরক্ষা সমিতি'তে যোগ দেন।

মজুতদাররা চাল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য গোপনে মজুত করে এই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে। তাই শুধু লঙ্গরখানা নয়, জোতদার, মজুতদার, চোরাকারবারিদের গোপন মজুত উদ্ধার করে মানুষের মাঝে তা বিলি করার জন্য সংগঠিত আন্দোলন গড়ে ওঠে। জমিদার, জোতদার, মজুতদারদের সঙ্গে পুলিশের যোগসাজশের ফলে এই সংগ্রাম কোথাও কোথাও তীব্র শ্রেণী-সংগ্রামের পর্যায়ে আসে। আমাদের জেলাতেও কোনও কোনও গ্রামাঞ্চলে এই সংগ্রাম জঙ্গি সংগ্রামের রূপ নেয়। এ থেকে পরবর্তী সময়ের তেভাগা আন্দোলনের ভিত্তিই গড়ে ওঠে।

যুদ্ধ যখন শেষের দিকে আসে, তখন ভারতে তীব্র গণ-সংগ্রাম গড়ে উঠতে থাকে। তেলেঙ্গানার কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রাম, বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক সংগ্রাম এবং শ্রমিকদের সংগ্রাম তীব্রতর হতে থাকে। বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে প্রজাদের সংগ্রাম ক্রমশ উত্তাল হয়ে ওঠে। এই সময়ই আই এন এ'র বন্দীদের এবং পরে রশিদ আলির মুক্তির দাবিতে যে সংগ্রাম হল, তাতে কোনও কোনও জায়গায় সশস্ত্র পুলিশের আক্রমণ ব্যর্থ করার জন্য সংগ্রামীরা ব্যারিকেড লড়াই করলেন। কংগ্রেস নেতারা এই সব সংগ্রামের বিরোধিতা করতে লাগলেন। কিন্তু তা অগ্রাহ্য করেই সংগ্রাম এগিয়ে চলল। সরকারের সৈন্য ও পুলিশের কোনও কোনও অংশ ধর্মঘট করল। তারপর হল বোম্বাইয়ের বন্দরে নৌসেনাদের ধর্মঘট। নৌসেনাদের মিছিলে হাজার হাজার শ্রমিক, ছাত্র-যুব যোগ দিল। ইংরেজ সরকার বেপরোয়া গুলি চালিয়ে কয়েকশো মিছিলকারীকে হত্যা করল। কিন্তু তাতেও সংগ্রামী মানসিকতা নষ্ট হল না। এ জেলাতেও এই সব সংগ্রামের পক্ষে সকল স্তরের মানুষ এগিয়ে আসতে লাগল। এর পর হল ২৯-এ জুলাইয়ের ডাক ও তার ধর্মঘট। সেদিন সমস্ত ভারত অচল হয়ে গেল।

তারপর ইংরেজ সরকার বাঁচবার জন্য পরিকল্পিতভাবে দেশে দাঙ্গা বাধাল। কিন্তু এই বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মানুষ শ্রেণী-সংগ্রাম ও সরকার-বিরোধী গণ-আন্দোলনের পথ থেকে সরে এল না। আমাদের জেলা তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছে। ১৯৪৬-এর দাঙ্গার কিছুদিন পর চন্দননগরের গোন্দলপাড়া চটকলের হিন্দু-মুসলমান শ্রমিক ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম কমিটি গঠন করে পুলিশের আক্রমণে অবিচল থেকে প্রায় দেড় মাস ধর্মঘট চালায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর এক নতুন বিশ্ব পরিস্থিতি সৃষ্টি হল! পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠল। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উপনিবেশ, অর্ধ-উপনিবেশে মুক্তির সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠল। পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিক আন্দোলনও তীব্র হতে থাকল। সেই পরিস্থিতিতেই ভারতের গণ-সংগ্রামগুলি ইংরেজ সরকারকে এমন আঘাত হানল, যা সরকারকে টলমল করে দিল। সরকার বুঝল যে, এই সংগ্রাম আরও তীব্র হলে তাদের পতন হবেই। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের নেতারাও বুঝলেন যে, জনগণের এই সংগ্রাম বাড়লে তাঁদের নেতৃত্ব চলে যাবে। সেই কারণে ইংরেজ

সরকার কংগ্রেস ও লিগ নেতৃত্বের সঙ্গে আপস আলোচনা করে ভারতের শাসনাধিকার ছেড়ে দিল। ভারত স্বাধীনতালাভ করল।

ফরাসি চন্দননগরের আন্দোলন সম্পর্কে কয়েকটি কথা

ভারতে ফরাসিদের যে পাঁচটি উপনিবেশ ছিল, তার মধ্যে চন্দননগর একটি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এখানে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন হয় এবং সেই সঙ্গেই এখানে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের কার্যকলাপ শুরু হয়। এটি ছিল তাদের গোপন আশ্রয়স্থল, অস্ত্রশস্ত্র গোপনে জমা রাখার জায়গা। ইংরেজ সরকারের ওপর সশস্ত্র আক্রমণের পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতিও এখানে বসে করা হত। পূর্বে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষ থেকেই জনসম্মিলনী, প্রজাসমিতি এবং কিছু পরে দেশহিতসভা—এই তিনটি সংগঠন গড়ে ওঠে। এগুলির প্রধান কাজ ছিল ফরাসি চন্দননগরের পৌরসভার আসন দখল করার জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা।

বিশের দশকের শেষভাগে চন্দননগরের বিশিষ্ট দেশপ্রেমিক দুর্গাদাস শেঠ কিছু যুবককে নিয়ে 'চন্দননগর যুব সমিতি' গড়ে তোলেন। এই সংগঠনের প্রধান পরিচালক ছিলেন কালীচরণ ঘোষ। এ বিষয় আগে বলা হয়েছে। সমিতি চন্দননগরের যুবকদের সংগঠিত করে, জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়।

১৯২৯ সালে যুব সমিতির উদ্যোগে 'শহিদ দিবস' পালন করা হয়। এই উপলক্ষে নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দিরে যে জনসভা হয়, তাতে বিপুল সংখ্যক স্থানীয় যুবক যোগ দেন। শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানগুলি চন্দননগরের মানুষের মনে আলোড়ন জাগিয়ে তোলে।

সাইমন কমিশন বর্জন, লাজপত রায়ের মৃত্যু, যতীন দাসের অনশনে আত্মদান—এ সব ঘটনার পর যুব সমিতির উদ্যোগে হরতাল, স্কুলে ধর্মঘট, সভা, মিছিল হয়। এ সবে ব্যাপক মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

১৯২৯-এ যুব সমিতির আহ্বানে ফরাসি সরকারের বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে। ফরাসি সরকার এখানের নাগরিকদের দুইধরনের ভোটারে ভাগ করে। এখানে বসবাসকারী ফরাসিরা এবং স্থানীয় অধিবাসী যারা ফরাসি ভাষা শিখে চাকরির লোভে ফ্রান্সের নাগরিকত্ব চাইত—তাদের সংখ্যা খুবই কম হলেও তারা ছিল উচ্চশ্রেণীর ভোটার। এখানের সাধারণ নাগরিকরা ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর ভোটার। প্রথম শ্রেণীর ভোটাররা সংখ্যায় খুবই কম হলেও ভোট আসনের অর্ধেক পাবে, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ভোটার কয়েক হাজার হলেও—তারাও মোট আসনের বাকি অর্ধেক পাবে। এই ছিল ফরাসি আইন। দুই ভোটারের আইন বাতিল করা হোক—এই দাবিতে যুব সমিতির নেতৃত্বে ১৯২৯-এ যে প্রবল আন্দোলন এখানে হয়, তার ফলে ফরাসি সরকার ওই আইন বাতিল করতে বাধ্য হয়।

১৯৩০-এ যুব সমিতির তিনটি দল মেদিনীপুরে আইন অমান্য করতে যায়। এই সময়ে চন্দননগরে কংগ্রেস কমিটি গঠনের চেষ্টা হয়। কিন্তু ফরাসি সরকার তা করতে দেয়নি।

'স্ফুলিঙ্গ' ও 'স্বদেশীবাজার' দুই পত্রিকার কথা আগে বলা হয়েছে। এই দুই পত্রিকাতেই সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রচার করা হয়।

১৯৩১-এ যুব সমিতির কর্মীরাই গোন্দলপাড়া চটকল শ্রমিক ইউনিয়ন ও শ্রমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলে। আগেই বলেছি কমিউনিস্ট পার্টির হুগলি জেলা কমিটি এই চন্দননগরেই গোপনে গঠিত হয় এবং এখান থেকে পার্টির জেলার কাজকর্ম চলতে থাকে। ১৯৩৮-এ কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির গোপন সম্মেলন চন্দননগরেই হয়।

১৯৩৭-এ এখানেই ছাত্র আন্দোলনের সংগঠন জেলা ছাত্র ফেডারেশন গড়ে ওঠে। জেলায় ১৯৩৮-৩৯এ যে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন সংঘটিত হয়, তার নেতৃত্ব দেয় ছাত্রকর্মীরাই।

আগেই বলা হয়েছে, ১৯৩৯-এ চন্দননগরে গড়ে ওঠে 'চন্দননগর মহিলা সমিতি'। সম্পাদিকা হন হেমন্ত দেবী। মহিলা আন্দোলনের আদর্শের ভিত্তিতেই এই সংগঠন গড়ে ওঠে। পাড়ায় পাড়ায় মহিলাদের সভায় ম্যাজিক লণ্ঠন লেকচার দেওয়া হত। মহিলা সমিতির সদস্যদের নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক দলও গড়া হয়, যারা মহিলা সভায় গান নাটকাভিনয় করত। এই সব কাজের ফলে মধ্যবিত্ত পরিবারের বহু বয়স্কা গৃহিণী মহিলা সমিতিতে আসেন এবং নিজেদের পাড়ায় মহিলা সমিতি গড়ে তোলেন। এঁরা হলেন—পুষ্প ঘোষ, আশালতা চট্টোপাধ্যায়, চারুশীলা শীল, বীণা দাস, নলিনীবালা ভড় প্রমুখ। এঁরা সবাই প্রয়াত হয়েছেন। তরুণীদের মধ্যে ছিলেন সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায়, শেফালী নন্দী, কৃপা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

১৯৪৫-এ চন্দননগরের বামপন্থীরা গঠন করেন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট। ১৯৪৬-এ চন্দননগর পৌরসভার নির্বাচনে এই ফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে পৌরসভা পরিচালনা করার ক্ষমতা পায়। তখন থেকেই এই ফ্রন্টের নেতৃত্বে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে চন্দননগরকে মুক্ত করার আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। 'ভারতের স্বাধীনতা ও চন্দননগরের স্বাধীনতা চাই'—এই আওয়াজ চন্দননগরবাসীর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হতে থাকে। ১৯৪৭-এ ভারত স্বাধীন হবার পর ফরাসি সরকারি চন্দননগর ত্যাগ করুক এবং চন্দননগর স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হোক—এই আন্দোলন চলতে থাকে। এই আন্দোলনের আঘাতে ফরাসি সরকার চন্দননগর ত্যাগ করে এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ১৯৫৪-এ চন্দননগর স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সাহায্য নিয়েছি :

১। স্বাধীনতা সংগ্রামে হুগলি জেলা—তুষার চট্টোপাধ্যায়

২। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা—সরোজ মুখোপাধ্যায়

হুগলি জেলার সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক রূপরেখা

(সংক্ষিপ্ত রূপরেখা)

বিষ্ণু বেরা



হুগলি জেলার সাংস্কৃতিক পরিচয় তার বর্তমান প্রশাসনিক অবয়বের ফ্রেমে আবদ্ধ নয়। বর্ধমান, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগনা, বাঁকুড়া, হাওড়া প্রভৃতি জেলার যে বিস্তৃত অঞ্চলের সঙ্গে এই প্রাচীন ভূখণ্ডটি যুক্ত ছিল—তাদের সঙ্গে সংলগ্ন হয়েই গড়ে উঠেছে এই জেলার সাংস্কৃতিক বলয়।

লক্ষণীয়, এই জেলার ইতিহাস মুখ্যত নদীলালিত। অজস্র শাখা-প্রশাখা নিয়ে এই জেলার উপর দিয়ে বয়ে যেত গঙ্গা, সরস্বতী, ঘিয়া, কুন্তী, দামোদর, মুণ্ডেশ্বরী, দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদ-নদী। এদের তীরেই গড়ে উঠেছিল প্রাচীন জনপদগুলি। সরস্বতী নদীতীরে ছিল বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র সপ্তগ্রাম, ভূরিশ্রেষ্ঠী ছিল দামোদরের তীরে। গুপ্তিপাড়া, বাঁশবেড়িয়া, ত্রিবেণী, হুগলি, চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর, শ্রীরামপুর, কোন্নগর, হরিপাল, সিঙ্গুর, চণ্ডীতলা, জনাই, আঁটপুর, রাজবলহাট, ভাঙ্গামোড়া, খানাকুল প্রভৃতি প্রাচীন সমৃদ্ধ স্থানগুলি গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন নদ-নদী বা তাদের শাখা-প্রশাখার গতিপথের ধারে। এগুলি ছিল ছোট-বড় বাণিজ্যকেন্দ্র বা শাসনকেন্দ্র বা বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান ও কুটিরশিল্পে উন্নত অঞ্চল। নদীর গতি পরিবর্তনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত এদের উত্থান-পতনের ইতিহাস।

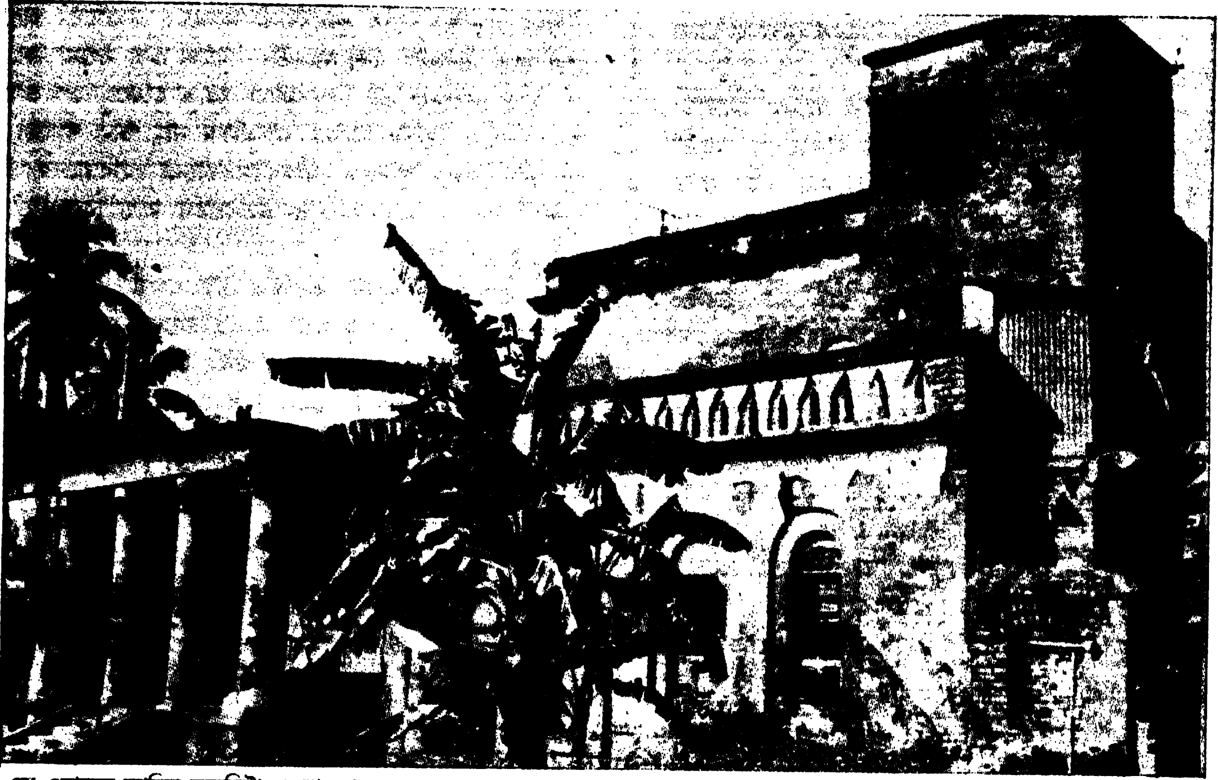
দ্বিতীয়ত, এই সুনাব্য নদীগুলির কল্যাণেই এখানে নৌ-বাণিজ্য ও নৌ-শিল্পের ঐতিহাসিক খ্যাতি। বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্যের পরিপোষকতায় উৎকর্ষ লাভ করেছিল অন্যান্য কুটিরশিল্প। কার্পাসবস্ত্র, রেশমবস্ত্র, তিমির সুতোর সূক্ষ্মবস্ত্র, পিতল ও কাঁসার বাসনপত্র এবং শিল্পসামগ্রী, বাঁশ ও বেতের তৈরি নানা সামগ্রীর সুনাম এবং চাহিদা ছিল প্রচুর।

তৃতীয়ত লক্ষণীয়, এখানকার নদ-নদীগুলির মধ্যে গঙ্গার ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এক সময় গঙ্গার প্রধান জলধারা বইত সরস্বতীর খাতে। দামোদরের খাতেও বইত গঙ্গা-প্রবাহ। গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চল প্রাচীনকাল থেকেই বহু যুগান্তকারী ঘটনার সাক্ষী। গঙ্গার বুকে উজান ঠেলেই আসে ইউরোপীয়রা। গঙ্গাতীরে পা রেখেই এল ইতিহাসের আধুনিক যুগ। অতএব সপ্তগ্রাম ভুরিশ্রেষ্ঠী থেকে শুরু করে একাল পর্যন্ত হুগলির সংস্কৃতি প্রধানত গাঙ্গেয়।

চতুর্থত, এই নদ-নদীই হুগলি জেলার প্রাচীন ইতিহাস রচনাকে অনেকাংশে দুরূহ করে তুলেছে। এই জেলার পলিমাটি পালিত পেলব ভূশরীর বারে বারে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে বন্যায়। ফলে বিলুপ্ত হয়েছে সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। নদীই গ্রাস করেছে তার আনুকূল্যে গড়ে ওঠা প্রাসাদমালা, দেব-দেউল বিদ্যানিকেতনের স্মারক ও স্মৃতিকে। যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আমরা পেয়েছি—তার অধিকাংশই সপ্তম শতাব্দী বা তার পরবর্তীকালের। যে সব অট্টালিকা, মন্দির অথবা মসজিদ বা চণ্ডীমণ্ডপের কালজীর্ণ অস্তিত্ব আছে—তার কোনওটাই ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেকার নয়। পাণ্ডুয়ার বা সপ্তগ্রামের কিছু সমাধি বা মসজিদ অবশ্য বিরল ব্যতিক্রম। তাই এই জেলার বিরল তথ্য, ইতিহাস বিতর্ক-কুটিল।

পঞ্চমত, হুগলি জেলার সংস্কৃতিতে রক্ষণশীলতার দাপট ঐতিহাসিকভাবেই কম। তার সাংস্কৃতিক গতিময়তা অক্ষুণ্ণ ছিল বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণজাত আবর্তে। এই ভূখণ্ডে আর্যরা এসেছে, বৌদ্ধভিক্ষু ও জৈনরা এসেছে; এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল, এসেছে মোগল। দলবেঁধে এসেছে পর্তুগিজ, ফরাসি, ইংরেজ প্রভৃতি নানা ইউরোপীয় জাতি। তারপর এসেছে গঙ্গার দুকূল ছাপিয়ে দেশি-বিদেশি শিল্পপতিরা আর তাদের সঙ্গে ভারতের নানা প্রান্ত থেকে আগত হাজার হাজার অবাঙালি শ্রমিক পরিবার—তাদের বহু বিচিত্র, ভাষা, বেশভূষা ও জীবনচর্যা নিয়ে। মনে রাখতে হবে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শুধু মুসলমান সৈন্যবাহিনীই আসেননি, এসেছিলেন গাজী ও আউলিয়ারা, আর সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে এসেছিলেন খৃস্টান মিশনারীরাও। অর্থাৎ সৈন্যাভিযান ও ধর্মাভিযান বা সাংস্কৃতিক অভিযান ছিল যুগপৎ। হুগলি জেলার জীবনসন্ধানী আগন্তুকদের মধ্যে নবীনতম অতিথি পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল শরণার্থীরা। গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চল এদের জীবন কল্লোলে আলোড়িত।

ষষ্ঠত স্মরণীয়, প্রাচীন রাজন্যবর্গ বা ভূস্বামীরা হুগলি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে দেশের নানা প্রান্ত থেকে গুণী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা বৈদ্য পরিবারকে এনে তাঁদের ভূমিদান বা বৃত্তিদান করে বসবাস করাতেন। হুগলি জেলার বিখ্যাত বণিক সম্প্রদায়ের বহু পরিবারের আদিপুরুষরা বহিরাগত। হুগলি জেলার শিষ্টসমাজের বিদ্যাচর্চা বা সংস্কৃতিচর্চা ছিল এদের নিয়ন্ত্রণে। বাগ্দি, ডোম, কৈবর্ত, গোপ প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত প্রাচীন অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে শিষ্ট সমাজের জীবনযাত্রার পার্থক্য নিশ্চয়ই ছিল। যে বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে হুগলি জেলার প্রাচীন অধিবাসীদের জীবনচর্যা ও সংস্কৃতি নানা বহিরাগত উপাদানের মিশ্রণে হুগলি জেলার বর্তমান যৌগ সংস্কৃতিকে গড়ে তুলেছে—তার বিশ্লেষণই একটি বৃহৎ ব্যাপার। একটি প্রবন্ধের পরিসরে তার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। পরিশেষে, কিন্তু মুখ্যভাবে বিবেচ্য, হুগলি জেলার কৃষকসমাজের ভূমিকা। কেননা, তারাই হুগলি জেলার সাংস্কৃতিক বিকাশের মূলাধার ও নিয়ামক। কৃষকরা ছিল পৌনঃপুনিক বিপর্যয় ও অনিশ্চয়তার শিকার। বন্যায় বিধ্বস্ত হত তাদের ঘরবাড়ি ও ফসল খেত, বদলে যেত জনবসতির মানচিত্র। আজ যা কৃষকপল্লী, কালই তা হয়ত বালিয়াড়ি, না হয় জলাভূমি। সর্বস্ব খোয়ানো চাষীদের ছুটতে হত নতুন বসতির সন্ধানে। হুগলি জেলার অনেক চাষীপল্লীই নতুন গাঁ। (দ্র. চণ্ডীমঙ্গলের বুলান মণ্ডল)। প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামে তাদের চরিত্র সাধারণভাবে প্রতিবাদী ও প্রতিরোধী। তাই ভদ্রলোকরা এদের বলতেন—চোয়াড়। আর্যরা বলতেন—পাখির মত অনর্থভাষী, বৌদ্ধদের অভিযোগ—এরা ভিক্ষু দেখলে কুকুর লেলিয়ে দেয়। যদিও দক্ষিণরাঢ়ীয় এই সুজলা অঞ্চলে উত্তর-রাঢ়ীয় রুক্ষতা অনেকটা প্রশমিত, তবুও এখানকার বাগ্দি, কৈবর্ত ও ডোম সৈন্যদের বীরত্ব ছিল প্রবাদপ্রতিম। এদের বাহুবলের উপর ভিত্তি করেই চলত বণিকের বাণিজ্য, রাজার রাজকীয় গৌরব। নিজেদের রক্ষা করার জন্য লাঠি ধরলেই এদের বলা হত ডাকাত। সুদীর্ঘকাল ধরেই এই জেলা ডাকাতি অধ্যুষিত! মধ্যযুগের বণিকরা ডাকাতির ভয়ে সদা-সন্ত্রস্ত। ইংরেজ শাসকরা ছিলেন বিমূঢ়। ইংরেজ লেখকদের জবানীতে জানা যায়—গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে যারা দিনে চাষী, গৃহস্থ, তারাই রাতে ডাকাত। ডাকাতির এই সামাজিক চরিত্রের বিশ্লেষণে তাঁরা কবুল করেছেন—অন্নসংস্থানে অনন্যোপায় মানুষগুলির অবর্ণনীয় দুরবস্থার কথা। যে দুরবস্থার হদিস মেলে বাংলা সাহিত্যেও। চর্যাপদের যুগ থেকেই তাদের 'হাঁড়িত ভাত নঈ নীতী আবেসী'। মুকুন্দরাম বলেছেন—আমীন, সরকার, ডিহিদার ও গ্রামীণ পোদ্দার প্রভৃতির নির্মম শোষণের কথা। কালকেতুর নতুন গল্পরাজ্যে যা কল্পরাজ্যেই—তাই তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন—সাময়িক কর রেহাই, সরকার থেকে হালবলদ ও বীজধান সরবরাহ, বাড়ি প্রথার বিলোপ, হাটে তোলার ব্যবস্থার উপর নিষেধাজ্ঞা। উত্তরকালে এই সব কটি বিষয় নিয়ে কৃষক আন্দোলনকে অনেক রক্ত ঝরাতে হয়েছে। যাই হোক, এত নির্যাতনের মধ্যেও তাঁরা মাঝে মাঝে শাসনক্ষমতা দখল করেছেন। হুগলি জেলায় অনেক বহু প্রশংসিত ডোমরাজা, বাগ্দিরাজা ও গোপরাজার কাহিনী শোনা যায়। কে জানে কালকেতুর চরিত্রে তাদের কারো ছায়াপাত ঘটেছে কিনা। যাই হোক, অনেক সময় এই ডাকাতদের নেতৃত্ব দিতেন রাজা জমিদার বা উচ্চবর্গের মানুষজন। বোঝা যায়, ডাকাত হয়েও এঁরা ওদের কব্জা থেকে রেহাই পাননি। ইতিহাস যাই বলুক, লোকস্মৃতিতে ডাকাতদের মহিমামুগ্ধ ছড়া, গান এবং গল্প আজও বেঁচে আছে বীরের স্বীকৃতি নিয়ে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, উত্তরকালের কৃষক আন্দোলন



এস ওয়াজেদ আলির জন্মভিটা ॥ তাজপুর

ছবি অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

মহিমান্বিত হয়েছে এদের উত্তরপুরুষদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে ও আত্মদানের গৌরবে।

হুগলি জেলার তফসিলি উপজাতিভুক্ত মানুষ আছেন তুলনামূলকভাবে কমসংখ্যায়। কিন্তু এদের বিশিষ্ট সংস্কৃতির অবদান কম নয়। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া বা মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার মত আদিবাসী সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব এই জেলায় নেই। হুগলি জেলার মিশ্র সংস্কৃতির একটি মূল্যবান উপাদান হিসাবে একে বিবেচনা করতে হবে।

সাংস্কৃতিক চিত্রপট

প্রাগাধুনিক যুগের সংস্কৃতির এক প্রধান উপাদান দেবভাবনা। জীবনভাবনার রূপান্তরিত প্রতিফলন হিসাবে তার গুরুত্ব অসীম। হুগলি জেলার প্রাগার্য সংস্কৃতির পরিচয় অস্পষ্ট। জঙ্গলাকীর্ণ এই প্রাচীন ভূখণ্ডে প্রাগার্য সভ্যতা ও সমাজজীবনের অনেক অবশেষ লুকিয়ে আছে বর্তমান শব্দভাণ্ডারে, অনুষ্ঠানের আঙ্গিকে, সামাজিক প্রথায়—দেবদেবীর রূপকল্পনায় ও পূজা পদ্ধতিতে। দোর্দণ্ড ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বাধ্য হয়েছে। রামজন্মের অনেক আগেই নাকি ভগীরথের শঙ্খধ্বনি শুনেছিল হুগলি। সেই গাঙ্গেয় অভিযানের পুরাকথার তাৎপর্য অলীক কল্পনা হিসাবেই গৃহীত হয়েছে।

প্রথম সহস্রাব্দের শেষদিকে সৃষ্টি হয় বাংলাভাষা। সংস্কৃতিচর্চার সংগঠিত উদ্যোগের নেপথ্যে রচিত চর্যাপদেই আছে তার প্রাথমিক নিদর্শন। কিন্তু বৌদ্ধ এবং জৈনদেরও ছিল সংগঠিত ধর্মীয় উদ্যোগ। জৈনধর্ম প্রভাব তখন ক্রমক্ষীয়মাণ, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল সমাজের সর্বস্তরে বিস্তৃত। অনেক ব্রাহ্মণও ছিলেন বৌদ্ধধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। সমাজের নিম্নবর্গের মধ্যেও বৌদ্ধধর্মের দৃঢ়মূল প্রভাব ছিল। ব্রাহ্মণেরা রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ নিতেন—সমাজে তাদের প্রভুত্ব ছিল প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখায় তৎকালীন জনসমাজে প্রচলিত তান্ত্রিক ভাবধারা পরিবর্তন এনেছিল। নিত্যসঙ্গী গ্রামীণ ও লৌকিক দেবদেবীদের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটছে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধদেবতাদের। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মধ্যে শুরু হয়েছিল অবক্ষয়—বল্লালী দাওয়াই তাকে রক্ষা করতে পারেনি—অবস্থাকে জটিল করেছে মাত্র। সম্ভব হয়নি তার আর্য বিশুদ্ধ রক্ষা।

বারংবার বাংলার বাইরে থেকে 'খাঁটি' ব্রাহ্মণ এনে 'রক্ষণশীলতা' আত্মরক্ষা করতে চেয়েছে। বারংবার লোকায়ত জীবনের টানে তা হয়েছে সমন্বয়মুখী। নগরে বিত্তবানদের গড়া শিষ্ট সমাজ থাকলে কী হবে, নগর-বাহিরে ডোম্বীর কুড়িয়ায় ব্রাহ্মণনাড়িয়া যাতায়াত শুরু করেছে। পাল-সেন যুগ থেকে শুরু করে হাল আমল পর্যন্ত ব্রাহ্মণসমাজের অবক্ষয়ের আক্ষেপ বহু উচ্চারিত। বর্ণভেদকে কঠোর থেকে কঠোরতর করে স্মৃতিগ্রন্থের বিতর্কজটিল টীকাটিপ্পনির পাহাড় চাপিয়ে ওই অবক্ষয়কে রোধ করা যায়নি। বৈদিক দেবতাদের মধ্যে—ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বরুণ, শিব, বিষ্ণু এবং তার নানা অবতারের পূজা ও মন্দিরাশ্রিত প্রতিষ্ঠা ছিল। লক্ষ্মী এবং পার্বতী স্ত্রীদেবতাও ছিলেন। বহু লৌকিক দেবতার মধ্যে ব্রাহ্মণ্য পূজাবিধি আরোপিত হয়েছিল—জনজীবনে বিস্তৃত হচ্ছিল ব্রাহ্মণ্য প্রভাব। কিন্তু বৌদ্ধ সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে ছিলেন নিম্নবর্গীয় মানুষ। হুগলি জেলায় বৌদ্ধ বাগ্‌দি রাজাদের কাহিনী শোনা যায়। স্বয়ং বিষ্ণু-পরবর্তী যুগে নারায়ণশিলার মাধ্যমে জনপ্রিয়তা অর্জন করে লোকালয়ে

চণ্ডীমঙ্গলের দুই শ্রেষ্ঠ কবি—মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি—মুকুন্দরাম এবং ভারতচন্দ্র উভয়েই হুগলি জেলার। মুকুন্দরাম হুগলির পল্লীজীবন এবং ভারতচন্দ্র তাঁর নাগরিক বৈদগ্ধ্যকে অমর করে রেখেছেন। চণ্ডীকাব্যের প্রাচীন কবি মাধবাচার্যও হুগলির অধিবাসী ছিলেন। কাশীরাম দাসের উপরও হুগলি জেলার দাবি আছে।

বিখ্যাত পদকর্তা মনোহরদাস বৈষ্ণবসাহিত্যে অমর অবদান রেখেছেন। সত্যনারায়ণ পাঁচালিও রচিত হয়েছে অনেকগুলি—স্বয়ং ভারতচন্দ্রও সত্যনারায়ণের পাঁচালি রচনা করেছিলেন। অনেক দেশবিখ্যাত কীর্তনিয়া কাহিনী লোকশ্রুতি ছড়িয়ে আছে।

শায়েস্তা খাঁর আমলে ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয় সেনাদের প্রথম সশস্ত্র যুদ্ধ হয়েছিল হুগলির মাটিতে। তাতে ইংরেজরা সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়। হুগলির বুকে কৃষকদের বিরূপ প্রকৃতি ছাড়াও মানুষের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে বারবার। বর্গীরা এদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়েছে, নীলকররা ধনমান হরণ করেছে, কোম্পানির লুণ্ঠনে ধ্বংস হয়েছে এদের কুটিরশিল্প, পর্তুগিজ জলদস্যুরা ও অন্য দাস ব্যবসায়ীরা এদের দলে দলে ধরে নিয়ে দাসদাসী হিসেবে বিক্রয় করে দিয়েছে। ক্ষুধার জ্বালায় এরা আত্মবিক্রয়, স্ত্রীবিক্রয়, কন্যাবিক্রয়ের দলিলে সই করেছে। এই সব অত্যাচার সম্পর্কে জনগণের মধ্যে প্রচলিত ছড়া, গান, গল্প সংগৃহীত হয়নি। তা সুষ্ঠুভাবে করলে হুগলির সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পূর্ণ হবে।

এ কথা বলা যায়, হুগলি জেলা সঙ্গীতরসে আর্দ্র। কীর্তন, মঙ্গল গান, কথকতা, পাঁচালি গান, পটুয়াসঙ্গীত আর কৃষকদের নিজস্ব গানে মধ্যযুগের হুগলি মুখর হয়ে থাকত। এর মধ্যে মাঝি-মাল্লার গান, লেটোর গান, রাখালিয়া গান ও প্রেমসংগীত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর সঙ্গে ছিল অসংখ্য গ্রাম্য বাদ্যযন্ত্র। ঢাক-ঢোল, মাদল, শ্রীখোল, বাঁশি, সানাই, কাড়া-নাকাড়া, ডুগডুগি, একতারা, কাঁসি, করতালের অজস্র রকমফের। এর শিল্পীদের অধিকাংশ কৃষক সম্প্রদায়ের লোক। কীর্তিমানদের কথা তো সবাই বলে, কিন্তু গ্রামে গ্রামে সহজপটুতা নিয়ে যাঁরা সমাজ-জীবনকে ভরিয়ে রাখতেন—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাঁদের নিশ্চিহ্ন করেছে।

হুগলি জেলার নৃত্যচর্চা কোনও স্বতন্ত্র ধারায় বিকাশলাভ করেনি। তবে ঢাক-ঢোলের বাজনার সঙ্গে গ্রামবাসীরা নৃত্য করত। গাজনে ও চড়কে হত শিবের নাচ। ওলাবিবির থানে যাবার সময় মিছিলের নৃত্য বিশেষ ভূমিকা নিত। গীর্তনিয়া ও পাঁচালি গানের সঙ্গেও নৃত্য আছে। পরবর্তীকালে ঝুমুর নাচ কবিওয়ালাদের ও তর্জাওয়ালাদের নৃত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। আদিবাসী মহিলা ছাড়া কৃষক রমণীদের লোকনৃত্যের কোনও পরিচয় হুগলি জেলায় নেই। পরে অবশ্য যাত্রা ও সখীর দলের নাচ খুবই জনপ্রিয়তা পায়। বৈষ্ণবীরাও নৃত্য সহযোগে গান গাইতেন।

হুগলি জেলায় গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন এ রকম মানুষের সংখ্যা কম নয়। দ্বারে দ্বারে গান গেয়ে বেড়ানো বৈষ্ণবদের জাতিবৃত্তি ছিল। তাছাড়া আগমনী, বিজয়া, শিবের গৃহস্থালি সম্পর্কিত গান, বাউল ও দেহতত্ত্বের গান ভ্রাম্যমাণ গায়করা গেয়ে বেড়াতেন। সমাজই এঁদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করত।

ইউরোপীয়দের আগমনের পর হুগলি ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে একেবারে সামনের সারিতে চলে আসে কলকাতার আগেই। কলকাতার উত্থানের পরও হুগলির সম্পন্ন বণিক, কায়স্থ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যেরা কলকাতায় কর্মকেন্দ্র বা বাসস্থান স্থানান্তরিত করেন। ইউরোপীয়দের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে হুগলির বহু পরিবার হঠাৎ নবাব হয়ে পড়েন ও জমিদারি পত্তন নেন। হুগলির মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধি পায় 'বাবু'র সংখ্যা। গঙ্গার উভয় তীরে বাগানবাড়িগুলি হঠাৎ বাবুদের বিলাসকেন্দ্র হয়ে ওঠে। পরে এই ব্যবসার কেন্দ্র, শিল্পকেন্দ্র হয়ে ওঠায় চাকরিজীবী মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে এবং হুগলির সংস্কৃতির ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়। গাঙ্গীয় রণতরী ও বাণিজ্যতরীর পাশে পাশে আসে বাইচ প্রতিযোগিতা, বাঈজী নৃত্য, মদের ফোয়ারা। এই সব বাবুর চন্দনগরের জগদ্ধাত্রী পূজা বা মাহেশের রথযাত্রা উপলক্ষে ফূর্তির ফোয়ারা ছোটাতেন, এখানে স্নানরতা পল্লীবধূদের জোর করে বজরায় তুলে নিয়ে যেতেন। এই সময়ে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর যাঁরা সাহিত্যের আসর জাঁকিয়ে বসেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁরা কবি নন—কবিওয়ালা।

হুগলি জেলা কবিগানের উর্বর ভূমি ছিল। ভোলা ময়রা, বাসু, নৃসিংহ, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, বহু ভাষাবিদ কালী মির্জা প্রমুখ প্রসিদ্ধ কবিয়াল এই নতুন সৃষ্টিকে ছড়িয়ে দেন। এদের সঙ্গে ছিলেন হুগলির প্রসিদ্ধ ঢোল-বাদকরা। বাবুদের বৈঠকখানা থেকে এই গান পল্লীসমাজে ছড়িয়ে পড়ে এবং বৈচিত্র্যলাভ করে। গ্রামে গ্রামে কবিওয়ালা, তর্জাওয়ালারা এতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন যে, পূজা অনুষ্ঠান উপলক্ষেও কবি বা তর্জার আসর বসত। অনেক গ্রামীণ স্বভাবকবি প্রসিদ্ধ গায়কদের সঙ্গীত রচনা করে দিতেন। গোপাল ভাঁড়ের সঙ্গীতকার ভৈরব হালদার এঁদেরই একজন। কৃষ্ণযাত্রার প্রবর্তক শিশুরাম অধিকারী এবং গোপাল অধিকারীও হুগলির লোক। এঁরা তো যাত্রাশিল্পীদের একটা স্বতন্ত্র উপনিবেশ গড়েছিলেন এখনকার ইনস্টিটিউটের মতো। যাত্রার সঙ্গে সঙ মিশিয়ে এক ধরনের 'নাচের দল' তৈরি হয়, হুগলি অঞ্চলে তার খুবই জনপ্রিয়তা ছিল। সমাজ বাস্তবের প্রতিবিম্ব হিসাবে এর আকর্ষণ ছিল অপ্রতিরোধ্য। বিখ্যাত ব্যঙ্গ কবি রূপচাঁদ পক্ষীও ছিলেন এই জেলার।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার মানসপ্রকর্ষ সৃষ্টির ক্ষেত্রে হুগলি জেলার ঐতিহাসিক অবদানের মুখ্য ভূমিকা এই জেলার দুই মনীষীর—রামমোহন ও বিদ্যাসাগর। হুগলি বাংলাদেশকে দিয়েছে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র, প্রথম মুদ্রিত বাংলা হরফ বা বাংলা পুস্তক, প্রথম সংবাদপত্র ও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের মতো প্রথম সাংবাদিক। সমকালীন জীবন নিয়ে লেখা প্রথম উল্লেখযোগ্য বাংলা উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা করেন হুগলির প্যারীচাঁদ মিত্র। প্রথম আখ্যায়িকা কাব্য রচয়িতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই জেলার, যিনি ঘোষণা করলেন—স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে। তারপরেই হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। নাট্যজগতের শীর্ষপুরুষ গিরিশচন্দ্র ঘোষ। কবিদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন ও তাঁরই বংশধর মোহিতলাল মজুমদার বাংলা কবিতার স্বতন্ত্র যুগের সাধক হিসাবে চিহ্নিত।

চড়ক মেলা ॥ চন্দননগর

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে হুগলি জেলার ভূমিকা ছিল অন্যতম পথিকৃতের। তাই জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তার অবস্থান ছিল দেশের সামনের সারিতে। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে সভা করতেন, প্রচার করতেন তাঁর জাতীয় ভাবধারা। হুগলির উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি। হুগলি জেলার কবি-মনীষীরা ছাড়াও এই জেলায় তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা যাতায়াত করতেন বা সাময়িকভাবে বাস করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত শ্বশুরালয়ের সুবাদে এখানে থাকতেন, তাঁর সংবাদ প্রভাকরের সঙ্গে এই জেলার কয়েকজন সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। মধুসূদন এখানে বাস করেছেন, রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলও এই জেলায় কিছুদিন বাস করেছিলেন। তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রও কিছুদিন এই জেলায় বাসকালেই বন্দেমাতরম গানটি লেখেন। এ গানের প্রথম সুরারোপ এবং পরিবেশনাও হয় এই জেলায়। হুগলি কলেজের ছাত্র বঙ্কিম, এই জেলায় তাঁর সহপাঠীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতেও অংশগ্রহণ করতেন। স্বাভাবিকভাবেই বঙ্কিমের স্বাদেশিকতা ভাবনা এ অঞ্চলে প্রভাব-বিস্তার করেছিল। স্বয়ং বিবেকানন্দও এই জেলার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তাঁর উদ্দীপ্ত স্বদেশপ্রেম ও বীরত্বপূর্ণ চারিত্র জাতীয় আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল। সেই স্তরে অনেক সন্ন্যাসীও জাতীয়তাবাদের প্রচারক ছিলেন আবার অনেক অন্দোলনকারীও পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। এমন কি হুগলির প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যিনি শিকাগো ধর্মসভায় বিবেকানন্দের সঙ্গে বক্তা ছিলেন, তাঁরও জাতীয় ভাবোদ্দীপক ভূমিকা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

তবে সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন বসু কেবল শহরাঞ্চলে নয়—তারকেশ্বরের মতো গ্রামাঞ্চলেও সভা করেন এবং জাতীয় ভাবধারার প্রচার করেন। হুগলির তরুণেরা স্বাভাবিকভাবেই ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশেই তাতে বীরের মতো সাড়া দেন।

কালাপাহাড়, প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি শঙ্কর সর্দার, সিরাজের সেনাপতি মোহনলালের স্মৃতি যেমন ছড়া ও গানের আশ্রয়ে বেঁচে আছে, তেমনি উনিশ শতকের কর্মবীর এবং ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি নিয়েও অনেক ছড়া এবং গান প্রচলিত আছে হুগলি জেলায়। এসব গান, মৌখিক ও লোকাশ্রয়ী সাহিত্য এবং অখ্যাত স্বভাবকবিদের রচনা দ্রুত বিলীয়মান। এই ছড়া ও গানের মধ্যে উত্তরকালে বিষয়ীকৃত হয়েছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্নের মতো মানুষ, নীলচাষ ও বর্গী হাঙ্গামার মতো ঘটনা। অথবা বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, খৃস্টান, মেমসাহেব, জাহাজ, রেলগাড়ি, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ। এই সব ছড়া ও গানেই আছে ঐতিহাসিক ঘটনা বা ব্যক্তিদের সম্পর্কে জনমানসের প্রতিক্রিয়ার স্বাক্ষর। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা জমিদার, পত্তনিদার শ্রেণীর ভূমিকা মুখ্য হলেও জনগণ সে সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না—লোকায়ত জনজীবনে তার পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া কাজ করছিল।

বিংশ শতাব্দীর সূচনাতে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে হুগলি জেলা উত্তাল হয়ে ওঠে। তৎকালীন প্রচার আন্দোলনে জনগণের চিত্তে ভাবধারার যে প্রসার আনে, পরবর্তীকালে তা বিচিত্র পথে বিকশিত হয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই হুগলি জেলায় বিপ্লববাদী সংগঠন দানা বাঁধতে শুরু করে। চন্দননগর-চুঁচুড়া থেকে শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে সশস্ত্র সংঘাতের প্রস্তুতি কেন্দ্র গড়ে ওঠে। চন্দননগর ফরাসি অধিকৃত এলাকা হওয়ার জন্য ইংরেজ পুলিশের চোখ এড়িয়ে এখানে বিপ্লবীদের কর্মকেন্দ্র গড়ে ওঠে। হুগলি জেলার অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ও তাঁর ছাত্র এবং সহযোগী সম্প্রদায়, চারু রায়, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবী গ্রামাঞ্চলেও বিভিন্ন কেন্দ্র গড়ে জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা—সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অবস্থানের ভিত্তি রচনা করেন। দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ তুচ্ছ করে সংগ্রাম করার আবেগ জনগণের মানস গঠনে অনপনেয় প্রভাব ফেলে।

বিভিন্ন গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তির প্রচেষ্টায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে রাজনৈতিক মাত্রা যুক্ত হল। হুগলির দেবব্রত বসু ও বারীন ঘোষের সহযোগিতায় হল যুগান্তর পত্রিকার প্রকাশ।

চালু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চাহিদা পূরণের জন্য জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে নতুন নতুন ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক এবং শিক্ষাক্রমের প্রবর্তনও এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সময় বিদ্যামন্দিরের ভূমিকা শিক্ষার তাৎপর্যকেই পরিবর্তিত করে। সুরেন বড়াল, পরবর্তীকালে রাসবিহারী বসু প্রমুখ বিপ্লব প্রচেষ্টার নায়করা এই উদ্যোগে যুক্ত ছিলেন। এ রকম নামের দীর্ঘ তালিকা না দিয়ে বলা যায়, তৎকালীন বাংলাদেশের বিপ্লবীরা ক্ষুদিরাম বসু থেকে শুরু করে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন পর্যন্ত প্রতিটি বিপ্লবী কর্মসূচিতে হুগলির কেন্দ্রগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিল। কলকাতার অসুবিধা এড়াতে হুগলিই হয়েছিল বিপ্লবীদের প্রধান কেন্দ্র।

তারকেশ্বর মোহান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন ব্যাপক গণ-আন্দোলনের রূপ নেয়। চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতারা এই আন্দোলন পরিচালনা করেন—শহর-গ্রামের সম্মিলিত আন্দোলনে হুগলি জেলার চেতনার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। মোহান্ত কেবল ধর্মীয় ক্ষমতার অধিকারী নন, বেশ বড় মাপের ভূস্বামী এবং প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক প্রতিপত্তির অধিকারী, প্রশাসনযন্ত্রও ছিল তার পক্ষে। এই আন্দোলনের পর চিত্তরঞ্জন এবং সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এই জেলার রাজনৈতিক যোগ আরও দৃঢ় ও সক্রিয় হয়।

অতএব, রাজনৈতিক আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা তরঙ্গাঘাতে হুগলি জেলার মানস প্রকর্ষে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়, তার অভিব্যক্তি ছিল খুব বিস্তৃত ও জটিল। বঙ্কিম-বিবেকানন্দের প্রভাব, উমেশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন বসু, ব্রহ্মবান্ধব ও সমস্ত গোষ্ঠীর বিপ্লবীরা, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, অরবিন্দ থেকে শুরু করে সুরেন গোস্বামী, ভূপেন দত্ত, বঙ্কিম মুখার্জি, মুজাফ্ফরের আহ্বানে সকলেরই কর্মধারা এখানে মিলিত হয়েছিল। বহুমাত্রিকতা ছিল এই কর্মোদ্যোগের বৈশিষ্ট্য। বহুমুখী প্রশ্ন সত্ত্বেও আন্দোলনকে চালিত করছিল দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তি সম্বন্ধে একটি সংহত ভাবাবেগ। গান্ধীজির আদর্শে গড়ে ওঠা চড়কাকেন্দ্রগুলিও গ্রামাঞ্চলে মানুষকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

তিরিশের দশকে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের কর্মোদ্যোগে শ্রমিক আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলনের বিকাশ জনগণের মানসপ্রকর্ষ নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। গ্রামীণ তরুণরা বিভিন্ন ব্যায়াম সমিতি, সাংস্কৃতিক ক্লাব, পল্লীমঙ্গল সমিতি, নৈশ বিদ্যালয়, ম্যাজিক লণ্ঠন, গণ-প্রচারাভিযান, সাংস্কৃতিক অভিযানে শামিল হতে থাকেন। সাংস্কৃতিক দিগন্তে এই নতুন উষার স্বর্গদ্বার খুলে যায়। হুগলি জেলায় নজরুলের বাসকালে একদল তরুণ তাঁর গান ও কবিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আবৃত্তি এবং সংগীতকে প্রচারাভিযানের অঙ্গ হিসাবে তুলে আনেন। এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক হন হুগলি জেলার ছাত্রকর্মীরা। গ্রামাঞ্চলে দেশাত্মবোধক নাটক নিয়ে সখের থিয়েটার ও মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রার অসংখ্য সৌখিন ক্লাব গড়ে ওঠে। গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী গানের দলও গ্রামে এবং গ্রামীণ বিদ্যালয়ে ব্যাপকভাবে শুরু হয়। 'অ্যামেচার' সংগঠনগুলি ব্যাপক জনগণের সাংস্কৃতিক ক্ষুধা নিরসনে গ্রামীণ শিল্পীদের ভূমিকাকে অর্থবহ করে তোলে। সমাজ বাস্তবতার প্রকাশ এখানে দ্বিধাজড়িত, কিন্তু সুস্পষ্ট। অস্বাভাবিক নয়, ইংরেজ সরকার তার দমননীতির অঙ্গ হিসাবে ক্লাবগুলিকে নিষিদ্ধ করেছিল।

আবার নতুন মাত্রা যোগ করতে এগিয়ে আসেন কম্যুনিস্টরা, শ্রমিক-কৃষকের নবজাগরণের দাবি মেটাতে হুগলি জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে নূতন সৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে আসেন দয়াল কুমার, দুলাল রায়ের মতো শিল্পীরা। জনগণকে রাজনৈতিক আন্দোলনে শামিল করার কার্যক্রমে গ্রামাঞ্চলের কর্মসূচি অনেক নতুন অভিজ্ঞতা আনে। রাজনৈতিক দর্শনও দৃষ্টিভঙ্গিতে বিতর্কমুখর হয়ে উঠতে শুরু করে। কৃষক আন্দোলনে স্বভাবতই জন্ম নেয় অনেক নতুন শ্লোগানের পরিহার্যতা।

এর উপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ও তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ জনসাধারণের অভিজ্ঞতাকে দ্রুত পরিণত করে দেয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার চেতনা প্রসারিত হয় ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের অভিজ্ঞতায়। হুগলি জেলায় জনচেতনা প্রসারের কাজে ম্যাজিক লণ্ঠন ও অন্যান্য আঙ্গিকের ব্যবহার জনগণের সাংস্কৃতিক মানের উজ্জীবনে খুব সাহায্য করে। হুগলি জেলার ছাত্র-কর্মীরা উপলব্ধি করেন সাক্ষরতা আন্দোলনের গুরুত্ব। শিক্ষার সঙ্গে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের আচ্ছেদ্য সম্পর্কের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাঁরা সাক্ষরতা কর্মসূচি গ্রহণ করেন নিজস্ব উদ্যোগে। শহরাঞ্চলের বিকশিত শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের মানুষের মানসিক সাযুজ্যের মাধ্যম হিসাবে সাক্ষরতা আন্দোলন এক নতুন দিকচিহ্ন।

এর পর অবক্ষয়ী সংস্কৃতির আগ্রাসী আক্রমণ এবং এর বিরুদ্ধে প্রগতিশীল সাহিত্যশিল্পের সংগ্রাম। হুগলি জেলার রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক পালাবদলের ইতিহাস শুরু হয়। তার বিবরণ দিতে গেলে পৃথক প্রবন্ধের প্রয়োজন। তবে নাগরিক ও গ্রামীণ শিল্প-সংস্কৃতির সম্মিলিত অভিযানেই আগামীদিনে সুস্থ সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধিত হবে—এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

হুগলি জেলার একটি অর্থনৈতিক রেখাচিত্র
সেকাল ও একাল

রূপচাঁদ পাল



হুগলি জেলার অর্থনৈতিক কাজকর্মের চেহারায় ও প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন নিরন্তর ঘটে চলেছে তার গতিধারার সামগ্রিক মূল্যায়নের কোনও উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা তেমন হয়েছে বলে জানি না। তবে সাধারণভাবে এই জেলার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম তথা শিল্প-কৃষি পরিষেবার নানান দিক নিয়ে কিছু অনুসন্ধান, আলোচনা ও পর্যালোচনা বিক্ষিপ্তভাবে হয়েছে বলে শুনেছি।

অতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে শিল্পায়নের যে গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে তার পটভূমিতে রাজ্যে শিল্প-সম্ভাবনা বিষয়ে শ্রীপার্থ ঘোষের সাম্প্রতিক বক্তব্যে দেখা যায় যে (শ্রীঘোষ একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে তাঁর পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে।) তিনি এই শিল্প সম্ভাবনাময় হুগলি জেলাকে (যা একসময়ে প্রায় ২০০ বছর আগে বর্ধমান জেলারই অঙ্গ ছিল) বর্ধমান, মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার সঙ্গে একই গোষ্ঠীতে রেখেছেন। শ্রীঘোষ রাজ্যে শিল্প-সম্ভাবনার এইরূপ গোষ্ঠী ভাগ করার সময় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে যে-সকল পরিবর্তন এই জেলাগুলিতে ইতিমধ্যে ঘটে গেছে বিশেষত বামফ্রন্ট রাজত্বকালের বিগত ১৯ বছরে, সে বিষয়টি নিশ্চয়ই নজরে রেখে গোষ্ঠী ভাগ করেন।

এই পরিবর্তন ঘটেছে শিল্পে, যার মধ্যে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প, মাঝারি শিল্পও যেমন পড়ে, তেমনই পড়ে বিদ্যমান বৃহৎ শিল্পগুলি। বর্তমানে শিল্পে ও কৃষিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারা। যেমন হুগলি জেলায় আছে হিন্দমোটর কারখানা, ডানলপ কারখানা, দশটি চটকল, ত্রিবেণী টিস্যু ও আরও কয়েকটি শিল্প-কারখানা। এর মধ্যে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের গুরুতর সমস্যায় জর্জরিত। কয়েকটি ইতিমধ্যেই রুগ্‌ণ হয়ে পড়েছে বা হতে চলেছে। অন্য দিকে কৃষিতে ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে তুলনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে।

গোষ্ঠী ভাগের সময় শ্রীঘোষ হুগলি জেলা যে কৃষিপ্রধান তা মনে রেখেই শিল্প-সম্ভাবনার বিষয়ে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। হুগলি জেলায় ধান উৎপাদন বিগত বছরগুলিতে বেড়ে চলেছে। (১৯৭৪-৭৫-এ আউস, খরিফ ও বোরো সব মিলিয়ে উৎপাদন যেখানে ছিল সাড়ে চার লক্ষ টনের কাছাকাছি, বর্তমানে তা পৌঁছেছে প্রায় সাত লক্ষ টনে)। এর মধ্যে বোরো চাষের প্রবণতা যত বাড়ছে প্রয়োজনে চাষের জন্য ক্যানেলের জল না পাওয়া কয়েকটি ক্ষেত্রে একটি বাৎসরিক বিক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জল পাওয়া যাবে না এইরূপ সরকারি সতর্কতাকে উপেক্ষা করেই বোরো চাষ বেড়েই চলেছে। তাই নিয়ে গণ্ডগোল কম হয় না। ধান উৎপাদনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অর্থকরী ফসল। বাড়ছে আলুচাষ। হুগলি জেলা একাই উৎপাদন করে প্রায় ২০ লক্ষ টন আলু। (যা ১৯৭৭ সালের আগে ছিল সাড়ে চার লক্ষ টনের মতো) আলু উৎপাদনের অর্থনীতি প্রতি বছর নতুন চেহারা নিচ্ছে। হিমঘরের মালিক, বড় ব্যবসায়ী ফড়ে আর মাঝখানে ছোট চাষী, মাঝারি চাষী এদের লাভ-লোকসানের বড় রকম হেরফের একটা নতুন অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করছে ; অন্য দিকে খোলাবাজারে আলুর দাম বৃদ্ধি নিয়ে নানা মুনির নানা মত। আর সরকার হয়ে পড়ছে সমালোচনার শিকার। সবজি উৎপাদনে হুগলি জেলা দেশের মধ্যে আজ এক নম্বরে। বর্তমানে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ টন বিভিন্ন ধরনের সবজি উৎপাদন হয়। ১৯৭৭-এর আগে তা ছিল তিন লক্ষ টনের চেয়ে কিছু বেশি। অন্য ক্ষেত্রের মতো এই সাফল্যেও বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা কম নয়।

তৈল বীজের চাষও বাড়ছে। নতুন নতুন জায়গায় বাদামের চাষ বাড়ছে। সরষে, কিছুটা তিল, এ তো ছিলই তবে পাটচাষ, মেস্তা মাঝে খুব বৃদ্ধি পেলেও এই চাষ দ্রুত যেভাবে কমছে তাতে আগামী দিনে পাটকলগুলোর জন্য কাঁচা পাটের জোগান গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। আজ এই কয় বছরের ব্যবধানে কী উল্লেখযোগ্য সব পরিবর্তন ঘটে চলেছে ভাবাই যায় না।

হুগলি জেলায় যে সুদূর অতীতে তুলোচাষ, রেশমগুটির চাষ হত আর সেই রেশম ও তুলাবস্ত্রের রপ্তানি হত সপ্তগ্রাম বন্দর দিয়ে তা মানুষ ভুলে গেছে বললেই হয়। তবে কী পাটের ক্ষেত্রেও তাই ঘটবে না কি ভবিষ্যতে? সত্যিই চিন্তার বিষয়।

আর ঠিক তার পাশে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে নানান মাছের চাষ। ১৯৭৭-এর আগে জেলায় যেখানে বছরে মাছ উৎপাদন হত ১১ হাজার মেট্রিক টনের মতো আজ তা প্রায় আড়াই গুণ বেড়েছে। মিঠে জলের মাছ তো আছেই। বলাগড়ে, আরও কোথাও কোথাও নোনা জলের চিংড়ি, এমন কী ইলিশের চাষও সফলভাবে হচ্ছে। মাঠের মাছ—সিঙ্গি, মাগুর, ট্যাংরা ইত্যাদি কমছে নানান কারণে। তার মধ্যে চাষের জন্য নানা রাসায়নিক ঔষধ প্রয়োগ অন্যতম কারণ। তবে হুগলি জেলায় মাছের চাষ ব্যক্তিগত উদ্যোগে, সরকারি সাহায্যে, কী সমবায়ের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়লেও মাছের চাহিদা পূরণে আজও পশ্চিমবাংলায় এবং হুগলিতেও বাংলাদেশের মাছ, অন্ধ্রপ্রদেশের মাছ না এলে কিছুটা সংকট হয়ে যায়। তবে 'মাছে-ভাতে বাঙালি'র চাল আর মাছ উৎপাদনে হুগলি জেলা এগিয়ে গেলেও 'সন্তানকে দুধেভাতে' রাখার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে। দুধ উৎপাদনে আশানুরূপ অগ্রসর হুগলি জেলা হতে পারেনি। যদিও গত বছর থেকে হুগলি জেলার প্রধান দুগ্ধ সমবায় দামোদর মিল্ক কোঃ ইউনিয়ন লাভের মুখ দেখেছে। অন্য কয়েকটি দুগ্ধ সমবায়ও ভালো ফল দেখিয়েছে। তবে দুধ থেকে ছানা বানিয়ে কলকাতায় নিয়মিত জোগান বলাগড়, পোলবা-দাদপুরের হারিটা, পোলবা, রাজহাট, আমনান, সুগন্ধা প্রভৃতি অনেক এলাকার মানুষের প্রধান পেশা।

সরস্বতী নদীতীরবর্তী সপ্তগ্রাম বন্দরের ধ্বংসাবশেষের পুরাতাত্ত্বিক বহু নিদর্শন হুগলি জেলার অতীতের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বহু স্মৃতিচিহ্ন বহন করছে। অতীতের স্বয়ংসম্পূর্ণ ভারতীয় গ্রাম্য অর্থনীতিতে যে বৈশিষ্ট্যগুলি কার্ল মার্ক্সের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা একদা হুগলিতেও যে কিছুটা বিরাজ করত তা বলাই বাহুল্য। যজমানী প্রথা আর পণ্যের লেনদেনের সেই শান্তধীর দিনগুলির কথা সপ্তগ্রামের আশেপাশের এলাকা নিশ্চয়ই স্মৃতিতে বহন করে। তবে একদা হোগলা চাষে মশগুল গঙ্গাতীরবর্তী হুগলি (হোগলা থেকে) পরবর্তী সময়ে পোর্তুগিজদের আগমনে শিহরিত হল। আজকের ব্যান্ডেল চার্চের পাশে দাঁড়ালে বোধহয় আকাশে-বাতাসে আজও সেদিনের ফিসফিসানি শোনা যায়। না হলে এত মানুষ দূরদূরান্ত থেকে আসে কেন আজও এই স্থানে? হুগলিতে পর্যটকদের এক প্রধান আকর্ষণ এই ব্যান্ডেল চার্চ।

তবে নীলচাষের আর তার সঙ্গে সম্পর্কিত অত্যাচার-নিপীড়নের 'নীলদর্পণের' স্মৃতিবিজড়িত বহু স্থান যেমন বাঁশবেড়িয়া কী জেলার অন্য এরূপ এলাকা তেমন মানুষকে বোধ হয় টানে না। নীলচাষের বাঁশবেড়িয়ার কাগজকল দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় অনেক বেশি উদ্বিগ্ন মানুষ। যেমন জেলার মানুষ উদ্বিগ্ন হয় জেলার দশটা চটকলের কোনোটা বন্ধ হলে। চটকলের ক্ষেত্রে যা আজকাল প্রায় একটা খোলা-বন্ধের আলো-আঁধারের খেলার মতো। তবু বাঁশবেড়িয়ায় চটকল চলছে ভালভাবেই। ভিক্টোরিয়া, অ্যাঙ্গাস, নর্থ শ্যামনগর জুটমিল বিদেশির কব্জায়। তবু বামফ্রন্ট সরকারের চেষ্টার অন্ত নেই পাটকলগুলোকে চালু রাখতে, শ্রীরামপুরের ঔষধের কারখানা স্ট্যান্ডার্ড কারখানা দীর্ঘদিন বন্ধ। কী নিদারুণ কষ্টে শ্রমিকরা আছে তারাই জানে। তবু ভাল, আশার আলো দেখা যাচ্ছে যে বামফ্রন্ট সরকারের চেষ্টায় হয়তো শীঘ্র খুলবে।

জেলার শিল্পবিকাশের কর্মসূচিতে যেমন নতুন নতুন শিল্পও আছে যেমন ডানকুনিতে মডুলার ফুড পার্ক, বৈঁচিতে আলুর প্রক্রিয়াকরণ, কী হরিপালে মাশরুম চাষ ও প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি, তেমনই রুগ্‌ণ শিল্পের পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবনও আছে। জেলার

উন্নয়নের দাবির মধ্যে আছে ডানলপ, হিন্দমোটর, ত্রিবেণী টিস্যু প্রভৃতি কারখানার সম্প্রসারণ ও উৎপাদনের বহুমুখীকরণ।

জেলার উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক বিকাশের পটভূমিতে বিচার করতে হবে হুগলি জেলার কয়েক লক্ষ তাঁতিদের দুর্দশার কথা। উপযুক্ত পরিমাণ সুতোর ও মূলধনের জোগান, বাজারের সীমিত সুযোগ ইত্যাদি সমস্যায় জর্জরিত তাঁতির জীবনে সমবায় আন্দোলন নতুন আলো এনে দিয়েছে। তন্তুজ, তন্তুশ্রীর মতো রাজ্যের কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে একটা বিকাশের পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। তবু হস্তচালিত তাঁত বিদ্যুৎচালিত তাঁতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকবে কী করে এ এক জ্বলন্ত প্রশ্ন। অন্য দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন আর্থিক নীতি, শিল্পনীতির কৃপায় দেশের সমগ্র কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প যখন একান্ত অসহায় ও অসম প্রতিযোগিতায় দ্রুত পিছু হঠছে সেই সময়ে বামফ্রন্ট সরকারের শত চেষ্টা সত্ত্বেও যে কোনও গ্রামীণ শিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পকে আজ রক্ষা করা দায়। তবু পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকারের কৃতিত্ব সুতোর যোগান বৃদ্ধি ও তার জন্য সুষ্ঠু নীতি, সমবায়ের জন্য মদতদান, তাঁতজাত বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য তাঁত মেলা ইত্যাদির ব্যবস্থা এক কঠিন অবস্থার মধ্যেও তাঁতশিল্পীদের রক্ষা করে চলেছে। আজও তাই সুদূর দিল্লিতে চিত্তরঞ্জন পার্কে কী মাদ্রাজে, মুম্বই কী অন্যত্র এমন কী সুদূর লন্ডনে আমেরিকায় ধনিয়াখালির শাড়ির কদর। শুধু ধনিয়াখালি, রাজবলহাটের তাঁতবস্ত্র বা কেন বাগনানের চিকনও কিছু কম যায় না। বিদেশে তারও কদর কম নয়।

শুধু তাঁতবস্ত্র কী চিকনই বা কেন হুগলির জনাইয়ের মনোহরা, সোমরার কাঁচাগোল্লা, চন্দননগরের জলভরা, হরিপালের দধি এরা কম কীসে কদরের দিক থেকে!

তবে বর্তমান প্রজন্ম দিশেহারা ও কিছুটা দিগ্‌ভ্রান্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া আর্থিক নীতি ও তার পাশাপাশি দেশি-বিদেশি ফিল্মে ও টেলিভিশনে অপসংস্কৃতির তাণ্ডবলীলা নতুন প্রজন্মকে বিপথে চালিত করছে। আর তারই ধাক্কায় হারিয়ে যাচ্ছে গৌরবের এইসব শিল্পকারিগরিবিদ্যা। সর্বত্র একই চিত্র। তবে আশার দিকও আছে। বাজারের চাহিদা মেটাতে অনেক ক্ষেত্রে নকলও আসছে বাজারে যা আসলকেও পাল্লা দিতে পারে। একেই বোধ হয় বলে পুরনো আর নতুন, ট্রাডিশন্ আর মডার্নিটির যুগলবন্দী। যেন গীটারে শাস্ত্রীয় সংগীত। তাও ভাল একেবারে হারিয়ে যাওয়ার চেয়েও।

তবে হারিয়ে তো যায়ই। দিন হারিয়ে যায়। মানুষ হারিয়ে যায়। বন্যায় আরামবাগ খানাকুলের পথ-ঘাট মাঠ-বন খেত-খামার ঘর বাড়ি সব হারিয়ে যায়। তবে ডুবে আবার উঠছে ভেসে এই খেলা তার সর্বনেশে। দামোদরের প্রায়-বাৎসরিক ডুগডুগিতে আরামবাগ-খানাকুল অন্য আরও দু-চারটে জায়গার মতো ডোবে আর ভাসে। আরামবাগ মহকুমার মানুষ মেনে নিয়েছে। তবু চলে লড়াই প্রকৃতি আর মানুষে। মানুষ জেতে শেষ পর্যন্ত। পঞ্চায়েত পাশে আছে। একটা বন্ধু সরকার আছে। বামফ্রন্ট সরকার। না থাকলে কী হয় তা প্রবীণেরা গল্প করে বলে অতীত দিনের কথা।

শুধু বন্যার মোকাবিলায় নয় অর্থনীতিতে দুর্বলতর শ্রেণী ও পেছিয়ে পড়া পুরুষ ও নারীদের সচেতন, সক্ষম ও সুদক্ষ করে তুলতে এক সফল কর্মযজ্ঞেও হুগলির মানুষ এগিয়ে এসেছে। সার্বিক সাক্ষরতায় সফল কর্মসূচি জেলার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। জনস্বাস্থ্যের কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে শিশুদের সর্বজনীন টিকাদান ও পরবর্তী সময়ে পালস পোলিও কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে আগামী দিনের সুস্থ ও সবল কর্মজীবী মানুষ গড়ে তোলায় আজ ব্যস্ত জেলার পঞ্চায়েতি ও পৌর পরিচালকরা রাজ্য সরকারের নেতৃত্বে। এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়তে বাধ্য আগামী দিনের জেলার সমগ্র অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে।

শিল্প-কর্মসূচির সঙ্গে পরিবেশ ভাবনাতেও হুগলি জেলা কিছু পেছিয়ে নেই। বনসৃজন প্রকল্পে বহু এলাকা কী গ্রাম কী শহর আজ সবুজ থেকে সবুজতর। আর তারই প্রতীক বোধ হয় বলাগড়ের সবুজদ্বীপ যা জেলার পর্যটন শিল্পকে সমৃদ্ধ করতে চলেছে গোঘাটের গড় মান্দারণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

ব্যান্ডেল-কাটোয়া রেল লাইনে নতুন ই এম ইউ ট্রেন চলছে সকলের বিশেষ করে জেলার সাংসদদের একান্ত প্রয়াসের ফলে। এই লাইনেই গড়ে উঠবে বলাগড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। বর্তমান ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে কিছু উত্তরে।

এ তো গড়ে ওঠার কাহিনী। এর পাশেই চলেছে গঙ্গার ভাঙনের এক খেলা। গঙ্গার ভাঙনে বলাগড়ে ভয়ংকর চেহারা নিচ্ছে। যেমন নিয়েছে নদিয়ায়, মুর্শিদাবাদে। কেন্দ্রীয় সরকার জেগে ঘুমচ্ছে। কে জাগাবে তাকে?

হুগলি জেলার সুদীর্ঘ যাত্রাপথে সে দেখেছে কতই না ভাঙাগড়া, কতই না উত্থান-পতন। দেখেছে শাসনের রদবদল, শাসকের আসা-যাওয়া। দেখেছে দুর্ভিক্ষ, মহামারী। আরামবাগ জানে ম্যালেরিয়ার অতীতের সর্বনাশের চেহারার কথা। হুগলি জেলা জন্ম দিয়েছে অসংখ্য বরেণ্য সন্তানদের। হুগলি জেলার কত বীর শহিদ দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে হুগলি জেলার কথা। গণতন্ত্রের জন্যে সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার সংগ্রামেও প্রাণ দিয়েছে এই জেলার অসংখ্য মানুষ। শত নির্যাতন সত্ত্বেও মাথা নত করেনি। তাই হুগলির মাথা আজও উঁচু। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে বিজ্ঞানচর্চার অসংখ্য কৃতী সন্তানের স্মৃতিধন্য এই হুগলি জেলা।

আজ নব জন্মের নব সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা হুগলি জেলাকে উদ্দেশ্য করে বলতে ইচ্ছা করে—হুগলি তুমি ধন্য। তোমার সম্পদ নিয়ে তুমি আরও বিকশিত হও।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে যে নতুন শিল্প-কার্যক্রম রূপায়িত হতে চলেছে তারই অঙ্গ হিসাবে হুগলি জেলায় গড়ে উঠুক নতুন নতুন শিল্প-কারখানা ও আধুনিক পরিষেবা। বিভিন্ন স্বনিযুক্তি প্রকল্পে শিক্ষিত যুবকদের কার্যকরী উৎসাহ যোগাক বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, জাতীয়কৃত ব্যাঙ্ক। দারিদ্র্য দূরীকরণের বিভিন্ন প্রকল্পকে সফল করে তুলতে পঞ্চায়েত ও পৌরসভার প্রচেষ্টা যেন সার্থক হয় সংশ্লিষ্ট সকলের আনুকূল্যে। খাদি গ্রামোদ্যোগের অসংখ্য সম্ভাবনাময় প্রকল্প নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যেও হাতে তুলে নিতে হবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে যা কোনও চমক ছাড়াই অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটাতে পারে। উদ্বৃত্ত বিক্রয়যোগ্য কৃষিপণ্য শাক-সবজি ফলমূল—যা

উপযুক্ত পরিবহণ যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে আজও বাজারস্থ করার সুযোগ নেই তার জন্য সবজি ফলমূল প্রক্রিয়াকরণের সুযোগ আসুক। গড়ে উঠুক এই সকল কৃষিপণ্যের জন্য বিভিন্ন ধরনের আধুনিক হিমঘর।

জওহর রোজগার যোজনা, আই আর ডি পি, নেহরু রোজগার যোজনা, ট্রাইসেম, ডোকরা, আই সি ডি এস প্রভৃতি প্রকল্পের আরও বিস্তৃতি ঘটাতে হবে ও তাকে আরও কার্যকরী করে তুলতে হবে। জেলার অর্থনৈতিক বিকাশে তা খুবই প্রয়োজন।

হুগলি জেলায় সংগঠিত শিল্পের শ্রমিকদের পাশাপাশি বিরাট সংখ্যক অসংগঠিত শ্রমিক বিভিন্ন ধরনের পেশায় নিযুক্ত। তারা জেলার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের অংশীদারই শুধু নয় এর অর্থনৈতিক বিকাশে এদের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সারা দেশের গভীর ও ব্যাপক সংকটের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে রুটি-রুজির জন্য প্রাণপাতকরা সংগ্রামে লিপ্ত এই অসংগঠিত শ্রমিকদের বিপুল অংশ দেশ ভাগের পর বিভিন্ন পর্যায়ে পশ্চিমবাংলায় এসেছে। যেমন এসেছে শিল্পে অনগ্রসর প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকে। ট্রেনে বাসে রাস্তায় হকারি, সাইকেল রিকশা চালানো, ট্রলি-ভ্যান চালানো, চায়ের দোকান চালানো প্রধানত পুরুষেরা করে। আর মেয়েদের একটা অংশ পরের বাড়ি ঠিকে ঝিয়ের কাজ করে। লেখাপড়া জানা গরিব মধ্যবিত্ত ঘরে বহু বেকার যুবক-যুবতী প্রাইভেট ট্যুইশনি করে সংসার চালান, নিজের খরচ জোগাড় করেন।

ইতিমধ্যে গড়ে ওঠা উচ্চবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্তের ঘরের নতুন সব ভাবনা-চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষা এক নতুন সংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে। ঘরে একটি কী দুটি সন্তান। তাদের পাঠাচ্ছে নাচ, গান, ছবি আঁকা এমন কী ক্রিকেট, ফুটবল, দাবা শেখার স্কুলেও রাজ্যের জন্য পাঁচটা শহরের মতোই। এই সব কাজে দক্ষ বেকার যুবক এই সব শিখিয়েই সংসার চালাচ্ছে। বিচিত্র বিচিত্র অসংখ্য পেশায় জেলার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের তারা অংশ।

নতুন অনেক পেশাও গড়ে উঠছে। তথ্য বিপ্লবের যুগে কম্পিউটার ইত্যাদি শিক্ষার সুবাদে আরও অনেক পেশার প্রকাশ আগামী দিনেও ঘটবে। যেমন পুরনো নাপিত, যাদের কাকা দাদা বলে ছেলেরা মেয়েরা ডাকত, তারা হারিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি গড়ে উঠছে 'বিউটি পার্লার'। পূজারী পুরোহিতের সংখ্যা কমছে। ধোপাদের বাড়ির ছেলে ভাবছে 'ডাইং ক্লিনিং' করতে হবে। একটা দোকানঘর চাই বাজারে। ব্যাঙ্কের ঋণ পেতে চাইছে। নিম্নবিত্ত, দুস্থ পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পরিবারের মধ্য থেকে প্রধানত হকার, রিকশা চালানো, পরের বাড়ি কাজ, চায়ের দোকান চালানো ইত্যাদি পেশাতে এলেও রাস্তা ঝাঁট দেওয়া, নর্দমা পরিষ্কার ইত্যাদি জেলার ১২টি পৌরসভার পৌরসেবার কাজে প্রধানত অন্ধ্র, বিহার, উত্তরপ্রদেশের পূর্বভাগ কী ওড়িশার কিছু এলাকা থেকে আগত শ্রমিকরাই করে থাকে।

কিন্তু কলকাতার খুব কাছের এই জেলায় শহর ও আধা-শহর এবং শহরের লাগোয়া গ্রাম এলাকার দ্রুত বিস্তৃতি ও বিকাশ ঘটছে। বাড়িঘর হচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক রাজমিস্ত্রি, ছুতোর এমন কি ইলেকট্রিসিয়ানের খুব অভাব। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই কাজের উপযোগী লোকের যোগান বৃদ্ধির কথা ভাবতে হবে।

গ্রামাঞ্চলেও কৃষির আধুনিকীকরণের ফলে কৃষিমজুরের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। এদের বাড়তি একটা অংশ রাজ্যের নতুন শিল্প-কার্যক্রমের বিশেষ করে আধুনিক খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি শিল্পে কাজের কিছু সুযোগ পাবে। কিন্তু কমিউনিটি পলিটেকনিক ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামের পুরুষ ও নারীদের নতুন প্রয়োজনীয় সকল পেশার উপযোগী করে গড়ে তোলা প্রয়োজন।

হুগলি জেলার এই সামগ্রিক আর্থিক বিকাশের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করতে যে পরিকাঠামোর—বিশেষ করে রেলের সম্প্রসারণ, রাস্তাঘাট সংস্কার ও নির্মাণ, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে—যে জেলা পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তাকে কার্যকরী করতে যে অর্থের প্রয়োজন সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সাহায্য-সহযোগিতা জরুরি। রেল, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি আবার কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। আর এ রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণের কথা সকলেরই জানা।

শুধু পরিকাঠামো নয় শিল্পের জন্য উপযুক্ত দক্ষ শ্রমিক তৈরির জন্য কারিগরি শিক্ষার প্রসারণ ঘটাতে হবে। জেলার শিল্পের জন্য প্রশিক্ষণ ও শিক্ষানবিশী কেন্দ্রগুলি—যেমন ব্যান্ডেল আই টি আই, ব্যান্ডেল সার্ভে ইনস্টিটিউট, হুগলির এইচ আই টি, এ ছাড়া কমিউনিটি পলিটেকনিক, মহিলাদের পলিটেকনিক ইত্যাদির প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিতে হবে। আধুনিক তথ্য বিপ্লবের এই যুগে যখন সারা পৃথিবীর সঙ্গে কম্পিউটার এক নতুন বাস্তবতা নিয়েছে এবং কৃষি-শিল্প পরিষেবায় প্রায় সর্ব শাখায় আজ কম্পিউটার দ্রুত পরিব্যাপ্ত হচ্ছে তখন আমাদের শিক্ষায়ও কম্পিউটার শিক্ষা দ্রুত অঙ্গীভূত হবে বলে আশা করা যায়। দেখতে হবে আগামী প্রজন্মে যেন কৃষি-শিল্প পরিষেবার আধুনিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে তাল রেখে নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারে। জেলা শিল্পকেন্দ্র, ব্যাঙ্ক, সমবায়, কর্মসংস্থান কেন্দ্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জেলা পরিকল্পনা সংস্থা, জনপ্রতিনিধি, রাজ্য সরকার, পঞ্চায়েত, পৌরসভা, জেলা প্রশাসন, ডি আর ডি এ সকলের যৌথ প্রয়াসে আগামী দিনের উপযোগী করে শিল্পে কৃষিতে ও পরিষেবায় সম্ভাবনাময় হুগলি জেলাকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে।

হুগলি জেলার গ্রামীণ শিল্প অতীত ও বর্তমান

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়



শুরুতেই বলে নেওয়া ভাল আলোচ্য প্রবন্ধটি আদৌ কোনও গবেষণামূলক প্রবন্ধ নয়—বরং এটিকে একটি 'তথ্যমূলক বিবরণী' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সমাজের ক্রম-বিকাশের ধারায় এই জেলার শিল্প, যা প্রধানত গ্রামীণ, হস্ত ও কুটিরশিল্পভিত্তিক, নানা ঘাত-প্রতিঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, কীভাবে, কতটুকু টিকে আছে, সেই টিকে থাকার রূপ অবিকৃত অথবা পরিবর্তিতভাবে, কতটুকু বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে অথবা হতে বসেছে তার একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পকর্মগুলির সৃষ্টিকর্তা, তার ধারক ও বাহক হিসাবে অসংখ্য নাম-না-জানা শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্প-ভাবনায় সমাজের পরিবর্তিত গতি-প্রকৃতি চাহিদা-প্রয়োজনের মাপকাঠিতে কী কী বিষয় প্রতিকল্পিত হচ্ছে তার একটি সংক্ষিপ্ততম রূপ ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

কালের বিচারে এ জেলার বয়স মাত্র ২০০ বছর হলেও অঞ্চল ও এলাকাগতভাবে এর একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ভারতবর্ষ তথা বাংলার শিল্পমানচিত্রে যে ঐতিহ্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাত ধরে উত্তরাধিকারসূত্রে গ্রথিত হয়ে চলেছে সে কাহিনী একদিকে যেমন স্মৃতিমধুর তেমনই বেদনাবিধুর। তবু তা আজও কতটা স্ব-মহিমায় বলা না গেলেও, অস্তিত্বের প্রশ্নকে সামনে রেখেও বর্তমান।

বস্ত্রশিল্প—জেলার প্রাচীন শিল্পের কথা বলতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় বস্ত্রশিল্পের কথা। বাংলার মসলিন ছিল জগদ্বিখ্যাত। কথাতেই আছে "বাংলার মসলিন বোগদাদ রোম চীন। কাঞ্চন তৌলেই কিনতেন একদিন"। অনেকের ধারণা মসলিন কেবল ঢাকাতেই (বর্তমানে বাংলাদেশে) হত। ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ তা নয়। বাংলার প্রায় সর্বত্রই মসলিন তৈরি হত। মসলিন বিভিন্ন প্রকারের ছিল। ঢাকার মসলিন ছিল সর্বোৎকৃষ্ট। ঢাকার অনুরূপ মসলিন আরও যে সব জায়গায় তৈরি হত তার মধ্যে সপ্তগ্রাম ও ধনিয়াখালিও ছিল। এখানে 'মলমলখাস' নামে শ্রেষ্ঠতম মসলিন তৈরি হত। 'শিরজ্' তুলার সুতায় মসলিন বোনা হত—এর টানায় ১৮০০-২০০০ সুতা থাকত—ওজন ছিল ৮ তোলা আনা মাত্র। মলমলখাস সাধারণের ব্যবহার্য ছিল না—কেবলমাত্র বাদ্শা-বেগমেরাই ব্যবহার করতেন। মলমলখাস ছাড়াও ঝুনা, আঙ্রানা, যুবনম্, সবনম্, জামদানি, তঞ্জারকাশিদা প্রভৃতি প্রায় চল্লিশ রকমের মসলিন তৈরি হত। এর মধ্যে কাশিদা ছিল মিশ্র (Spun)—এতে মুগা ও রেশম মিশিয়ে বোনা হত। জামদানি ছিল শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন। এর বুননের নানা নাম ছিল—যেমন আনারদানা তোড়দার, মেল্, পান্নাহাজার, করেলা প্রভৃতি। এই শিল্প জেলার আরও অনেক এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

'মসলিন' বর্তমানে জেলা থেকে প্রায় লুপ্ত। তবে জামদানি নিত্যনতুন বৈচিত্র্যে এখনও বিরাজমানা। বামফ্রন্ট সরকারের আনুকূল্যে জেলার তাঁতশিল্পে নতুন প্রাণসঞ্চার হয়েছিল—এ জেলার নিজস্ব ঘরানায় ধনেখালির শাড়ি, বেগমপুর-রাজবলহাটের ধুতিসহ হরিপাল, খানাকুল, আরামবাগ, সিঙ্গুর, পাণ্ডুয়া, বলাগড়, চণ্ডীতলা প্রভৃতি ব্লকে এই শিল্পের বিস্তৃতি রয়েছে। বিখ্যাত ফরাসডাঙার (চন্দননগর) ধুতি ক্রমক্ষীয়মান। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের উদার অর্থনীতি ও তৎসম্ভূত বস্ত্রনীতির ফলে এই শিল্পের সামনে নিদারুণ সংকট দেখা দিয়েছে ফলে হাজার হাজার তাঁতশিল্পের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

রেশমশিল্প—জেলাতে এই শিল্পটিরও রমরমা ছিল। পুরনো রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে ১৭৫৫ খ্রিঃ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিম্নলিখিত 'আড়ং'-এ সিল্ক ক্রয়ের জন্য অগ্রিম টাকা দিয়েছিল।

কারখানা	টাকা	রেসিডেন্ট কমিশনার
হরিপাল	৮৫,৪৪৩	টমাস হিউয়েট
ধনিয়াখালি	৩৫,৫৩৩	
গোলাঘর (মগরা)	৩৮,৫১৮	রজার লেন ওরিকার্ড
ক্ষীরপাই	১,৬২,৫৭০	পিটস্ মিড্লটন

সূত্র : হুগলি জেলার ইতিহাস, শ্রীসুধীরচন্দ্র মিত্র।

উপরোক্ত স্থান ছাড়াও দ্বারকেশ্বর নদের পশ্চিমে গোঘাট থানার দেওয়ানগঞ্জে রেশম ব্যবসায়ের কেন্দ্র ছিল। গুটিপোকার চাষ, কাট-ঘাইতে সুতা বের করা এবং তাঁতে বোনাসহ সবরকম কাজই হত। কালক্রমে নানা কারণে এই শিল্পটি জেলা থেকে প্রায় অবলুপ্ত হয়ে যায়। বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দপ্তর এবং পঞ্চায়েত উদ্যোগে গোঘাট, তারকেশ্বর ও হরিপাল এলাকার কিছু অংশে পরীক্ষামূলকভাবে গুটিপোকার চাষ ও প্রসেসিংয়ের কাজ শুরু করা হয়েছে।

সিল্ক প্রিন্টিং—আমাদের রাজ্যে গুটিপোকার চাষ যে পরিমাণে হয় তার ৭০% চাষ হয় মালদহ জেলাতে। রেশমশিল্পের কেন্দ্রীভূত জেলাগুলি হল মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া (তসর), নদিয়া প্রভৃতি। এর মধ্যে সিল্ক থান বুননে মর্শিদাবাদের স্থান প্রথম। কিন্তু মজার কথা হল রেশম উৎপাদনের সর্ব শেষ যে কাজ তা হল প্রিন্টিং বা ছাপার কাজ। এই কাজে এই জেলার শ্রীরামপুরের একচেটিয়া কারবার আজও অব্যাহত। এই একচেটিয়াপনা ভাঙার চেষ্টা থাকলেও শ্রীরামপুরের কাজের উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য সত্যই বিস্ময়কর। সারা রাজ্যের সিল্ক প্রিন্টিংয়ের শতকরা ৮০ ভাগ কাজ এখানেই হয়ে থাকে। এখানকার বাটিকের কাজের বিশেষ মর্যাদা আছে।

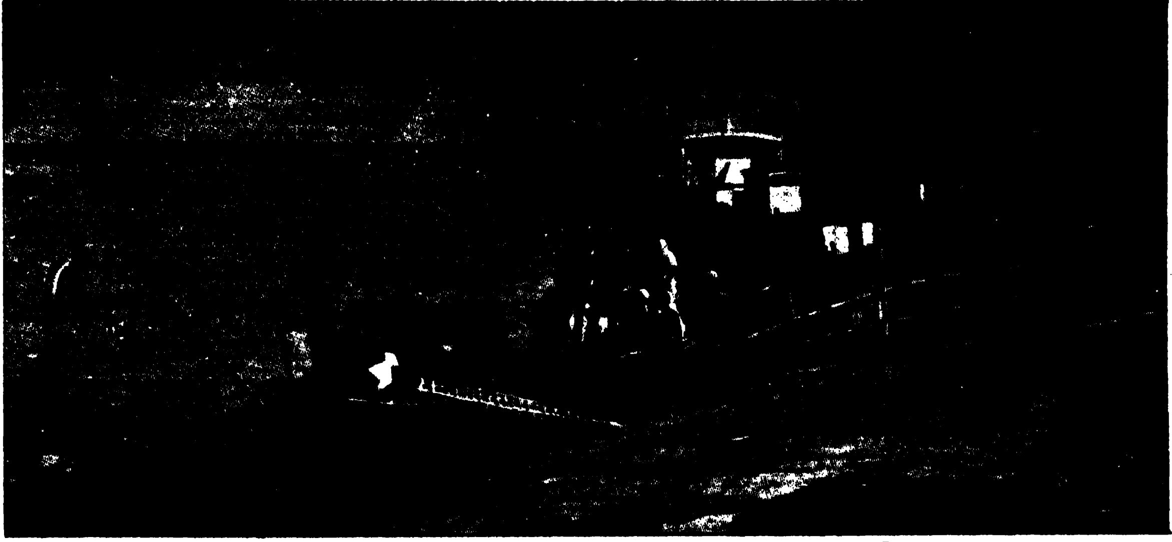
চটশিল্প—এই শিল্পের ইতিহাসও প্রাচীন। পাট থেকে সুত্লি, সুতা দড়ি (লাগ্লাইন), কাছি, রশি তৈরি করা হত। অনেক সময় নৌকা ও জাহাজের পাল চট দিয়ে প্রস্তুত হত। হস্তচালিত তাঁতে চট ও চটের কাপড় বোনা হত। সাধারণত জোলা, তাঁতি, কপালী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরাই এই শিল্পে নিযুক্ত ছিল। একটি হিসাবে দেখা যায়—১৮৪৯-৫০ সালে কলকাতা থেকে ২২,৯৬,১৪,৪৪১ খণ্ড থলে এবং ২৩,৮০,১৯১ খণ্ড চট কলকাতা থেকে রপ্তানি করা হয়েছিল যার অর্থমূল্য ছিল ২৭ লক্ষ টাকা। এই শিল্পের বিস্তৃতি এবং লাভের অঙ্কতে প্রলুব্ধ হয়ে বিলাতের ব্যবসায়ীরা শিল্পটিকে কুক্ষিগত করে এবং বড় বড় জুটমিল স্থাপন হয় এই জেলার গঙ্গাতীরবর্তী স্থানগুলিতে। ফলে হাজার হাজার শিল্পী এই শিল্প থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। অনেকে পাটকলের শ্রমিকে পরিণত হয়।

বর্তমানে আর্থ-সামাজিক কারণে পাটচাষের এলাকা সঙ্কুচিত হচ্চে। গ্রামের এই শিল্প এখন কেবল সুত্লি, দড়ি, ব্যাগ তৈরিতে সীমাবদ্ধ। অতি সম্প্রতি পাটজাত বস্ত্র, কার্পেট প্রভৃতি তৈরির উদ্যোগ শুরু হয়েছে। কামারপুকুরে রামকৃষ্ণ মিশন এ রকম একটি উদ্যোগ পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে চালু করেছে। রাজ্য সরকারের খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের আনুকূল্যে এই প্রকল্প চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে গোঘাট এলাকায়।

চিরাচরিত শিল্প—জেলার চিরাচরিত শিল্পের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় মৃৎশিল্পের কথা। কাদামাটি নিয়েই শুরু হয়েছিল মানুষের শিল্পকর্ম। কাদামাটিকে বিশেষভাবে 'পাট' করে আগুনে পোড়ালে রঙিন হয়, শক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। একেই বলা হয় 'টেরাকোটা'। হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতায় এর নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে—এটা এই শিল্পের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। বাংলার মন্দিরে এই শিল্পের নিদর্শন আজও দেখতে পাওয়া যায়। হুগলি জেলায় এখনও 'টেরাকোটা' শিল্পসমৃদ্ধ ২৫০টি মন্দির রয়েছে।

সূত্র—শ্রীশম্ভু মিত্র "বাংলার মৃৎশিল্প" অলংকরণ

গার্হস্থ্যজীবনে মৃৎশিল্পের অবদান আজও অপরিসীম। আজও গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৪০ ভাগ মানুষ (প্রধানত ক্ষেতমজুর) গৃহস্থালি কাজে মাটির বাসন ব্যবহার করেন। ভাতের হাঁড়ি, মুড়ি ভাজার



নৌকা তৈরির কারখানা ॥ শ্রীপুর, বলাগড় ॥ ছবি প্রভাস পাল

খোলা-খুলি, কলম, কলসি, কুঁজা, পিঠাপুলির সরা, ফুলের টব, মাটির পাইপ, মাটির ফিল্টার প্রভৃতি হরেক রকম দ্রব্যের বাজার আজও জমজমাট। চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে রুচি-বৈচিত্র্যও সৃষ্টি হচ্ছে। মাটির প্রতিমা, খেলনা ও বাজার চিরায়ত কুয়োর পাট একটি বিখ্যাত শিল্প—প্রধানত চন্দননগর ও বলাগড়ে এই শিল্পের মান খুব উন্নত। জেলার প্রায় সর্বত্রই শিল্পের বিস্তৃতি রয়েছে।

বাঁশ-বেতশিল্প প্রধানত গ্রামাঞ্চল এবং শহরের উপকণ্ঠে এই শিল্পের অবস্থান। ঝুড়ি, পেতে, ঘুনি, পলো, আটল, বাড় ছিপ, মোড়া, বেতের চেয়ার, টেবিল, ধামা, কুলো, ধুচুনি, পালি, আড়ি প্রভৃতি সামগ্রী উৎপাদিত হয়। পাণ্ডুয়া, পোলবা-দাদপুর, বলাগড়, মগরা, ধনেখালি, আরামবাগ, খানাকুল প্রভৃতি এলাকায় বাঁশের কাজ এবং ব্যাণ্ডেল, চন্দননগর, শেওড়াফুলি এলাকায় বেতের কাজের বিস্তৃতি রয়েছে।

এ ছাড়া খেজুরপাতার চাটাই, ঝাঁট দেওয়ার বাড়ন, প্রধানত আদিবাসী, তফসিলি শিল্পীরা তৈরি করেন। আসন, ফুল ঝাড়ুও তৈরি হয়।

মাদুর শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান রয়েছে। জেলার চণ্ডীতলার মাদুর বিখ্যাত।

কর্মকার—কামারশালার হাপরের টানের শব্দের সঙ্গে হাতুড়ি পেটার খটাং খটাং শব্দের রেশ ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এলেও এখনও এই শিল্পের গুরুত্ব কম নয়।

জেলার প্রায় সর্বত্রই শিল্পটি নানা আকারে বর্তমান। দা, কাটারি, হেঁসো (হাসুয়া), কোদাল-কুড়ুল, লাঙল, ফাল, শিকল, ডোঙা, কাস্তে, বঁড়শি, চাবি, তালা, হুইল এ সব কিছুই ভাল পরিমাণেই তৈরি হয়। চণ্ডীতলার চাবি, তালা, হুইল বিখ্যাত।

ঘরামি/কাঠামি—এঁরাও একশ্রেণীর শিল্পী। গ্রামাঞ্চলের বেশির ভাগ মানুষ আজও মাটির ঘরে বাস করেন। বাঁশের কাঠামোয় খড় দিয়ে ঘর ছাওয়া বা কাঠের কাঠামোয় টালি দিয়ে ঘর ছাওয়া এক উৎকৃষ্ট শিল্পনিদর্শন। জেলার সর্বত্রই এদের অবস্থান। যদিও ঘরামি সম্প্রদায় ক্ষীয়মাণ। রাজমিস্ত্রি সম্প্রদায় অবশ্য বর্তমান।

কাঠের কাজ—কাঠের কাজের কদর ক্রমবর্ধমান। কাঠ ক্রমশ মহার্ঘ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের আয়ত্তের বাইরে যাওয়ার উপক্রম হলেও, সমাজের উপরের স্তরের মানুষের চাহিদা ও বৈচিত্র্যের প্রয়োজনে শিল্পীদের কদর বেড়েছে। চেয়ার, টেবিল, দরজা, জানালা, আলমারি, খাট, চৌকি প্রভৃতি ব্যস্ত জেলার সর্বত্রই তৈরি হয়।

নৌশিল্প—জেলার ঐতিহ্যবাহী শিল্প। বলাগড়ে বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পীদের উদ্যোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চর্মশিল্প—জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কুটিরশিল্প। পাণ্ডুয়া, মগরা, চন্দননগর, শ্রীরামপুর, আরামবাগ প্রভৃতি এলাকায় এর প্রসার রয়েছে। জুতা, চপ্পল, ব্যাগ, ফোমের বগু, ঢাক, ঢোল, খোল প্রভৃতি সামগ্রী তৈরি হয়। চাহিদাও ভাল। কাঁচা চামড়ার প্রধান বাজার কলকাতা।

হস্তনির্মিত কাগজ—এই শিল্পের একটি প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে এ জেলায়। প্রধানত দশঘরা ও মহানাদের কাগজীপাড়া অঞ্চলের শিল্পীরা সব রকমের কাগজ বিশেষত মিহি কাগজ তৈরিতে দক্ষ ছিলেন। বর্তমানে খাদি বোর্ডের "দশঘরা হস্তনির্মিত কাগজ উৎপাদন কেন্দ্র" একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এখানে ডিপ্লোমা পেপার, বগু পেপার, ফিল্টার পেপার, ফাইল কভার প্রস্তুত হয়। এ ছাড়া সপ্তগ্রাম ও সুগন্ধ্যা এলাকাতেও এই শিল্পের প্রসার ঘটেছে। এ সব দ্রব্যের চাহিদা বিপুল।

চিকন—জেলার অত্যন্ত খ্যাতিসম্পন্ন শিল্প। "বাবনানের চিকন" ভারত বিখ্যাত—লখনউ চিকনের সমকক্ষ। প্রধানত আমেরিকায় রপ্তানি হয়। বিশেষভাবে মুসলমান পরিবারের হাজার হাজার মহিলা শিল্পী এই শিল্পকার্যে নিযুক্ত। পোলবা-দাদপুর, পাণ্ডুয়া, ধনেখালি, হরিপাল এলাকায় কেন্দ্রীভূত।

এই প্রসঙ্গে জাঙ্গিপাড়ার জরির কাজের উল্লেখ করা যায়। এমব্রয়ডারি, পট, দর্জির কাজও রয়েছে জেলার সর্বত্র। এ সব কাজে উল্লেখযোগ্য দিক হল বেশ কিছু মহিলা সমবায় সমিতি এ উদ্যোগের অংশীদার।

স্বর্ণশিল্প—জেলায় স্বর্ণশিল্পীর সংখ্যা কম নয়। প্রায় সর্বত্রই এঁদের অবস্থান। শিল্পনৈপুণ্যও অসাধারণ। সোনারুপার গহনার কদর সার্বজনীন। তবে দুর্মূল্যের বাজারে এ শিল্প সংকটাপন্ন। উল্লেখযোগ্য, জেলার বহু শিল্পী বোম্বাই, সুরাটে কাজ করতে যান।

পিতল-কাঁসা—শিল্পটি ক্রমশ ক্ষীয়মাণ। পূর্বের রমরমা নেই। গোঘাট ও বলাগড়ের একাংশে বর্তমানে সীমাবদ্ধ। বলাগড়ের পিতলের গহনার কদর আছে উত্তর ভারতে।

শঙ্খ—এই শিল্পটি বর্তমানে চন্দননগর, ত্রিবেণী, ব্যাণ্ডেল, তারকেশ্বর এলাকায় সীমিত হয়ে পড়েছে। তা সত্ত্বেও শাঁখার চাহিদা বর্ধমান। শাঁখের গহনার কদর বাড়ছে। শিল্পীদের কাজের সূক্ষ্মতা ও নৈপুণ্য বিস্ময়কর। কাঁচামালের সংকট এই শিল্পের স্থায়িত্বে আশঙ্কার সৃষ্টি করেছে। জেলা পরিষদ থেকে এই শিল্পের কাঁচামালের সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল—বর্তমানে তা সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে।

কাঁথাশিল্প—ঠাকুমা-দিদিমাদের যুগে বিস্ময়কর সূচিশিল্প কাঁথা-শিল্প পুরনোরূপে বিদায় নিলেও সম্প্রতি শাড়ি, পাঞ্জাবি অলংকরণে এই শিল্পের পুনরুত্থান ঘটেছে। দামি শাড়ি বিশেষত সিল্ক, তসর নামে কাঁথা স্টিচের কাজের কদর আজ প্রায় সর্বত্র। রুচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বৈচিত্র্যে ভরা এই শিল্প শহর লাগোয়া গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে।

শোলাশিল্প—কদর কমেনি বরং বেড়েছে। অবশ্য কাঁচামাল সোলা উৎপাদন ব্যাপকভাবে কমে গিয়েছে। প্রধানত দুর্গা, জগদ্ধাত্রীর 'ডাকের সাজে' সোলার কাজ আজও বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। চাঁদমালার ব্যবহার আজও সার্বজনীন। সোলার মহার্ঘতার কারণে তার বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে থার্মোকল। প্রায় সকল অনুষ্ঠানেই থার্মোকলের ব্যবহার—গ্রাম-শহরের সর্বত্র এর প্রচলন রয়েছে। বেকার ছেলেমেয়েরা এই কাজে দক্ষতা অর্জন করে রোজগারের পথ বের করে নিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য চন্দননগরের সোলাশিল্প এত উন্নত মানের ছিল যে ১৯৫৬ সালে বিশ্বশান্তি পরিষদের প্রতিনিধিরা সোলার পাখি উপহার পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ শিল্প :

ঢেঁকি—গ্রামবাংলার সমাজজীবনে একে নিয়ে কত ঠাট্টা-তামাশা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ—যেমন (১) ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে (২) ব্যাটা বুদ্ধির ঢেঁকি (৩) অবুঝকে বোঝাব কত বোধ নাহি মানে। ঢেঁকিরে বোঝাব কত নিত্য ধান ভানে। এমত অসংখ্য ছড়া যাকে নিয়ে সেই ঢেঁকি আজ প্রায় অন্তর্হিত। ধান থেকে চাল, চালগুঁড়ি, ছাতু প্রভৃতি তৈরির কাজে এর ব্যবহার একেবারেই সীমিত হয়ে পড়েছে—তার স্থান নিয়েছে হাস্কিং মেশিন। অনুরূপ অবস্থা ডাল, গম ভাঙানি জাঁতার। সে মানুষও নেই, সে গতরও নেই। আটা চাকী মশলা চাকী তার স্থান দখল করে নিয়েছে।

খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পের মধ্যে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় মুড়ি, চিঁড়ে, বড়ি, পাঁপড়, চানাচুর, বাতাসা, মুড়কি, ঘানির তেল, খেজুর গুড়, তালগুড়,—চিরায়ত শিল্প হিসাবে এগুলি আজও টিকে রয়েছে। তবে 'শিউলী' সম্প্রদায় দ্রুত ক্ষীয়মাণ—এঁরা খেজুর গুড়, তালগুড়ের শিল্পী। হুগলি জেলার অধিবাসী কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর তাঁর অন্নদামঙ্গলে লিখেছেন—

'আম আমসত্ত্ব আর আমসী আচার
চালিতা তেঁতুল কুল আমড়া মন্দার'—আজও হুগলির গ্রামে গ্রামে মগরা, ব্যান্ডেল, সিঙ্গুর, হরিপাল, বলাগড় প্রভৃতি এলাকায় আচার, জ্যাম, জেলি প্রভৃতির ব্যাপক বিস্তৃতি রয়েছে।

আধুনিক রুচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে তৈরি হচ্ছে নুডল্‌স্, জ্যাম, জেলি, গুঁড়াদুধ, বিস্কুট, পাউরুটি প্রভৃতি। বিস্কুট, পাউরুটি আরামবাগ মহকুমা, পাণ্ডুয়া, মগরা, পোলবা, ব্যাণ্ডেল, সিঙ্গুর প্রভৃতি এলাকায় কেন্দ্রীভূত। বর্তমানে আলু ভাজা (পটেটো চীপস্) খুব জনপ্রিয়—শহর লাগোয়া এলাকাগুলিতে এর প্রাধান্য রয়েছে।

হুগলি জেলায় এত অসংখ্য বৈচিত্র্যময় শিল্প বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে যে তা বলে শেষ করা যায় না। স্থানাভাবে সেগুলির শুধু নাম এখানে উল্লেখ করা হল। যথা—মাছ ধরা জাল, নাইলনের দড়ি, ইলেকট্রিক বাল্ব, মুদ্রাযন্ত্র; তুষ থেকে তেল, গরুর গাড়ি, ভ্যান রিকশা, ছাতা, মানিব্যাগ, আয়ুর্বেদ ঔষধ, চশমার কাচ, ফুলের কাজ, কেশশিল্প (খোঁপা ইত্যাদি), রং, লেপ, তোশক, ডেকরেটর, ক্যাটারিং, বরফ, আইসক্রিম, ব্যাটারি, আর্মেচার, প্যাকেজিং, বিড়ি, ঠোঙা, লেদ, গ্যারেজ, ঢালাই, স্টিলের বাসনপত্র, ইট, ছাই থেকে ইট, পোল ফ্যাক্টরি, সিমেন্ট জালি, জাফরি, পাইপ, পলিথিন পাইপ, পলিপ্যাক, পার্টিক্‌ল্ বোর্ড, রুফ, টালি, ফ্লোর টালি, টালি, খেলনা, ফুটবল, বাদ্যযন্ত্র, রেডিমেড পোশাক, রাসায়নিক সার, প্লাইউড, গো-খাদ্য, ধানঝাড়া মেশিন, লণ্ঠন, আঠা, মোমবাতি, আতসবাজি, আলোর কাজ, গ্যারেজ, কাচের চুড়ি, বাসন, ঘি, মধু, চুন, সুরকি, সিমেন্ট, রেডিও, টি ভি, টেপ রেকর্ডার, টেপ, বলপেন, অ্যালুমিনিয়ম, ঘুঁটে, গুল, উনুন, দশকর্ম দ্রব্য, আলতা, সিঁদুর, সেন্ট, গুঁড়ো সাবান, ঘড়ি প্রভৃতি। এ সব শিল্পকর্মে হাজার হাজার শিল্পী জীবিকা অর্জন করছেন।

কথায় বলে 'মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ''। মিষ্টিমুখ শেষ পাতে। তাই পরিশেষে, হুগলি জেলার মিষ্টান্নশিল্প। জনাইয়ের মনোহরা, যদিও পুরনো রূপ নেই, তবু আজও মনোহারিনী। বলাগড়ের কাঁচাগোল্লা, কামারপুকুরের বঁদে ও জিলাপী (সাদা), পোলবা-মগরার ছানা, মহানাদের খাজা, চন্দননগরের জলভরা তালশাঁস সন্দেশ, খানাকুলের কলাকাঁদ, ভাণ্ডারহাটির রসগোল্লা, সিঙ্গুর-হরিপালের দই,—আজও অতীতের গৌরবের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে।

নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আজও হুগলির গ্রামীণ শিল্পগুলি টিকে রয়েছে। অফুরন্ত এদের প্রাণশক্তি। সম্প্রতি ভারত সরকারের শিল্পনীতি, উদার অর্থনীতির ঠেলায় এ শিল্পের সামনে অস্তিত্ব রক্ষার সংকট উপস্থিত হয়েছে—দৈত্যাকার বিদেশি পুঁজির সঙ্গে বামনসদৃশ গ্রামীণ শিল্পকে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে বলা হচ্ছে।

শিল্পী ও শিল্প অবিচ্ছেদ্য। শিল্পী বাঁচলে শিল্প বাঁচে—তার বিকাশ হয়। শিল্পীকে শিল্প থেকে বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টা চলছে—মূলধন-প্রগাঢ় যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন, মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করতে চায়—মুনাফাই তার একমাত্র লক্ষ্য। একে প্রতিহত করা দরকার। গ্রামীণ শিল্পে আছে ''মানবিক স্পর্শ''—মানবিক মূল্যবোধ। সমাজের স্বার্থেই একে রক্ষা করা দরকার।

হুগলি জেলার আদি জনগোষ্ঠীর প্রাচীন ইতিহাস

সুধীর মুখোপাধ্যায়

সহায়ক : শক্তি মণ্ডল, সুলেখা মুখোপাধ্যায়



সুপ্রাচীন কোল, অস্ট্রিক প্রাক্-আর্য জনগোষ্ঠীর ইতিহাস বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে, আজ আমরা যাকে হিন্দু ধর্মকর্ম বলে থাকি বা যাকে ব্রাহ্মণ্য সাধনা বলে জানি তা আর্য-অনার্যের সমন্বিত রূপ।

অরণ্যচারী হিংস্র, উলঙ্গ অর্ধমানুষ হতে আরম্ভ করে কত শ্রেণী, কত দেশ-দেশান্তরের মানুষ সমন্বিত হয়েছেন তার অন্ত পাওয়া যায় না। তাদের জীবনপ্রবাহ, ধর্মকর্ম-সাধনা চলমান ব্রাহ্মণ্যশ্রেণীর প্রবাহে মিলিত হয়েছে। আর্য ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ নায়কগণ এই মিলিত প্রবাহের নেতৃত্ব করেছেন, এ কথা সত্য। কিন্তু অনার্য আদিবাসীগণ নিষ্ক্রিয় বা অচেতন ছিলেন না। তাঁরা জৈব প্রকৃতির নিয়মে বহু বিশ্বাস, বহু সংস্কার, বহু অনুষ্ঠান নিজেদের মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। এই সমন্বয়ক্রিয়া আজও চলছে। আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্ম, লোকায়ত অনার্য ধর্মকর্মের অনেক অনুষ্ঠান, দেবদেবী নিজস্ব সম্পদ করছে প্রায়ই অবিকৃতরূপে।

এই মিলিত সৌধের ওপরেই বিচিত্র বাঙালির ইতিহাস গড়ে উঠেছে।

সুতরাং এটাই হুগলি জেলাবাসীর ইতিহাসের ভিত্তি। বাঙালির সাধারণ ইতিহাসের পরিচয় না দিয়ে হুগলি জেলা জনগোষ্ঠীর ইতিহাস বর্ণনা করা সম্ভব হয় না।

হুগলি জেলার আদিম জনগোষ্ঠী এই জয় প্রবাহের অংশ। এই অঞ্চলটি প্রাচীন রাঢ়ভূমির অন্তর্গত।

আমরা মূলত হুগলি জেলার আদিবাসীগণের ইতিহাস বর্ণনা করব।

(২)

এই জনগোষ্ঠীর প্রবাহ সুপ্রাচীন ভারতীয় জনপ্রবাহের ধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে এক অতিবেগবান প্রবাহ বহন করছে। এই মানবগোষ্ঠীকে অস্টিক এই সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে এদের নিষাদ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

(৩)

বাংলার জনগোষ্ঠী তথা হুগলি জেলার জনগোষ্ঠীর মূলত দুটি অংশ। একটি হচ্ছে উপজাতি গোষ্ঠী। যেমন শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল ইত্যাদি। যাদের সমাজে অচ্ছুত বলে মনে করা হয়। অন্যটি হচ্ছে উচ্চতর জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত। প্রথমটি অধিকাংশ বঙ্গদেশে বসবাসকারী। এরা এক-একটি আদিম জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

বর্তমানে আমরা এদের হুগলি জেলার চৌতারা, ভাটুয়া, ত্রিবেণী, তারকেশ্বর, শিবরাম, দোনারপাড়া, বেলগড়ি, রামেশ্বরপুর, দেবানন্দপুর, ব্যাণ্ডেল প্রভৃতি নানাস্থানে দেখতে পাই।

ক্রমশ সভ্য জাতি ও সংস্কৃতির ক্রমাগত প্রসার ও প্রভাবের ফলে সেই প্রাচীন সমাজে ধীরে ধীরে নানা পরিবর্তন হয়েছে এবং হচ্ছে।

নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, এদেশের আদিম অধিবাসীগণ সম্ভবত দ্রাবিড়-মঙ্গোলীয়দের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই মত সমর্থন করেছেন। তবে এই মত বর্তমানে ঐক্যমত হয় নাই।

তবে বঙ্গদেশে তথা হুগলি জেলায় আদিমকালে আর্যগণ ছিলেন না। এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ একমত। আদিম যুগে কারা ছিলেন তা বিতর্কিত বিষয় হয়ে আছে। তাই আলোচ্য বিষয়টির সরল বিবরণ লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে বেশ জটিলতা আছে।

(৪)

রাঢ়ভূমি তথা হুগলি জেলাবাসীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় :

প্রাচীন জাতির নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল মানুষের কঙ্কাল। ১৯৬০—৬৫ সালে পাণ্ডুরাজার ঢিবি হতে চারটি কঙ্কাল পাওয়া যায়। এই কঙ্কাল বিশ্লেষণ করে অনুমান করা হয়, কত দেশের কত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটেছিল। হুগলি জেলার সপ্তগ্রামে সরস্বতী নদীর বুকে বেশ কয়েকটি কঙ্কালের করোটি ও হাড় বার হয়। করোটি উদ্ধার করে আনা সম্ভব হয়নি। কিছু কিছু হাড় উদ্ধার করা হয়েছে। এটা বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এটা বিশ্লেষণের অপেক্ষায় আছে।

(৫)

পশ্চিমবঙ্গের উপজাতিদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে সাঁওতাল উপজাতি। তারপর সংখ্যার দিক হতে ওঁরাও উপজাতি। উপজাতি জনসংখ্যার দিক হতে হুগলি জেলার স্থান চতুর্থ। সাঁওতালগণের মধ্যে মুর্মুগোষ্ঠী মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। ভাষার দিক হতে মুণ্ডারা পোদগোষ্ঠী। শবরদের বংশধর কৈবর্ত। কৈবর্তরা অতি প্রাচীন গোষ্ঠী। আর্যদের আগমনের পূর্ব হতেই আদিম গোষ্ঠীগুলি এখানে বাস করতেন। মহাভারতে রাঢ় দেশে নিষাদ উপজাতির কথা জানা যায়।

আর্যগণের বাংলায় আগমনের পরবর্তীকালে প্রাচীন গ্রন্থে আদিম অধিবাসীগণকে স্বক্রিয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—শবর, পুলিন্দ, কিরাত, পুণ্ড্র প্রভৃতি।

সমাজের সর্বনিম্ন জাতিসমূহের উল্লেখ প্রাচীন বৌদ্ধ চর্যাপদে দেখা যায়। ডোম, চণ্ডাল, শবর জাতির কথা বিভিন্ন প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে উল্লেখ আছে। পাহাড়পুরে তাদের উৎকীর্ণ ছবি পাওয়া গেছে।। তারা শহরের বাইরে ডালি, ঝুড়ি ইত্যাদি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করত। তারা বাঁশ, বেত ও অন্যান্য গাঁথবার উপযুক্ত লতাপাতার সাহায্যে বুননকার্যে দক্ষ ছিল। ডোমগণও এই পর্যায়ে পড়ে। তাদের মহিলাগণ পথে পথে গুঞ্জমালা, ময়ূরপুচ্ছের মাধ্যমে দেহসজ্জা করে নৃত্যগীত করত। শিকার এদের প্রধান উপজীবিকা। স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে তীর-ধনুক ব্যবহারে পারদর্শী। পশুর মাংস এদের প্রধান খাদ্য। এরা প্রাচীন যুগে কোনও সময়ে সামরিক জাতি ছিল। এখনও প্রচলিত ছড়ায় তার প্রমাণ দেয়।

'আগা ডোম, বাঘা ডোম, ঘোড়া ডোম সাজে
ঢাই ঢুই নাকাড়া বাজে.....' ইত্যাদি।

ধর্মমঙ্গল সাহিত্যে কালুডোমের কথা উল্লেখযোগ্য। কোনও কালে এরা কোনও উন্নত জাতির নিকট যুদ্ধে পরাজিত হলে এদের নিগ্রহ করে বিচ্ছিন্ন ঘৃণ্য কাজ করতে বাধ্য করা হয়। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অবস্থায় পরিণত হবার উপযুক্ত তথ্য পাওয়া যায় না।

হাড়ি : এদের অবস্থা ডোম সম্প্রদায়ের অনুরূপ।

দেবানন্দপুর গ্রামের বাইরে তাদের অবস্থিতি দেখা যায়।

কেওড়া : 'রিজনী' বলেছেন এরা হাড়িদের অনুরূপ অন্ত্যজ শ্রেণী। এরা খেজুরের রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করে।

নিজেদের পঞ্চায়েত গঠন করে নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে চেষ্টা করে।

বাউরি : ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী—হুগলি জেলার বাউরি জনতার সংখ্যা ৩৭,৬০৪। ইহা জনসংখ্যার ১.৭ শতাংশ। এদের দৈহিক গঠন এদের অনার্য বলে চিহ্নিত করে। এক খেটে খাওয়া মানুষ। কিছু কিছু ভাগ চাষ করে। এদের বিবাহ নিজ বংশে হয়ে থাকে। কখনও কখনও ভিন্ন বংশে হয়ে থাকে। এরা প্রধানত মনসাপূজারি। মনসাগাছও পূজা হয়। মূর্তিও পূজা হয়। এরা অচ্ছুত। পুরোহিত এদের পূজার কাজ করে না। নিজেরাই করে থাকে। কিছু সমাজচ্যুত ব্রাহ্মণ এদের পূজার কাজ করে।

যুগী : কোনও কালে এরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের উচ্চতম অংশ ছিলেন বলে দাবি করা হয়। পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। শেষে নাথগুরু মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রমুখের প্রভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত হন। সে যুগে এদের সম্প্রদায় সারা ভারত, এমন কি সারা পৃথিবীতে প্রাধান্যলাভ করেছিল বলে দাবি করা হয়।



আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী এটা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এরা নিজেদের নাথ সম্প্রদায়কে বিশ্বের প্রাচীনতম জাতি বলে দাবি করেন। এর ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

হুগলি জেলায় এদের প্রধান কেন্দ্র মহানাদে, যেখানে নাথ সম্প্রদায়ের মঠ আছে।

পরবর্তীকালে বল্লাল সেনের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ নেতাদের সঙ্গে এদের বিবাদ হয়। নাথ নেতাগণ কোনও কারণে বল্লাল সেনের বিরাগভাজন হন। সে সময় মহারাজা বল্লাল সেন এদের সমস্ত অধিকার হতে বঞ্চিত করে অন্ত্যজ শ্রেণী বলে চিহ্নিত করেন। তাঁতের কাপড় তৈরি এদের হয় জীবিকা নির্বাহের উপায়। অতীত ইতিহাস হতে জানা যায় যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশেষ করে আয়ুর্বেদে এদের অবদান রয়েছে। যোগসাধনার ক্ষেত্রে এর অগ্রগামী ছিল। পূর্ববঙ্গে এরা সংখ্যাধিক এবং প্রভাবশালী ছিল। মহারাজ গোপীচন্দ্রের কাহিনীর সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের কাহিনী জড়িত। এ বিষয়ে ময়নামতীর গান পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে সমধিক প্রচলিত ছিল।

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই এক সময় নাথ যোগীগণের প্রভাব জাতপাতের বিভাগের কঠোরতা হ্রাস করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। বর্তমানে নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণব বা অনুরূপ ধর্মে যোগ দেওয়ার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। এটা নাথ উচ্চ সম্প্রদায়ের বিশেষ সমস্যার কারণ হয়েছে।

বাঙালি কায়স্থগণ, বাঙালি সদগোপ ও কৈবর্তকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ। এটা নরতাত্ত্বিক পরিমিতি হতে ধরা পড়ে। সদগোপদের সঙ্গে কায়স্থদের কোনও পার্থক্য নেই। প্রশান্ত মহলানবীশ দেখিয়েছেন যে, কায়স্থ, সদগোপ ও কৈবর্তরাই যথার্থ বঙ্গজনের প্রতিনিধি, বস্তুত, বাংলাদেশের সমস্ত বর্ণের সঙ্গে কায়স্থদের আত্মীয়তা সবচাইতে বেশি।

নমঃশূদ্রদের সম্পর্কে একটি চাঞ্চল্যকর নরতাত্ত্বিক পরিমিতি গণনার ফল এই যে, দেহবৈশিষ্ট্যের দিক হতে এদের উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে দেহতাত্ত্বিক আত্মীয়তা বাঙালি ব্রাহ্মণ, বৈশ্য অপেক্ষা বেশি। অথচ এই নমঃশূদ্রগণ সমাজের একেবারে নিম্নস্তরের অচ্ছুত। আমরা তাদের চাঁড়াল বা চণ্ডাল বলিয়া থাকি। নমঃশূদ্র সম্প্রদায় প্রধানত পূর্ববঙ্গের অধিবাসী। পশ্চিমবঙ্গে তারা এসেছিলেন উদ্বাস্তু হিসাবে। পূর্ববঙ্গে উচ্চবর্ণের অত্যাচারে সেখানে তারা অধিকাংশই ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গে আগতগণ দেখা যায়, প্রায়ই বৈষ্ণবধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, পোলবা, মহানাদ প্রভৃতি রাঢ় অঞ্চলে তাদের বেশি দেখা যায়। তাঁরা বৈষ্ণব আচার-আচরণ পালন করেন এবং এখন প্রায়ই জলচল।

উপরে বর্ণিত সামাজিক তথ্যের (বিশেষভাবে হাড়ি ও ডোম সম্প্রদায়ের) যুক্তি ও ইতিহাসসম্মত ব্যাখ্যা এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই হয়তো বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে।

মোটের উপর বর্তমানে সংক্ষেপে বিবৃত হুগলি জেলার বিচিত্র বর্ণসমূহের মধ্যে পরিমিতি, শ্রেণিবৈচিত্র ইত্যাদি বিচার করে বলতে হয়—এ সমস্তই জনসংকার্যের দ্যোতক।

স্মরণাতীতকাল হতে এই জনসংকার্য চলছে। ভারতের অন্যত্র এটা খুব সুলভ নয়। এই মিশ্রণ এত গভীর ও ব্যাপক যে, নরতত্ত্বের দিক হতে কোনও বিশেষ বর্ণ, তা যতই উচ্চ বা নিম্ন হক না কেন, তা কোনও বিশেষ স্থানের অদিবাসীদের এককভাবে দেখবার উপায় নেই।

(৬)

হুগলি জেলার প্রাচীন কিছু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা—

১৯৩৬ সাল পর্যন্ত যে সব জাতির সংখ্যা দুহাজারের অধিক ছিল—

(i)	কৈবর্ত	১,৮৮,৩০৩ জন।
(ii)	বাগদি	১,৫১,২৩০ জন।
(iii)	সদগোপ	৫,৪০০ জন।
(iv)	গোয়ালা	৪,৩০০ জন।
(v)	তেলি	৩,৬৩৫ জন।
(vi)	কায়স্থ	৮,১৩০ জন।
(vii)	ব্রাহ্মণ	৮৪,৩৭২ জন।

এদের প্রাচীনত্ব সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়নি।

সাঁওতাল উপজাতির কথা

পঞ্চাশ শতকের পূর্বে, এমন কি মৌর্য যুগের পূর্বে এরা বাংলা জনপদে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করত। তাদের সমাজ ছিল, রাজা ছিল, রাষ্ট্র ছিল। কৌম সমাজের সেই উষাকালে সমাজ শাসন পদ্ধতি ছিল। আজও হুগলি জেলার বিভিন্ন সাঁওতাল গ্রামে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। এদের কিছু বসতির কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে; তাদের দলপতি নির্বাচিত হয়। নিজেদের বিশিষ্ট উত্তরাধিকার বিধান আছে। এদের প্রাপ্তবয়স্ক যুবক-যুবতীদের স্বাধীনভাবে বিবাহের অধিকার স্বীকৃত। সাঁওতালদের অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত। তাদের মাতৃ বংশে বিবাহ চলে। প্রস্তাবককে অবশ্য বিনামূল্যে হাড়িয়া দিতে হয়। ছপ্রকার বিব্যাহ চালু আছে—তার মধ্যে সিন্দুর ঘষাই প্রধান। মনে করা হয়, এই প্রথা হিন্দুসমাজ হতে গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যান্য প্রথার উল্লেখ করা হল না। বিধবা বিবাহ চালু আছে। ভাসুরের সঙ্গে সাধারণত বিবাহ চলে না। মোটের ওপর পুরুষপ্রধান সমাজ। মহিলাদের কিছু অধিকার স্বীকৃত আছে।

এ কথা নিষ্ঠুরভাবে সত্য যে, উপজাতিদের মধ্যে অন্ধ কুসংস্কার প্রবলভাবে আছে। বিশেষভাবে ডাইন সম্বন্ধে অন্ধ বিশ্বাস বদ্ধমূল আছে। গ্রামে কোনও অশুভ ঘটনা ঘটলে সমাজ কাউকে ডাইন বলে চিহ্নিত করে। তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করবার রায় হয়। তা কার্যকর করবার চেষ্টা করা হয়। বর্তমানে স্বাস্থ্য, সমাজচেতনার ফলে ডাইন সম্পর্কে অন্ধ বিশ্বাস কমতে আরম্ভ করেছে, প্রমাণ পাওয়া যায়।

সাঁওতালগণ ভিন্ন সমাজে বিবাহ এখনও সহ্য করেন না। যে বিবাহ করে তাকে সমাজ শাস্তি প্রদান করে থাকে। প্রতি সাঁওতাল গোষ্ঠীর একটি বাৎসরিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এটা গ্রামের প্রান্ত সীমানায় হয়ে থাকে। মুরগি বধ হয়। যথেচ্ছ হাড়িয়া পান হয়ে থাকে।

বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বিশেষ উৎসব পালন করে। এটা প্রায় এক মাস স্থায়ী হয়। কালীপূজার সময়ও পরব হয়। পাণ্ডুয়ার পৌষমেলা খুবই প্রসিদ্ধ। এই সময় তাদের ক্রমশ সামাজিক নিয়মকানুন, জমিজমা বণ্টন নতুন করে হয়ে থাকে।

উৎসব আনন্দ-সংস্কৃতি—সাঁওতাল উপজাতি—উৎসবমধুর সমাজ

সাঁওতাল উপজাতি সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই মনে হয় তাদের উৎসবমধুর সমাজজীবনের কথা। পল্লীগুলি খুবই সুন্দর। গৃহের দেওয়াল ও প্রাঙ্গণে সুন্দর আলপনা দেওয়া থাকে। সাঁওতাল পুরুষ ও নারীগণ কঠোর পরিশ্রমী। তার মধ্যেও তাদের সৌন্দর্যপ্রিয়তা, উৎসবপ্রিয়তা চোখে পড়ে। আদিবাসীমাত্রই অনেকটা প্রকৃতির উপাসক। ফুল মেয়েদের বড় আপনার। ফুলের মালা দিয়ে তারা নিজেদের সাজায়। কাজের শেষে সজ্জিত হয়ে হাত ধরে গান গেয়ে চলে। ছেলেরা মাদল বাজায়, বাঁশি বাজায়।

সাঁওতাল ও বিভিন্ন উপজাতির সাধারণ আচার-আচরণ

বর্তমান হিন্দুধর্মের কয়েকটি বিশিষ্ট অঙ্গ, যেমন কর্মফল, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি বিশ্বাস—এ সবই আর্যজাতির সংস্পর্শে আসবার পূর্বে বাঙালি ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ ছিল। তারা বৈদিক হোমযজ্ঞের বিরোধী ছিল। শিব, শক্তি, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবদেবীর আরাধনা এবং পুরাণ বর্ণিত অনেক কাহিনী, ব্রত, আচার-অনুষ্ঠান, সিন্দুর প্রভৃতি ব্যবহার করতেন। নৌকানির্মাণ ও প্রাচীন অনেক শিল্পনির্মাণে পারদর্শী ছিলেন।

সাঁওতালগণ শিকারপ্রিয়, শিকার তাদের উৎসববিশেষ। অযোধ্যা পাহাড়ের শিকার উৎসব সমগ্র সাঁওতাল উপজাতির জাতীয় উৎসব। তারা রাতভর পাহাড়ের ওপরে শিকার করে। রাত্রিশেষে নেমে আসে। খাওয়া-দাওয়া, উৎসব করে। শিকার অভিযানে মেয়েদের যোগ দেওয়ার অধিকার থাকে না।

মোরগের লড়াই সাঁওতালদের একটি বিশেষ জনপ্রিয় উৎসব।

সাঁওতালদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

সাঁওতালগণ স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি। তাদের কাজ চাই, বন চাই, জমি চাই। সাধারণ বিপদে সমস্ত সাঁওতাল গোষ্ঠীকে সমবেত করবার জন্য শালপাতাসহ ডাল ভেঙে গ্রামে গ্রামে পাঠানো হয়। এই সংকেত পেয়ে দলে দলে সাঁওতালগণ সমবেত হন। এইভাবে অভ্যুত্থানের আহ্বানকে হুল বলা হয়। তাদের দাসত্ববিরোধী মনোভাব

সব সময় জাগ্রত থাকে। সেই জন্য অনায়াসে তাদের প্রাণ দিতে দেখা যায়, যদিও সাধারণত তারা নম্র এবং বিনীত। সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রভাব ছিল উত্তর রাঢ়ভূমিতে বিশেষ চাঞ্চল্যকর ঘটনা।

বাগদিসমাজ

হুগলি জেলার বাগদি জাতি তফসিলিদের মধ্যে বৃহত্তম অংশ। এদের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বাগদিরা মুণ্ডারী গোষ্ঠিভুক্ত বলে বলা হয়।

এরা জেলার কৃষি শ্রমজীবীদের মধ্যে শতকরা ৪৫ ভাগ। এদের অধিকাংশই হল ভাগচাষী। যাদের জমি আছে, তাও এতই সামান্য যে, ভাগচাষের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় এবং প্রয়োজনে অন্য উপজীবিকাও গ্রহণ করতে হয়। দুলে বাগদিদের বংশগত প্রথা পালকি বহন। হুগলি জেলায় দুলে বাগদিরা হচ্ছে সংখ্যায় সবচেয়ে অধিক। এর মধ্যে সামান্য অংশই যানবাহনের কাজ করে থাকে। ব্রাহ্মণগণ এবং নবশাখগণ বাগদিদের হাতে জল গ্রহণ করে না ও তাদের পুরোহিতও হয় না। এরা সামাজিক সমস্যা মীমাংসার জন্য পঞ্চায়েত গঠন করে নেয়। বিত্তশালী বয়স্ক লোকেরা পঞ্চায়েতের সভাপতিত্ব করে। অধিকাংশ বাগদি গ্রামেই বাস করে। তারা বর্ণহিন্দুদের মান্য করে। বাগদিরা যোদ্ধা জাতি। কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে দেখা যায়, বাগদিরা চোয়ার বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছিল। ব্যাণ্ডেলে বিরাট সংখ্যক বাগদি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে পর্তুগীজদের নেতৃত্বে মোগলবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। বাগদিদের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী আছে।

(ক) তেতুলিয়া বাগদি।
বোধ হয় তেতুল টোটেম থেকে এই নাম হয়েছে। এর সঙ্গে শিবঠাকুর ও পার্বতীর চাষারীকাহিনী জড়িত আছে।

(খ) কালসাই কুলিয়া বাগদি—
নামটি নদীর সঙ্গে যুক্ত।

(গ) দুলে বাগদি।

(ঘ) ওঝা—এরা ম্যাজিকে ওস্তাদ।

(ঙ) মেছো মাঝি—পেশা মাছের কাজ।

(চ) ভন্ত মাঝি—পূর্বে সমাজের আইনের দায়িত্ব পালন করত।

(ছ) কুশমেটিয়া—এদের পূর্বপুরুষ বিষ্ণুপুরের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতাকে লালনপালন করেছিলেন বলে কথিত।

(জ) মল্লমেটিয়া—
মনে হয়, মল্লভূমি থেকে আগত। এদের টোটেমগুলি হচ্ছে কাক, বক, পান, শোলমাছ, একজাতীয় সিম, কচ্ছপ। এ সব এরা স্পর্শ করে না। এদের সৃষ্ট বিষ্ণুপুরের মন্দির অপূর্ব সৃষ্টি।

বাগদিদের দ্রাবিড় জাতির অংশ বলে অনুমান করা হয়। এরা হিন্দু পূজাপদ্ধতি পালন করে। নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে পূজারি আছে, তারা পূজা করে। বর্তমানকালে এদের মধ্যে জাতপাতের কড়াকড়ি বিশেষ দেখা যায় না। বিবাহ ভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গেও চালু হচ্ছে দেখা যায়। শিক্ষাও কিছু প্রসারিত হয়েছে। যুবকদের মধ্যে খেলাধুলা, গান, নাটক জনপ্রিয়। এদের মধ্যে বৃহৎ অংশ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত।

কৈবর্ত ও মাহিষ্য—জনসমাজ

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে, হুগলি জেলার দ্বার-বাসিনীতে সুলতানী বিজয়ের পূর্বে দ্বারপাল নামে এক মাহিষ্য রাজা ছিলেন।

হুগলি জেলার মাহিষ্যদের বেশির ভাগ অংশ খেতমজুর ও চাষী। এদের মধ্যে কিছু অংশ আছে ধনী চাষী। কিছু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি যেমন চাকরিজীবী, ডাক্তার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি। মাহিষ্যদের মধ্যে যারা বৃহৎ ভূস্বামী, ব্যবসায়ী বা চাকরিজীবী তাদেরও অনেকেই গ্রামে বাস করে। যৌথ পরিবারও বেশ কিছুসংখ্যক আছে। ফলে এই শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক-অর্থনৈতিক একটা পশ্চাৎপদতা চলছে। সমাজে নিজস্ব পঞ্চায়েত প্রথা প্রায় অচল। ধনী, শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা অধিক। তারকেশ্বর এলাকায় মাহিষ্যদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত, বিত্তবান অগ্রগামী বিশিষ্ট অংশ আছে। মাহিষ্যরা নিজেদের নবশাখ বলে দাবি করে। কিন্তু বর্ণহিন্দুরা সে দাবি মানতে চায় না। ব্রাহ্মণরা এদের পূজারির কাজ করে না।

মাহিষ্যগণ কৈবর্তের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক স্বীকার করে না। তারা কৈবর্তদের তথাকথিত ছোট জাত বলে গণ্য করে। কৈবর্তদের এক অংশ বিশেষভাবে বৃত্তিমূলক কাজের ফলে উন্নত হওয়ায়



গাজন মেলায় সঙ

নিজেদের মাহিষ্য বলে দাবি করে। কৈবর্তদের মধ্যে এক অংশের নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তর্বিবাহ চালু আছে। এরা মাছ ধরার কাজ করে। এরা নিজেদের বলে লুপ্ত মাহিষ্য।

উল্লেখযোগ্য যে, পালযুগে কৈবর্ত সম্প্রদায়ের যে একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই থেকে যে, সেই সময় গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে দিব্যক, ভীম প্রমুখ ছিলেন।

অন্যান্য গোষ্ঠী

হুগলি জেলার উপজাতি জনসংখ্যা ৯৩০১ জন। এরা জেলার জনসংখ্যার শতকরা ৪ ভাগ। এর মধ্যে সর্ববৃহৎ অংশ হচ্ছে সাঁওতাল উপজাতি। তারপর পরপর হচ্ছে কেওরা, ওঁরাও, লোধ এবং মুণ্ডা। এরা নিজেদের হিন্দু বলে প্রাচীন ধর্ম-কর্ম পালন করে। অবশ্য তার সংখ্যা এবং গুরুত্ব কমে যাচ্ছে।

বণিক সম্প্রদায়

মগরা থানার শঙ্খনগর অঞ্চলে শঙ্খ বণিকগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাম্বুলি বণিকগণ আরামবাগ, পুরশুরা এবং বিভিন্ন স্থানে ছিল এবং এখনও আছে। এরা চিরকাল ব্যবসায়ী। এদের নবশাখ বলা হয়।

সুবর্ণ বণিকগণের বসতি ছিল প্রধানত সপ্তগ্রামে। এরা উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় হলেও এদের নবশাখ বলে গণ্য করা হয় না। সম্ভবত তারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল, সেজন্য তাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

আর্য-অনার্য সমন্বয়সাধন

বাংলাদেশে মোটামুটি খ্রিস্টীয় পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম শতকে আর্যধর্ম প্রবাহের সময় হতেই সমন্বয়ক্রিয়া চলতে আরম্ভ করে। মধ্যযুগে এই সমন্বয় সাধনা আমাদের চেতনার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং চলতে থাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে।

বস্তুত, বাঙালি ধর্মকর্মের গোড়ার ইতিহাস হচ্ছে রাঢ় (হুগলি) সহ পাণ্ডু, বঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের অসংখ্য জন ও কোমের, এককথায় বাঙালি আদিবাসীদের পূজা অনুষ্ঠানের বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতির ইতিহাস।

ইহা স্বীকৃত যে, আর্য ব্রাহ্মণরা বা জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ধর্মকর্ম, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সংক্রান্ত বিশ্বাস ও সংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠান, নানা দেবদেবীর রূপ ও কল্পনা ইত্যাদি অনেক কিছু আদিবাসীদের নিকট হতে আত্মসাৎ করা হয়েছে। বিশেষ করে হিন্দুদের জন্মান্তরবাদ, পরলোক সম্বন্ধে ধারণা, প্রেততত্ত্ব, পিতৃতর্পণ, পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধ সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সমস্তই আমাদের আদিবাসী প্রভাবের ফল। আমাদের অনেকের রক্তস্রোতেও রয়েছে এই আদিবাসী রক্তের দান। ধুতি, শাড়ি প্রভৃতি পরিচ্ছদ এই যুগের সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া মনে করা হয়। মোটের উপর বোঝা যায় আর্যজাতির সংস্পর্শে আসবার পূর্বেই বর্তমান বাঙালি জাতির উদ্ভব হয়েছিল। তারা উচ্চাঙ্গের বিশেষ সভ্যতার অধিকারী, সে বিশ্বাস যুক্তিসঙ্গত বলে গ্রহণ করা যায়।

রাঢ়ভূমি তথা হুগলি জেলার জনগণ তার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল তাও সুবিদিত।

বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের কৃষিজীবনের সঙ্গে যারা পরিচিত তারা জানেন মাঠে হালচালনা, প্রথমদিনের বীজ ছড়াবার সময়, সবজি বোনবার সময়, ফসল কাটবার সময়, ঘরে তোলবার সময় নানাপ্রকার আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়। প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানই বিচিত্র সুষমার এবং জীবনের সুষমার ও জীবনের সুষমায় আনন্দমণ্ডিত। কিন্তু লক্ষণীয় যে, এর একটিতেও ব্রাহ্মণ পূজারির দরকার হয় না। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকলেই এইসব পূজা-অনুষ্ঠানের অধিকারি। নবান্ন উৎসব অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ঋতুর দান। আমাদের মধ্যে প্রবাহিত মাধুর্য, বিশ্বধর্মের একই প্রবাহ দেখা যায়, বিশ্ব প্রকৃতি জীবন্ত ও সক্রিয়। শুধু কৃষিজীবনের মধ্যে আবদ্ধ নয়, শিল্পজীবনেও দেখা যায় বিশেষ বিশেষ দিনে কামারের হাপর, কুমারের চাকা, তাঁতির তাঁত, চাষীর লাঙ্গল, ছুতোরের বাটালি, মিস্তিরির কারুযন্ত্র প্রভৃতিকে আশ্রয় করে এক ধরনের ধর্মকর্ম, অনুষ্ঠান আজও প্রচলিত। তার কিছুটা আর্যকৃত সংস্কৃত রূপ আমরা বিশ্বকর্মা পূজায় প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু মূল এই ধরনের পূজা-পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কোনও প্রয়োজন হয় না। এই প্রসঙ্গে আমরা লোককবিদের এই লোককথা স্মরণ করতে পারি—'সেখানে মন্দিরে মসজিদে মানুষের পথ ঢাকা পড়ে না। সব মানুষেরই মহান ভূমিকা।'

যে সব গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

১। বাঙালির ইতিহাস — নীহাররঞ্জন রায় — দেজ পাবলিশিং

২। ট্রাইব অ্যান্ড কাস্টস — রিজলী

৩। Hooghly District Gazetteer 1971

৪। দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ (প্রাচীন যুগ) — কান্তিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত — কে পি বাগচি

৫। বাঙালির ইতিহাস (১ম খণ্ড) — রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় — দেজ পাবলিশিং

৬। পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী আন্দোলন — ডঃ অমলকুমার দাস, ডঃ শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় — পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৭। An Introduction to the Study of Indian History — Kosambi — Popular Prakashan Bombay

৮। রাজগুরু যোগি বংশ — সুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার — East Bengal Press Cal-700 012

৯। প্রাচীন ভারত — রামশরণ শর্মা — পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

হুগলি জেলা—কৃষি ও কৃষক

বিনোদ দাস

আমাদের দেশের কৃষি ও কৃষকের ইতিহাস, নিদারুণ শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস। কৃষকের সীমাহীন দারিদ্র্য এবং দুর্গতির ইতিহাস, আর সেই সঙ্গে শোষণ, বঞ্চনার বিরুদ্ধে তার আপসহীন সংগ্রামের ইতিহাস। এই ইতিহাস বিবৃত করতে গেলে এর অর্থনৈতিক কাঠামো, কৃষির উৎপাদন এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন। কিন্তু পরিসরের স্বল্পতার জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক কাঠামোয় কৃষকের ওপর যে মাত্রাহীন শোষণ চালানো হয়েছিল, সেই শোষণের এবং সেই শোষণের ফলে কৃষকের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ যে বিদ্রোহের সৃষ্টি করেছিল, সেই বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত কাহিনী—সাধারণভাবে সমগ্র দেশের এবং বিশেষভাবে হুগলি জেলার কথা—এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ভারতের সমাজের উৎস ছিল গ্রামসমাজ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এটাই ছিল মুল ভিত্তি। কৃষিজ জমির ওপর কৃষক সাধারণের অধিকার। কৃষি ও হস্তশিল্পের অপূর্ব সংমিশ্রণ, অপরিবর্তনীয় শ্রমবিভাজন এবং সকলে মিলে একত্র কৃষিপণ্য উৎপাদন, সমস্তটাই একটা ছকে বাঁধা পথে পরিচালিত হত। সমাজের প্রধান ব্যক্তি ছিল সর্বময় কর্তা। কর আদায়কারী, প্রশাসন পরিচালনা এদের হাতেই ন্যস্ত ছিল। গ্রামসমাজের ওপর ভিত করেই গড়ে উঠেছিল নিজস্ব সামন্তপ্রথা।

মধ্যযুগে মোগল আমলে গ্রামের নিজস্ব সামন্তব্যবস্থার মধ্যে রাষ্ট্রীয় সামন্তব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থায় কৃষকরা অত্যাচারিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত দেশীয় সামন্তগোষ্ঠীরা কৃষকদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে মোগল সাম্রাজ্যের অবসানের পথ প্রশস্ত করে। ইতিমধ্যে সপ্তদশ শতক থেকে একটা 'ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণী' বিকশিত হয়। অষ্টাদশ শতকে এরা একটি শক্তিশালী শ্রেণীতে পরিণত হয়। কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের বাড়তি অংশ দেশীয় কারিগরদের সাহায্যে পণ্যে পরিণত হত আর সেই পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য সকল নগরীতেই এদের ব্যবস্থাপনাতে ব্যবসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগররা গ্রাম থেকে নগরে এসে ভিড় করত। ব্যবসায়ী বুর্জোয়ারা এদের নিয়ে ছোট ছোট কলকারখানা বসিয়ে উৎপাদিত পণ্যসম্ভার নগরে, বাজারে ও বিদেশে রপ্তানি করে বিপুল ধন-ঐশ্বর্য সংগ্রহ করে প্রবল প্রতাপান্বিত হয়ে উঠেছিল। হুগলি জেলার কোন্নগর ও সপ্তগ্রাম ছিল এই রকম দুটি ব্যবসাকেন্দ্র। ইংরেজ আসার আগে পর্যন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজ ছিল উৎপাদনের কেন্দ্র। ইংরেজ আসার আগে এটাই ছিল আমাদের গ্রামের ছবি, কৃষক জীবনের সাধারণ ছবি।

কিন্তু ইংরেজ আসার পর এই ছবিটা সম্পূর্ণ বদলে গেল। তার শাসনের মূল লক্ষ্য হল—নিজের দেশের ক্রমবর্ধমান শিল্পের প্রয়োজনে এদেশ থেকে কাঁচামাল সরবরাহ করা। সুতরাং এখানে যেটুকু শিল্প গড়ে উঠেছিল, সেটাকে আঘাত করে চুরমার করা হল, কারিগরদের ওপর চালানো হল অকথ্য অত্যাচার। দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস হল। আর কাঁচামাল উৎপাদন করে চালান করার জন্য ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনসাধন করা হল। কৃষকের ওপর চালানো হল নির্মম শোষণ। গ্রামীণ আর্থিক বুনিয়াদ ভেঙে শ্মশানে পরিণত হল, আর এরই ফলে দেখা গেল ভয়াবহ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

ব্রিটিশরাজের ঘৃণ্য শোষণ ও লাগামহীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৭৭৬ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে দেখা গেল কৃষকদের বিদ্রোহ। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, খরুই বিদ্রোহ, খয়রা বিদ্রোহ, সন্দ্বীপের বিদ্রোহ, কৃষক তন্তুবায়গণের এবং রেশমচাষীর সংগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা বিদ্রোহ, ইংরেজ শাসনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। শাসকশ্রেণী নিষ্ঠুর নগ্ন হত্যা করে এই বিদ্রোহগুলিকে প্রশমিত করেছিল। কিন্তু শাসকশ্রেণীর রুদ্ররোষকে উপেক্ষা করে বিদ্রোহীরা তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।

১৭৬০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মীর কাসেমের কাছ থেকে বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রামের পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করে। কিন্তু মেদিনীপুরের আদিবাসীরা বিনা সংগ্রামে ব্রিটিশের কর্তৃত্ব মেনে নেয়নি। বাংলাদেশের উত্তর ও পশ্চিমভাগে 'জঙ্গল মহলে' সৈন্য পাঠিয়ে বিক্ষুব্ধ অবাধ্য কৃষক এবং জমিদারদের খাজনা দিতে বাধ্য করা হয়। ১৭৬৭ থেকে ১৮০০ পর্যন্ত সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বাংলাদেশ এবং বিহারে ছড়িয়ে পড়ে। ১৭৯৮ সালে দ্বিতীয়বার চোয়ার বিদ্রোহ মেদিনীপুরে এবং বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। হুগলি জেলার চন্দ্রকোণা পরগনার ওপর চোয়ার বিদ্রোহীরা আক্রমণ করে। এই বিদ্রোহ হুগলি জেলার পশ্চিমাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়াও ছিল বিখ্যাত নীল বিদ্রোহ। দাদন দিয়ে কৃষককে যে অমানুষিক অত্যাচার করে নীলচাষে বাধ্য করা হত, তার বিশদ বিবরণ অতিপরিচিত। সেজন্য এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হল না। হুগলি জেলার বহু জায়গায় নীলকর সাহেবেদের কুঠি ছিল। তার নিদর্শন আজও মিলবে। বাঁশবেড়িয়া এবং বাঁশবেড়িয়া টেম্পল, হোসনাবাদ, তালদা, গোপীগঞ্জ, দুর্গাপুর, কালকাপুর, মেলিয়া, পায়গাছি, কালীপুর, খন্যান প্রভৃতি স্থানে নীলকুঠি ছিল। কালীপুর এবং খন্যানে নীল তৈরির ফ্যাক্টরির ভগ্নাবশেষ আজও আছে। ১৮১০ সালে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে চণ্ডীতলার নীলকুঠিতে মিসেস স্পেপলট নামে একজন ইংরেজ মহিলাসহ ৭জন কর্মচারীকে বিদ্রোহী নীলচাষীরা আক্রমণ করে আহত করে। এদের মধ্যে ২জন পরে মারা যায়। ১৮৮৫ সালে চণ্ডীতলার নীলকুঠিতে মিস্টার ক্যাসেল নিহত হয়। নীল বিদ্রোহ দাবানলের মতো সমস্ত বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। রেশমচাষ হুগলি জেলার প্রধান ব্যবসায়ী পণ্য ছিল। রেশমচাষে কমার্শিয়াল রেসিডেন্টদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। ১৭৯৫-এর আগে গোঘাট থানার দেওয়ানগঞ্জ রেশমশিল্পের প্রধান ব্যবসায়ী কেন্দ্র ছিল। উটের পিঠে উত্তর ভারতে এই পণ্য সরবরাহ করা হত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নদীপথে ঘাটাল হয়ে কলকাতা এবং ইউরোপে এই রেশম রপ্তানির ফলে উত্তর ভারতের ব্যবসা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে কৃষিজীবীরা চরম সঙ্কটে পড়ে। তাদের সংগ্রাম শুরু হয়। নীলচাষীদের সঙ্গে রেশমচাষীরা যুক্ত হলে এই সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

কৃষকদের বিদ্রোহকে নিয়ন্ত্রণ করা, তার ওপর শোষণের মাত্রাবৃদ্ধি করে তাকে সুনিশ্চিত করা এবং সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদের সুরক্ষায় একটি সুগঠিত স্তম্ভ নির্মাণ করার জন্য ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ ভূমিব্যবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করলেন। ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ ভূমিস্বত্বের ওপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পত্তনের নির্দেশ জারি হয়। এর ফলে মুষ্টিমেয় ইংরেজ বশংবদ জমিদার সৃষ্টি হয়। ইংরেজ সৃষ্ট মুষ্টিমেয় জমিদারশ্রেণী ভূমিস্বত্বের ওপর একচ্ছত্র অধিকার লাভ করে বাংলাদেশে এক অভিজাত শ্রেণী হিসাবে আবির্ভূত হয়। এরই জঠরে জন্ম নেয় ইজারাদার, তালুকদার, পত্তনীদার, দর পত্তনীদার, মহাজন প্রমুখ এক মধ্যশ্রেণী। একই স্বার্থসম্পন্ন বলে গোষ্ঠিবদ্ধ মধ্যশ্রেণী বিরাট শোষকরূপে দেখা দেয়। ইংরেজ শাসক এবং জমিদার-মহাজনদের বল্গাহীন শোষণে জমিচ্যুত হয়ে কৃষিতে স্তর-ভেদ সৃষ্টি হতে থাকে। ভূমিস্বত্বের নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে হুগলি জেলাতে দেখা যায় পাটনীদার, পাটওয়ারি, দেবোত্তর, বৈষ্ণবোত্তর, পিরোত্তর, মোকররি, খয়রাতি, ইজারাদারি, আরমা, ওয়াকফ্ চিরাগী জমি, চাকরান, খোদখামার প্রভৃতি রূপ। হুগলি ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের অন্যতম রচনাকারী ওমানি সাহেব বলেছেন, হুগলি জেলার ভূমিতে যত বৈশিষ্ট্য আছে, অন্যত্র তা দেখা যায় না। এইসব বিভিন্ন নামের আড়ালে আসলে কৃষক তার জমির অধিকার হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে। আর জমিদার এবং জমিদারি প্রথার অন্তর্গত বিপুল মধ্যশ্রেণী স্ফীত হয়েছে এবং তাঁদের প্রভু ইংরেজের শোষণের মাধ্যম হিসাবে কাজ করেছেন। এই ব্যবস্থার ফলে জমিদাররা জমি

বন্দোবস্তের অধিকার ; যথেচ্ছভাবে খাজনা বৃদ্ধির এবং আদায়ের অধিকার লাভ করেছেন। তাঁরা সরকারি প্রাপ্য মিটিয়ে অথবা না মিটিয়ে পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করে কৃষকদের কাছ থেকে সর্বস্ব শোষণ করেছেন। জমির এবং কৃষির উন্নতির জন্য কোনও চিন্তা করেছেন—এমন কোনও ইতিহাস পাওয়া যাবে না। পরিবর্তে তাঁরা অনুৎপাদী খাতে, এর জন্য অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভোগবিলাসে অর্থ অপচয় করেছেন। এর জন্য অনেক সময় জমিদারি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন এবং ক্রমশ দেশের জমির বৃহত্তর অংশটি শহুরে পুঁজিপতিদের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছিল।

(২)

দেশজ শিল্পকাঠামো ধ্বংস করে এবং কৃষক শোষণের প্রয়োজনীয় বিস্তারিত আয়োজন করে অষ্টাদশ শতক শেষ হল। শুরু হল নতুন করে কৃষকের শোষণ এবং তার সংগ্রাম। অষ্টাদশ শতকে কৃষক বিচ্ছিন্নভাবে যে সংগ্রাম পরিচালনা করেছে, সেগুলি এক হিসাবে ছিল ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই সংগ্রামের অভিজ্ঞতালব্ধ চিন্তা ও চেতনাই উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিদ্রোহের অভ্যন্তর বস্তুর চেতনা এই পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকেই সৃজিত হয়েছিল। এই অভিজ্ঞতা থেকেই কৃষক চেয়েছিল তাদের বিদ্রোহের মাধ্যমে বৈদেশিক শাসনের উচ্ছেদ, তাদের সৃষ্ট সামন্ত শোষণের অবসান। স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে এক নতুন জাতি গঠনের অতৃপ্ত কামনাও তাদের কর্মসূচির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। শ্রমিকশ্রেণীর সেই সময় নতুন আবির্ভাব। তার ক্রমবর্ধমান সত্তায় তখনও শ্রেণীচেতনার অভাব। সেজন্য ঐক্য এবং জাতীয় সংস্কৃতিবিহীন কৃষক সম্প্রদায়কে সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত অভ্যুত্থানের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল। পক্ষান্তরে নব্য-শিক্ষিত এক শ্রেণী ইংরেজের এবং জমিদারদের অনুগ্রহভাজন হয়ে নিজ শ্রেণীস্বার্থে কৃষকের ওপর অত্যাচার এবং জুলুম বাড়িয়েছিল, কৃষকের সংগ্রামকে আরও কঠিন করে তুলেছিল। কিন্তু কৃষক তার বিদ্রোহে কোনও জাতিভেদ রাখেনি আর শত পরাজয়েও তার মুক্তির বাসনা স্তিমিত হয়নি।

উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক বিদ্রোহের সবচেয়ে উজ্জ্বল কাহিনী রচিত হয়েছিল সাঁওতাল বিদ্রোহে। উনিশ শতকে সাঁওতাল উপজাতীয় কৃষকরা জমিদার, মহাজন এবং ব্যাপারীদের শোষণ ও ইংরেজ শাসনের অবিচার, অনাচারের বিরুদ্ধে সাতবার বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এর মধ্যে ১৮৫৫-৫৬ সালে সিধু-কানুর নেতৃত্বে বিদ্রোহ এক গুরুতর রূপ ধারণ করে। এই বিদ্রোহে ৩০থেকে ৩৫ হাজার সাঁওতাল অস্ত্রধারণ করেছিল। এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য ইংরেজ শাসক ১২ থেকে ১৪ হাজার সৈন্য মোতায়েন করেছিল। জমিদার মহাজনেরা এই বিদ্রোহ দমনে ইংরেজকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিল। সরকার বিদ্রোহ দমন করতে সামরিক আইন জারি করে গণহত্যা করে এবং সাঁওতাল গ্রামগুলি ধ্বংস করে। কিন্তু সাঁওতাল কৃষক এবং কারিগরগণ আত্মসমর্পণ না করে মরণপণ সংগ্রাম করতে থাকে। ২৫ হাজার বিদ্রোহী নিহত হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষক তার জমি হারায়, কিন্তু বন্দোবস্তের শর্ত অনুযায়ী জমিদার কৃষি উন্নয়নের জন্য সেচব্যবস্থার উন্নতির প্রতিশ্রুতি পালন করে না। জমির উন্নতিতে তার কোনও আগ্রহ নেই। সে শহরের ভোগেতে গা ভাসিয়েছিল, তার ভোগবিলাসের জন্য কৃষককে শোষণ করেছিল। মানুষের শোষণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রকৃতির বিরূপতা। খরা ও বন্যায় কৃষকের দুর্দশা চরমে উঠেছিল। এর ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে কৃষক সমাজ বারে বারেই দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হয়েছিল। ১৮৩৪, ১৮৩৭, ১৮৪৫, ১৮৮৬, ১৮৯৪ সালে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা যায়। হুগলি জেলার দ্বারকেশ্বর, দামোদর ও ভাগীরথীর জলোচ্ছ্বাসকে প্রতিহত করার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। এদের রুদ্ররূপ কৃষকের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।

ইতিমধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের চেতনা, সমাজ সংস্কারের আন্দোলন থেকে এক ধাপ এগিয়ে গেল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক চেতনা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পথে। গড়ে উঠল ভারতসভা, প্রতিষ্ঠিত হল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, যদিও কংগ্রেসের উদ্ভব থেকেই নেতৃত্ব রইল বিত্তবানদের হাতে। ইতিমধ্যে ভারতে বুর্জোয়া শ্রেণীও বেড়ে উঠল এবং শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভবের পর তারাও সংহত হল। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম প্রবাহিত হল দ্বিধারায়। কৃষি ও চাকরির সঙ্কট তীব্র হয়ে উঠল বিংশ শতাব্দীর সূচনাতে। সঙ্কটের এই তীব্রতাতে মধ্যশ্রেণীর একাংশের মোহভঙ্গ হল। যাঁরা আশা করেছিলেন ইংরেজ আমাদের দেশ গড়ে তুলবে, তাঁরা ইংরেজ শাসনের নগ্নরূপ ক্রমশ প্রত্যক্ষ করলেন এবং মোহমুক্ত হয়ে দেশের প্রগতির শক্তিকে শক্তিশালী করলেন। একদিকে বুর্জোয়া জমিদারদের আপসমূলক কংগ্রেসি কর্মপন্থা এবং মধ্যশ্রেণীসুলভ সন্ত্রাসবাদী কর্মপন্থা বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে অনুসৃত হতে লাগল। আর দেশের দরিদ্র কৃষক ভূমিব্যবস্থার ফলে ভাগচাষীতে পরিণত হল। সরকারি রিপোর্ট থেকে জানা যায় এরাই হল আদিম যুগের অত্যাচারিত, অর্ধাহারী, অনাহারী, কৃষক, যারা অসহায় অবস্থায় জমিদার এবং বিত্তশালীদের জমিতে বিনামজুরিতে বছরের বেশির ভাগ সময় শ্রম দিতে বাধ্য থাকে। কৃষি মরসুমে এরা ২/৪ দিন মাত্র কাজ পায়। ১৯৩০ এবং ১৯৩৭ -এর সার্ভে সেটেলমেন্টের সময় এইসব তথ্য পাওয়া গেছে। এদেরই মধ্যে ১৯২৮ সালে জেলার মধ্যে যখন ভাগদার নামে কৃষকের এক অংশ ফসলের অংশে রাজস্ব দেয়,, তখন জমিদারদের চাপে পড়ে সিভিল কোর্ট রায় দিয়েছিল, এরা ভাগদার নয়, এরা হল ভূমিস্বত্বহীন কৃষক। যাই হোক, এই ভাগচাষীর এবং ভূমিহীন কৃষকের দল প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে দলে দলে জমি থেকে উৎখাত হয়ে কলকারখানায় প্রবেশ করতে থাকে।

বিশ শতকের তিরিশের দশকে কৃষি এবং শিল্পে চরম অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়। এই সঙ্কট প্রতিরোধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামগুলি ব্যাপকতা লাভ করে। বৈপ্লবিক ধারায় কৃষকের সংগ্রামগুলি গ্রামান্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। বহু স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষক সংগঠনের বিকাশ হতে থাকে। ১৯৩১-৩৩ এর মধ্যে পাঞ্জাব,

বিহার, কর্নাটক, অন্ধ্র এবং বঙ্গদেশে কৃষক সংগঠন গণচরিত্র লাভ করে। রাজপুতানার আলোয়ার রাজ্যে কৃষকের বৃহত্তর অভ্যুত্থান ঘটে। তারা কয়েকটি শহর দখল করে, ৩০ হাজার লোকের এক সৈন্যবাহিনী গঠন করে। যদিও সংগ্রামে কৃষকরা পরাজিত হয়, তবুও তাদের বীরত্বপূর্ণ অভ্যুত্থানগুলির অভিমুখ থাকে ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তির দিকে। এরই সঙ্গে জমিদার-মহাজনদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে মুক্তিই ছিল তাদের লক্ষ্য। তাই এই সংগ্রামগুলি শোষক ও শোষিতের সংগ্রাম।

শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামের এই মৌলিকত্ব দেখে বঙ্গদেশে বিপ্লবী ধারায় দীক্ষিত যুবকেরা সংগ্রামে আশাবাদী হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বে যে সব যুবক সন্ত্রাসবাদী পথে ভারতের মুক্তি সাধনাতে ব্রতী হয়েছিল তারা প্রগতিশীলতার উচ্চস্তরে আরোহণ করে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন এবং শ্রমিক-কৃষকের মুক্তির পথ হিসাবে শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাসী হতে থাকে। এই তরুণ শক্তি বিশের দশকের প্রথমার্ধে মহামতি লেনিনের নেতৃত্বে অক্টোবর বিপ্লবের দ্বারা বিশ্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত হয় এবং ভারতে তথা বাংলাদেশে বিপ্লবী কর্মধারার বিকাশ ঘটাতে তৎপর হয়। শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলন সংগঠিত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। এই প্রচেষ্টায় হুগলি জেলা একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে।

১৯২৯ সালে দুর্গাদাস শেঠ এবং কালীচরণ ঘোষের উদ্যোগে 'চন্দননগর যুব সমিতি' গঠিত হয়। ১৯৩১ সালে Indian Protetarian Revolutionary party গঠিত হয়। যুব সমিতির কিছু কর্মী ও IPRP শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলন ও কয়েকটি গ্রামে কৃষক আন্দোলন এবং সংগঠন গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হন। ১৯৩৩ সালে হুগলি জেলায় প্রথম কৃষক সমিতি গঠিত হয় এবং কৃষকের দাবি নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ হয়। সদর মহকুমার কাশ্যাওড়া গ্রামে হুগলি জেলার প্রথম কৃষক সম্মেলন হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ডঃ ভূপেন দত্ত। বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত এই জেলার যুবকবৃন্দ দেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে ১৯৩০-৩২ সালে আরামবাগে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন এবং পরে সেটেলমেন্ট বয়কট আন্দোলন চালান। ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদের খাজনা বন্ধ আন্দোলনও চলে। এর জন্য ইংরেজ সরকার কৃষকদের এবং গ্রামবাসীদের ওপর সীমাহীন অত্যাচার চালায়। এতে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা থানা আক্রমণ করলে দুজন পুলিশ নিহত হয়। জেলায় কৃষক সমিতি গঠিত হওয়ার পরে নানাবিধ কৃষক আন্দোলন হয়। দ্বারবাসিনীতে ১৯৩৭-৩৮ সালে হাটে তোলা আদায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে জমিদারদের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘাত হয়। জমিদার বেআইনিভাবে কৃষকের ধান আটকে রাখেন। তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় জমিদারের পাইক-বরকন্দাজদের সঙ্গে কৃষক সমিতির রীতিমত সংঘর্ষ হয়। ফলে কৃষকের প্রতিরোধ তীব্র হয় এবং আন্দোলন অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। পোলবা, পাণ্ডুয়া প্রভৃতি থানায় এই আন্দোলন অনেকদিন চলে। স্থানীয় দাবি নিয়ে ডুবির ভেড়িতে এই সময় বাঁধ সংস্কারের আন্দোলন হয়। ডুবির ভেড়িকে কেন্দ্র করে বাঁধ সংস্কারের সঙ্গে জমিদার-বিরোধী আন্দোলনও চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সিঙ্গুর, থানার অন্তর্গত সমস্ত গ্রামাঞ্চল জুড়ে এই আন্দোলন অত্যন্ত শক্তিশালী হয় এবং জেলার সর্বত্র জমিদার-বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক রূপ পরিগ্রহ করে। ১৯৩৮ সালের শেষদিকে বড়ায় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে ২৫,০০০ কৃষক যোগ দেন। এই সম্মেলন উপলক্ষে জেলার সাধারণ মানুষ অকাতরে অর্থসাহায্য করেন। ১৯৩৯ সালে বলাগড় থানার ইউনিয়ন বোর্ডে ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এর জন্য ব্রিটিশ পুলিশ গ্রামে অকথ্য নির্যাতন চালায়।

মোটের ওপর তিরিশের দশকে কৃষক সমিতি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। সর্বভারত কৃষকসভার সভাপতি সহজানন্দ সরস্বতীর নেতৃত্বে কৃষকসভা এক জঙ্গি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং তার ডাক সর্বত্র বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। জেলার আন্দোলন সম্পর্কেও বলা যায় যে, অনেক স্থানীয় দাবি নিয়ে আন্দোলন হলেও এর মূল দাবি ছিল জমিদারি ব্যবস্থার অবসান। জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন, স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জাতীয় আন্দোলনকেও শক্তিশালী করেছে।

চল্লিশের দশক ছিল দেশের ইতিহাসে বিশেষভাবে বাংলাদেশের পক্ষে এক অগ্নিগর্ভ দশক। এই দশকে '৪৬-৪৭ সালে সমস্ত বাংলাদেশ জুড়ে তেভাগার দাবিতে ৬০ লক্ষ ভাগচাষীর রক্তাক্ত সংগ্রাম ১৯টি জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। সমস্ত জেলা মিলিয়ে ৭০ জন কৃষক তেভাগা আন্দোলনে প্রাণ দেয়। এই ব্যাপক তেভাগা আন্দোলনের জোয়ার হুগলি জেলাকেও ধাক্কা দিয়েছে। গ্রামে গ্রামে জোরাল আন্দোলন হয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে প্রয়াত কমরেড তুষার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'স্বাধীনতা সংগ্রামে হুগলি জেলা' গ্রন্থে লিখেছেন—'এ জেলায় আগে থেকেই যেসব দাবির ভিত্তিতে কৃষক আন্দোলন চলছিল, সেগুলি নতুন গতিবেগ পায়। উপরন্তু যেখানে যেখানে ভাগচাষীর অধিকার নিয়ে বিরোধ ছিল, সেসব জায়গায় তেভাগার দাবি তুলে আন্দোলনকে আরও জোরাল করা হয়। সাধারণভাবে জেলার সদর ও শ্রীরামপুর মহকুমার বহু গ্রামাঞ্চলে হাটের তোলা আদায় এবং খাজনা আদায়ের জুলুমের জন্য জোতদার-জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছিল ১৯৩৮ সাল থেকেই। সেগুলি এখন আরও জোরাল হয়। কোথাও কোথাও বেগার প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়। দ্বারবাসিনীর গ্রামাঞ্চলে বেগার-বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। বিশেষভাবে তেভাগা আন্দোলন হয় চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত কৃষ্ণরামপুর, রমানাথপুর অঞ্চলে। এই আন্দোলনে অনেক স্থানীয় কৃষককর্মী অগ্রণী ভূমিকা নেন। এঁদের মধ্যে নাম করতে হয় মহম্মদ সুকুর, গিয়াসউদ্দিন, বিজয় মালিক প্রমুখের। কানাইডাঙ্গা অঞ্চলে এই আন্দোলনের জের অনেকদিন পর্যন্ত চলে। পার্শ্ববর্তী হাওড়া জেলার গ্রামাঞ্চলের কর্মীরাও এসে এতে যোগ দেন। ১৯৪৭-এ সিঙ্গুরে এক বিরাট জমিদার-বিরোধী সম্মেলন হয় অজিত বসু, মনোরঞ্জন হাজরা প্রমুখের নেতৃত্বে। এর পরে এই সমস্ত আন্দোলন আরো জোরাল হয়ে ওঠে। মালঞ্চপাড়ার খেতমজুর আন্দোলন অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করে। কৃষক সমিতির অন্যতম সংগঠক পরিতোষ চট্টোপাধ্যায় এই

আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। আরামবাগের উত্তরাঞ্চলে তিরোল, বাতানল, মায়াপুর প্রভৃতি গ্রামে আন্দোলন জেগে ওঠে এখানে অনুষ্ঠিত জেলা কৃষক আন্দোলনের পর থেকে। জমিদার-জোতদারগোষ্ঠীর আক্রমণও ক্রমশ প্রবল হতে থাকে। জমিদারের পাইকের লাঠির আঘাতে কৃষককর্মীরা আহত হন। এই পরিস্থিতি চলতে থাকে অনেকদিন পর্যন্ত। ১৯৪৭-এর আগস্টের পরেও অনেকদিন এরই জের হিসাবে বড়ায় নৃশংস আক্রমণ চলে কৃষক সমিতির লোকেদের ওপর। পুলিশ জমিদারদের পক্ষ নিয়ে আক্রমণ চালায়। এর ফলে পুলিশের গুলিতে স্থানীয় দুই কৃষককর্মী কার্তিক ধাড়া ও গুইরাম মণ্ডল নিহত হন। পরে তেভাগা ও অন্যান্য দাবি নিয়ে ডুবির ভেড়ি অঞ্চলেও প্রচণ্ড সংগ্রাম চলে, যার নেতৃত্ব দেন নিমাই ভট্টাচার্য। পুলিশবাহিনীর প্রতিরোধে রুখে দাঁড়ান গ্রামের মহিলারা। পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেন ছজন কৃষক রমণী—পাঁচুবালা ভৌমিক, দাসুবালা মাল, পুষ্পবালা দাসী, চণ্ডীবালা পাকিড়া, মুক্তকেশী মাজি ও রাজকৃষ্ণের মা। বড়া ও ডুবির ভেড়ির এই ঘটনাগুলি ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্টের পরের ঘটনা হলেও সারা বাংলার ব্যাপক তেভাগা সংগ্রামের জের হিসাবে ঘটে। কৃষক আন্দোলন ছাড়াও আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবিতে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তের সংগ্রামের তরঙ্গ সমস্ত দেশকে আন্দোলিত করে তুলল। এই সময়ে সংগঠিত হয়েছিল তেলেঙ্গানার কৃষকের তুলনাহীন সশস্ত্র মহাসংগ্রাম। সংগ্রামী কৃষকেরা ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এই সংগ্রাম চালিয়ে ১৬ হাজার বর্গমাইল এলাকাজুড়ে ৩০ লক্ষ মানুষকে মুক্ত করে 'গ্রামরাজ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সংগ্রামের এই অত্যুজ্জ্বল যুগে ১৯৪৩ সালে মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষুধার আগুনে পুড়তে থাকে। কৃষক সমিতিগুলির উদ্যোগে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্য লঙ্গরখানা খোলা হয়। সেই সঙ্গে যারা গোপনে চাল-গম মজুত করে চোরাকারবারে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করছিল, সেই সব মজুতদার ও চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মজুত উদ্ধার করে অভাবী মানুষের মধ্যে বিলি করা হয়। বিরুদ্ধে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের এই সংগ্রাম পরবর্তীকালে তেভাগা আন্দোলনের পটভূমি রচনা করে। সব মিলিয়ে ১৯৪৭ সালে দেশের যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, তা দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত বৃটিশরাজ বৃহৎ বুর্জোয়া এবং ভূস্বামীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়। শুরু হয় নতুন পর্যায়।

(৩)

দেশের পট পরিবর্তন হল, কিন্তু কৃষকের অবস্থার পরিবর্তন হল না। সেজন্য কৃষকের সংগ্রামের ধারাও অব্যাহত রইল। এই ধারায় স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সময় এবং তার অব্যবহিত পরে বড়া কমলপুর এবং ডুবির ভেড়ি গ্রামের কৃষক সংগ্রামের কাহিনী ইতিপূর্বে বিবৃত হয়েছে। মোটের ওপর ১৯৩৬ সালে সর্বভারতীয় কৃষক সমিতি সংগঠন সৃষ্টির পরে কৃষকের আজ পর্যন্ত সংগ্রামের ইতিহাসের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে কৃষকের জমি হারানোর বেদনা আর তারই সঙ্গে প্রশমিত হয়েছে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তার অনন্য সংগ্রামী সত্তা।

তীব্র কৃষক আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি অধিগ্রহণ আইন ১৯৫৩ সালে প্রণয়ন করা হয়। ভারতের সংবিধানে ভূমিসংস্কারকে রাজ্য তালিকাভুক্ত করে কেন্দ্র ভূমিসংস্কারের দায়িত্ব এড়িয়ে যায়। মজার কথা হল—জমিদারদের জমির অধিকার মৌলিক অধিকারের মধ্যে রাখা হয়। অর্থাৎ রাজ্য সরকার ভূমিসংস্কার করে কৃষকের হাতে জমি দিতে চাইলেও, তাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষিত হচ্ছে কি না, তা দেখার অজুহাতে কেন্দ্রের ক্ষমতা বহাল রাখা হয়। এও এক প্রতারণা। যাই হোক, জমিদারি অধিগ্রহণ আইনে জমিদারদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হল। ১৯৫৫ সালে পাস হল পঃ বঃ ভূমিসংস্কার আইন। এই আইনেই পরিবারের সদস্যপিছু ৭৫ বিঘা পর্যন্ত জমি রাখার ব্যবস্থা স্বীকৃত হল, অর্থাৎ জমিদারের জমির একটা বড় অংশই জমিদার পরিবারের মধ্যে রাখার ব্যবস্থা হল। সিলিং আইনের এই ফাঁককে কাজে লাগিয়ে প্রাক্তন জমিদাররা স্বনামে, বেনামে বহু জমি লুকিয়ে ফেলল।

মজার কথা, ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত সিলিং আইনে উদ্বৃত্ত কোনও জমি কৃষক পেল না। তীব্র গণ-আন্দোলনের জোয়ারে ১৯৬৭-তে প্রতিষ্ঠিত হল প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার। ভূমিরাজস্বমন্ত্রী কৃষকনেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার আহ্বান জানালেন—'কৃষক তুমি কোমরের জোরে সরকারি খাস জমি দখল করে চাষ করো, সরকার তোমার সঙ্গে আছে।' বাধার বাঁধ ভেঙে গেল। শুরু হল কৃষক আন্দোলনের নতুন অধ্যায়। স্বল্পমেয়াদী প্রথম যুক্তফ্রন্টের পর ১৯৬৯-এ বিপুল গরিষ্ঠতা নিয়ে ফিরে এল দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার। সারা রাজ্যের সঙ্গে এ জেলাতেও চলল জমি দখলের লড়াই। পোলবা, পাণ্ডুয়া, বলাগড়, হরিপাল, প্রধান কেন্দ্র। শত শত বিঘা জমি দখল হল—বিলি হল। পোলবার আকনা, মহানদ, পাণ্ডুয়ার বেজপাড়া, দ্বারবাসিনী, চণ্ডীতলার বাঁধপুর প্রভৃতি এলাকায় এই আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটল। জেলার প্রায় ৮০% গ্রামে কৃষক সমিতির বিস্তার ঘটল। প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হতেই এ জেলাতেও পুলিশরাজ কায়েম হল। আক্রমণ শুরু হয়ে গেল কৃষক আন্দোলনের ঘাঁটি গ্রামগুলিতে। কৃষকরা শুরু করলেন অর্জিত অধিকার রক্ষার লড়াই। গ্রামগুলি হল চরম অত্যাচার আর সন্ত্রাসের শিকার। গ্রামে গ্রামে পুলিশ-সি আর পি ক্যাম্প। শত শত মানুষ ঘরছাড়া। মেড়িয়া, সুদর্শন, পাটনা, বেজপাড়া প্রভৃতি গ্রামে চলল নৃশংস অত্যাচার। বিনাবিচারে আটক করা হতে থাকল কৃষকনেতা ও কর্মীদের। তাঁদের পাঠিয়ে দেওয়া হল সুদূর মাদ্রাজের কুড্ডালোর জেলে। হাজার হাজার কৃষককর্মীকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হল—থানা হাজতে নৃশংস অত্যাচার চালানো হল। খুন হয়ে গেলেন অনেকে। এই রকম অবস্থায় ১৯৭১-এ নির্বাচন হল। কিন্তু এত সন্ত্রাস সত্ত্বেও সি পি আই (এম) ১১৩টা আসন পেয়ে প্রধান দলে পরিণত হল। কিন্তু তাকে সরকার গড়তে ডাকা হল না। দুজন সদস্যবিশিষ্ট দলের নেতা অজয় মুখার্জি কংগ্রেসের সমর্থনে সরকার গড়লেন। স্বল্পমেয়াদী সরকার। কেন্দ্রের শাসন জারি হল। সিদ্ধার্থশঙ্কর বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রের মন্ত্রী। গ্রামগুলিতে নির্যাতনের মাত্রা বাড়ল। কংগ্রেসের ভৈরববাহিনী ও পুলিশের যৌথ আক্রমণে কৃষকরা সন্ত্রস্ত। ১৯৭২-এ পুনরায় নির্বাচন।

কংগ্রেস কোনও ঝুঁকি নিল না। গণতন্ত্রকে বিসর্জন নিয়ে জাল-জুয়াচুরি-সন্ত্রাস করে ক্ষমতা দখল করল। কৃষক আন্দোলন কিন্তু থামানো গেল না। ১৯৭৩ সালে শুরু হয়ে গেল মজুরির আন্দোলন। পাণ্ডুয়া, পোলবা, দাদপুর, বলাগড়, হরিপাল, চণ্ডীতলা, ধনেখালি প্রভৃতি এলাকায় ব্যাপক বিস্তার ঘটল এই আন্দোলনের। ১৯৭৪-এ শুরু হল সেটেলমেন্ট অপারেশন। বর্গাদারদের নাম রেকর্ড করার জন্য কৃষক সমিতি প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়—অন্যদিকে জমিদার, কংগ্রেস-পুলিশ-আমলাচক্রের বর্গা উচ্ছেদের চক্রান্ত। একই সঙ্গে ভারতের রাজনীতি টালমাটাল। জয়প্রকাশের আন্দোলন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয় হল। ক্ষমতা না ছেড়ে জরুরি অবস্থা জারি করলেন তিনি। এদিকে নতুন করে বিনাবিচারে আটক শুরু হল। কৃষকনেতাদের আটক করা হতে থাকল। আটক করা হল বর্গাদার রামধন টুডুকে। কিন্তু আন্দোলন থামানো গেল না। অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এল ১৯৭৭ সাল। কেন্দ্রে কংগ্রেস পরাজিত—নতুন সরকার। রাজ্যে প্রথম বামফ্রন্টের সরকার। আইনকে বর্গাদারদের দুয়ারে পৌঁছে দেবার পদ্ধতি নিয়ে ক্যাম্প বসল সদর মহকুমার পোলবা থানার গ্রাম হালুসাইতে। এখান থেকেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হল অপারেশন বর্গার। তারপরের ইতিহাস চলমান বর্তমান।

(৪)

এই বর্তমানের সূচনাতে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে সরকারে ন্যস্ত ও দখলীকৃত জমি বণ্টন করে। ৯.৫০ লক্ষ একর জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টিত হয়। এর ফলে ৪.৪৭ লক্ষ আদিবাসী, ৮.২৭ লক্ষ তফসিলি জাতি সহ মোট ২২ লক্ষ ভূমিহীন দুস্থ কৃষক উপকৃত হয়েছে। উপকৃত মানুষের ৫৮ শতাংশ আদিবাসী ও তফসিলি উপজাতিভুক্ত মানুষ লাভবান হয়েছে যদিও এ রাজ্যে মোট জনসংখ্যার তুলনায় তাদের উভয়ের মোট হার ২৭ শতাংশ মাত্র। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ১৪.৬২ লক্ষ বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে উপকৃত মানুষের সংখ্যা ২ কোটি হবে। বাস্তুজমি পেয়েছে ২.৬৯ লক্ষ মানুষ।

হুগলি জেলার ভেতরে বামফ্রন্ট সরকার ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত উদ্বৃত্ত ২৬২৯৮.৫১৮ একর জমি দখল নেয়। এর মধ্যে ৭৭৯০ একর জমি কৃষিকাজের অযোগ্য। জেলাতে বৃহৎ জমির মালিকদের সংখ্যা অন্যান্য জেলার তুলনায় কম থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত ১০,৮৮৭.৫ একর দখলীকৃত জমি ৫১,৫৬৭ জন ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে বণ্টিত হয়েছে। ১,০৭,১৬০ একর বর্গাজমি নথিভুক্ত হয়েছে। রেকর্ডভুক্ত বর্গাচাষী, আদিবাসী ও তফসিলির মিলিত সংখ্যা এর অর্ধেকেরও বেশি।

ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে আরও সাফল্য হচ্ছে—সমাজের বঞ্চিত কৃষিমজুরদের দৈনিক মজুরি হার বৃদ্ধি করা। এই হার বর্তমানে ৩২.৫১ টাকা দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য জেলার সঙ্গে তাল মিলিয়েই এই মজুরি বেড়েছে। ১৯৯৩ সাল থেকে 'অ্যাসিওরেন্স স্কিম' নামে প্রকল্প রাজ্যে চালু হয়েছে। এর লক্ষ্য হল—কর্মহীনতার সময় কৃষিমজুরদের অন্তত ১০০ দিনের মজুরি সুনিশ্চিত করা। জেলায় পঞ্চায়েতের

নিউ দীঘা ॥ বলরামপুর ॥ সিঙ্গুর

মাধ্যমে কৃষিমজুরদের বহুমুখী নানা প্রকল্পের মাধ্যমে ৩২.৯৬ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলত হুগলি জেলা সহ পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে সীমিত ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে গ্রাম্য অর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে সফলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

হুগলি জেলায় কৃষিযোগ্য জমির মোট পরিমাণ ৫,৭৮,২৫২ একর। এক দশকে এখানের ফসল উৎপাদনের হার ১৮৮.০৬ থেকে বেড়ে ২৬৮.৫৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আলু উৎপাদনে জমির পরিমাণ ছিল ৮১.৫৬০ একর। এটা বেড়ে হয়েছে ৯৬,০০০ একর। এ ছাড়া গম, সরষে, তিল প্রভৃতি চাষে হুগলি জেলা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। জেলার সেচব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি সেচ জমির পরিমাণ ৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি বিকাশের ক্ষেত্রে কৃষি ছাড়া মৎস্যচাষ, বনসৃজন, মৌমাছি পালন, প্রাণিসম্পদ বিকাশের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আয়ের নিম্নতম উৎস সৃষ্টি করা হয়েছে। জেলার নিম্ন দামোদরের অববাহিকায় বন্যাজনিত সমস্যা প্রকট আকারে বিদ্যমান। এর সমাধান রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। কিন্তু জেলার মানুষ নিম্ন দামোদর প্রকল্প রূপায়ণের দাবিতে সোচ্চার হয়েছে।

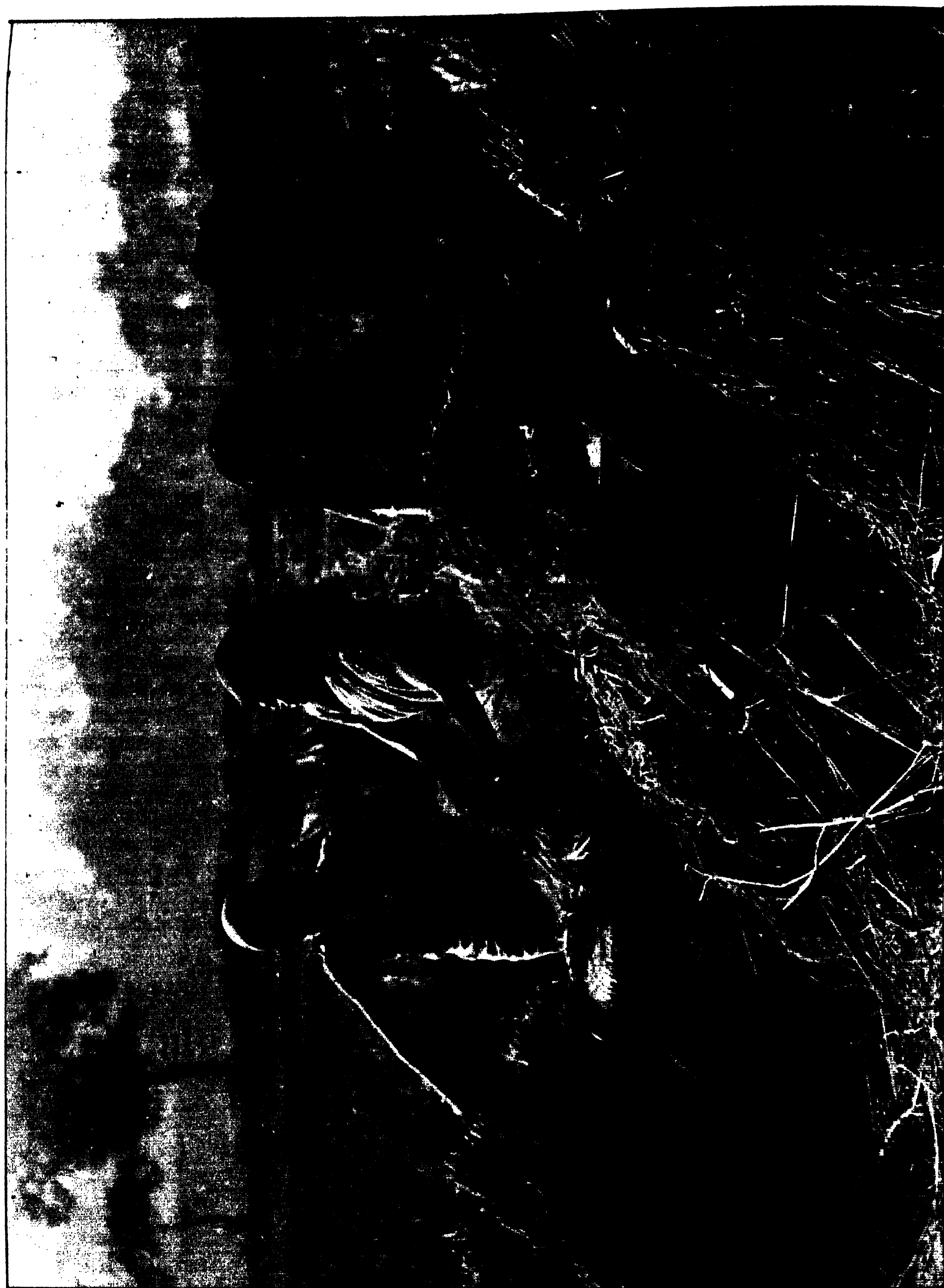
কিন্তু এই সমস্ত উন্নতির সঙ্গে নতুন সমস্যাও সৃষ্টি হয়েছে। কৃষিতে পুঁজিবাদী প্রক্রিয়া বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করা যাচ্ছে। মালিকের জমি সিলিংয়ের উর্ধ্বে নয়, কিন্তু নানা নৈতিক-অনৈতিক ব্যবস্থা ধারায় সে বিত্তশালী হচ্ছে। কৃষকের জমি চড়া দামে কিনে নিচ্ছে, এরাই বেশি পরিমাণে কৃষি উৎপাদনের জন্য খেতমজুর নিয়োগ না করে যন্ত্রের ব্যবহার করে। পুঁজির জোরে বাজারে বিক্রয়যোগ্য ফসল উৎপাদন করে। ভাগচাষীর জমি লিজ নিয়ে উচ্চফলনশীল ফসল তৈরি করে, সেচের জল চড়া দামে বিক্রি করে এবং অন্যান্য নানা উপায়ে অর্থ উপার্জন করে। কো-অপারেটিভ, মার্কেটিং সোসাইটি প্রভৃতি দখল রেখে অর্থ আত্মসাৎ করে ক্রমাগত বিত্তবান হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে এরাই একটি চক্র হয়ে উঠেছে। এদের সংখ্যা, আর্থিক সঙ্গতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা নেই। এ সম্পর্কে রাজ্য কৃষকসভা গ্রামাঞ্চলের অর্থ-সামাজিক অবস্থা বোঝার জন্য সমীক্ষার কাজ হাতে নিয়েছে। হুগলি জেলাতে ১০খানা গ্রামের সমীক্ষা করা হয়েছে। এর বিস্তারিত ফল এখন জানা যায়নি, তবে হুগলি জেলার পোলবা থানার মেরিয়া গ্রামের একটি নমুনাচিত্র নীচে দেওয়া হল। এখান থেকে পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ কেমন হয়েছে, তার একটা ছবি পাওয়া যাবে।

	১৯৮৫	১৯৯৫
লাঙ্গল ছিল	১৪৭	৪৩
পাওয়ার টিলার	১	১২
ট্রাক্টর	১	৫
শ্যালো	৫	x
মিনি ডিপ্ টিউবওয়েল	x	১০
ডিপ্ টিউবওয়েল	x	১
রেট—লাঙ্গল	২০ টাকা	৫৫ টাকা
পাওয়ার টিলার	২০ টাকা	৭০ টাকা
ট্রাক্টর	৯০ টাকা	২৫০ টাকা
শ্যালো	৮০ টাকা	x
মিনি ডিপ	x	৪০০ টাকা বিঘা
দৈনিক মজুরি	৮ + ১ কেজি চাল	১৯ + ২ কেজি চাল
চাষযোগ্য জমির পরিমাণ—১৬০০ বিঘা		
বোরো চাষ	২০০ বিঘা	১০০০ বিঘা
আমন	১৬০০ বিঘা	১৬০০ বিঘা
আলু	১০০ বিঘা	৫০০ বিঘা
কাটরা	২০ বিঘা	১০০ বিঘা
পাট	৩০ বিঘা	১০ বিঘা

তবে সমস্যা থাকলেও রাজ্য কৃষি উৎপাদনে যেমন প্রথম স্থান করে নিয়েছে, হুগলি জেলাও তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এগিয়ে চলেছে।

রাজ্য সরকার তার সীমাবদ্ধ শক্তিতে যেটুকু ভূমিসংস্কার এখানে সম্ভব করতে পেরেছে, তাতে কৃষি উৎপাদনে এ রাজ্য প্রথম স্থান অধিকার করেছে। শুধু এইটুকুতেই এই সাফল্যের পরিমাপ করা যাবে না। এই সীমাবদ্ধ ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে পুঁজিপতি এবং সামন্ত ও আধাসামন্ত শ্রেণীর ক্ষমতার অবসান ঘটাতে না পারলেও তার ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করেছে। অধিকন্তু মৌখিক দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কৃষক তার সংগ্রামের মধ্যে প্রসারিত শ্রেণী-চেতনাতে উপলব্ধি করেছে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করাই মৌলিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ এবং এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘস্থায়ী কঠোর শ্রেণী সংগ্রাম। সংগ্রামের কোনও বিকল্প নেই। কৃষকের আন্দোলন, এই জেলার কৃষককে সারা দেশের সঙ্গে এই সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে।





পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার মাধ্যমে জেলার কৃষি সেচ ও সমবায় অগ্রগতি

বলাই সাঁবুই



ভারতের কৃষি মানচিত্রে হুগলি জেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। আলু উৎপাদনে এই জেলা জেলাগতভাবে সবার শীর্ষে। সমগ্র উত্তরপ্রদেশে যে আলু উৎপাদন হয়, মাত্র হুগলি জেলাতে তার চেয়ে বেশি আলু উৎপাদন হয়। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজ্যের সমগ্র গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে হুগলি জেলার গ্রামাঞ্চলে কৃষিতেও অগ্রগতির জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা এবং জেলাভিত্তিক বিকেন্দ্রিত পরিকল্পনা এই অগ্রগতিকে আরও লক্ষ্যমুখী ও সংহত করেছে। কৃষির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মেহনতি কৃষক ও খেতমজুরদের জীবন-জীবিকার উন্নতির যে লক্ষ্য বামফ্রন্ট সরকারের গ্রাম উন্নয়নের কর্মসূচিতে ঘোষিত হয়েছে, সেই লক্ষ্য রূপায়ণে হুগলি জেলা এগিয়ে চলেছে দৃঢ় পদক্ষেপে।

হুগলি জেলার ভৌগোলিক আয়তন ৩১৪৫ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে গ্রামের সংখ্যা ১৯৪৬। মৌজার সংখ্যা ১৯৯৩। গ্রাম পঞ্চায়েত ২১১। ১৯৯১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী এই জেলার মোট জনসংখ্যা ৪৩,৫৫,২৩০। এর মধ্যে তফসিলি জাতি ও আদিবাসী মানুষের সংখ্যা যথাক্রমে ১০,৫০,২৮০ ও ১,৭৬,৪০১। জেলায় এঁরা মূলত গ্রামাঞ্চলেই বাস করেন এবং কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। খেতমজুরের সংখ্যা ২,৮১,৩২৩।

ডি এল এল আর ও-র রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯২ সাল পর্যন্ত জেলায় বর্গাদারের সংখ্যা ছিল ১,০৩,৪৮৯। ১৯৯১ সাল পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী পাট্টাপ্রাপ্ত জমির মলিকের সংখ্যা ৫৫,২২২। ১৯৮১ সালের সেন্সার রিপোর্ট অনুযায়ী এই জেলায় ক্ষুদ্র কৃষকের সংখ্যা ৪০,৮৩৫। প্রান্তিক চাষীর সংখ্যা ৩২,৯৭১। জেলার মোট চাষের জমির পরিমাণ ৫,৪৯,৬৯৮.৫০ একর। মোট তৃণভূমি ও ফলের বাগানের পরিমাণ ১৪,০৪৫ একর। চাষযোগ্য অনাবাদী জমির পরিমাণ ১,৫০,০০০ একর। বাস্তুজমির পরিমাণ ১,০৭,৫৯৫ একর, বনভূমির আয়তন ৭২,০০০ একর। ডি এল এল আর ও-র ১৯৯২ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী জেলায় খাসজমির পরিমাণ ২৮,৯৯৪ একর। এই সময়ের মধ্যে বণ্টিত জমির পরিমাণ ১১,৩০১.৮০ একর।

জেলায় একই মরসুমে একের বেশি ফসল চাষের পরিমাণ ১৯৮১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী ৬৬,৮০১.৬২ একর। জেলার আলুর পরই গুরুত্বপূর্ণ ফসল ধান। ধান প্রধান ফসল, এর পর আলু। এ ছাড়া পাট, সবজি ফসল, বাগিচা ফসলেও হুগলি জেলার গড় উৎপাদন রাজ্যের গড় উৎপাদনের প্রায় সমান।

জেলায় আলু উৎপাদনের মূল কেন্দ্র হরিপাল, তারকেশ্বর, পুরশুড়া, খানাকুল, আরামবাগ প্রভৃতি থানা। এ ছাড়া প্রায় সব অঞ্চলেই আলুর উৎপাদন হয়। তবে ওই থানাগুলির উৎপাদিত আলুর বাজার দর পাণ্ডুয়া, খানাকুল ইত্যাদির উৎপাদিত আলুর চেয়ে কিছুটা বেশি। ধান উৎপাদন হয় জেলার সর্বত্র। পেঁয়াজ উৎপাদনে বলাগড় থানার সুনাম বহুদিনের। পাট উৎপাদন গ্রামাঞ্চলের সব থানায় কম-বেশি হলেও, বাজার দরের অভাবে সমগ্রভাবেই পাটচাষের এলাকা কমে যাচ্ছে। আলু উৎপাদনের এলাকাও বর্তমানে কিছুটা সঙ্কুচিত নানা কারণে। এটা ঠিক নয় বরং বাড়ছে। কিন্তু প্রতিবিঘা গড় ফলনের হার মোটামুটি আগের মতোই আছে। বোরো, আমন ও আউশ মিলিয়ে মোট ধান উৎপাদনের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে।

সবজি ফসলের উৎপাদনে গত কয়েক মরসুমে চণ্ডীতলা থানার অগ্রগতি উল্লেখ করার মতো।

বাগিচা ফসলের ক্ষেত্রে চন্দননগর, সিঙ্গুর, ব্যাণ্ডেল প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলের কলাচাষের কথাই প্রথমে উল্লেখ করতে হয়। কলাচাষ ছাড়াও ভদ্রেশ্বর গ্রামাঞ্চল থেকে ব্যাণ্ডেল অঞ্চল পর্যন্ত বিভিন্ন জাতের দিশি আমের ফলনেও হুগলি জেলার একটা উল্লেখ করার মতো স্থান রয়েছে।

মাছচাষের ক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগও এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করার মতো। বেসরকারি ক্ষেত্রে আরামবাগ, মগরা ও পাণ্ডুয়া প্রভৃতি অঞ্চলের ফিসারিগুলি সারা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সরকারি ক্ষেত্রে মৎস্যচাষ ও মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার উন্নতিতে বামফ্রন্ট সরকারের অনেকগুলি প্রকল্প সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে। সরকারি উদ্যোগে মাঝারি ও ক্ষুদ্র সেচব্যবস্থার উন্নতির ফলে এই জেলায় সেচভুক্ত জমির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেকটা বেড়ে গেছে। বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় সেচ ও অন্যান্য কৃষি-কেন্দ্রিক কিছু প্রকল্প সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে বা হতে চলেছে। দামোদরের জলকে কেন্দ্র করে যে নদীমাতৃক সেচব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, বর্ধমান, হাওড়ার কিছুটা অংশ সহ হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার আরামবাগ, খানাকুল, হরিণখোলা প্রভৃতি বিরাট অঞ্চলের কৃষিব্যবস্থা তার ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। তাই দামোদরের জলের অভাব এই অঞ্চলে খরা এবং জলস্ফীতির ফলে বন্যা এখানকার মানুষের জীবনের যুগ-যুগান্তর দিনলিপির অংশ। এ ছাড়া সময়মতো দামোদরের জল না পাওয়াও এইসব অঞ্চলের চাষের ফলনের ক্ষেত্রে একটা স্থায়ী সমস্যা। জেলার বর্ধমান সীমান্ত সংলগ্ন পাণ্ডুয়া থানার মাটিতে বালির পরিমাণ অত্যন্ত বেশি থাকায় এই অঞ্চল কিছুটা খরাপ্রবণ।

জেলায় পরিকল্পিতভাবে সমাজভিত্তিক বনসৃজনের কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে। এর ফলে পরিবেশ দূষণমুক্তির রাজ্যব্যাপী অভিযানে হুগলি জেলা তার নিজস্ব ভূমিকা যথাযথভাবেই পালন করে চলেছে। এই জেলার চুঁচুড়ায় রয়েছে রাজ্যের কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্র ও কৃষি খামার। পাণ্ডুয়ায় রয়েছে এর একটি শাখা। ধনেখালি প্রভৃতি অঞ্চলে রয়েছে সরকারি বীজ খামার। চুঁচুড়া কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের সৃষ্ট নানা উচ্চ ফলনশীল খরা ও বন্যাসহনশীল জাতের ধান ও অন্যান্য ফসলের বীজ ইতিমধ্যে সারা দেশের ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন গতি এনেছে।

আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে জেলার কৃষিব্যবস্থা পিছিয়ে নেই। সেচব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি রাসায়নিক সার, কীটনাশক, টিলার, ট্রাক্টরের ব্যবহার দিন-দিন বাড়ছে। জেলার উত্তরপাড়া, রিষড়া, শ্রীরামপুর, ভদ্রেশ্বর, চাঁপদানি, তেলিনীপাড়া, সাহাগঞ্জ, বাঁশবেড়িয়া অঞ্চলে আধুনিক শিল্পের প্রসার ঘটলেও জেলার অর্থনীতি এখনও মূলত কৃষিনির্ভর।

এই জেলার আয়তন পশ্চিমবঙ্গের ৩.৬ শতাংশ। জেলার জনসংখ্যা রাজ্যের জনসংখ্যার ৬.৫ শতাংশ। এই জেলার জলবায়ু ও মাটি বিভিন্ন রকম ফসল চাষের সহায়ক। গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৫০০ মিলিমিটার। সেচব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত। খরিফ মরসুমে প্রায় ৬৯ শতাংশ এবং শীত-গ্রীষ্ম মরসুমে প্রায় ৪৮ শতাংশ জমি ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প, নদীনালা, পুকুর দামোদর ও কংসাবতী জলাধার থেকে সেচের জল পায়।

বিভিন্ন প্রকার কৃষি উপকরণগুলি—যেমন বীজ, সার ওষুধ, যন্ত্রপাতি, সেচ, কৃষিঋণ প্রভৃতির সমন্বয় ঘটিয়ে আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তিলব্ধ কৃৎকৌশলের সফল প্রয়োগে জেলায় চাষের নিবিড়তা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি বেড়েছে গড় ফসলের হার।

হুগলি জেলার খরিফ মরসুমে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ হয় ৭০ শতাংশ জমিতে। আউশ ও বোরো চাষ হয় ১০০ শতাংশ জমিতে। বর্তমানে চাষের নিবিড়তা ২০০ ভাগ। উন্নত কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহার সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন ফসলের এলাকা এবং উৎপাদন লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে। কোনও কোনও ফসলের গড় ফলন দ্বিগুণ হয়েছে। ১৯৮২-৮৩ সালে বোরো ধানের এলাকা ছিল ৪২০০০ হেক্টর। ১৯৯৩-৯৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৩,০০০ হেক্টরে। এই সময়ের মধ্যে আলুচাষের এলাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০,০০০ হেক্টর থেকে ৬৮,০০০ হেক্টরে। সরষে চাষের এলাকা গোটা জেলায় এখন ১৯০০০ হেক্টর। ১৯৯২-৯৩ সালে এর পরিমাণ ছিল মাত্র ৫০০০ হেক্টর। ১৯৮২-৮৩ সালে জেলায় আউশ ধানের চাষ উৎপাদন হত হেক্টরপ্রতি ১৬ কুইন্টাল। ওই সময়ে আমন ধানের চাল উৎপাদনের

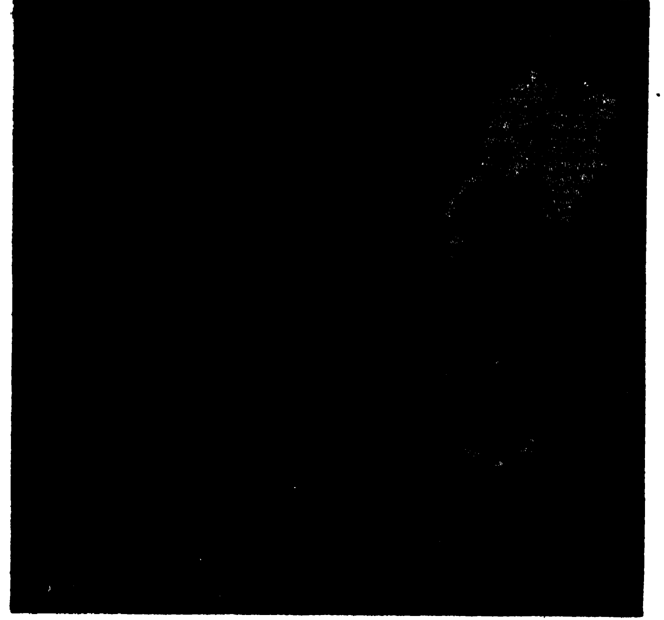
পরিমাণ ছিল হেক্টরপ্রতি ১২ কুইন্টাল। বোরো ধানে চাল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল হেক্টরপ্রতি ২৩ কুইন্টাল। ১৯৯৩-৯৪ সালে এইগুলির পরিমাণ হেক্টরপ্রতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৪ কুইন্টাল, ২২ কুইন্টাল এবং ৩১ কুইন্টাল। এই সময়ের মধ্যে সরষের চাষ বেড়ে দাঁড়িয়েছে হেক্টরপ্রতি ৫.৮ কুইন্টাল থেকে ৮.৭৫ কুইন্টাল। তিল ৫.০ কুইন্টাল থেকে ৯.০ কুইন্টাল, পাট ১২ বেল থেকে ১৫ বেলে এবং হেক্টরপ্রতি ২১.০৮ থেকে ২৫.০ টনে।

এর কারণ—(১) প্রতিটি ব্লকে ভরতুকিতে উচ্চফলনশীল শংসিত বীজ সরবরাহ করা হয়েছে। সরকারি কৃষি খামার, রাজ্য বীজ নিগম এবং বীজ বিক্রেতাদের মাধ্যমে ইতিমধ্যে প্রায় ৫০০ টন বীজ সরবরাহ করা হয়েছে। (২) ধানের গড় ফলন বৃদ্ধির জন্য এই জেলায় সুসংহত দানাশস্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। (৩) ২০ একর মাঝারি নিচু জমিতে অধিক ফলনশীল উন্নত জাতের ধানচাষের একটি প্রদর্শনক্ষেত্র পোলবা, দাদপুর ব্লকে করা হয়েছে। (৪) উচ্চ ফলনশীল ধানের এলাকা ও উৎপাদনের হার বৃদ্ধির জন্য সম্ভবনাপূর্ণ ২০টি ব্লকে ৭৫৭টি বীজ মিনিকিট কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। (৫) সুসংহতভাবে রোগ ও পোকা দমনের জন্য ৪টি ব্লকে ৪০ হেক্টর করে ৪টি প্রদর্শনীক্ষেত্র স্থাপন করা হয়েছে। (৬) গোঘাট ব্লকে জাতীয় জল বিভাজিকা উন্নয়ন প্রকল্পে 'দলকার জলায়' ধানের ফলন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১০০টি ধানের প্রদর্শনক্ষেত্র হয়েছে। (৭) হুগলি জেলার ৪টি ব্লকে বিশেষ পাট উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ভরতুকিতে বীজ বিতরণ, রাসায়নিক সার বিতরণ, পাট পচাবার চৌবাচ্চা তৈরির ব্যবস্থা, আঁশের মান উন্নয়নের জন্য ছত্রাকের প্যাকেট দেওয়ার ব্যবস্থা, ৭০টি প্রদর্শনক্ষেত্র স্থাপন, প্রতিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। (৮) ভরতুকিতে প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও বর্গাচাষীদের সার বিতরণ এবং অল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে সহজলভ্য ঋণ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। (৯) বর্ষাকালীন ডালশস্যের ফলন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ৭০০টি বিশেষ বিশেষ ধরনের প্রদর্শনক্ষেত্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। (১০) প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও মাটির চরিত্র অনুযায়ী এ বি সি ট্রায়ালের মাধ্যমে চাষীদের সার প্রয়োগের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে মাঠে ও কৃষি খামারে। (১১) খরিফ মরসুমে ভরতুকিতে পাওয়ার টিলার ও ছোট ট্রাক্টর দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ ছাড়া স্পেয়ার, থ্রেসার ইত্যাদি কৃষিযন্ত্র বিক্রেতাদের মাধ্যমে বিলির ব্যবস্থা করা হয়েছে। (১২) কৃষি খামারগুলির ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হয়েছে।

জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে ৪টি ব্লক বীজ খামার, ৩টি মহকুমার প্রতি যোগ্য গবেষণা খামার এবং একটি আদর্শ খামার নিয়ে জেলায় মোট কৃষিতে হুগলি জেলার অগ্রগতি জেলার অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে

বৈজ্ঞানিক মানসিকতায় সেচব্যবস্থা সম্প্রসারণ :

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। কয়েক দশক আগে পর্যন্ত কৃষিকার্যে সেচব্যবস্থা মূলত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল ছিল। বাস্তব প্রয়োজনে পরবর্তীকালে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে ভূগর্ভস্থ জলের

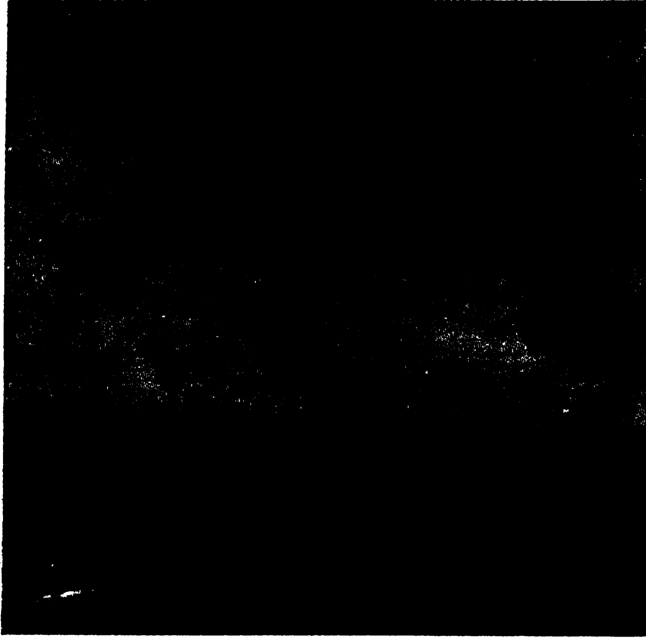


ব্যবহারের মাধ্যমকে কৃষি সেচব্যবস্থায় কৃষি উৎপাদনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়েছে—যা সারা পশ্চিমবঙ্গে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার সঙ্গী হিসাবে হুগলি জেলার ক্ষুদ্রসেচ দপ্তরের পরিকল্পনামাফিক ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হুগলি জেলায় সেচ সম্প্রসারণের সাফল্য অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সমগ্র জেলায় যা চাষযোগ্য জমি, তার প্রায় ৭০ শতাংশ ভূমির উপর সেচের ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়েছে। আমাদের জেলায় জলের উৎস চারটি ক্ষেত্র থেকে ব্যবহৃত হয়—(১) ভূগর্ভস্থ জল (২) নদীর জল (৩) পুকুর, জলাশয় ইত্যাদি (৪) ডি ভি সি।

প্রথমত, ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারে যেমন কৃষি উৎপাদনের সাফল্য অভূতপূর্ব, তেমনি অন্যদিকে বিপদের বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যেভাবে আমরা ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার ও নিঃশেষ করে চলেছি তাতে প্রকৃতি ও পরিবেশ বিপদসঙ্কুল হতে পারে। যার পরিণামে প্রাণিজগতে এক ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে। ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিকরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ সত্ত্বেও বর্তমান পরিকাঠামোয় ক্ষুদ্র সেচ দপ্তর যে সমস্ত গভীর/অগভীর/মাঝারি ধরনের সেচ পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত করেছে তার চিত্র দিলাম। আমাদের জেলায় সরকারি ক্ষেত্রে গভীর নলকূপের সংখ্যা ৩৫৫। মাঝারি নলকূপ ৪৪টি। অগভীর নলকূপের সংখ্যা ১২৮। এ ছাড়া বেসরকারিভাবে কৃষকরা ছোট ছোট সেচ প্রকল্প যেমন—শ্যালো, মিনি ইত্যাদি প্রায় ৫০০০-এর মতো ব্যবহার করছে।

দ্বিতীয় সেচের সুযোগ হচ্ছে নদী। এ ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছি যে, কিভাবে নদীর জলকে উত্তোলন করে কৃষিতে ব্যবহার করা যায়। ইতিমধ্যে কৃষি যান্ত্রিক দপ্তর হুগলি পরিকল্পনা-মাফিক বিশাল এলাকায় সেচের সম্প্রসারণ সম্পূর্ণ করেছে। বিশেষ করে গঙ্গার পর্যাপ্ত জল মাঠে পৌঁছে দিচ্ছে, তার চিত্রটা উপস্থিত



করছি। মোট নদীর জলোত্তোলন প্রকল্প জেলায় ৩২৮টি বসানো হয়েছে। তার মধ্যে ২৯২টি চালু আছে। বাকিগুলি নানান কারণে বন্ধ আছে। সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, গঙ্গানদী, দামোদর, মুণ্ডেশ্বরী, রূপনারায়ণ ও গঙ্গানদীর সঙ্গে সংযোগকারী অন্যান্য নদীকে কেন্দ্র করে পাঁচ বছরের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করবে, যাতে কম খরচে বিভিন্ন জলের উৎস থেকে সেই জল কৃষি উৎপাদনে সাহায্য করতে পারে। আর একটি জলের উৎস হচ্ছে অসংখ্য জলাশয় ও ছোট-বড় পুকুর। তার জন্যও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বৃষ্টির জল সঞ্চয় করে কৃষিতে লাগাবার জন্য আরও একটি জলের উৎস আছে। তা হল বিতর্কিত জলাধার ডি ভি সি প্রজেক্ট। ডি ভি সি পরিকল্পনার প্রথমদিকে কৃষকদের আশার আলো মনে হলেও বর্তমানে সেই আশা স্তিমিত এবং কোনও কোনও সময়ে বিপদসঙ্কুল করে তুলছে। কংসাবতী জলাধার যেটুকু সেচের জন্য জল সরবরাহ করে, গোঘাট থানার অল্প অংশে তার বেশি আশা করা বাতুলতামাত্র।

সেচ সম্প্রসারণ সম্পর্কিত একটি প্রকল্প, যা খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, সেটা হচ্ছে ত্রিবেণী ত্রিফসলী কৃষি ও সেচ সম্প্রসারণ সমিতির একটি অভিনব পরিকল্পনা। ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের এবং ত্রিবেণী টিসুর পরিত্যক্ত জল ব্যাপক এলাকার কৃষকের উৎপাদনে সাহায্য করছে। সব এলাকাই এক ফসল থেকে তিন ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। এর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সেচ দপ্তর কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে পাকা সেচনালি তৈরি করে দিয়েছে। এ ধরনের পরিকল্পনা বিরল।

একটি বিষয়ে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তা হচ্ছে গঙ্গানদী ও পশ্চিমদিকে বিরাট গ্রামাঞ্চল তার যে মাটির সমতা, সে বিষয়টি হিসাব করে পরিকল্পনামাফিক গঙ্গার জোয়ারের জল লাগোয়া পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে সেচের জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করা যায় কিনা ভাবা দরকার।

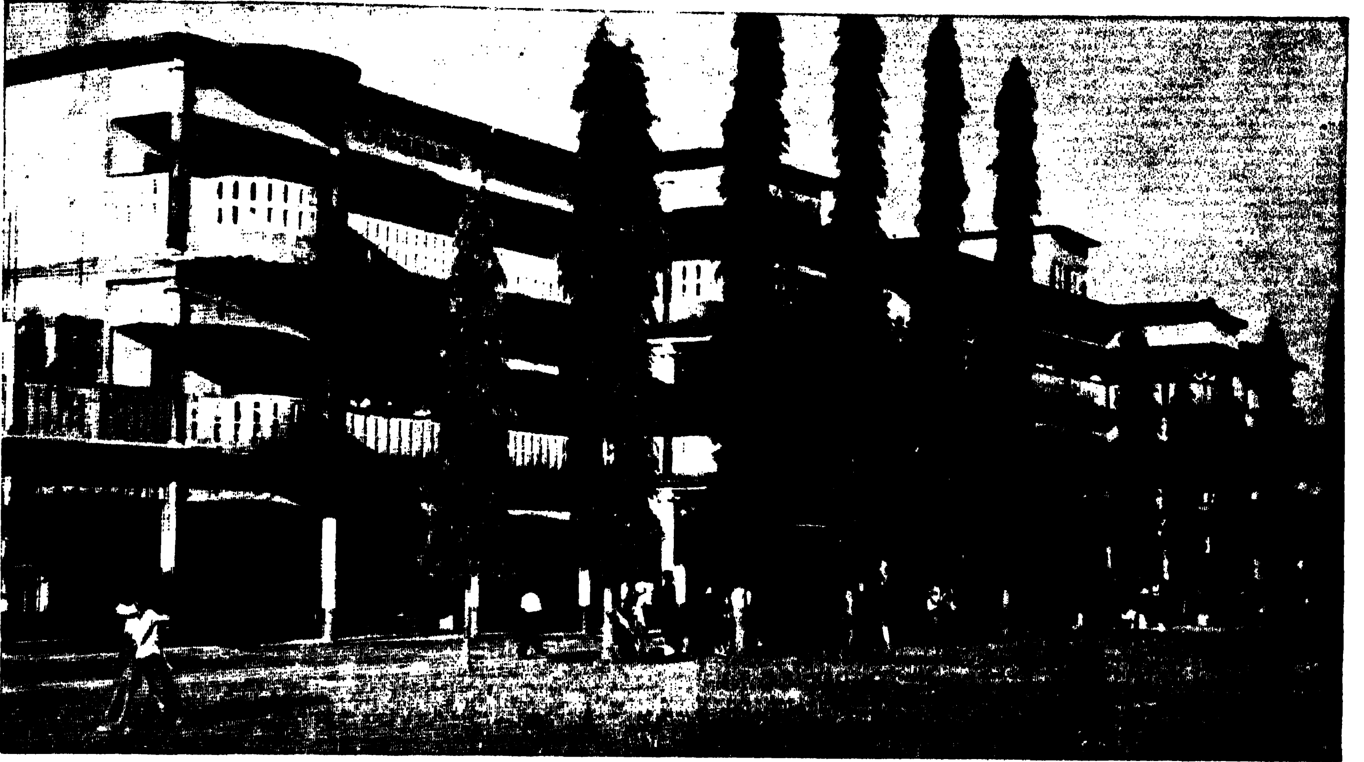
হুগলি জেলায় কৃষি এবং সেচ—এই দুটি সমন্বয়ে যে পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে, তার অর্থনৈতিক প্রভাব চুঁয়ে চুঁয়ে একেবারে তৃণমূলে মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। বর্তমানে সর্বত্র অর্থনৈতিক কাঠামো দেখলেই বোঝা যাবে, গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য বাজার, গঞ্জ, দোকান যেভাবে গড়ে উঠছে, তার মূল ভিত্তি হচ্ছে কৃষি অর্থনীতি।

আরও বিকাশ সাধন করা যায়, যদি ভারত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো সর্বক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক না হত। এর ওপর নতুন করে বিপদ পরিলক্ষিত হচ্ছে তা হচ্ছে, বহুজাতিক অর্থনৈতিক বাজারের প্রভাব। জানি না এইসব প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে কৃষি উৎপাদনকে অভিভাবকের দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে কিনা।

সমবায় আন্দোলন ও আমাদের ভূমিকা :

ভারতবর্ষে অতীতে সমবায় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এক কঠিন পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে, সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ, গ্রাম্য জমিদার, মহাজন, সুদখোরদের অত্যাচার ছিল সীমাহীন। কৃষক সাধারণ সম্পত্তির অধিকারকে মহাজনদের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত করার জন্যই ঋণদান সমিতি গড়ে তুলেছিল অর্থাৎ সকলে সকলের জন্য—এই ছিল দৃষ্টিভঙ্গি। বর্তমানে ঐতিহাসিক কারণে সমবায় আন্দোলন বিশেষ শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বহুক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়েছে। সমবায় আন্দোলন গণতন্ত্র ও জাতীয় সংহতি রক্ষার ভূমিকা অনেক ক্ষেত্রে পালন করছে। আজকে আর ঋণদান সমিতির মধ্যে এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ নেই। আজকের আন্দোলন বহুমুখী উৎপাদনের সংস্থাগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। এই পটভূমিকায় হুগলি জেলার সমবায় আন্দোলনকে প্রগতিশীল দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে। সমবায় সমিতিগুলি প্রধানত কৃষিভিত্তিক বলা চলে। পশ্চিমবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র কলকাতার কাছাকাছি হুগলি জেলায় বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতিও উল্লেখযোগ্যভাবে গড়ে উঠেছে। যেমন— আরবান ক্রেডিট ব্যাঙ্ক, আবাসন সমবায় সমিতি, ইঞ্জিনিয়ার্স ও লেবার কনট্রাক্ট সমিতি, কর্মচারী ঋণদান সমিতি। বিশেষ করে গ্রামীন কৃষি সমবায় সমিতিগুলির কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমাদের জেলায় উৎপাদনমুখী বহু সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে। যেমন মৎস্য, তাঁত ও অন্যান্য ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পকে কেন্দ্র করে। সর্ববৃহৎ সমবায় সমিতি হল—সিঙ্গুর, হরিপাল গ্রামীণ বৈদ্যুতিক সমবায় সমিতি। সদস্যসংখ্যা হচ্ছে ৪০,০০০ মতো। কৃষি ও শিল্পে এই সমিতির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এইটিকে পঃ বঙ্গ সরকার মডেল হিসাবে গ্রহণ করেছে।

সমবায় সমিতিগুলিকে আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কোঃ অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ভূমিকা আজকের দিনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি আর্থিক সহায়তা বা তার সদস্যভুক্ত সমিতিগুলি দ্বারাই বিপুলসংখ্যক জনগণের সঞ্চিত অর্থ তিলে-তিলে সমৃদ্ধ করে তুলছে। অবশ্য এক্ষেত্রে দুর্বলতা অনেকটা থেকে গেছে, যা বিধিসঙ্গতভাবে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে ১০০টি কৃষি সমবায় সমিতি আমানত প্রকল্প সংগ্রহের কাজ করে চলেছে।



ছবি অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

যার পরিমাণ প্রায় ১০ কোটি টাকার মতো। দুঃখের বিষয়, এর মধ্যে একটা বড় অংশের টাকা বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে জমা রাখছে, যেটা আইনসঙ্গত নয়। সমিতিগুলো নিজস্ব ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় টাকা হাতে রেখে যদি সমস্ত টাকা জেলার সেন্ট্রাল কোঃ অপাঃ ব্যাঙ্কে জমা রাখে, তা হলে কৃষি ও শিল্পে উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। বর্তমানে ৩৩৭টি কৃষি উন্নয়ন সমিতি বেশ সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে। সদস্যদের ঋণ দেওয়া, সার বণ্টন উন্নত মানের বীজ ও কীটনাশক ওষুধ, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচের সুব্যবস্থা, নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য সরবরাহ করে থাকে। কৃষিক্ষেত্রে যে মূলধন নিয়োগ হয়, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক তা যোগান দেয় ৭০ ভাগ টাকা অর্থাৎ ১৮ কোটি ১৪ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকার মধ্যে ১৩ কোটি ২৯ লক্ষ ৫৯ হাজার ঋণ, ৫৩ হাজার ৭৮৫ জন কৃষককে যোগান দিতে পেরেছে। নথিভুক্ত বর্গাদারও জমির পরিমাণ অনুযায়ী ফসলওয়ারি ঋণ পেয়ে থাকে।

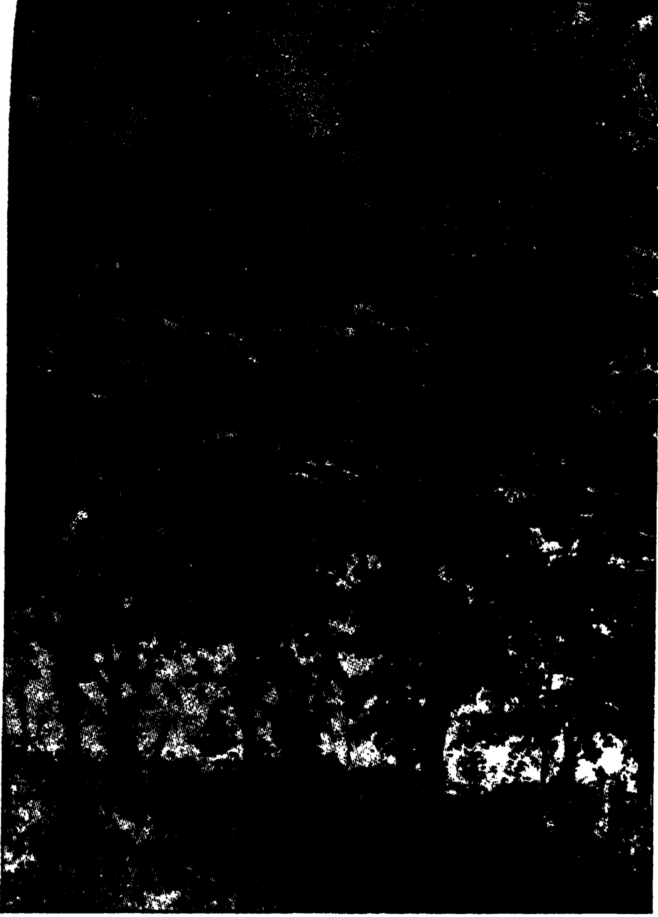
ভূমিহীন শ্রমিকদের জন্য ৫০ টাকা করে ভরতুকি শেয়ার পঃ বঙ্গ সরকার দিয়ে থাকে। আজ পর্যন্ত ১১ হাজার ৬ শো ৯ জন সদস্যপদ লাভ করতে পেরেছেন। এই গরিব সদস্যরা ঝুড়ি তৈরি, মুরগি পালন ও ছাগল পালন ইত্যাদি ব্যাপারে ঋণ পেয়ে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনামাফিক আর্থিক সহায়তায় ১২৭টি সমিতির অফিসঘর সমেত ১৮৩টি গুদামঘর নির্মাণ করা হয়েছে। ১৯৯৩-৯৪ বর্ষে ওই সকল গুদামঘর হতে রাসায়নিক সার বিক্রয় হয়েছে, যার মূল্য ১২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। ভোগ্যপণ্য বিক্রয়ের পরিমাণ ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকার উপর।

হুগলি জেলার কৃষি সমবায় সমিতির মাধ্যমে অনুদানের ভিত্তিতে ৪৪৪টি মিনি ডিপটিউবওয়েল বসানো হয়েছে। এ সমস্ত ঋণ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক হতে সরবরাহ করা হয়েছে। এর ফলে ১১,০০০ একর জমিতে সেচের বন্দোবস্ত হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ৬টি ব্লকে আই সি ডি পি প্রকল্পের কর্মকাণ্ড চালু করা হয়েছে।

হুগলি জেলার বিভিন্ন ব্লকে ১১টি কৃষি বিপণন সমিতি আছে। এই সমিতিগুলি বছরে ১৬ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা বিপণন করে। তাছাড়া তারা ৩ লক্ষ ৭ হাজার টাকা কৃষি যন্ত্রপাতি, ৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার রাসায়নিক সার, ১৭ লক্ষ ১৯ হাজার টাকার বীজ এবং ২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকার ভোগ্যপণ্য দ্রব্য বিক্রয় করেছে।

হুগলি জেলার অর্থকরী ফসল হল আলু। আলু সংরক্ষণের জন্য ৮টি সমবায় হিমঘর কাজ করে চলেছে। এই সমবায় হিমঘরগুলোর মাধ্যমে চাষীরা চল্লিশ হাজার মেট্রিক টন আলু সংরক্ষণের সুবিধা পাচ্ছে। তাছাড়া দীর্ঘমেয়াদী কৃষি উন্নয়নের জন্য দুটি সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক রয়েছে। এদের কাজ হল সেচ, কৃষি যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টর, মৎস্য প্রকল্প, ভূমি উন্নয়ন প্রভৃতি। ৫ বছরে উভয় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের ঋণ দেওয়ার পরিমাণ হল ৫ কোটি ৩৫ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। এতে ২ হাজার ৭৩২ জন কৃষক উপকৃত হয়েছেন। প্রায় ১৬ হাজার ১০০ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তন্তুবায় সমবায় সমিতিগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বহন করে চলেছে। ধনিয়াখালি, বেগমপুর প্রভৃতি এলাকার তাঁতের শাড়ির কথা কারোর অজানা নেই। প্রায় ৮০টি সমিতির মাধ্যমে হাজার হাজার পরিবার তাদের জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। বামফ্রন্ট সরকার তাদের বিভিন্ন প্রকার সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। এক্ষেত্রে সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। গত ১ বছরে সমিতিগুলি ঋণ গ্রহণ করেছে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। কিন্তু গুরুতর



বিপদ হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে সুতো পাওয়ার ক্ষেত্রে। ভারত সরকার যে বস্ত্রনীতি গ্রহণ করেছে, তাতে লক্ষ লক্ষ তাঁতশ্রমিক অনিশ্চিত অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চলছে।

আমাদের জেলায় বর্তমানে ৩৮টি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি সুনামের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। সবগুলি সমিতি লাভজনক অবস্থায় সরকারি বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে আর্থিক অবস্থারও বেশ উন্নতি ঘটিয়েছে। কয়েকশো মৎস্যজীবী পরিবার সমিতিগুলোর ওপর নির্ভরশীল। জাতীয় ক্ষেত্রে পরপর কয়েক বৎসর পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এতে হুগলি জেলার মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলির অবদান কম নয়।

ইঞ্জিনিয়ার্স ও লেবার কন্ট্রাক্ট সমবায় সমিতি মূলত বেকার ইঞ্জিনিয়ার ও স্নাতকদের নিয়ে গঠিত। আর লেবার কন্ট্রাক্ট সমিতি মূলত বেকার দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক এবং ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে গঠিত। বেকার সমস্যা যতই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, এ ধরনের সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা ততই বাড়ছে। বর্তমানে ৩৪টি ইঞ্জিনিয়ার ও ৫০টি লেবার কন্ট্রাক্ট সমিতি কাজ করছে। হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সমিতিগুলিতে ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঋণ দিয়েছে।

কর্মচারী ঋণদান সমবায় সমিতিগুলি শহর ও গ্রামভিত্তিক। অফিস, স্কুল, কলেজ, কলকারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের নিয়ে এই ধরনের সমিতি গঠন করা হয়। বর্তমানে আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় এ ধরনের সমিতি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং এর সংখ্যা বর্তমানে ২৭০। এই সমিতিগুলির ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ৭,১৭,০০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ হিসাবে দিয়েছে এবং আদায়ের পরিমাণ ১০০ ভাগ।

আরবান ক্রেডিট ব্যাঙ্ক—এ ধরনের সমিতির অস্তিত্ব শহরাঞ্চলে। বর্তমানে ৫টি ব্যাঙ্ক সুষ্ঠুভাবে কাজ করছে। এ সমস্ত সমিতির সঞ্চয়ের মোট পরিমাণ ২১,৬৩,০০০ টাকা সাধারণত ছোট ছোট ব্যবসা, ক্ষুদ্রশিল্প লরি বা বাস কেনা, গৃহনির্মাণ, গৃহসংস্কার, বিবাহ ইত্যাদি কার্যের জন্য ঋণ দিয়ে থাকে। সম্প্রতি মহিলাদের নিয়ে একটি আরবান ক্রেডিট ব্যাঙ্ক গঠিত হয়েছে। ফলে মহিলাদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে ১,০০,০০০ শেয়ার বিক্রি হয়েছে। সদস্যসংখ্যাও ১০০০-এ দাঁড়িয়েছে। আমানতের সংগ্রহ পরিমাণ ১,০০,০০০ দাঁড়িয়েছে।

ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি হুগলি জেলায় ২টি হোলসেল কনজিউমারস কো-অপারেটিভ আছে। তাদের সদস্যভুক্ত ৫৫টি প্রাথমিক কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি। বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে ব্যবসাদারদের সঙ্গে তারা প্রতিযোগিতা করে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে এবং শহরাঞ্চলের মানুষের কাছে তাদের সেবা পৌছতে পেরেছে। এ সময়ে এদের বিক্রিত পণ্যের পরিমাণ ১২,৮৫,০০,০০০ লক্ষ টাকারও বেশি।

মধ্যবিত্ত সমাজে গৃহসমস্যা আজ একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাস্তব প্রয়োজনে হুগলি জেলায় ৫৯টি আবাসন সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে, এর ফলে কয়েক হাজার পরিবার তাদের মাথাগোঁজার ঠাঁই পেয়েছে। আরেকটি সমায় সমিতির কথা উল্লেখ করতে চাই, সেটা হচ্ছে ত্রিবেণীর ত্রিফসলী কৃষি ও সেচ সমবায় সমিতি। ত্রিবেণীর BTPS পরিত্যক্ত ময়লা জল পাকা ড্রেনের মাধ্যমে ১৫০০ একর জমিতে সেচের জল পৌঁছে দিতে পেরেছে। এর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সেচ দপ্তর ২৩ লক্ষ টাকা খরচ করে পাকা ড্রেন, কৃষকের প্রয়োজনমতো মাঠে মাঠে সম্প্রসারণ করেছে। এভাবে ত্রিবেণী টিসুর পরিত্যক্ত জল কৃষি উৎপাদনের কাজে ব্যবহারের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এই সমিতির কর্মকাণ্ড দেশের কাছে এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। সেচের জলের জন্য কোনও খরচ না করে ১ থেকে ৩টি ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে।

পরিশেষে বলতে চাই হুগলি জেলায় বিভিন্ন ধরনের ছোট-বড় ১১০০ রকমের সমবায় সমিতি আছে। যোগ্য নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে সমবায় আন্দোলন পরিচালিত হলে শুধু সমিতিগুলো সবল হবে তাই নয়, এতে কর্মসংস্থানের যথেষ্ট সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে হুগলি জেলাতেই বিভিন্ন সমিতিতে ৪০০০-এর বেশি কর্মচারী কাজ করেন। বেশির ভাগ সমিতি গ্রামমুখী এবং কৃষিভিত্তিক। এগুলিকে আরও জোরদার করতে হলে পঞ্চায়েতগুলোর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক প্রয়োজন। কেননা, উভয় ব্যক্তি গ্রামবাংলায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে চলেছে। বর্তমানে বহুজাতিক সংস্থার অনুপ্রবেশের ফলে উভয়ের আরও নিবিড়ভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার সময় উপস্থিত হয়েছে। সঠিক ও যোগ্য নেতৃত্ব দিতে পারলে তবেই বহুজাতিক সংস্থার অনুপ্রবেশকে অনেকটা ঠেকিয়ে রাখতে পারা যাবে।

হুগলি জেলায় সংগঠিত শিল্প

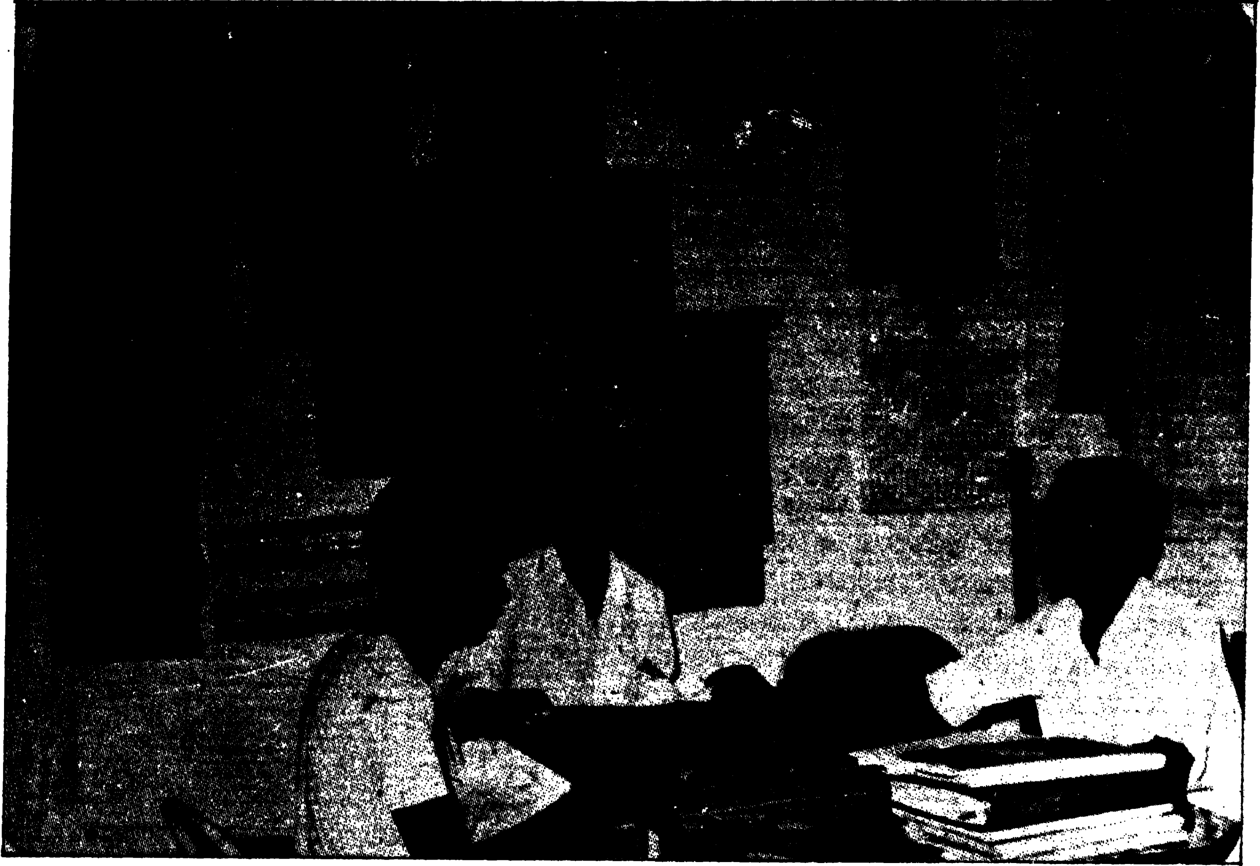
শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায়



হুগলি জেলা অবিভক্ত বাংলার প্রাচীন জেলাগুলির মধ্যে অন্যতম। এই জেলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবময়। উনিশ শতকের নবজাগৃতির অন্যতম পীঠস্থান এই হুগলি জেলা। রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্র প্রমুখ মনীষীদের স্মৃতি বিজড়িত এই জেলা। স্বাধীনতা আন্দোলনে এই জেলার অবদান বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

হাওড়া জেলার পরেই শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যার ক্ষেত্রে হুগলি জেলার স্থান। সুদূর অতীতে সপ্তগ্রাম ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র। সরস্বতী নদীপথে ব্যবসা পরিচালনা হত। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে হুগলিতে সাজাহান যখন পর্তুগীজদের বাসস্থান ধ্বংস করে দেন তখন সপ্তগ্রামের অবস্থান অবনতির দিকে যায় এবং ইউরোপীয়রা ভাগীরথীর তীরে চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর এবং কলিকাতায় ছড়িয়ে পড়েন। বহিঃসমুদ্রে ব্যবসার ক্ষেত্রে হুগলি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

এই জেলার প্রাচীন শিল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তাঁত, চিকন, পিতল, ইট ও টালি, ধান ভানাই প্রভৃতি। এ ছাড়া স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় এই জেলায় বেল্টিং শিল্প গড়ে উঠেছিল।



ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প এই জেলায় গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে চটশিল্প এই জেলায় সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সংগঠিত শিল্প। ভারতবর্ষে প্রথম চটকল ১৮৫৩ সালে রিষড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জেলায় স্কটল্যান্ডের টমাস ডফের উদ্যোগে কয়েকটি চটকল গড়ে ওঠে। গঙ্গার উভয়তীরে হুগলি এবং বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনায় চটকলগুলি বিস্তৃত। হুগলি জেলায় বর্তমানে ১০টি চটকল যার শ্রমিক সংখ্যা হল আনুমানিক ৫০ হাজার। এদের মধ্যে ৬টি চাঁপদানি ভদ্রেশ্বর চন্দননগর এলাকায়, ৩টি শ্রীরামপুর-রিষড়া এলাকায় এবং একটি বাঁশবেড়িয়াতে। এদের মধ্যে টমাস ডফের কারখানা ৩টিতে দীর্ঘদিন ধরে নানা সমস্যা চলছে। এর মালিকানা পরিবর্তন হয়ে জনৈক ইংল্যান্ডবাসীর হাতে গেছে। তিনি মোট ৪টি মিল (যার মধ্যে একটি উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত) নিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি করেছেন তাতে এই মিলগুলির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধ সত্ত্বেও ভারত সরকার এই বিদেশি মালিকের বিরুদ্ধে এখনও কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এখন চটকলের উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার যথেষ্ট ভাল। সময়মত আধুনিকীকরণ করে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করলে এই মিলগুলি জেলার তথা রাজ্যের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

এই জেলার সংগঠিত শিল্পগুলির মধ্যে সূতীবস্ত্র শিল্পেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। বর্তমানে অধিগৃহীত ৪টি সূতাকল যা এন টি সি পরিচালিত, তাদের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। কেন্দ্রীয় সরকার এন টি সি মিলগুলির আধুনিকীকরণের জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা এখনও কার্যকরী না করায় এই জেলার শ্রীরামপুর মহকুমায় অবস্থিত চারটি সূতাকল যথা রামপুরিয়া, বঙ্গলক্ষ্মী, লক্ষ্মীনারায়ণ ও বঙ্গলক্ষ্মীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। শ্রমিক সংগঠনগুলি যুক্তভাবে রাজ্য সরকারের সহায়তায় এই মিলগুলি বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগের মিলগুলি তাদের উৎপাদন ব্যবস্থায় আধুনিকীকরণ তথা diversification করায় লাভজনকভাবে চলছে। রাজ্য সরকার পরিচালিত সমবায়ভিত্তিক একটি মিল এই জেলায় আছে। সেটি এখনও লাভজনক হয়ে ওঠেনি।

ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের মধ্যে এশিয়ার বৃহত্তম কারখানা হিন্দুস্থান মোটরস এই জেলায় অবস্থিত। শ্রমিক কর্মচারী অফিসারসহ কর্মীসংখ্যা ১৫ হাজার। দৈনিক ১২৫টি গাড়ি উৎপাদন হয়। এ ছাড়া হায়দরাবাদ ইন্ডাস্ট্রিজ পৃথক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে যেখানে মেরিয়ান, শোভেল, ওভারহেড ক্রেন প্রভৃতি নির্মিত হয়।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারখানা হল ব্রেথওয়েট যা অ্যাঙ্গাস ওয়ার্কস হিসাবে পরিচিত এবং চাঁপদানিতে প্রতিষ্ঠিত। এখানে রেলওয়ে ওয়াগনের অংশ, রাস্তার রোলার, ক্রেন প্রভৃতি উৎপাদিত হয়। কারখানাটি ভারত সরকার অধিগ্রহণ করে। রুগ্‌ণতার অজুহাতে এটি বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। বি আই এফ আর-এর মাধ্যমে এটি বর্তমানে রক্ষা পেয়েছে যদিও শ্রমিকসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। লাভজনক সূতাকল হিসাবে রিষড়ায় অবস্থিত জয়শ্রী টেক্সটাইল এবং চাঁপদানিতে জি আই এস কটন

মিলটির উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জয়শ্রীর উৎপাদিত দ্রব্যের বিদেশেও অর্ডার আছে।

আর একটি পুরাতন কারখানা জে কে স্টিল যা রিষড়ায় অবস্থিত এবং চটকলের বেলিং হোপন উৎপাদন করত। দুর্ভাগ্যের বিষয় পরিচালকদের ত্রুটির জন্য কারখানাটি গত নয় বৎসর ধরে বন্ধ হয়ে আছে। অন্য পরিচালক নিয়ে কারখানাটি চালু করাবার প্রচেষ্টা এখনও পর্যন্ত আইনের জটিলতায় বাস্তবায়িত হয়নি।

উত্তরপাড়ায় অবস্থিত সুইল ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাটি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান। এটি মূলত কাগজ উৎপাদনের মেশিন প্রস্তুত করে।

এই জেলার উত্তরাঞ্চলে যে সব সংগঠিত শিল্প আছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ডানলপ কারখানা। ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কারখানাটি রবারজাত দ্রব্য উৎপাদনে এশিয়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এদের উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে বড়-ছোট গাড়ির টায়ার এরোপ্লেনের টায়ার অন্যতম। বর্তমানে মালিকানার পরিবর্তন, পরিচালন ব্যবস্থার ত্রুটি, বাজার ইত্যাদি নানা কারণে এই প্রতিষ্ঠানটি আগের মতো গৌরবজনক অবস্থায় নেই। বর্তমানে এর শ্রমিকসংখ্যা ৫০০০-এর মতো।

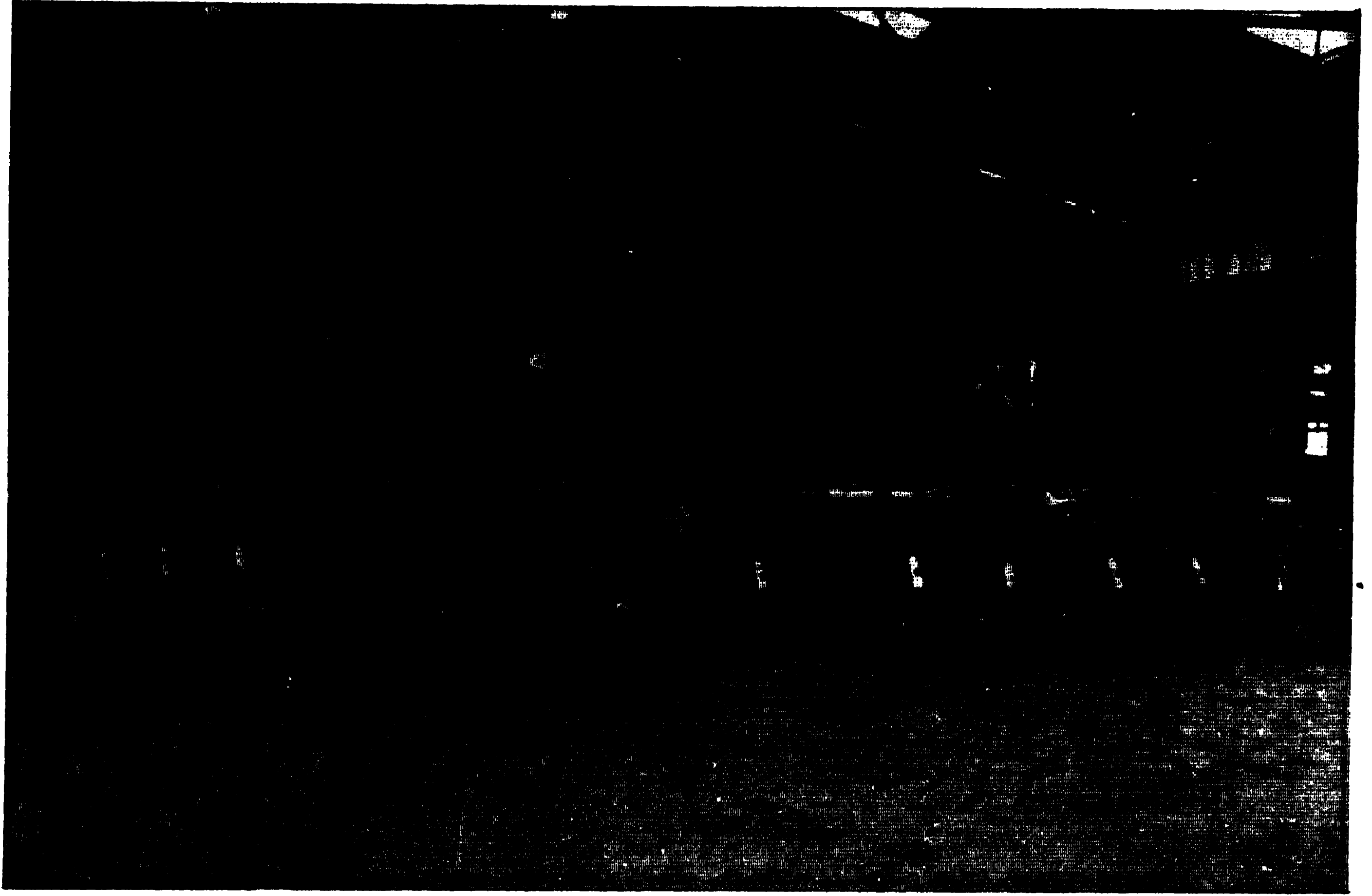
বিড়লাগোষ্ঠী পরিচালিত কেশোরাম রেয়ন কারখানাটি ৫০-এর দশকের শেষভাগে ত্রিবেণীর কাছে রঘুনাথপুরে স্থাপিত হয়। রেয়ন সুতাই এদের বিশেষ উৎপাদিত দ্রব্য। প্রায় ২৫০০ শ্রমিক এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত ত্রিবেণী টিস্যু কারখানাটি দেশ-বিদেশে সিগারেট কাগজ তৈরি করে। বর্তমানে ITC-এর পরিচালনাভার গ্রহণ করেছে। এই জেলায় আরও গুরুত্বপূর্ণ যে শিল্পগুলি আছে তার মধ্যে রিষড়ায় অবস্থিত অ্যালকালি কারখানাটি উল্লেখযোগ্য। ৪০-এর দশকে প্রতিষ্ঠিত এই কারখানাটি রং ইত্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে আরও আধুনিক হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি শ্রমিক সংখ্যাও কমছে।

পূর্বভারতের মধ্যে কাচের শিশি-বোতল যা ঔষধ প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে লাগে একমাত্র কারখানা হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গ্লাস রিষড়ায় অবস্থিত।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে যে সব সংগঠিত শিল্প এই জেলায় গড়ে উঠেছিল তার অনেকগুলিই সময়মতো পরিকল্পিতভাবে আধুনিকীকরণ না হওয়ায় বর্তমান সময়ে নানা সংকটের মধ্যে আছে। সর্বোপরি অর্থনীতির বিশ্বায়ন, উদার অর্থনীতি, আই এম এফ বিশ্বব্যাংক নির্দেশিত পথে ভারত সরকারের নয়া অর্থনীতি ও শিল্পনীতি এইসব শিল্পগুলির বিকাশে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা দেশে চার লক্ষাধিক কারখানা রুগ্ণ ও বন্ধ। হুগলি জেলাতেও এর প্রভাব পড়তে বাধ্য। তবে একটা কথা





মনে রাখা দরকার যে এই জেলায় যে সব কারখানা রুগ্‌ণ ও বন্ধ হয়ে আছে তা শ্রমিক মালিক বিরোধের জন্য নয়।

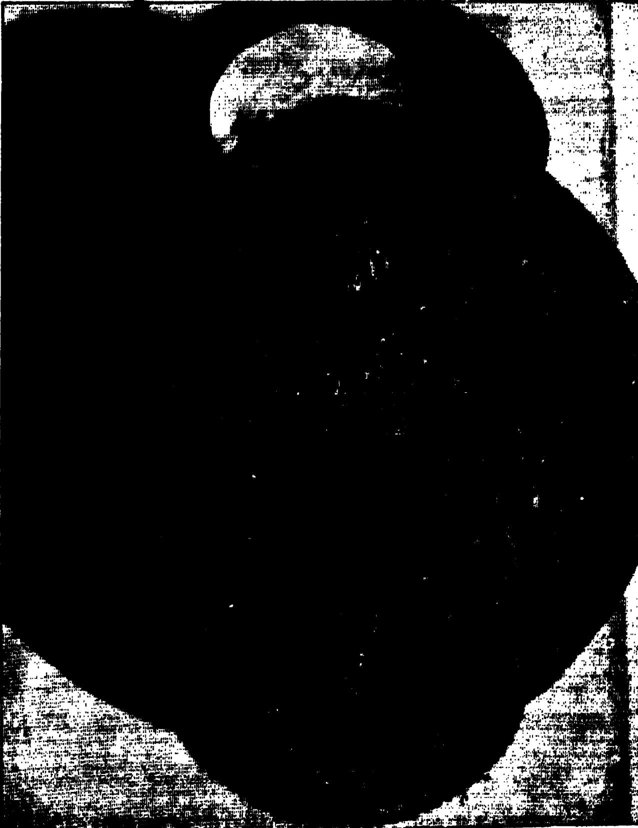
৬০-এর দশকে হুগলি জেলার মধ্যে দিয়ে জাতীয় সড়ক (দিল্লি রোড) তৈরি হয়ে যাওয়ায় এবং দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের কাজ শুরু হওয়ার মধ্য দিয়ে এই বিস্তীর্ণ এলাকায় বড়, মাঝারি ও ছোট শিল্প গড়ে উঠছে। গঙ্গাতীরে অবস্থিত প্রাচীন শিল্পকেন্দ্রটি দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে নতুন শিল্পকেন্দ্রে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই সময়কালে মাদার ডেয়ারি (যা কলিকাতা ও শহরতলীতে দুগ্ধ সরবরাহ করছে), ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স, বেঙ্গল বেভারেজ (কোকোকোলা), হিন্দুস্থান ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, লাইট মেটালসহ অনেক আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার যে শিল্পনীতি গ্রহণ করেছে তাতে হুগলি জেলার নতুন নতুন এলাকায় আরও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবার বাস্তব সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্য সরকার যে Food Park তৈরির পরিকল্পনা করেছেন তা বাস্তবায়িত হলে এই জেলার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটবে। তবে এই শিল্প সম্ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে জেলার সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন, সকল রাজনৈতিক দল এবং প্রশাসনের যুক্ত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

শিল্পের বিকাশ ও প্রসারে দায়িত্বশীল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একটি বড় ভূমিকা আছে। উদার অর্থনীতিবাদের নামে আজকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে যাকে deunionisation বলা যায়, তা কখনই শিল্পসম্পর্ককে উন্নত করতে পারে না। পাশাপাশি সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনকেও পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী বাস্তবসম্মত সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। হুগলি জেলার প্রধান ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সি আই টি ইউ, আই এন টি ইউ সি এবং এ আই টি ইউ সি। যদিও রাজনৈতিকভাবে জেলার শ্রমিকশ্রেণীর এক বড় অংশের মধ্যে (বিশেষ করে অবাঙালি হিন্দুস্থানী শ্রমিকদের মধ্যে ধনিকশ্রেণীর আদর্শগত প্রভাব আছে, তা সত্ত্বেও ২০-এর দশক থেকে হুগলি জেলার শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে কমিউনিস্টদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। আজও সেই ধারা অব্যাহত আছে।

বর্তমানে প্রাপ্ত এক হিসাবে জানা যায় যে এই জেলায় ১৯৯৩ সালে ৪০৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১,০২,৬৩৭ জন শ্রমিক কর্মরত আছেন। এই জেলায় শিল্প স্থাপনের যে বাস্তব সম্ভাবনা আছে তাকে কার্যে রূপায়িত করতে হলে পরিকাঠামো অর্থাৎ রাস্তাঘাট, টেলিফোন, নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ, বাসস্থান, শিক্ষা ইত্যাদির আরও সুবন্দোবস্ত করা প্রয়োজন।

অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক সংগ্রামে হুগলি জেলা

প্রশান্ত ঘোষ



অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক এবং অসংগঠিত শ্রমিক সমার্থক নয়। সংগঠিত ক্ষেত্রের অগণিত শ্রমিক সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের শরিক না হওয়ায় চিন্তা ও চেতনার মানের দিক থেকে তারা পশ্চাদবর্তী। অসংগঠিত ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত বিপুল সংখ্যক শ্রমিক সংগঠিত হয়ে পুঁজিবাদী শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে ধর্মঘটের মোক্ষম অস্ত্রটিও প্রয়োগ করতে পিছপা হয় না। অতীতে শ্রমশক্তির এই বিশাল জগৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা হত না পুঁজিবাদের অবশেষকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে।

হুগলি জেলার অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক আন্দোলন নানা বাঁক ও মোড় নিয়ে এগিয়ে চলেছে। নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রের মধ্যে আছে টালি ও ইটভাঁটাগুলিতে কর্মরত মরসুমি শ্রমিক-কর্মচারীরা। রুটি-কারখানা বা বেকারি শ্রমিক ও লাইনম্যান নৌ-শিল্প, তাঁত-শ্রমিক, চিকনশিল্প, মুটিয়া-মজদুর, ট্রাক ও ম্যাটাডোর ভ্যানগুলির ড্রাইভার ও ক্লিনার, বিড়ি শ্রমিক, দোকান কর্মচারী, প্রেস কর্মচারী, চালকল, তেলকল, গুলকল, চিঁড়াকল, করাতকল, লেদ ও মোটর গ্যারেজগুলিতে কর্মরত হাজার হাজার শ্রমিক। পুঁজিবাদী শ্রেণী- শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করা বা তাকে আঘাত করার ক্ষমতা এদের সকলের সমান না হলেও পুঁজিবাদের আশীর্বাদ বেকারির যুগে এদের শ্রমশক্তি এখন

অনেক সস্তা। সমগ্র জেলার অসংগঠিত ক্ষেত্র, ক্ষুদ্রশিল্প ও পেশার সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকসংখ্যা প্রায় চার লক্ষ।

এদের নামমাত্র বেতনে নিয়োগ করা যায় কোনও নিয়োগপত্র ছাড়াই। এদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড বা ই এস আই-এর সুযোগ নেই। নেই সংগঠিত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছুটির নিয়ম-কানুন, ভাতা, বোনাস, কাজের আট ঘণ্টা সময়, গ্র্যাচুইটি ও অন্য নানাবিধ শ্রমিক-কল্যাণমূলক কর্মসূচির সুযোগ-সুবিধা। এমন কি ন্যূনতম মজুরি হাজিরা খাতা ও বেতন রেজিস্ট্রার চালু করার কথা উত্থাপিত হলে অনেকেই 'রে রে' করে ওঠেন। কর্মরত অবস্থায় আহত, নিহত বা নিখোঁজ হলে ক্ষতিপূরণ পাবার কোনও আশা এদের পূর্বে ছিল না। বর্তমানে এই ঘটনার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। অতীত এখন অতীত। বর্তমানে এই ক্ষেত্রের শ্রমিকরা নিজেদের অধিকার রক্ষার সংকল্পে শক্ত চোয়ালে দাঁতে দাঁত চেপে লড়ে যাচ্ছে।

ইটভাঁটা ও টালিখোলা—ইটভাঁটা আমাদের জেলার প্রতিটি ব্লকেই আছে। টালিখোলা আছে বলাগড়ের শ্রীপুর ও গুপ্তিপাড়া, পোলবা থানার রাজহাট, হোসেনাবাদ, মাথলা-হিন্দমোটর প্রভৃতি এলাকায়। এরা যেহেতু মরসুমে, বিশেষত শীত ঋতুর প্রাক্কালে কাজ শুরু করে এবং বর্ষা আগমনের পূর্বে নিজ নিজ দেশে ফিরে যায়, তাই এদের সংগঠিত করতে স্থানীয় উৎসাহ অনেক কম। অনুরূপ ঘটনা ঘটছে হিমঘরগুলিতে (আমাদের জেলায় ১১০টি) সর্দারদের অধীন কর্মরত লোডার-আনলোডার বা মুটিয়া-মজুরদের ক্ষেত্রে। কারণ, এরাও তো মরসুম শ্রমিক।

আমাদের জেলায় ইটভাঁটা ও টালিখোলা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ও অন্যান্য দাবি-দাওয়ার ক্ষেত্রে যথাক্রমে ত্রিপাক্ষিক ও দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সমগ্র জেলা ভিত্তিতে কার্যকরী হয়েছে। পূর্বে এরা বর্ষারম্ভের পূর্বে নিজ রাজ্য বা জেলায় প্রত্যাবর্তনের সময় গাড়ি ভাড়াও পেত না। এখন এটা সম্ভব হয়েছে ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির অন্যতম শর্ত থাকায়।

ইদানীং ইটভাঁটা ও টালিখোলাগুলিতে মাটির যোগানে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। এক সময় ইটভাঁটা শালি-শুনা জমিতে গড়ে উঠত। উর্বরা জমিতে ইটভাঁটা থেকে লম্বা চিমনির কালো ধোঁয়া উঠত, বর্গাদার বা গরিব কৃষকরা জমিহারা হত। উৎপন্ন খাদ্যশস্যে টান পড়ত। এখন আইন হয়ে গেছে ওভাবে আর ইটভাঁটা করা যাবে না। সরকার এবং পঞ্চায়েতের অনুমোদন তো বাধ্যতামূলক। চাষযোগ্য জমিতে ইটভাঁটা করা নিষিদ্ধ। পতিত জমিও আর পূর্বের মতো নেই। মাটি বহু দূর থেকে আমদানি করতে হলে পরিবহনের পিছনে যে বিপুল ব্যয় হয়, তার ফলে ইটের মূল্যও বহুগুণ বৃদ্ধি ঘটে। বিক্রয়ে ভাঁটা পড়ে।

আমাদের জেলায় ভাগীরথী, বালিখাল, সরস্বতী, কুন্তী, বেহুলা প্রভৃতি নদীর ধার ঘেঁসে অনেক টালিখোলা ও ইটভাঁটা দুইই চলছে। কিন্তু নদীবক্ষে যে পলিমাটির জমি দেখা যায়, সেগুলোতে চাষবাস হচ্ছে। নদীতটে ভাঁটা করতে যেমন নতুন অনুমোদন মিলছে না, তেমনি পুরনো ভাঁটাগুলো তার প্রধান কাঁচামাল পলিমাটি সংগ্রহ করতে পারছে না। ফলত অদূর ভবিষ্যতে ইট ও টালিশিল্প বন্ধ হয়ে যাবে। শ্রমিকরা এক কথায় 'জবলেস' বা কর্মহীন হয়ে পড়বে। ইতিমধ্যেই তার ছাপ পড়তে শুরু করেছে এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পটির ওপর।

বেকারি শিল্প—জেলার মধ্যে আরামবাগ মহকুমাই হল বেকারি শিল্পে পথিকৃৎ। এই মহকুমার বাসিন্দা বেকারি শ্রমিকরা জেলার প্রত্যন্ত প্রান্তে তো বটেই, পশ্চিমবাংলার অপরাপর জেলায়, এমন কি রাজ্যের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। আরামবাগ মহকুমার বাসিন্দা অনেক মালিকও অন্যত্র রুটি কারখানা খুলছে। রুটি অর্থাৎ পাউরুটি তৈরি করার পিছনে যে কারিগরি কুশলতা আবশ্যক, তার জন্য আরামবাগ মহকুমার যোগ্যতা ও প্রাচীনতা সবার শীর্ষে। অবশ্য বর্তমানকালে চাঁপাডাঙ্গা, ব্যাণ্ডেল, হুগলি, মগরা, পাণ্ডুয়াতেও রুটি কারখানা ক্রমবর্ধমান।

রুটিশিল্পের প্রধান কাঁচামাল ময়দা ও ডালডার মূল্য কেন্দ্রীয় সরকার বারে বারে বৃদ্ধি করায় এই শিল্পের ওপর গভীর সঙ্কট নেমে এসেছে। অনেক কারখানার মালিক তার বেকারি বন্ধ করে দেবার কথা ভাবছে।

আবার এটাও সত্য যে, মালিকরাও সরকারের অজান্তে রুটির দাম বারংবার একতরফা সিদ্ধান্তের বৃদ্ধি করছে। এর পরও শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি বা কমিশন কোনওটারই বৃদ্ধি ঘটেনি। এই শিল্পে রাজ্যভিত্তিক ত্রিপাক্ষিক পরিবর্তে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয়, এবার সেই চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়নি, কারণও অদ্ভুত। ইউনিয়ন চুক্তির অন্য শেষতম ধারাটি সংযোজিত করতে চায় যে, মালিকগণ অতঃপর শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রচলিত সুযোগ-সুবিধা হরণ করবে না। এটার তো আইনেই উল্লেখ আছে। কিন্তু পাল্টা চাল দিল মালিকরা যে রুটির মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে রুটিকারখানার শ্রমিক-লাইনম্যানরা কখনও আন্দোলন করবে না। এটা কি সম্ভব লিখিতভাবে চুক্তিবদ্ধ হওয়া? নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের আকাশছোঁয়া উর্ধ্বগতির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর অংশ হিসাবে রুটি কারখানর শ্রমিকরা প্রতিবাদ জানাতে পারবে না। এ রকম আবদার করার সাহস মালিকদের এখন হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের মুক্ত বাজার অর্থনীতির খোয়াব দেখছে। ট্রেড ইউনিয়ন করার শ্রমিকশ্রেণীর সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্যমণ্ডিত অধিকার ওরা কেড়ে নিতে চাইছে। বেকারি মালিকরা এই শিল্পের শ্রমিকদের নিয়োগপত্র দিতে অনিচ্ছুক হওয়ার পিছনে একই মানোভাব কাজ করছে।

নৌ-শিল্প—বলাগড় থানার শ্রীপুর, তেঁতুলিয়া গ্রাম দুটি ভাগীরথী তটে অবস্থিত। এই গ্রাম দুটিতে বহু প্রাচীনকাল থেকেই নৌকা তৈরির সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের বসবাস। নৌকা তৈরির কৃৎকৌশল এই এলাকার শ্রমিক-মালিক উভয়েরই জানা। সপ্তদশ শতাব্দীতে গৌরবমণ্ডিত আদি সপ্তগ্রাম বন্দরনগরীর পতনের পর ওই এলাকায় বসবাসকারী সোনা-রুপার করিগর, নৌকা তৈরির সঙ্গে যুক্ত মালিক ও শ্রমিকরা পাণ্ডুয়া (বা 'প্রদ্যুম্নগর'), বলাগড় এলাকার নদীতটে বসবাস শুরু করে। প্রদেশের সীমানা ছাড়িয়ে এদের অনেকে ওড়িশার সমুদ্রোপকূলে বাসস্থান বেছে নেয়।

সমগ্র এলাকায় এমন ৬৫ ঘর নৌ-শ্রমিকের বাস। এদের একটা বড় অংশ (২৭ জন) পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষুদ্র ও



কুটিরশিল্প দফতরের অধীন 'খাদি বোর্ড' থেকে মাথাপিছু ২৭ হাজার টাকা অনুদান পেয়ে মালিক বনে গেছে।

নৌ-শিল্পের শ্রমিকদের অবশ্য কারোরই কোনও মালিকের কাছ হতে নিয়োগপত্র নেই। বর্ধিত মজুরি আছে, আছে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার লিখিত স্বীকৃতি।

উপরোক্ত তিনটি শিল্পেই নিযুক্ত আছে প্রচুর শিশুশ্রমিক। ইটভাঁটায় এরা প্রায় বেগার শ্রমিক। রুটি কারখানায় স্বল্প বেতনের 'ছোকরা' আর নৌ-শিল্পের ক্ষেত্রে হেডমিস্ত্রির জোগাড়ের একই অবস্থা।

তাঁতশিল্প—জেলায় অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্প তাঁত। ধনিয়াখালি, জাঙ্গিপাড়া, বেগমপুর এলাকার তাঁতশিল্পীদের কাজের উৎকর্ষতার খ্যাতি আছে। এ ছাড়াও জেলার অন্যান্য জায়গায় আছে যেমন গুপ্তিপাড়া, সোমড়া, কালিয়াগড়, জিরাট (সবই বলাগড় থানা), হরিপাল থানার কৈকেলি-ইছাপুর, খানাকুল থানার দাসপুর, পাণ্ডুয়া থানার সরাই, আরামবাগের গৌরহাটি, বড়ডোঙ্গল, গোঘাট, পুড়শুড়া, তারকেশ্বর থানার রামনগর, সিঙ্গুর থানার মীর্জাপুর-বাঁকিপুর ছাড়াও শহর এলাকার মধ্যে শ্রীরামপুরের স্থান সবার উর্ধ্বে। শ্রীরামপুর শহরে একাধিক তাঁত সমবায় আছে।

হুগলি জেলার তন্তুবায় সমবায় সমিতিগুলির সংখ্যা চুরাশি। এর প্রায় অর্ধেক যেগুলির প্রতিষ্ঠা সত্তর দশকে অধিকাংশই সাইনবোর্ড সর্বস্ব বা ভুয়া অথবা মহাজনের ফ্যামিলি কো-অপারেটিভ। বেগমপুরে এ রকম সমবায়ের সন্ধান মিলবে। ওই গ্রামে কয়েকজন মহাজন তাঁতশিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে পাওয়ারলুম উৎপন্ন বস্ত্র চালান করার ব্যবসায় দীর্ঘকাল লিপ্ত।

বামফ্রন্ট সরকার আশির দশকের শুরুতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই যে কতকগুলি ব্লকে ব্লক প্রাইমারি কো-অপারেটিভ সোসাইটি তৈরি হয়, সেগুলির অধিকাংশই সক্রিয়। এর পরই আসে তাঁতবিহীন তাঁতশ্রমিকদের সমবায় গঠন, শেড নির্মাণ, উন্নত মানের যন্ত্রপাতি প্রদান, উৎপন্ন বস্ত্রের বাজার সন্ধানের প্রচেষ্টা, তফসিল জাতিভুক্ত তন্তুবায়ীদের জন্য পৃথক সমবায় গঠন, পেনশন প্রথার প্রবর্তন, চশমা দেওয়া, তাঁতের ঘর নির্মাণ, বিদ্যুতের চার্জ ২টি পর্যন্ত তাঁতের ক্ষেত্রে ডোমেস্টিক চার্জ চালু। তাঁতপিছু রেশন কার্ডে কেরোসিন তেল সরবরাহ প্রভৃতি প্রকল্প চালু হয়।

উৎকৃষ্ট মানের বস্ত্রাদি হুগলি জেলার প্রত্যন্ত গ্রামেও পাওয়া যায়। আরামবাগ থানার মুথাডাঙ্গা, গৌরহাটি, বড়ডোঙ্গল প্রভৃতি গ্রামে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। তাঁতসিল্ক ও

জামদানী শাড়ি তৈরির জন্য সোমড়া, কালিয়াগড়, জিরাট যেমন সুপ্রসিদ্ধ, তেমনি গোঘাট থানার কয়াপাট-বদনগঞ্জের তাঁতিদের খ্যাতি চেলি তৈরির কাজে একচেটিয়া আধিপত্যের জন্য।

তাঁতের শাড়ির নক্‌শা আইনানুযায়ী সংরক্ষিত থাকলেও ইদানীং পাওয়ারলুমেও নকল তাঁতের শাড়ি তৈরি হতে থাকায় বেগমপুরের তাঁতিদের মধ্যে দুবছর পূর্বে বিক্ষোভ চরমে ওঠে। বস্তুত তাঁত-শ্রমিকরা নানা বাস্তব এবং অনতিক্রম্য কারণে এখনও অধিকাংশই দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠতে পারেনি।

কেন্দ্রীয় সরকার আই আর ডি পি অনুসারে তাঁতশিল্পীদের জন্য কোনও কাজের ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালতি ব্যাংকগুলি তো বটেই, সমবায় ব্যাংকগুলি পর্যন্ত 'সার্বিক গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি' অনুযায়ী তাঁতশিল্পকে সাহায্য করতে বিশেষ অগ্রসর হয়নি। সমবায়ভিত্তিক তাঁতশিল্প কিছুটা সরকারি সহযোগিতা পাচ্ছে কিন্তু সমবায়বহির্ভূত (প্রত্যেক্ষ এবং পরোক্ষভাবে) তাঁতশিল্পীরা 'ওয়েলফেয়ার স্কিম'গুলোর কোনও সুযোগ পাচ্ছে না। কারণ, আই আর ডি পি-র জন্য গ্রামভিত্তিক যে তালিকা তৈরির নির্দেশিকা কেন্দ্রীয় সরকারের রয়েছে, তাতে গ্রামীণ কারিগরি হিসাবে পৃথকভাবে তাঁতশিল্পকে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

আমাদের জেলায় অবশ্য বেশ কয়েকটি 'হ্যান্ডলুম ডেভেলপ-মেন্ট সেন্টার' এবং পাশাপাশি 'কোয়ালিটি ডাইং ইউনিট' কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী চালু হয়েছে বা হবে। প্রথমদিকে এই সুযোগ পায় ধনিয়াখালি, জাঙ্গিপাড়া ও চণ্ডীতলার কয়েকটি সমবায়। তখন শর্ত ছিল সংশ্লিষ্ট সমবায়ে ন্যূনতম ২৫০ তাঁত বা তাঁতশিল্পী থাকতে পারে। পরবর্তীকালে এই সীমারেখা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হস্তক্ষেপে আরও নিচে নেমে এলে আরও কয়েকটি সমবায় সমিতি 'এইচ ডি সি' এবং 'কোয়ালিটি ডাইং ইউনিট' গড়ার সুযোগ পেয়েছে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সারা জেলায় একটি তাঁতশিল্পী অধ্যুষিত গ্রামকে 'হ্যান্ডলুম ভিলেজ' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ওই গ্রামটি সার্বিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পৃথক বরাদ্দ লাভ করবে। আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের সদস্য অনিল বসুর সুপারিশক্রমে এমন একটি গ্রাম হল খানাকুল থানার দাসপুর গ্রাম। এর পরই আসে গুপ্তিপাড়ার নাম।

কেন্দ্রীয় সরকার এসব কর্মসূচি ঘোষণা করেছে, কিন্তু তা তখনই সাফল্যলাভ করবে, যদি সুতোর মূল্যবৃদ্ধি রুখতে পারা যায়। সুতো বাইরের দেশে রপ্তানি হয়ে যাবে, অভ্যন্তরীণ চাহিদার ওপর কোনও গুরুত্ব আরোপ না করেই, আর দেশের তাঁতশিল্পীরা সুতোর অভাবে, বাজারের অভাবে পড়ে পড়ে মার খাবে—এটাই এখন নিয়ম হয়ে গেছে।

চিকনশিল্প—অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের একটা বড় অংশ জুড়ে আপন অস্তিত্ব এখনও রক্ষা করে চলেছে হুগলি জেলার বাবনান চিকনশিল্প। চিকনের কাজ করে এক-একটা গোটা পরিবার-—স্ত্রী-পুরুষ-শিশু-কিশোরনির্বিশেষে মাথাপিছু রোজগার মাসিক মাত্র ত্রিশ টাকা থেকে চল্লিশ টাকা। মহাজন-ফড়িয়া-পাইকাররা শোষণ করছে শ্রমিকদের একেবারে যেন আদিম পদ্ধতিতে। প্রায় বেগার প্রথার বা শিশুশ্রমের ফসল তুলে তা রপ্তানি হয় জেলা-রাজ্য অতিক্রম করে ভিন্ রাজ্যে বিশেষত উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম ভারতে, আবার সেখান থেকে আরব কান্ট্রিতে, জাপানে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, ইউরোপ-আমেরিকায়।

সমগ্র দাসপুর থানা এলাকা, হরিপাল, সিঙ্গুর ও ধনিয়াখালির একাধিক অঞ্চলে 'বাবনান চিকনশিল্প' বিস্তৃত হয়েছে। প্রায় চল্লিশ হাজার শ্রমিক এখনই এই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। 'ডোকরা' কর্মসূচি রূপায়িত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে দাসপুর থানা এলাকায় রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দপ্তর।

ইমিটেশন গহনা—বলাগড় থানার শেষ প্রান্তে বাঁধাগাছি গ্রামে ইমিটেশন গহনার কাজকর্মেও ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দপ্তর দুস্থ মহিলা শিল্পীদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে। এরা এখনও সমগ্র জেলায় আক্ষরিক অর্থেই অসংগঠিত।

চালকল—জেলার মধ্যে আরামবাগ মহকুমা আরামবাগ ও গোঘাট থানা এলাকায় রাইস মিল বা চালকলগুলো প্রতিষ্ঠিত। চালকল শ্রমিকরাও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক। বেশকিছুটা সিজননির্ভর। মহিলা শ্রমিকরা পুরুষদের তুলনায় কম মজুরি পায়। স্থায়ী শ্রমিক অধিকাংশই মেলে মেসিনরুমের, বাকিরা ছুটো। আরামবাগ, গোঘাট ছাড়াও ধনিয়াখালি, মগরা, পোলবা ও পাণ্ডুয়া থানায় দু-একটি রাইসমিল আছে। পাণ্ডুয়া থানার দুটি মিল বন্ধ। শ্রমিকরা বেকার। দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে আরামবাগ মহকুমার শ্রমিকদের কিছু মজুরি বৃদ্ধি ঘটেছে। এর প্রভাব জেলার অন্যত্র প্রতিফলিত হলেও এই শিল্পে খুব শীঘ্রই আধুনিকীকরণ হচ্ছে। ধানসিদ্ধ, ভাপা, শুকানো, ঝাড়াই—সব প্রক্রিয়াই আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে সমাধান হবে—শ্রমিকসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাবে।

বিড়ি—আরামবাগ মহকুমা ব্যতীত জেলার মধ্যে সিঙ্গুর, কোদালিয়া, পাণ্ডুয়া, মহানাদ, জনাই প্রভৃতি এলাকায় কয়েক হাজার বিড়ি শ্রমিক বাড়িতে বিড়ি বেঁধে দিন গুজরান করে। পাতা, মসলা সরবরাহ করে মহাজনরা। এখন কমন শেডের তলায় একত্রে বসে কাজ করার সুযোগ প্রায় চালু নেই বললেই চলে। সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি অত্যন্ত সীমিত স্থানে বা প্রায় চালু নেই বললেই চলে। পুরুষ শ্রমিকরা যা মজুরী পায় মহিলারা পায় প্রায় তার অর্ধেক। পাণ্ডুয়া থানায় বিশেষত পাণ্ডুয়া , কলবাজার, আবাদপাড়া, নিয়ালনপাড়া প্রভৃতি এলকায় অধিকাংশ বিড়ি শ্রমিকই মুসলিম মহিলা। মহানাদ এলাকায় আছে সাবেক পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তু মহিলা।

ইদানীং 'চালানি বিড়ি' বিড়ি মার্কেট দখল করে ফেলেছে। বিড়ি তৈরি হয়ে আসছে লেবেল ছাড়া জেলার বাইরে থেকে। স্থানীয় মালিকরা তার ওপর নিজেদের লেবেল মেরে দিচ্ছে। এরফলে কর্মহীন বিড়ি শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান

পশ্চিম বাংলা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মসূচি অনুযায়ী বিড়ি শ্রমিকদের 'পরিচিতিপত্র' দেবার ঢালাও ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু প্রশাসনিক ঢিলেমি, পরিকাঠামোর অভাবের জন্য ছাড়াও সরকার-আমলা সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মীর অনাগ্রহের ফলে একদিকে যেমন 'পরিচিতিপত্র' বণ্টনে বিলম্ব ও হয়রানি হতে হচ্ছে, অন্যদিকে বিভিন্ন 'ওয়েল ফেয়ার স্কিম থেকেও বঞ্চিত হতে হচ্ছে শ্রমিকদের।



তন্তুবায় সমবায় সমিতি // মশাট

এতদ্‌সত্ত্বেও ইতিবাচক কিছু কাজ নিশ্চয়ই হয়েছে, তবে তা সেখানেই সাফল্যলাভ করেছে। যেখানে বিড়ি শ্রমিকরা ইউনিয়নগতভাবে সঙ্ঘবদ্ধ।

মুটিয়া মজুর—মুটিয়া-মজুররা সবচেয়ে বেশি কাজের সুযোগ পায় জেলার একশো দশটি ব্যক্তিমালিকানা ও আটটি সমবায় হিমঘরে। প্রতিটি হিমঘরে লোডিংয়ের সময় দেড়-দুশো শ্রমিক বা তারও বেশি যেমন কাজ পায়, আনলোডিং-এর সময় পঁচিশ-ত্রিশের বেশি প্রয়োজন হয় না। ইদানীং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা থেকেই বেশি শ্রমিক আসে। আমাদের জেলার বাসিন্দা শ্রমিকরা এই কাজে বেশি দক্ষ নয়। মুর্শিদাবাদ জেলা থেকেও মজদুররা আসে। সর্দার প্রথা ছাড়া যেন এই শিল্পের গতি নেই। তবে ইদানীং সর্দারদের বজ্রমুষ্টি শিথিল হতে শুরু করেছে শ্রমিক-আন্দোলনের ফলে। শ্রমিকরা দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির সুফল পাচ্ছে। দৈনিক মজুরি হার বেড়েছে, বোনাস পাচ্ছে সরাসরি। সর্দাররা 'ভাগা' আর 'কমিশন' দুটোই এখনও কব্জায় রেখেছে। হিমঘর মালিকরা জানে মুটিয়া না এলে হিমঘর অচল হয়ে পড়বে। অথচ তাদের স্বীকৃতি দেবে না। এদের বাসস্থানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা এখনও মালিকদের প্রবল অনিচ্ছা। তবে দুর্ঘটনায় আহত বা নিহত হলে অতীতে যেমন কোনও ক্ষতিপূরণ মিলত না, শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠনের বৃদ্ধির ফলে ক্ষতিপূরণের দায় মালিকদের কোথাও পুরাপুরি, কোথাও বা অংশত মেনে নিতে হচ্ছে। শ্রম কমিশনার দপ্তরের এ ব্যাপারে আরও সক্রিয়, আরও উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

এর পরেই আসে গঞ্জের মুটিয়াদের প্রশ্ন। বস্তা মজদুর, পরিবহন মজদুর, আলু বাছনদার, বালি (নদী) যাদের মজদুর তারাও এই সংগঠনের আওতায় পড়ে। বিভিন্ন এলাকায় ওই ধরনের মুটিয়াদের অর্থনৈতিক দাবি স্বীকৃত হয়েছে মূলত স্থানীয় ভিত্তিতে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ফলে। আলু বাছনদাররা ইদানীং কোথাও কোথাও কর্মচ্যুত হয়ে পড়ছে আলু স্থানীরভাবে বাছাই না করে সিঙ্গুর থানার রতনপুর এলাকার বিশাল মস্ত বাজার এলাকায়, বৈদ্যবাটি, তারকেশ্বর রোডের দুপার্শ্বে অবস্থিত শেডগুলিতে। ইউনিয়ন আলুবাছনদারদের মধ্যে কাজ না করে মজুরি নেওয়া হবে না এই আওয়াজ তুলেছে। যেহেতু এমন একটা প্রবণতা ওদের মধ্যে মাঝে মাঝেই মাথাচাড়া দেয়। আলু বাছনদাররা তাদের অভাব-অভিযোগ বিভিন্ন দাবিদাওয়ার কথা তুলছে ন্যায়সঙ্গতভাবে স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতিগুলির কাছে।

সংস্থা ও দোকান কর্মচারী—মূলত দোকান কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া নিয়ে জেলার মধ্যে চুঁচুড়া, মগরা, পাণ্ডুয়া প্রভৃতি এলাকায় আন্দোলন এবং দ্বি-পাক্ষিক ও ত্রি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়ে আসছে। দোকান কর্মচারী ছাড়াও নানা প্রকার সংস্থার শ্রমিক-কর্মচারীরা এই সমিতির পতাকাতলায় দাঁড়িয়ে লড়াইসংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। পেট্রোল পাম্প, গ্যাস সরবরাহ, নার্সিংহোম, ডিসপেনসারি, ওষুধের দোকান, মিষ্টির দোকান, রেস্টুরেন্ট হোটেল প্রভৃতি সংস্থার কর্মচারীরা অবহেলিত। দোকান কর্মচারীদের নিয়োগপত্র দেওয়ার ব্যাপারে হাই কোর্টের কোনও নিষেধাজ্ঞা না থাকা সত্ত্বেও তা কার্যকর করা যাচ্ছে না। এমন কি হাজিরা খাতা ও বেতন রেজিস্টার চালু রাখার ব্যাপারের মালিকদের অনাগ্রহ। বেতনের কোনও মাপকাঠি নেই। পাণ্ডুয়ায় ত্রিপাক্ষিক চুক্তি (পরপর দুবার) এ ব্যাপারে অন্যদের কাছে এক মডেল হতে পারে। পূর্বে দোকান কর্মচারীরা যেভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না পেয়েই ছাঁটাই হয়ে যেত, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার ফলে তার গতি কিছুটা শ্লথ হয়েছে। দোকান কর্মচারীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আইনে আট ঘণ্টা শ্রমদিবসের কথা বলা থাকলেও কার্যত তা অনিবার্য করণেই অকার্যকর থেকে গেছে। তবে পাণ্ডুয়া, চুঁচুড়া, মগরা প্রভৃতি কয়েকটি থানায় গঞ্জের দোকান কর্মচারীদের আইনানুযায়ী বাৎসরিক ছুটি, ফেস্টিভাল লিভ, মে দিবসের ছুটি ইত্যাদি সবেতন হয়েছে।

মুদিখানা, বস্ত্রবিপণি, স্টেশনারি ছাড়াও জরুরি এবং অত্যাবশ্যক যে সকল সংস্থা ও দোকান আছে এবং কর্মীরা ইউনিয়নে সঙ্ঘবদ্ধ যেমন—গ্যাস, খাবার ও মিষ্টির দোকান, নার্সিংহোম, ফার্মেসি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা নিজেদের অর্থনৈতিক দাবি নিয়ে লাগাতর আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা যায় না এই চেতনাবোধ ইদানীং নানা ঘটনার নানান ঘাত-প্রতিঘাতের জন্য কর্মীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। তাছাড়া দাবি-দাওয়ার বহর যাতে প্রতিষ্ঠানটির বহনক্ষমতার মধ্যে থাকে, সে ব্যাপারে কর্মীরা এখন পূর্বের তুলনায় অনেক সচেতন।

ট্রাক ড্রাইভার—হুগলি জেলার ট্রাক ও ম্যাটাডোর ভ্যানগুলির ড্রাইভার এবং ক্লিনারদের জেলাব্যাপী কেন্দ্রীয় সংগঠন বলতে সি আই টি ইউ অনুমোদিত 'জনপথ পরিবহন মজদুর ইউনিয়ন', মালিকদের জেলাব্যাপী একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন শেওড়াফুলিতে থাকলেও ওদের আরও কয়েকটি 'অ্যাসোসিয়েশন' আছে, যেগুলিকে ওরা জেলা সংগঠন বলে চালিয়ে দেয়।

ট্রাক ড্রাইভার ও তাদের সাহায্যকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য ১৯৬১ সালে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মোটর ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স অ্যাক্ট' প্রণীত হয় এবং '৬৬ সালে তার 'রুলস্'ও তৈরি হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত মালিকরা যেমন তার একটি চিঠিও কার্যকর করেনি, তেমনি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও এটি রূপায়িত করা নিয়ে আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ পায়নি। এটি কার্যকরী হলে প্রত্যেক ট্রাক ড্রাইভার মালিকদের কাছ হতে আবশ্যিকভবে 'নিয়োগপত্র' পাবে।

ইদানীং আরামবাগ মহকুমার ট্রাক ড্রাইভাররা সংগঠনের জোরে মালিকদের সঙ্গে একটা উন্নত মানের দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। এটি একটি নিঃসন্দেহে ভাল প্রয়াস। অনেক সময়ে ট্রাক ড্রাইভার পথ দুর্ঘটনায় নিহত বা গুরুতর আহত হচ্ছে। নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এরূপ অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের ভাগ্যে ক্ষতিপূরণও জোটে না। তবে আন্দোলন ও সংগঠনের জোরে এদের মজুরিবৃদ্ধি ঘটেছে। বাৎসরিক বোনাস আদায় হচ্ছে।

ঠিকাশ্রমিক—ঠিকাপ্রথায় সংগঠিত ক্ষেত্রে বহু শ্রমিক কাজ করে। যেমন হিন্দমোটর, ডানলপ প্রভৃতি কারখানায়। এদের বাদ দিয়ে অসংগঠিত ক্ষেত্র ও ক্ষুদ্রশিল্প এবং এই পেশায় বহু ঠিকাশ্রমিক কাজ করে চুক্তির ভিত্তিতে। এদের রক্ষাকবচের জন্য শ্রমআইনে কোনও ধারা নেই। হুগলি জেলায় এদের সংখ্যা সঠিক কত বলা সম্ভব নয়। যেমন বড় বড় সেতু, রাস্তা, আবাসন প্রভৃতি নির্মাণের কাজে যে সমস্ত শ্রমিক ঠিকাদারের অধীনে কাজ করেন এমন নির্মাণ শ্রমিকরা, সাব-রেজিস্ট্রি অফিসগুলিতে যে সমস্ত শিক্ষিত তরুণ-তরুণী চুক্তির ভিত্তিতে দলিল কপির কাজ করেন এমন কপি রাইটাররা, রেললাইনে গ্যাংম্যান এবং রেল কন্ট্রাক্টরদের অধীন এমন ঠিকাশ্রমিকরা অসংগঠিত ক্ষেত্রের অসংগঠিত শ্রমিক হিসাবেই পরিচিত। বিদ্যুৎ পর্ষদের অধীন ঠিকাদারদের অধীনে বিদ্যুতের পোস্ট ও লাইন টানার কাজে নিযুক্ত শ্রমিকরাও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের দলেই ভিড় করে।

পরিষেবামূলক ক্ষেত্র—অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক ইউনিয়ন-গুলির মধ্যে কয়েকটি আছে পরিষেবামূলক বা সার্ভিস সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত—যেমন, রুটি কারখানা, কৃষি সমবায়, কপিরাইটার, রেশন গোডাউন, গ্যাস, পেট্রোল পাম্প ও মিষ্টির দোকান ইত্যাদি। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সব ক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলন যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হয়। আন্দোনের কর্মসূচি রচনার ক্ষেত্রেও শ্রমিক-মালিক পক্ষ ছাড়াও তৃতীয় পক্ষ ক্রেতাসাধারণ বা জনসাধারণের জরুরি প্রয়োজনের কথা সচেতনভাবে বিবেচনায় রাখতে হয়। নচেৎ, সাধারণ মানুষ আন্দোলনের বিরোধিতা করে বসবে।

দাবিসনদ রচনার ক্ষেত্রেও ওই সব ক্ষুদ্রশিল্প ও পেশার আর্থিক বোঝার বহনক্ষমতা বা 'পেইং ক্যাপসিটি'র বিষয়টি মাথায় রাখতে হয়। আন্দোলন-সংগ্রাম যা এক কথায় 'শ্রেণিসংগ্রাম'। পরিষেবামূলক ক্ষেত্রে তা উর্বর হলেও শুরু করার পূর্বে যদি অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে হুইসেল বাজিয়ে অথবা শ্রেণিসংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে লেনিনীয় চিন্তাধারার অপব্যাখ্যা করে বাঁধা গৎ ধরে চলা লাগাতর সংগ্রামের রশি যদি টেনে ধরা না যায়, তবে তা থেকে যতটা ফসল আমরা আখেরে লাভ করব, হয়তো ঘুরপথে ততটাই বিযুক্ত হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে ইউনিয়ন নেতৃত্বের অবশ্যই সতর্ক ও সচেতন থাকাটাই একান্ত জরুরি তাই অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে গড়ে তোলার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

অন্যান্য—পরিষেবামূলক ক্ষেত্র ছাড়াও আছে স্বনিযুক্ত কর্মীদের সংগঠন যেমন রিকশ, ভ্যানচালক, রেলওয়ে হকার্স, স্ট্রিট হকার্স ইত্যাদি। এদের 'প্রিন্সিপ্যাল এমপ্লয়ার' না থাকলেও টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হয়। অথচ যারা কোনও উদ্বৃত্তমূল্য সৃষ্টি করে না, সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে এরাও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

সামাজিক সুরক্ষা ও সমাজকল্যাণে হুগলি জেলা

নির্মলকুমার দত্ত



যে কোনও গণতান্ত্রিক সরকারের প্রথম কর্মসূচিই জনগণকে দেয় সামাজিক সুরক্ষা ও সমাজকল্যাণ। সরকারের সমস্ত প্রকল্পই এই দায়বদ্ধতা স্বীকার করে। সমাজকল্যাণই জনগণের সেবা তা যে পথেই হোক। সরকারের সব বিভাগই এই উদ্দেশ্য সাধনে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে তা অধিক উৎপাদনই হোক বা রাস্তা সংস্কারই হোক উদ্দেশ্য একটাই, সমাজকল্যাণ, সমাজ সেবা। এই সব প্রকল্প ছাড়াও জনগণকে সামাজিক সুরক্ষা দিতে অতিরিক্ত কতকগুলি জনকল্যাণভিত্তিক প্রকল্প নেওয়া হয় যা দুর্বল জনগণের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিন্ত করে।

গত কয় বছরে রাশিয়ায় সামাজিক সুরক্ষার অবক্ষয় বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক সুরক্ষাগুলির সঙ্কোচনের প্রয়াস উভয় দেশেই এক চলৎশক্তিহীন অবস্থার জন্ম দিয়েছে। রাশিয়ার এই অবক্ষয় নব প্রজন্মের ইঙ্গিত তো ইতিমধ্যেই দিতে শুরু করেছে। তাই সামাজিক সুরক্ষাকে অবজ্ঞা করে কোনও সরকারই জনমুখী কর্মসূচি নিতে পারে না।

আমাদের সরকারের সুরক্ষা প্রকল্পগুলি আজ সমাজে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে এবং দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে হুগলি জেলাও এই প্রকল্পগুলি রূপায়ণে সার্থক ভূমিকা পালন করে দুঃস্থ অবহেলিত জনগণের সেবা করে যাচ্ছে।

সমাজের সব স্তরের দুঃস্থজনের জন্য যে প্রকল্পগুলি এখানে রূপায়িত হচ্ছে, সর্বসাধারণকে জানাতেই তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপিত হল।

বৃদ্ধ/বৃদ্ধাদের জন্য—

(ক) **বার্ধক্যভাতা**—মাসিক ১০০ টাকা আয়বিশিষ্ট ও ৬০বছর বা উর্ধ্ব বয়স্কা ব্যক্তিবর্গ মাসিক ১০০ টাকা হিসাবে বর্তমানে ২৪৭৮ জন ব্যক্তি এই ভাতা পান। দুঃস্থ প্রতিবন্ধীরা ৫৫ বছর বয়স হলেই এই ভাতা পেতে পারেন।

(খ) **ডে কেয়ার সেন্টার**—বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে বৃদ্ধ/বৃদ্ধারা বড়ই একা। এদের সামাজিক, মানসিক ও মনোরঞ্জনের জন্য এই কেন্দ্রগুলিতে বৈকালিক নানা আলোচনা ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। আশপাশের বৃদ্ধ/বৃদ্ধারা সেখানে সমবেত হয়ে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এই কেন্দ্রের আনুষঙ্গিক খরচ বাদেও অংশগ্রহণকারীদের দৈনিক বৈকালিক টিফিনের ব্যবস্থা আছে। এই জেলায় হুগলি অপরাজিতা ও কল্যাণভারতী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মধ্যে ২টি কেন্দ্র যথাক্রমে চুঁচুড়া ও কামারকুণ্ডুতে চলছে। আরও ৩টি কেন্দ্র খোলার সুপারিশ সরকারের কাছে করা হয়েছে।

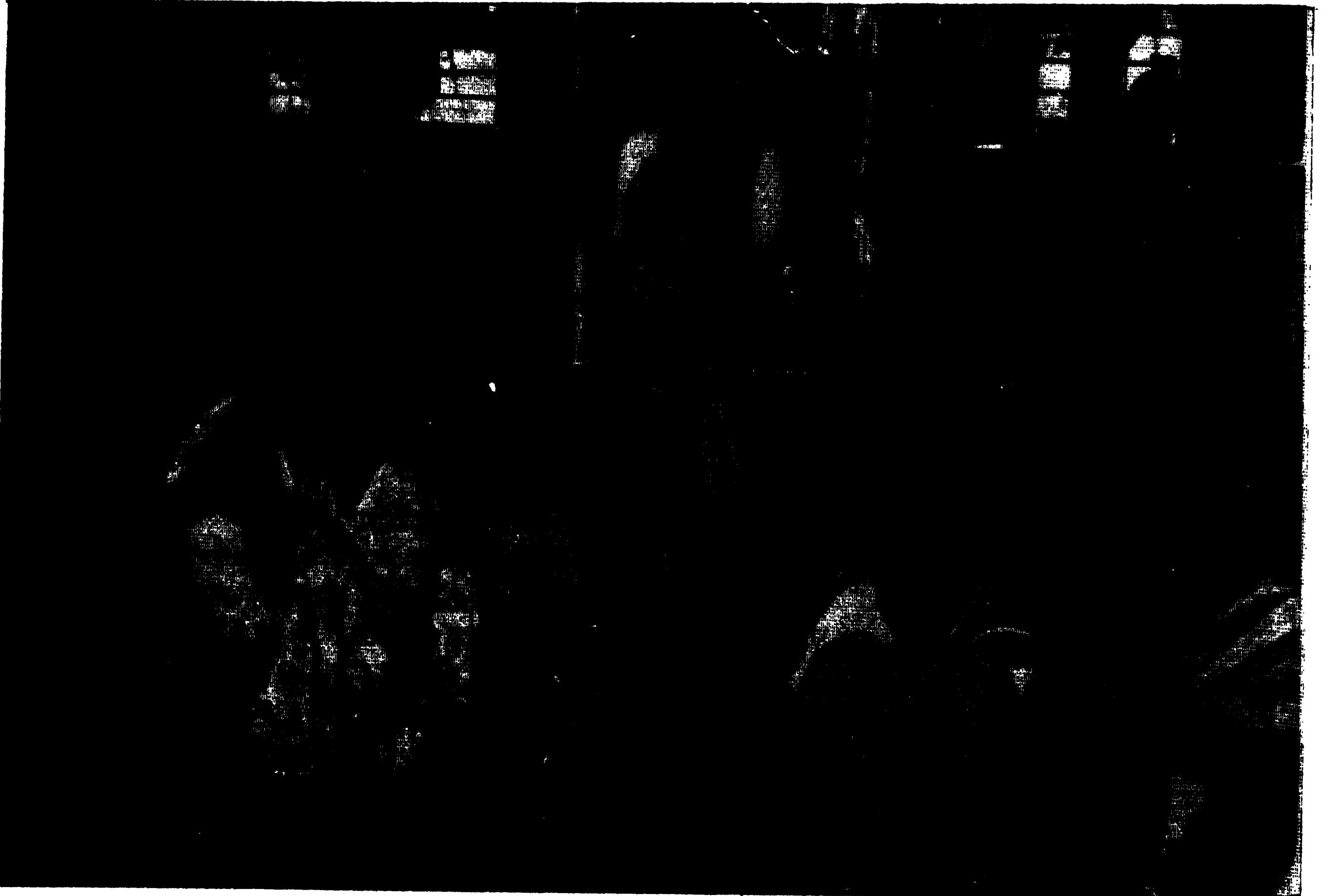
(গ) **মোবাইল মেডিকেয়ার ইউনিট**—বৃদ্ধ/বৃদ্ধাদের গৃহপ্রাঙ্গণেই স্বাস্থ্য পরীক্ষার, পরামর্শের ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। একজন বৃদ্ধের পক্ষে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসার জন্য উপস্থিত হওয়ার যে প্রতিবন্ধকতা তা থেকে তাদের মুক্তি ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থাই এই ইউনিটগুলির উদ্দেশ্য। এই জেলায় অনুরূপ দুইটি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে।

(ঘ) **বৃদ্ধাশ্রম**—সহায়-সম্বলহীন বৃদ্ধদের বসবাস রক্ষণা-বেক্ষণের উদ্দেশ্যে এই আবাসগুলি স্থাপন করা হয়। সেখানে তাদের এক আনন্দঘন পরিবেশে থাকা খাওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। কল্যাণভারতীর অধীন সরকারি অনুদানে একটি বৃদ্ধাশ্রম বর্তমানে নালিকুলে চলছে।

নারী কল্যাণ

সমাজের দুর্বল নারীদের রক্ষণাবেক্ষণ ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন উদ্দেশ্যে নানা প্রকল্প এই জেলাতেও চলছে। বিশেষ প্রকল্পগুলি ঃ—

(ক) **বৈধব্যভাতা**—দুঃস্থ বিধবা, মাসিক আয় ১০০ টাকা এই ভাতা পান। এই জেলায় বর্তমানে ৪৬৪ জন এই ভাতা পাচ্ছেন।



(খ) নারী আবাস—নারীদের সুরক্ষার উদ্দেশ্যে এই আবাসে ১৮ বছর পর্যন্ত মেয়েদের রাখা হয়। এখানে পড়াশোনা ছাড়াও নানারকম অর্থকরী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এখান থেকে মেয়েদের নানা প্রতিষ্ঠানে চাকরির ব্যবস্থাও করা হয়। এই জেলায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় উত্তরপাড়ায় একটি দুঃস্থাবাস ও একটি ভবঘুরে আবাস আছে। এ ছাড়াও চন্দননগর প্রবর্তক সংঘ ও খাজুরদহে দুলাল স্মৃতি সংঘের পরিচালনায় ২টি আবাস আছে।

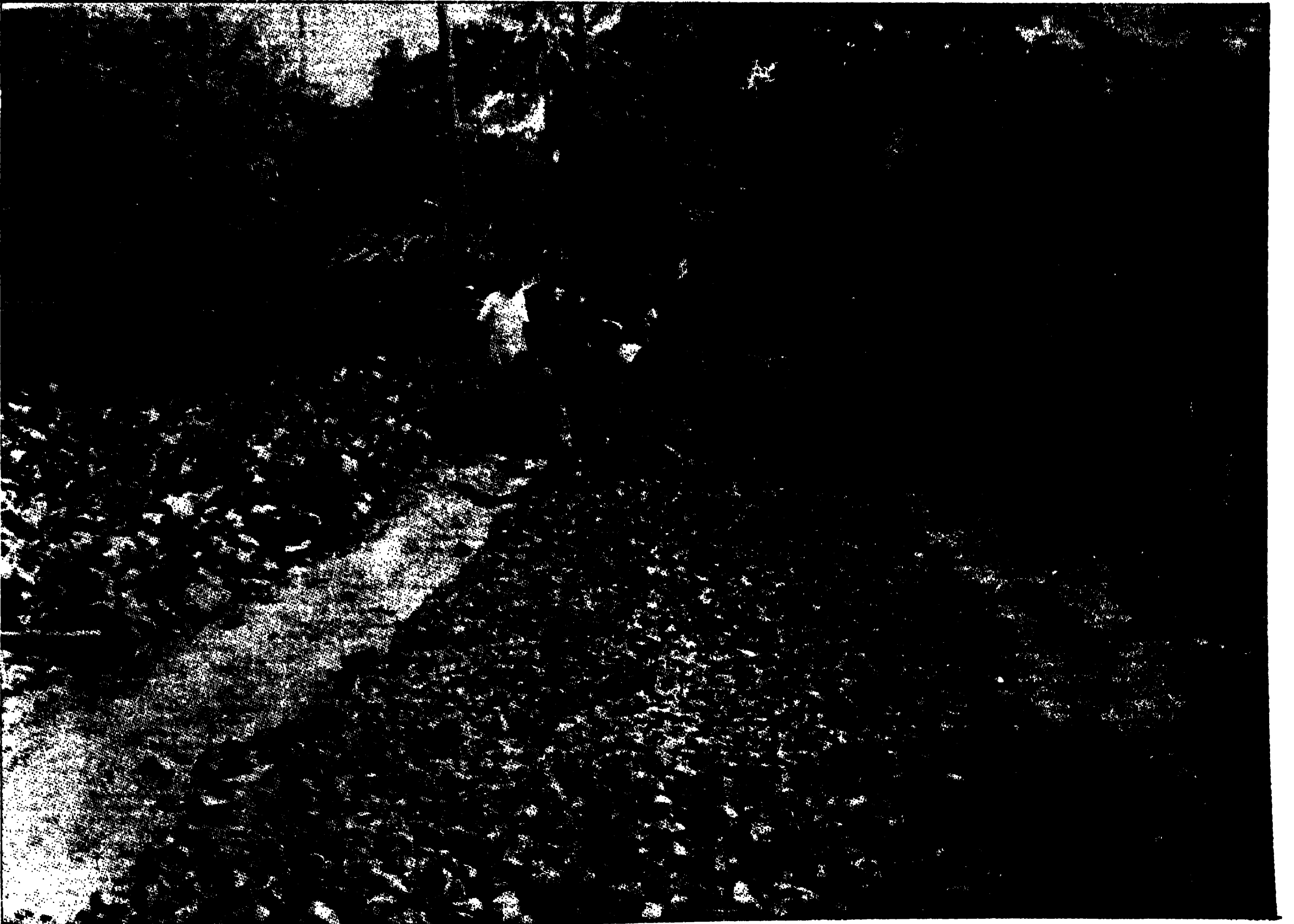
(গ) স্বল্পকালীন আবাস—সামাজিক নিরাপত্তা ও বিপদাপন্না ও অত্যাচারিতা মহিলাদের এই আবাসগুলিতে স্থান দেওয়া হয়। এখানে এই মহিলাদের সমাজে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা, পারিবারিক কলহের নিষ্পত্তির মাধ্যমে সুষ্ঠু পুনর্বাসন দেবার ব্যবস্থা করা হয়। অন্যথায় এই কেন্দ্রে স্বনিযুক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে উপার্জনক্ষম করার ও শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এখানে মহিলারা ৮ বছর পর্যন্ত শিশুসহ থাকতে পারেন। সাময়িক অত্যাচারিতা মহিলা, যাদের এই অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার কোনও রাস্তা নেই বা থাকবার অন্য ব্যবস্থা নেই তাদের পক্ষে এই আবাস বিশেষ কার্যকরী। হুগলি জেলায় নবগ্রামে সত্যভারতী, খাজুরদহে দুলাল স্মৃতি সংসদে ও বাগাণ্ডাতে জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্রের অধীন ৩টি স্বল্পকালীন আবাস বর্তমানে চলছে।

(ঘ) কর্মরতা মহিলা হস্টেল—কর্মরতা মহিলাদের নিজ বাড়ি না থাকলে বসবাসের যে অসুবিধা তা থেকে বাঁচবার জন্য মহিলাদের হস্টেল করা হয়। এই সব হস্টেলে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত মাসিক আয়বিশিষ্ট মহিলারা ১৫ শতাংশ টাকা ভাড়া দিয়ে থাকতে পারেন। এই জেলায় নবগ্রামে সত্যভারতী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অধীন এরূপ একটি হস্টেল আছে। যে কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হস্টেল তৈরির ১০ শতাংশ খরচ দিয়ে এরূপ হস্টেল করতে পারেন। সরকার বাকি ৯০ শতাংশ খরচ বহন করে।

(ঙ) পারিবারিক পরামর্শ কেন্দ্র—বর্তমানে সামাজিক প্রেক্ষাপটে এরূপ পরামর্শ কেন্দ্রের উপযোগিতা স্বীকৃত। কারণ পারিবারিক ভুল বোঝাবুঝি ও বিবাহ বিচ্ছেদের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি উক্ত কেন্দ্র বিশেষ আলোচনা ও প্রেক্ষাপট অনুসারে নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হয়। দুর্বল নারীকে পরামর্শ ছাড়াও আইনী সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। নবগ্রামে সত্যভারতীর ব্যবস্থাপনায় এইরূপ একটি কেন্দ্র বর্তমানে চলছে।

(চ) স্বনির্ভর শিক্ষাকেন্দ্র—যে কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মহিলাদের স্বনির্ভর ও উপার্জনশীল করার জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের কেন্দ্র সরকারি সাহায্যে পরিচালনা করতে পারেন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে রাস্তা নির্মাণ ॥ চণ্ডীতলা — *ছবি অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়*



বর্তমানে Noard Scheme-এ ৫০ জন মহিলার জন্য বাৎসরিক ৪ লাখ টাকার মধ্যে এরূপ কেন্দ্র খোলা যেতে পারে।

(ছ) সিবন শিক্ষা কেন্দ্র—সরকারি পরিচালনায় এই জেলার বলাগড়, পাণ্ডুয়া, হরিপাল ও সিঙ্গুরে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের অধীন ৪টি ও মহকুমা শাসক চন্দননগরের অধীন একটি কেন্দ্র চলছে। এখানে মহিলারা সিবন শিক্ষা হাতে-কলমে পান এবং শিক্ষান্তে নিজেরা সেলাইটাকে উপার্জনের পাথেয় হিসাবে নিতে পারেন। এই শিক্ষার্থীরা মাসিক ৫০ টাকা ভাতা পান।

(জ) মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা—গ্রামের মহিলারা সর্বাধিক ৩০০ টাকা পর্যন্ত নিকটস্থ পোস্ট অফিসে জমা রেখে বাৎসরিক ২৫ শতাংশ সুদ পেতে পারেন। সঞ্চয়ে উৎসাহ ও অসময়ে এই টাকা তাদের বিশেষ সাহায্যে আসতে পারে।

(ঝ) পণপ্রথা নিবারণ—অন্যান্য জেলার মতো এই জেলাতেও জেলান্তর উপদেষ্টা সমিতি গঠিত হয়েছে। এই সমিতি উপযুক্ত পরামর্শ ছাড়া প্রয়োজনে আইনী সাহায্য দেয়।

বালক / শিশু কল্যাণ

(ক) দুর্বল শ্রেণীভুক্ত বালক-বালিকাদের জন্য বালকাবাস ছাড়াও সুসংহত শিশু উন্নয়নে শিশু বিকাশ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এই জেলার ১৮টি উন্নয়ন ব্লকে সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৫টি ব্লকে এই প্রকল্প চালু হয়ে গেছে। নোবেল পুরস্কার জয়ী কবি Gabriela Mistreal-এর কথায়—"We are guilty of many errors and many faults, but our worst crime is abandoning the children, neglecting the fountain of life. Many of the things we need, can wait, the child cannot. Right, now is the time, his bones are being formed, his blood is being made and his senses are being developed. To him, we cannot answer. 'Tomorrow' his name is 'To-day.' শিশু বিকাশের কাজ, কাল নয়। আজই করতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই এই প্রকল্প—

প্রকল্পের উদ্দেশ্য—

(ক) ৬ বছর পর্যন্ত শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের উন্নতি।
(খ) শিশুর পূর্ণ মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক বিকাশ।
(গ) শিশু অপুষ্টি, কগ্ণতা ও মৃত্যু রোধ।
(ঘ) শিশু বিকাশের ক্ষেত্রে কর্মরত বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয়।
(ঙ) মাতাকে প্রকৃত অর্থে শিশু লালন-পালনের উপযুক্ত ও পুষ্টি-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন করা।

এই উদ্দেশ্যগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে যে সেবামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে—

(ক) অতিরিক্ত পুষ্টি প্রদান।
(খ) প্রতিষেধক টীকা।
(গ) স্বাস্থ্য পরীক্ষা।
(ঘ) অসুস্থ শিশু ও মাতার চিকিৎসা।
(ঙ) মহিলাদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সচেতনা।
(চ) প্রথা বহির্ভূত প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা।

প্রতিবন্ধী কল্যাণ

সমাজের দুর্বল শ্রেণীভুক্ত প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে নানা প্রকল্প রূপায়ণে এই জেলাও অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে—

(ক) **অক্ষমভাতা**—এই জেলায় ৩২৫ জন প্রতিবন্ধীকে মাসিক ১০০ টাকা হিসাবে আমৃত্যু অক্ষম ভাতা দেওয়া হচ্ছে।

(খ) **কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা সহায়ক যন্ত্রাদি প্রদান**—এই সহায়ক যন্ত্র দ্বারা প্রতিবন্ধীকে কর্মক্ষম করা হয়। অন্যান্য জেলার মতো এই জেলাও প্রতি বছর নানা সহায়ক যন্ত্রাদি বিনামূল্যে প্রদান করছে।

(গ) **আর্থিক পুনর্বাসন**—এককালীন ১০০০ টাকা পর্যন্ত অনুদান সাহায্যের দ্বারা প্রতিবন্ধীকে ছোট ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জনশীল করা হয় এবং পঞ্চায়েতের সুপারিশে প্রতি বছরই এই জেলার উদ্যোগী প্রতিবন্ধীকে সাহায্য করা হয়।

(ঘ) **বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ**—নানারূপ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীকে কার্যক্ষম করে তুলতে এই জেলায় তারকেশ্বর বিকাশ ভারতী ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও ভদ্রেশ্বরে জেলা পরিষদ পরিচালিত ভোকেশনাল শিক্ষণ ব্যবস্থা আছে।

(ঙ) **প্রতিবন্ধী আবাস**—প্রতিবন্ধীদের জন্য বেগমপুরে বোধনা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ও চন্দননগরে প্রবর্ত্তক সেবা নিকেতনের ব্যবস্থাপনায় যথাক্রমে মানসিক প্রতিবন্ধী ছেলেদের ও মূকবধির বালিকাদের আবাস চলছে।

(চ) **শিক্ষায় অনুদান**—প্রতিবন্ধী ছাত্র / ছাত্রীকে মাসিক ৬০ টাকা হিসাবে পড়াশোনার খরচ দেওয়া হয়।

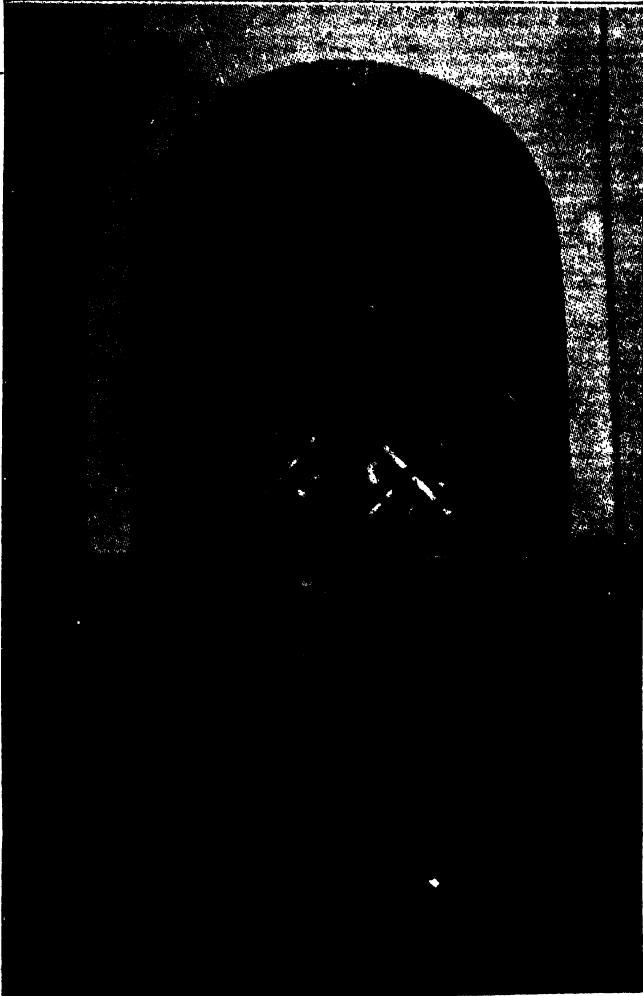
(ছ) **পরিচয়পত্র**—এই জেলার প্রতিটি প্রতিবন্ধীকে জেলার জেলা হাসপাতাল ও মহকুমা হাসপাতালে পরিচয়পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পত্র দ্বারা প্রতিবন্ধী রেল ও বাস ভ্রমণের বিশেষ সুবিধা পান।

অন্যান্য জেলার সঙ্গে হুগলি জেলাও সমাজকল্যাণের কার্যক্ষমে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

হুগলি জেলার শিক্ষাজগৎ

ডঃ বীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সহায়তায়—শ্রীদুলাল ভৌমিক, শ্রীঅচ্যুতানন্দ রায়, শ্রীঅজিত বাগ, শ্রীকালিপদ সেনগুপ্ত, অধ্যক্ষ চণ্ডীদাস মুখার্জি, অধ্যাপক স্বপন চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রুতিনাথ প্রহরাজ, অধ্যাপক দিলীপ ব্যানার্জি, অধ্যাপক সুখময় ভৌমিক এবং অধ্যাপক সাত্যকি ভট্টাচার্য



জনসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীতে ভারতবর্ষের স্থান দ্বিতীয়। এদেশের মানুষের দুঃখদুর্দশার জন্য জনসংখ্যাকে দায়ী করা হয়। কিন্তু জনসংখ্যাকে যদি সমস্যা না করে সম্পদে পরিণত করতে হয়, তা হলে দরকার শিক্ষার। শিক্ষার গুণেই মানুষ জীব থেকে মানুষ হয়ে ওঠে নতুন সম্পদ সৃষ্টি করার ক্ষমতা অর্জন করে, আর সেই সম্পদে দেশের উন্নতি অর্থাৎ দেশের আপামর জনসাধারণের উন্নতি হতে পারে। কিন্তু দেশ যাঁরা চালাবেন, তাঁদের লক্ষ্য যদি দেশের জনসাধারণ না হয়ে নিজের পছন্দমতো গোষ্ঠী বা শ্রেণীর উন্নতিবিধান হয়, দেশ শাসনের লক্ষ্য যদি হয় সাধারণ দেশবাসীকে শোষণ করে নিজেদের গোষ্ঠিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থরক্ষা করা, তা হলে তাঁরা দেশের সব মানুষের দিকে না তাকিয়ে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থেই শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। সেজন্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি এবং অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

আমাদের দেশে ইংরেজ শাসন শুরু হওয়ার পর যখন সংস্কৃত বিদ্যাচর্চা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলির অস্তিত্ব বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ পাঠশালাগুলি উঠে গেল, তখন সেই শূন্যতাকে পূর্ণ করল ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা। দেশের সমস্ত মানুষকে শিক্ষিত করার গরজ ছিল না ইংরেজের। তাদের প্রয়োজন

ছিল এ দেশের শাসন চালানোর জন্য ইংরেজি জানা কিছু লোক। আর দরকার ছিল ইংরেজি শিক্ষিত একটি বশংবদ শ্রেণী, যারা তাদের সাম্রাজ্যকে ধরে রাখার জন্য অন্যতম একটি স্তম্ভের কাজ করবে। এ জন্য তারা ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করল। আর এই সুযোগে আমাদের দেশের প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীরা চেষ্টা করলেন, ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার শুরু করতে যাতে দেশকে মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে আধুনিক যুগের আলোয় নিয়ে আসা যায়। এই সব মনীষীর সঙ্গে যুক্ত হলেন কিছু খৃস্টান মিশনারী। সেজন্য আমরা রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীর সঙ্গে স্মরণ করি কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখের নাম।

ইংরেজ আমলের আদি পর্ব থেকে যে প্রাথমিক শিক্ষা উপেক্ষিত এ কথা আমরা জানি। এ বিষয়ে আমাদের মনীষীরা, চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বারে বারেই দাবি জানিয়েছেন, কিন্তু ফল কিছু হয়নি। স্বাধীনতার পর আশা ছিল শিক্ষার চালচিত্র বদলাবে, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হবে, তা হয়নি। শিক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দ বাড়বে, শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। ব্যয়বরাদ্দ বাড়েনি বরং কমেছে। স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে আবেদন জানিয়েছিলেন, শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়বরাদ্দ মোট বাজেটের অন্তত ১০ ভাগ করা হোক। কিন্তু এই ব্যয়বরাদ্দ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে শতকরা ৭.৬ ভাগ থাকলেও পরে তা ক্রমশ কমতে কমতে শতকরা ২ ভাগে, এবং কোনও কোনও সময়ে তারও নীচে নেমেছে। অথচ আমরা রাজীব গান্ধীর নয়া শিক্ষানীতির মডেল স্কুল থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর আসনে অনেক ভাল ভাল কথা শুনেছি। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থার সময় শিক্ষাকে রাজ্য তালিকা থেকে কেন্দ্র-রাজ্য উভয়ের যৌথ ব্যবস্থার অধীন করেছেন। দায়িত্ব নিয়েছেন, কিন্তু দায় এড়িয়ে গেছেন। ইংরেজ আমলের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে পড়ে জারের আমলের শিক্ষাব্যবস্থা প্রসঙ্গে টলস্টয়ের উক্তি, যেটিকে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে নিজে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

> 'সরকারের শক্তি নির্ভর করে জনসাধারণের অজ্ঞতার ওপর। সরকার সে কথা জানে এবং সেজন্য প্রকৃত শিক্ষার বিরোধিতা করে।...এবং সেজন্য সরকার যখন অন্ধকার ছড়ায় তখন দেখায় যে তারা শিক্ষার প্রসারে কত ব্যস্ত'। (The strength of the Government lies in the peoples ignorance and the Government knows this and will therefore always oppose true enlightenment. It is true we realised that fact. And it is most undesirable to let the Government, while it is spreading darkness. Pretend to be busy with the enlightenment of the people.
> পৃঃ ৫৫৯, র.র. পঃ বঃ সঃ সং ১১শ খণ্ড)

শিক্ষাজগতে একটা আলাদা ছবি দেখা গেল এই রাজ্যে ১৯৭৭ সালের পর থেকে। এতে যে বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা গেল, তার বিবরণ নীচে দেওয়া হল—

(১) শিক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দ মোট বাজেটের শতকরা ১২ থেকে বাড়িয়ে তার দ্বিগুণ অথবা তারও বেশি করা হল।

(২) আগে যেখানে কেবলমাত্র গ্রামের মেয়েদের ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ ছিল, এখন ১২শ শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে বিনা বেতনে পড়ার ব্যবস্থা করা হল।

(৩) প্রাথমিক শিক্ষার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হল—(ক) প্রতিটি গ্রামে এবং শহরাঞ্চলের প্রতিটি পাড়াতে যাতে একটি অন্তত প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকে, তার জন্য ১৯৭৭ থেকে '৮৩-র মধ্যে ১০,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হল এবং ৭,০০০ নতুন শিক্ষক নিযুক্ত হল। কিন্তু ঘড়ির কাঁটাকে পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা শুরু হল। কয়েকজন 'শিক্ষানুরাগী'(!) ব্যক্তি ও সংগঠনের মামলার জন্য ১৯৮৩-৯৫ সাল পর্যন্ত আদালতের নির্দেশে কোনও নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করা গেল না বা নতুন কোনও শিক্ষক নিযুক্ত হল না। সম্প্রতি ১৯৯৫-এর অক্টোবরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সেই বাধা অপসারিত হয়েছে। নতুন শিক্ষক নিয়োগ শুরু হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি এক অর্ডিন্যান্স জারি করে নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। (খ) দুপুরের জলখাবার এবং পশ্চাৎপদ শ্রেণীর জন্য বিদ্যালয়ে আসার পোশাকের ব্যবস্থা করা হল। খেলাধুলাকে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা হল এবং প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী তাদের উৎকর্ষ অনুযায়ী যাতে রাজ্য স্তর পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হল। (গ) বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বই দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। আগেও এই ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তা নামমাত্র। এর জন্য ব্যয়বরাদ্দ ছিল মাত্র ৮০ লক্ষ টাকা। এখন সেটা বেড়ে প্রায় ১০ কোটি টাকায় দাঁড়াল। বর্তমানে প্রায় ৮৩ প্রকারের বই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরিত হচ্ছে। এর মধ্যে বাংলা ছাড়াও হিন্দি, উর্দু, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় লেখা বই, অলচিকি অক্ষরে মুদ্রিত সাঁওতালি ভাষারও বই আছে।

(৪) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার আর্থিক দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করল। '৭৭-এর আগে প্রাথমিক শিক্ষার ভার সরকারের ওপর থাকলেও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি ঘাটতিভিত্তিক কিছু অনুদান পেত। সব বিদ্যালয় এই অনুদান পেত না। যারা অনুদান পেত, তাদের ছাত্র বেতন বাবদ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করতে হত বাকিটা সরকার অনুদান হিসাবে দিত। জুনিয়র হাই স্কুলগুলিকে লাম্প গ্রান্ট দেওয়া হত। এর পরিমাণ প্রয়োজনীয় অর্থের ৩৭%-এর বেশি হত না। আবার যখন জুনিয়র হাই স্কুল, হাই স্কুলে উন্নীত হত, এই অনুদান বন্ধ হয়ে যেত। অনেক স্কুলকেই ঘাটতির সুযোগ পেতে ১০/১২ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত। '৭৮ সালের পর থেকে এমন একটিও অনুমোদিত বিদ্যালয় নেই যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর বেতন ও ভাতার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেনি। ফলে '৭৭-এর আগে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর মাস মাইনে পাওয়া ছিল অনিশ্চিত এবং অনিয়মিত। অনেক সময় তাঁরা যে টাকা পাচ্ছি বলে সই করতেন, সে টাকা পেতেন না। বেসরকারি কলেজগুলির অবস্থাও ছিল এক রকম। মাস মাইনে ছিল অনিয়মিত। একাধিক

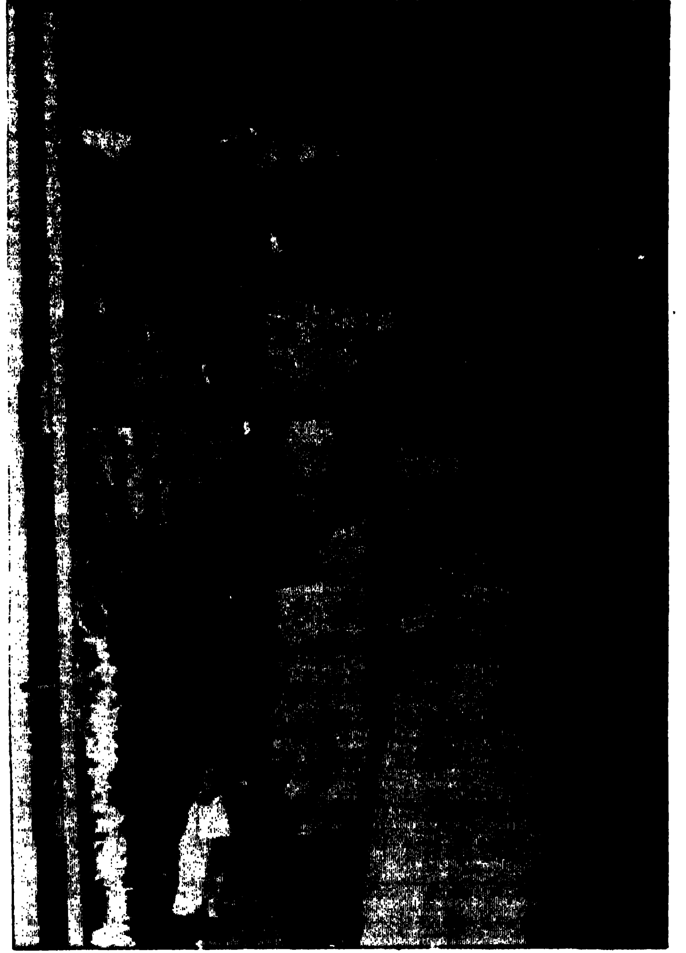
কিস্তিতে সে টাকা পাওয়া যেত। অনেক সময় কয়েক মাস যাবৎ মাস মাইনে বন্ধ থাকত, এমন ঘটনাও বিরল ছিল না। '৭৭ সালের পর '৭৮ সাল থেকে 'পে প্যাকেট' ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে এবং কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর বেতন সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

(৫) শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বেতন হার সংশোধিত হয়েছে। পেনশন ও গ্র্যাচুইটি স্কিম চালু হয়েছে। শিক্ষকদের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

(৬) শিক্ষার অঙ্গন প্রসারিত হয়েছে এবং বিভিন্ন জনমুখী ব্যবস্থার ফলে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে। '৪৭-৭৭ পর্যন্ত যেখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা গড়ে ১,৬০,০০০ করে বাড়ত, এখন সেখানে ২,৬০,০০০ করে বাড়ছে। ছাত্রবৃদ্ধির এই হার ভারতবর্ষের শিক্ষাজগতের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা। ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা '৭৭ সাল পর্যন্ত ছিল ২ লক্ষ ৯৩ হাজার '৭৭ সালের পরবর্তী দশ বছরে এটি বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ২০ লক্ষ ৯৩ হাজার। ১৯৭৭ সালের আগে শিক্ষায় এ রাজ্যে ক্রম অবনতিতে নবম স্থানে এসে দাঁড়িয়েছিল। '৭৭ সালের পর এটি আবার ক্রমশ উন্নত হয়ে তৃতীয় স্থানে পৌঁছেছে। স্ত্রীশিক্ষায় প্রথম এবং আশা করা যায় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অদূর ভবিষ্যতে এটি প্রথম স্থান অধিকার করার সম্মান লাভ করবে।

সারা রাজ্যের শিক্ষাচিত্রের এই পটভূমিতে হুগলি জেলার বিবরণটা নিচে দেওয়া হল।

প্রাথমিক শিক্ষা : আগেই বলা হয়েছে, আদালতের নির্দেশে ১৯৮৩-র পর নতুন কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা যায়নি বা নতুন কোনও শিক্ষক প্রাথমিক বিভাগে নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমরা জানি এক অভূতপূর্ব ব্যাপক প্রয়াসের জন্য ১৯৯২ সালে হুগলি জেলা পূর্ণ সাক্ষর জেলার মর্যাদা লাভ করেছে। এই ঘোষণার পরে ৫-৯ বছরের মধ্যে সমস্ত শিশু যাতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে নতুন করে কেউ নিরক্ষর না হয়, সেজন্য সাক্ষরতা মিশন এবং হুগলি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। জেলার সমস্ত শিশু যাতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার জন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, মাঝপথে কেউ বিদ্যালয় ছেড়ে না যায়, শিক্ষার মান উন্নত হয় এবং শিক্ষাদানের সুযোগ-সুবিধা বর্ধিত হয়—এই চারটি লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পনাটি রচিত হয়েছে। সমস্ত শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর লক্ষ্য নিয়ে '৯২ সালে জেলার সমস্ত গ্রামে এবং পাড়াতে এক ব্যাপক সমীক্ষা চালান হয়। এই সমীক্ষায় দেখা যায় ৮০,১৫৪ জন শিশু কোনও বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি। ওই বছরেই ১—১৭ আগস্ট এক নিবিড় কার্যক্রমের মাধ্যমে ৬১,৪৫৬ জন শিশুকে ভর্তি করা হয়। এইভাবেই নজর রাখা হচ্ছে যাতে সমস্ত শিশু বিদ্যালয়ে আসে। বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরেও কেউ যাতে ছেড়ে না যায়, সেজন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষা সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালার সিদ্ধান্তসমূহকে হুগলি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ রূপায়িত করছে। তবুও দেখা যায়, বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়া সম্পূর্ণ রোধ করা যায়নি। Circleভিত্তিক এই সব ছেড়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের সংখ্যা নির্ধারণ করা হচ্ছে এবং তাকে প্রতিহত



জগমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন উদ্বোধন করছেন শ্রীমতী অঞ্জু কর

করার চেষ্টা হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, নতুন করে যাদের ভর্তি করা হয়েছিল তাদের মধ্যে ২০—৪৮ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ছেড়ে যাচ্ছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৪-এ আর একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয় এবং এখানের সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করা হচ্ছে। শিক্ষাদান পদ্ধতিকে বিজ্ঞানসম্মত এবং উন্নত করতে জেলার সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার জন্য Orientation course-এর আয়োজন করা হয় ১৯৯২ সালে। শিক্ষা পর্যদের নির্দেশ অনুযায়ী ১৯৯৪তেও ৬ দিনের একটি Orientation course-এর আয়োজন করা হয়। শিক্ষাদানের সুযোগ-সুবিধা বাড়ান, বিদ্যালয় ভবন সংস্কার এবং উন্নয়নের জন্য প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতিকে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে ও প্রতিটি বিদ্যালয়ে দেওয়া হয়েছে শরীরচর্চার উপকরণ, বিদ্যালয়ে কৃষিকাজের উপযোগী উপকরণ, কমপক্ষে ৪টি বোর্ড, জিনিসপত্র রাখার জায়গা এবং কমপক্ষে ৮০ জনের বসার জায়গা। এভাবেই প্রাথমিক শিক্ষার ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা : হুগলি জেলায় মাধ্যমিক শিক্ষার সূচনা ১৮০০ সালে খ্রিস্টান মিশনারীদের উদ্যোগে। ওই বছরই উইলিয়াম কেরীর সহকর্মী মার্শম্যান প্রথম বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। হ্যানা মার্শম্যান

একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। দেশীয় খ্রিস্টান বালক-বালিকারাই এখানে শিক্ষার সুযোগ পেত। ১৮১৪ সালে লণ্ডন মিশনারি সোসাইটির রবার্ট মে সাহেব সাধারণের জন্য মাত্র ১১ জন ছাত্র নিয়ে চুঁচুড়া শহরে একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন। দু'বছরেই এই বিদ্যালয়ের আরও কয়েকটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাত্রসংখ্যা হয় ৯৫২। ১৮১৮ সালের মধ্যে শাখা বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় ৩৬, ছাত্রসংখ্যা ৩০০০।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এদেশে শিক্ষা বিস্তারে কোনও আগ্রহ ছিল না। এ বিষয়ে প্রথম আগ্রহ প্রকাশ করেন লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস এবং পরবর্তীকালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। কার্যত আমাদের জেলায় ইংরেজি শিক্ষা তথা মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সংগঠিত প্রয়াস শুরু হয় বেন্টিঙ্কের আমলে ১৮৩৫ সালের পর থেকে। এ বিষয়ে বিতর্কের কোনও অবকাশ নেই যে, কেরী, মার্শম্যান এবং ওথার্ডের মতো মিশনারিরা প্রদেশে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন ও পুস্তক প্রকাশ করে শিক্ষার পথ সুগম করে দেন। এক সময় মিশনারিরা জোর করে তরুণ ছাত্রদের খ্রিস্টান করতেন। এর জন্য তৎকালীন হিন্দুসমাজে আশঙ্কা এবং প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং রাজা রাধাকান্ত দেব এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এই আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা বিস্তার এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়।

১৮৫৪ সালে হ্যালিডে সাহেবের সহযোগিতায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হুগলি জেলার বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করে মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর ফলে হুগলি জেলায় ১৮৫৫ সালের আগেই হারোল, শিয়াখালা, কৃষ্ণনগর, কামারপুকুর ও ক্ষীরপাই অঞ্চলে ৫টি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবেই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একের পর এক এই জেলায় বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। স্থানীয় অধিবাসীদের আগ্রহে এবং তদানীন্তন জমিদার ও অবস্থাপন্ন মানুষজনের সাহায্যে এবং আর্থিক বদান্যতায় এই সব বিদ্যালয় গড়ে ওঠে ও প্রসারিত হয়। তবে ১৮৫৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত যত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার সবগুলো টিকে থাকেনি। অনেকগুলোই উঠে গেছে অর্থাভাবে। ১৯৪৭ সালের হিসাবে দেখা যায়, এই জেলাতে জুনিয়র হাই/সিঃ বেসিক/মাদ্রাসা স্কুলের সংখ্যা ৭৭ এবং হাই স্কুল/হাঃ সেঃ/হাই মাদ্রাসা স্কুলের সংখ্যা ৬৭। ১৯৬০-এ এই সংখ্যা বেড়ে হয় যথাক্রমে ১৪৭ এবং ১৫০। ১৯৭৭-এর মে মাস পর্যন্ত এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১১২ ও ৩৪৮ এবং বর্তমানে এর সংখ্যা ২৪৩ এবং ৪২৬। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী এবং অব্যবহিত পরবর্তীকালে বিত্তবানদের অবদান থাকলেও শেষের দিকে সাধারণ মানুষের আগ্রহ এবং উদ্দীপনাতে ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে এবং '৭৭-এর পর এদের পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই প্রসঙ্গে শতবার্ষিকী অতিক্রম করেছে এই জেলার এমন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিদ্যালয়ের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হল। সমস্ত বিদ্যালয়ের নাম দেওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার অঙ্গন বহু প্রসারিত হওয়ায় উচ্চশিক্ষার জন্য নতুন কলেজের প্রয়োজন বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। বামফ্রন্টের আমলে প্রতিষ্ঠিত জেলার ৬টি নতুন কলেজ এই সমস্যার অনেকাংশে সমাধান করেছে।

উচ্চশিক্ষা : রাজ্যের জনমুখী শিক্ষার ধারা এই জেলাতেও সমধিক প্রসারিত। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে হুগলি আগুয়ান। উনবিংশ শতাব্দীর ঊষালগ্ন থেকে দেশে আধুনিক শিক্ষা ও চিন্তা-চেতনার বিকাশ শুরু হয়। এই জেলার মহান সন্তান রাজা রামমোহন রায় ছিলেন তার পথিকৃৎ। আর এক মনীষী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিকাশের সেই গতিকে ত্বরান্বিত করেন। এই সময় তাঁর জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রাম হুগলি জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর এক প্রাতঃস্মরণীয় খ্রিস্টান মিশনারি উইলিয়াম কেরী জেলায় তথা রাজ্যের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এক মহান কীর্তি রেখে গেছেন শ্রীরামপুরে। কলকাতার বাইরে প্রথম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান শ্রীরামপুর কলেজ তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। এই জেলায় প্রতিষ্ঠানগত উচ্চশিক্ষা তখন থেকেই শুরু। অগ্রগতির সেই ধারা তখন থেকে আজও এগিয়ে চলেছে। ১৯৪৭-এর আগে এই জেলায় উচ্চশিক্ষার বিস্তারেও উদ্যোগী ভূমিকায় ছিলেন জমিদার ও বিত্তবান মানুষজন। স্বাধীনতার আগে প্রতিষ্ঠিত জেলার ৪টি কলেজ ছিল শহরাঞ্চলে। গ্রামে কোনও কলেজ ছিল না। পরবর্তীকালে সরকার ও গণ-উদ্যোগে বাকি কলেজগুলি চালু হয়। ১৮১৮ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত এই ১৭৮ বছরে জেলাতে মোট ২৮টি কলেজ হয়েছে। তার মধ্যে ২৩টি সাধারণ কলেজ, ৩টি শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ, ১টি শারীর শিক্ষণ কলেজ এবং ১টি বয়নশিল্প শিক্ষণ কলেজ। ২৮টির মধ্যে ৬টি শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য কলেজ। পরিচালনগত দিক থেকে বিচার করলে ২৮টির মধ্যে ৬টি কলেজ সরকারি, সরকারি স্পনসর্ড কলেজ ৪টি এবং বাকি ১৮টি কলেজ বেসরকারি পরিচালকমণ্ডলী পরিচালিত। এই বেসরকারি কলেজগুলির মধ্যে একটি ট্রাস্ট এবং একটি খ্রিস্টান মিশনারি পরিচালিত। ৭টি কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন, বাকি ২১টি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে জেলায় ৬টি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২৮টির মধ্যে ১৪টি কলেজ রয়েছে শিল্পাঞ্চলে এবং বাকি ১৪টি গ্রামাঞ্চলে। প্রতিষ্ঠার কালপঞ্জী অনুযায়ী কলেজগুলির তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

কারিগরি শিক্ষা : সমাজ উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষা ও প্রযুক্তি এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। কিন্তু দুঃখের হলেও এটা সত্য যে, স্বাধীনতার এতগুলো বছর পার হয়ে এলেও জাতীয় শিক্ষানীতি এবং অতিপ্রয়োজনীয় কারিগরি শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হয়নি। শিক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার উভয়ের দায়িত্ব থাকলেও, যেহেতু কারিগরি শিক্ষা বিশেষভাবে দেশের শিল্পনীতি, অর্থনীতি এবং বাণিজ্যনীতির সঙ্গে জড়িত সেজন্য কোনও রাজ্য সরকারের পক্ষে এককভাবে কোনও কারিগরি শিক্ষানীতি গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ফলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চাহিদা অনুযায়ী কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা চালিত হয়েছে। হুগলি জেলাও একই পথ ধরে হেঁটেছে।

কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা মূলত ত্রিস্তরের। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর (ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহ), ডিপ্লোমা অর্থাৎ মধ্যস্তর (পলিটেকনিকসমূহ) এবং তৃতীয় স্তরে পড়ে আই টি আই ও জুনিয়র

টেকনিক্যাল স্কুলসমূহ। হুগলি জেলায় এই তিন স্তরের কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থাই বিদ্যমান। এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

শ্রীরামপুর এবং এর সংলগ্ন এলাকায় তন্তুজীবি গোষ্ঠীর আধিক্য ছিল। সেই কারণে ১৯০১ সালে এখানে একটি এই শিল্পগত শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ১৯০৮ সালে শ্রীরামপুর স্কুল অফ ইনস্ট্রাকশন নামে শ্রীরামপুর টেক্সটাইল কলেজের সূচনা হয়। ১৯০৯ থেকে এখানে ছাত্রভর্তি এবং নিয়মিত পঠন-পাঠন শুরু হয়। ১৯৫৭ থেকে এখানে তিন বছরের বি এস-সি (টেক) কোর্স শুরু হয় এবং তখন থেকেই এর নাম হয় কলেজ অফ টেক্সটাইল টেকনোলজি, শ্রীরামপুর। ১৯৬০ সাল থেকে এখানে চার বছরের স্নাতক পর্যায়ে বি এস-সি (টেক) এবং ১৯৯৪ সাল থেকে এখানে স্নাতকোত্তর স্তরে এম এস-সি (টেক) কোর্স চালু হয়।

এইভাবে শিল্পের প্রয়োজনে বিশেষত যুদ্ধের সময় উন্নত মানের কারিগরের প্রয়োজন মেটানোর জন্য গড়ে ওঠে হুগলি বালির মোড়ে মোবার্লি টেকনিক্যাল স্কুল। যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতি ছিল এর প্রধান লক্ষ্য। পরবর্তীকালে ১৯৫১ সালে এই মোবার্লি স্কুলেই হুগলি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে পরিণত হয়। এখানে পড়ান হত এক বছর ও দুবছরের ট্রেড কোর্স, সেই সঙ্গে সিভিল, মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যালের তিন বছরের লাইসেনসিয়েট কোর্স, যা বর্তমানে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং হিসাবে চলছে। এ ছাড়া এই তিন বিভাগেই সান্ধ্যকালীন আংশিক সময়ের পঠন-পাঠন চলছে। শীঘ্রই এখানে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা এবং কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে পোস্ট ডিপ্লোমা কোর্স চালু হতে চলেছে।

এ ছাড়াও রয়েছে ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত সাহাগঞ্জ আই টি আই, ব্যাণ্ডেল। এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং নন্-ইঞ্জিনিয়ারিং মিলিয়ে ত্রিশ-বত্রিশটি ট্রেড কোর্স পড়ানোর সুযোগ রয়েছে।

আই টি আই সাহাগঞ্জের পাশে ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত বেসিক ট্রেনিং সেন্টার (কেমিক্যাল) রয়েছে। এখানে বিভিন্ন ট্রেডে দুবছরের সার্টিফিকেট কোর্স পড়ান হয়। শীঘ্রই আরও নতুন কিছু ট্রেড চালু হওয়ার সম্ভাবনা।

ব্যাণ্ডেল স্টেশনের কাছে জি টি রোডের ধারে ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সার্ভে ইনস্টিটিউট। জানা যায়, এই প্রতিষ্ঠানটির সূত্রপাত হয়েছিল অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার ময়নামতীতে। এখানে আগে সার্ভেতে ২ বছরের ট্রেড কোর্স পড়ান হত। এখন পড়ানো হয় ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স।

হুগলি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির পাশে ১৯৬১ সালে গড়ে উঠেছিল হুগলি জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি আই টি আই হিসাবে চলছে।

১৯৬৪ সালে হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার বেঙ্গাইতে গড়ে ওঠে সুভাষনগর জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল। এই প্রতিষ্ঠানটিও এখন আই টি আই হিসাবে চলছে।

এ রাজ্যে নতুন শিল্প বিকাশের প্রয়োজনে ১৯৯৪ সালে গড়ে ওঠে চন্দননগরে মেয়েদের জন্য পলিটেকনিক। বর্তমানে ওখানে ইলেকট্রনিক্স এবং আর্কিটেকচারে ডিপ্লোমা পড়ানো হচ্ছে।

চুঁচুড়া স্টেশনের কাছে কৃষিপ্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ধান্য গবেষণাকেন্দ্র রয়েছে।

সার্বিক গ্রামোন্নয়নের স্বার্থে জেলার দুটি পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠান, হুগলি এবং চন্দননগরে কমিউনিটি পলিটেকনিক্যাল সেল স্থাপিত হয়েছে। হুগলি জেলার গ্রাম অঞ্চলে কিছু কিছু কারিগরি বিদ্যানির্ভর শিল্প বহু যুগ ধরে চলে আসছে। যেমন বলাগড়ের কাছে শ্রীপুরে নৌ-শিল্প। কমিউনিটি পলিটেকনিকের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই শিল্পগুলিকে আরও উন্নত করা যেতে পারে। সাক্ষরোত্তর কর্মসূচিতেও কমিউনিটি পলিটেকনিকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বিশেষভাবে সক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গে হুগলি জেলা একমাত্র জেলা, যেখানে এতগুলি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, যদিও টেক্সটাইল বাদে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে কারিগরি প্রতিষ্ঠান নেই। তবে নতুন শিল্পায়নের যে সুযোগ এ রাজ্যে আমাদের সামনে এসেছে, তাতে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৯৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৭০টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ১৮টি হুগলি জেলাতে স্থাপিত হয়েছে। সুতরাং রাজ্যের সঙ্গে জেলারও শিল্প বিকাশের সমূহ সম্ভাবনা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কারিগরি শিক্ষারও বহুল সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

দেশের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার, বিশেষ করে রাজ্যের পটভূমিতে হুগলি জেলার শিক্ষাচিত্রের একটি অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল। স্থানাভাববশত প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার কোনও আলোচনা এখানে করা সম্ভব হল না।



শ্রীরামপুর কলেজ

পরিশিষ্ট

(ক) শতবর্ষ অতিক্রান্ত কয়েকটি বিদ্যালয়ের নাম :

১। হুগলি ব্রাহ্ম স্কুল (১৮৩৪)
২। উত্তরপাড়া গভঃ হাই স্কুল (১৮৪৬)
৩। জনাই ট্রেনিং স্কুল (১৮৫০)
৪। ভাণ্ডারা যজ্ঞেশ্বর উচ্চবিদ্যালয় (১৮৫৩)
৫। দশঘরা হাই স্কুল (১৮৫৮)
৬। শিয়াখালা বি এম হাই স্কুল
৭। আরামবাগ হাই স্কুল
৮। বাগাটী হাই স্কুল
৯। বৈদ্যবাটি বি এস ইন্
১০। বলাগড় হাই স্কুল
১১। ভাণ্ডারহাটি বি এম ইন্
১২। চাতরা নন্দলাল ইন্
১৩। গুপ্তিপাড়া হাই স্কুল
১৪। ইলছোবা মণ্ডলাই হাই স্কুল
১৫। কৈকালা হাই স্কুল
১৬। কোন্নগর হাইস্কুল
১৭। শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইন্
১৮। বল্লভপুর হাই স্কুল
১৯। সোমরা হাই স্কুল
২০। চুঁচুড়া এস সি সোম ট্রেনিং অ্যাকাডেমি
২১। চুঁচুড়া ডাফ হাই স্কুল
২২। হুগলি কলেজিয়েট স্কুল
২৩। উত্তরপাড়া ইউনিয়ন হাই স্কুল (বয়েজ)
২৪। বৈঁচিগ্রাম বি এস ইন্
২৫। কানাইলাল বিদ্যামন্দির, চন্দননগর
২৬। আটপুর হাই স্কুল
২৭। গোঘাট হাই স্কুল
২৮। হরিপাল জি ডি ইন্
২৯। বাঁশবেড়িয়া হাই স্কুল
৩০। গরলগাছা হাই স্কুল
৩১। শ্রীরামপুর হাই স্কুল
৩২। তেলিনীপাড়া ভদ্রেশ্বর হাই স্কুল
৩৩। বাক্‌সা বি এন হাই স্কুল
৩৪। দুর্গাচরণ রক্ষিত বঙ্গবিদ্যালয় চন্দননগর
৩৫। কোন্নগর হিন্দু গার্লস
৩৬। খুটিয়াবাজার মল্লিকবাটী পাঠশালা
৩৭। ধনিয়াখালি মহামায়া বিদ্যালয় (তালিকা অসম্পূর্ণ)

(খ) জেলার বিভিন্ন কলেজের নাম :

১। শ্রীরামপুর কলেজ, শ্রীরামপুর (১৮১৮)—১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের পর রাজ্যের দ্বিতীয় কলেজ।
২। হুগলি মহসিন কলেজ, হুগলি (১৮৩৫)—রাজ্যের পঞ্চম কলেজ
৩। রাজা পিয়ারীমোহন কলেজ, উত্তরপাড়া ১৮৮১
৪। চন্দনগগর কলেজ, চন্দননগর (১৮৯১)
৫। নেতাজী মহাবিদ্যালয়, আরামবাগ (১৯৪৭)
৬। হুগলি মহিলা কলেজ, হুগলি (১৯৪৯)
৭। বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয়, ইটাচুনা (১৯৫০)
৮। নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজ, নবগ্রাম, কোন্নগর (১৯৫৭)
৯। বিধানচন্দ্র কলেজ, রিষড়া (১৯৫৭)
১০। শ্রীগোপাল ব্যানার্জি কলেজ, বাগাটি (১৯৫৮)
১১। অঘোরকামিনী প্রকাশচন্দ্র মহাবিদ্যালয়, বেঙ্গাই (১৯৫৯)
১২। শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যামহাপীঠ, কামারপুকুর (১৯৫৯)
১৩। রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়, রাধানগর (১৯৬৪)
১৪। বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, হরিপাল (১৯৬৬)
১৫। খলিসানী মহাবিদ্যালয়, খলিসানী, চন্দননগর (১৯৭০)
১৬। রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, চাঁপাডাঙ্গা (১৯৭১)
১৭। শরৎ শতবার্ষিকী কলেজ, ধনিয়াখালি (১৯৭৬)
১৮। স্বামী নিঃসম্বলানন্দ বালিকা মহাবিদ্যালয়, ভদ্রকালী, উত্তরপাড়া (১৯৭৮)
১৯। শ্রীরামপুর গার্লস কলেজ, শ্রীরামপুর (১৯৮১)
২০। বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়, বলাগড় (১৯৮৫)
২১। তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজ, তারকেশ্বর (১৯৮৬)
২২। কবি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়, ভদ্রেশ্বর (১৯৮৬)
২৩। আরামবাগ বালিকা মহাবিদ্যালয়, আরামবাগ (১৯৯৫)

শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ ৩টি :

২৪। সরকারি ট্রেনিং কলেজ, হুগলি (১৯৫৫)
২৫। ইন অফ এডুকেশন পর উওমেন, চন্দননগর (১৯৬৫)
২৬। রামকৃষ্ণ সারদা শিক্ষামন্দির, আনুর (১৯৭১)
২৭। মহিলাদের জন্য সরকারি মহিলা শারীর শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, হুগলি (১৯৮৪)
২৮। জেলার একমাত্র প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয়, কলেজ অফ টেক্সটাইল টেকনোলজি, শ্রীরামপুর, অনুমোদন ১৯৫৭ সালে।

হুগলি জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলন

অনমিত্র



সুদূর অতীতে এদেশে শিষ্য-পরম্পরায় যে শিক্ষা দেওয়া হত তা ছিল স্মৃতিনির্ভর ও শ্রুতিবাহন। তখন শিক্ষাদাতা গুরুই ছিলেন জীবন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার। পরে লিপিচিত্রের পথে হস্ত লিখিত পুঁথি-পত্রের যুগ এলে তাদের সংখ্যাল্পতার জন্য সীমিত কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও আবাসিক ধর্মীয় সংস্থায় গ্রন্থাগার ছিল। প্রাচীন ভারতে তক্ষশিলা, নালন্দা, বিক্রমশিলা, ওদন্তপুরী, বলভি প্রভৃতি স্থানে নামী বিদ্যানুশীল-কেন্দ্রে গ্রন্থাগারের জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে উঠেছিল। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ (৬২৯-৪৫ খ্রি.) নালন্দায় 'রত্নদধি', 'রত্নসাগর' ও 'রত্নরঞ্জক' নামীয় গ্রন্থাগারের উল্লেখ করেছিলেন। এ জাতীয় প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগার ছাড়া কিছু ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের কথাও জানা গিয়েছে।

মুদ্রণ যুগ আসার পর অপেক্ষাকৃত কম খরচে বেশি সংখ্যায় বইপত্র পাওয়ার সুযোগ ঘটল। ফলে বিভিন্ন স্থানে আগ্রহী মানুষের প্রয়োজনে জ্ঞানভাণ্ডার স্থাপনের সুযোগ এল। এইভাবেই গড়ে-ওঠা গ্রন্থ সংগ্রহ নিয়ে তৈরি হল সাধারণ গ্রন্থাগার। সাহিত্য-প্রেমিক পোলিও, যাঁকে সাধারণ গ্রন্থাগারের জনক বলা হয়, তাঁর সম্বন্ধে জানাতে গিয়ে প্লাইনি লিখেছিলেন—'the made men's talents a public possession'। কথাটি সুন্দর ও অর্থবহ; মানুষের প্রতিভার ফসলকে জনগণের সম্পত্তিরূপে ব্যবহার করার সার্থক মাধ্যম নিঃসন্দেহে সাধারণ গ্রন্থাগার।

ইংরেজ শাসনকালে পশ্চিমী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে যে চেতনার আলোড়ন দেখা গিয়েছিল, তাকে সাধারণভাবে রেনেসাঁ (renaissance) বা নবজাগরণ বলা হয়। উনিশ শতকে সেই জাগৃতির ফলে নব নব ভাবধারার জন্ম হয়েছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষায়ত প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি জনশিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রন্থাগার স্থাপনার কথা ভাবা হয়েছিল। প্রথমে আমাদের দেশে এ-বিষয়ে এগিয়ে এসেছিলেন নবজাগরণের কয়েকজন পথিকৃৎ, জাগ্রত যুবশক্তি ও ভারতবন্ধু কিছু বিদেশীয়।

কলিকাতায় একটি সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ৩১ আগস্ট তারিখে আহুত জনসভায় প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল : "That it is expedient and necessary to establish in Calcutta a Public Library of reference and circulation that shall be open to all ranks and classes without distinction and sufficiently extensive to supply the wants of entire community in every department of literature"[১] প্রাথমিক ব্যবস্থার পরে ১৮৩৬-এর ২১ মার্চ বঙ্গের এই প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার 'ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি' চালু হয়েছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রসময় দত্ত, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রমুখ নবজাগরণের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং কয়েকজন বিদেশীয় এক্ষেত্রে উদ্যোগী ছিলেন। 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি'-সহ এই গ্রন্থাগার বর্তমানের 'জাতীয় গ্রন্থাগার'।

বঙ্গের দ্বিতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার মেদিনীপুর শহরের অলিগঞ্জে রাজনারায়ণ বসু ১৮৫১ সালে স্থাপন করেছিলেন। সহযোগী বেইলি সাহেবের নামে এর পরিচয় হল 'বেইলি হল পাবলিক লাইব্রেরি' (এই গ্রন্থাগারের বর্তমান নাম 'রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার')।

বঙ্গের তৃতীয় ও হুগলি জেলায় প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার 'হুগলি পাবলিক লাইব্রেরি' ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় শিক্ষিত ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হুগলি-চুঁচুড়ার পৌরপিতা ঈশানচন্দ্র মিত্রের বিশেষ অবদান ছিল এই গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে। পরে তত্ত্বাবধানের অভাবে জেলার প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার মৃতপ্রায় অবস্থায় চুঁচুড়া আদালত এলাকায় বার (Bar) লাইব্রেরির পাশে একটি কক্ষে তার অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। এখানকার অবশিষ্ট গ্রন্থ সম্পদ রক্ষা করার জন্য এটিকে হুগলি জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার বাধা নিশ্চয়ই অনতিক্রমনীয় নয়। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত West Bengal District Gazetters—Hooghly (October 1972) গ্রন্থের ৫৫৮ পৃষ্ঠায় পরিবেশিত ভ্রান্তিমূলক তথ্য 'Hooghly Public Library now functions as the District Library'-এ বিষয়ে কি কোনও দিক নির্ণয় করছে ?

সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হুগলি জেলায় যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রাথমিক ধাপ শুরু হয়েছিল তা দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। 'মনীষার শ্রীক্ষেত্র' এই ছোট মাপের জেলায় গত শতকে স্থাপিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা আরও দশটি। সেগুলি হল—কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরি (১ এপ্রিল ১৮৫৮তে প্রতিষ্ঠিত), উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি (১৫.৪.১৮৫৯), জনাই পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৬০, মতান্তরে ১৮৬৯ খ্রি.) শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৭১), চন্দননগর পুস্তকাগার (১৮৭৩), বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৯১), শ্রীপুর কল্যাণ সমিতি লাইব্রেরি (১৮৯১), মণ্ডলাই পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৯৪), জামগ্রাম নন্দী পাবলিক লাইব্রেরি (১৩০১ বঙ্গাব্দ) এবং বিশ্বেশ্বরী লাইব্রেরি, কৈকালা (১৮৯৭ খ্রি.)। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৯-এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে যে ৪৬টি গ্রন্থাগার শতবর্ষ অতিক্রম করেছে বা করবে, তাদের মধ্যে ১১টির অবস্থান হুগলি জেলায়। লক্ষণীয়, এই ১১টির মধ্যে ৫টি গ্রন্থাগার তৈরি হয়েছিল গ্রামাঞ্চলে।

সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি প্রতিষ্ঠার পিছনে নব চেতনার প্রভাব অন্যতম কারণ হলেও অন্য দু-একটি কথাও উল্লেখনীয়। জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও পরবর্তী কালে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রসার গ্রন্থাগার আন্দোলনে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেওছিল। বেশ কিছু গ্রন্থাগারের নেপথ্যে স্বদেশী বই, এমন কি শাসকশক্তির দ্বারা নিষিদ্ধ বই রাখা হত এবং বিপ্লবী আন্দোলনের সহায়ক কাজকর্ম চলত। স্বভাবতই তদানীন্তন বিদেশি সরকার গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠাকে ভালো মনে গ্রহণ করেনি।

হুগলি জেলার পূর্বোক্ত ১১টি প্রাচীন গ্রন্থাগারের মধ্যে তিনটি গ্রন্থাগার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে গ্রন্থাগার আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করতে।

(ক) ডিরোজিও'র শিষ্য ও 'ইয়ং বেঙ্গল'দের অন্যতম শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-৯০ খ্রি.) তাঁর স্বগ্রাম কোন্নগরে ছাত্রদের জন্য 'কোন্নগর সেমিনারি' প্রতিষ্ঠার পরে বিদ্যায়তনের সীমিত সুযোগের বাহিরে সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়ে 'কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরি ও ফ্রি রিডিং রুম' স্থাপন করেছিলেন। শিবচন্দ্র এ-ব্যাপারে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে ছোট অঙ্কের দান গ্রহণ করেছিলেন। মূল উদ্দেশ্য ছিল—জনসাধারণ যেন এই সাধারণ গ্রন্থাগারকে সাধারণের গ্রন্থাগার ভাবতে পারেন। ১৯০৬ সালে স্থানীয় ফ্রেন্ডস লাইব্রেরি হুগলি জেলার দ্বিতীয় সাধারণ গ্রন্থাগারটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এখানকার প্রাচীন গ্রন্থ সম্পদের মধ্যে প্রাচীনতম হল উইলিয়ম স্যালমন্-লিখিত Polygraphice (১৬৮১ খ্রি.)।

(খ) বঙ্গের নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ বিদ্যোৎসাহী জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮০৮-৮৮ খ্রি.) ১৮৫০ সাল থেকে ব্যবস্থা নিয়ে লক্ষাধিক টাকার পুঁথি-পুস্তক-পত্রিকা সংগ্রহ ও ৮৫,০০০ টাকা ব্যয়ে গ্রন্থাগারভবন নির্মাণ করে ১২৬১ বঙ্গাব্দের নববর্ষ দিবসে উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি উদ্বোধনের ব্যবস্থা করেছিলেন। জয়কৃষ্ণকে 'দেশকুশল কীলালতৃষ্ণ' অর্থাৎ অমৃত-অভিলাষী দেশপ্রেমিক আখ্যা দিয়ে তখনকার এক নামী সংবাদপত্র 'সম্বাদ ভাস্কর' এর ২৭.১.১৮৫৭ তারিখের সংখ্যায় লেখা হয়েছিল—'উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় উত্তরপাড়া গ্রামে নিজ ব্যয়ে এক পুস্তকালয় নির্মাণ করাইতেছেন। ঐ গ্রন্থমন্দির প্রায় প্রস্তুন



হইয়া উঠিল অল্প দিন মধ্যেই প্রস্তুত হইবেক। মহাশয় পৃথিবীর প্রায় সকল খণ্ড হইতেই সংস্কৃতি গ্রন্থ সকল আনয়ন করাইতেছেন, বাবু সঙ্কল্প করিয়াছেন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত যত গ্রন্থ পাইবেন সমস্ত আহরণ করিয়া গ্রন্থালয়ে রাখিবেন এবং প্রয়োজনীয় ইংরেজী পুস্তকাদিও থাকিবে, আর বাঙ্গালা ভাষায় সমুদায় পুস্তক ও সকল ভাষার সমাচার পত্র সকল গ্রন্থাগারে রাখিবেন, পাঠকেরা যাহা চাইবেন তাহাই পাঠ করিতে পাইবেন...।'[১] গ্রন্থাগারের দ্বিতলস্থ অতিথি ভবনে গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন স্যার উইলিয়ম উইলসন হান্টার, রেভাঃ জেমস লঙ, স্যার এডুইন আর্নল্ড প্রমুখ অনেকে। লক্ষণীয়, এই লাইব্রেরি ভারতের প্রথম নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার এবং সে যুগের বৃহত্তম নির্দেশক লাইব্রেরি (reference library)।

এখানে এক সময়ে শ্রেষ্ঠ পাঠককে সুবর্ণপদক দিয়ে পুরস্কৃত করা হত। শিক্ষার প্রয়োজনে পুঁথি-পুস্তক-পত্রিকার সঙ্গে গ্রন্থাগারে স্থান পেয়েছিল দূরবীণ, অনুবীক্ষণ যন্ত্র, এমন কি নরকঙ্কালও। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে প্রকাশিত প্রায় ৬০০ বই এই লাইব্রেরি (বর্তমান নাম উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরি)-তে আছে। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থাগারটি গবেষকদের পক্ষে রত্নভাণ্ডার এবং বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এক অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান। এখানকার গ্রন্থসম্পদকে যথাযথভাবে রক্ষণ ও ব্যবহারের প্রয়োজনে অসাধারণ এই সাধারণ গ্রন্থাগারকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান (Institute of National Importance) হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন।

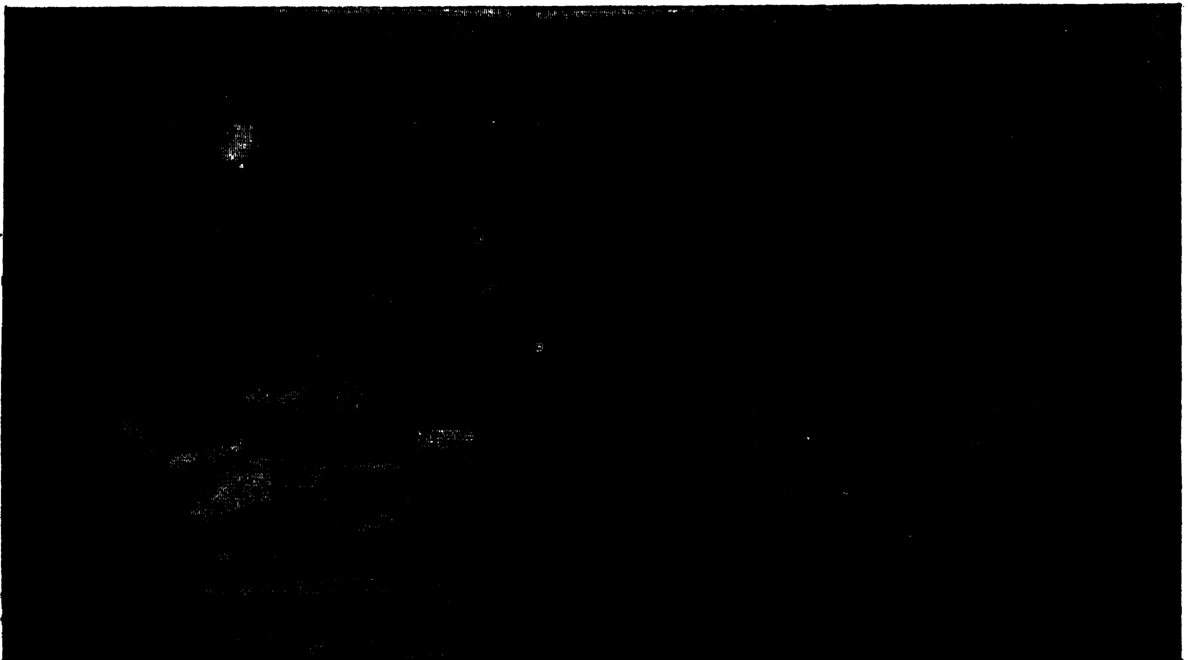
(গ) বাঁশবেড়িয়ার জমিদার দ্বিতীয় দেবরায়ের উৎসাহে কয়েকজন শিক্ষিত যুবক ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে যে ছাত্রসমিতি গঠন করেছিলেন তার উদ্যোগে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ১৮৯১ সালে একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। তার পর কয়েকবার স্থান বদল ও কয়েক বৎসর অনস্তিত্বের দুর্যোগ সামলে এই সাধারণ গ্রন্থাগার ১৯১৬ সালের মে মাসে পুনর্গঠিত হয়ে বাঁশবেড়িয়া মাইনর স্কুলে আশ্রয় নিয়েছিল। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরের পর গ্রন্থাগার তার ভূমিকা সুষ্ঠু পরিষেবা ও সমাজকল্যাণকর নানা কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে পালন করছে।

সাধারণ গ্রন্থাগারকে সজীব সমাজ শক্তি হিসাবে ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অনুশীলন এবং গ্রন্থাগারিক ও অন্য গ্রন্থাগারকর্মীদের যথাযথ ভূমিকায় উপস্থাপন—এ সবই গ্রন্থাগার আন্দোলনের অংশ। খুব সম্ভবত ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে এফ রালম্যান গ্রন্থাগার বিজ্ঞান কথাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন এবং এ-বিষয়ে পাঠদানের জন্য প্রথম শিক্ষায়তনটি মেলভিল ডিউই কর্তৃক ১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর ৫০ বৎসর পরে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাদান শুরু করেছিলেন ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথন। তবে বঙ্গদেশে প্রথম এ জাতীয় শিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছিল হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরিতে। বরোদা থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষা নিয়ে প্রমীলচন্দ্র বসু ফিরে আসার পর তাঁর সাহায্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম নেতা বাঁশবেড়িয়ার মুনীন্দ্র দেবরায় ১৯৩৪ সালের ১ জুন থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত শিক্ষণ-শিবিরের আয়োজন করেছিলেন। এই শিবিরে ঢাকা, আসানসোল, চন্দননগর, চুঁচুড়া, জিরাট ও বাঁশবেড়িয়া থেকে শিক্ষার্থীরা যোগ দিয়েছিলেন। মুনীন্দ্র দেবরায়ের উৎসাহে হুগলি জেলায় যে গ্রন্থাগার সমীক্ষা হয়েছিল তা বঙ্গের প্রথম।

গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে গণশিক্ষা ও জনচেতনা বাড়াতে ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে যথাযথভাবে প্রয়োগ সম্ভব করতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশেষ ভূমিকা আছে। দেশের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে গ্রন্থাগারের যে যোগসূত্র ছিল তার পরিণতিতে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে বেলগাঁও-এ কংগ্রেস অধিবেশনের পর ওই স্থানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে সারা ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে দেশবন্ধুর সাময়িক অনুপস্থিতির সময় সম্মেলনের কার্য-পরিচালনা করেছিলেন আইনসভার নবীন সদস্য শ্রীরামপুরের তুলসীচরণ গোস্বামী। পরের বৎসর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সভাপতি হিসাবে রেখে ২০ ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয়েছিল। তার আগেই মার্চ মাসের শেষ দিকে তুলসীচরণ গোস্বামীর পৌরোহিত্যে বাঁশবেড়িয়ায় যে প্রথম জেলা সম্মেলন হয়েছিল তার প্রধান সংগঠনের ভূমিকায় ছিলেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা মুনীন্দ্র দেবরায় ও তিনকড়ি দত্ত। পেশায় গ্রন্থাগারিক না হলেও রেল কর্মচারী তিনকড়ি দত্তকে 'an engineer by profession and a librarian by passion' বলা হয়েছে।

জেলা সম্মেলনের জেরে বাঁশবেড়িয়াকে সদর কার্যালয় করে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে জেলা গ্রন্থাগার সমিতি গঠিত হয়েছিল। এই প্রথম কাউন্সিলে সভাপতি ছিলেন তুলসীচরণ গোস্বামী সহসভাপতি—মুনীন্দ্র দেবরায় ও বরদাপ্রসাদ দে, সম্পাদক—অধ্যাপক মণীন্দ্রনাথ রুদ্র, যুগ্মসম্পাদক—তিনকড়ি দত্ত ও অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, হিসাব-পরীক্ষক—যদুগোপাল রায়। ১৯২৭-এ অধ্যাপক রুদ্র তাঁর নিজস্ব কাজের কারণে গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক হিসাবে থাকার অসুবিধা জানালে শ্রীরামপুরের ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। স্মরণীয়, হুগলি জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ পূর্বাঞ্চলের সব থেকে পুরাতন গ্রন্থাগার পরিষদ।

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে এডিনবরায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সম্মেলনে প্রতিনিধিরূপে যোগ দিয়েছিলেন বাঁশবেড়িয়ার নৃপতিকুমার ঘোষ। গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ মুনীন্দ্র দেবরায় ১৯৩২ সালে তৎকালীন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হিসাবে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করার জন্যে সভায় একটি বেসরকারি বিল এনেছিলেন। অবশ্য তখনকার আইনসভায় এ-বিল গৃহীত হতে পারেনি। ১৯৩৫-এ স্পেনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার ও গ্রন্থপঞ্জী কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ১৯৩৮ সালে তিনি ইউরোপে ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের উপর বক্তব্য রেখেছিলেন। মুনীন্দ্র দেবরায় মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত The Indian Library Journal-এর সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। অন্য কয়েকটি পুস্তকের



সঙ্গে তিনি 'গ্রন্থাগার', 'দেশ-বিদেশের গ্রন্থাগার' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশ গঠনের প্রয়োজনে মানুষের সচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্যোগ দেখা গিয়েছিল স্থানীয় মানুষদের পক্ষে। ১৯৬৬ সালের জুলাই-এ হুগলি জেলায় গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০০; পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলার মধ্যে এই সংখ্যা হল সর্বাধিক। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় (People's University) হিসাবে কাজে লাগানোর জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হল। এইভাবে গণমুখী শিক্ষা ও জনচেতনা বিকাশের প্রয়োজনে গ্রন্থাগারকে কাজে লাগাতে ১৯৭৯ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন (১৯৭৯) গৃহীত হয়েছিল। ১৯৩২-এ যে আইনের স্বপ্ন মুনীন্দ্র দেবরায় দেখেছিলেন, অবশেষে ৪৭ বৎসর পরে সেই আইন ব্যাপকতর ও গভীরতর সম্ভাবনা নিয়ে বাস্তবায়িত হল। তার ফলে গ্রন্থাগার-সংখ্যা এবং কর্মীদের সংখ্যা ও কার্যপরিধি বাড়ল পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই।

পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে এখন হুগলি জেলায় সরকারি ও সরকার-পোষিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ১৫৯; এগুলির মধ্যে জেলা গ্রন্থাগার (হুগলি জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, চুঁচুড়া)-১, বিশেষ গ্রন্থাগার (উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার)-১, শহর/মহকুমা গ্রন্থাগার-১২, উন্নীত শহর গ্রন্থাগার-১০, এরিয়া গ্রন্থাগার ২, গ্রামীণ/প্রাইমারি ইউনিট গ্রন্থাগার-১৩৩। তাছাড়া, জেলায় বেশ অনেকগুলি বেসরকারি গ্রন্থাগার আছে। থানা অনুসারে তাদের সংখ্যা : চুঁচুড়া থানায় ৪৬, ধনিয়াখালি-৩৫, পাণ্ডুয়া-৪৭, মগরা-১৭, পোলবা-২৩, দাদপুর-১৩, বলাগড়-৩৪, ভদ্রেশ্বর-২৫, চন্দননগর-৩৮, সিঙ্গুর-৬৩, হরিপাল-২৬, চণ্ডীতলা-৬৮, তারকেশ্বর-২৭, শ্রীরামপুর-৭৬, জাঙ্গিপাড়া-২৬, উত্তরপাড়া-৫২, আরামবাগ-৬৩, গোঘাট-২৯, খানাকুল-৪৯, পুরশুড়া-৩০, মোট ৭৮৪টি। কাজেই হুগলি জেলায় গ্রন্থাগারের সর্বমোট সংখ্যা প্রায় সাড়ে ন'শ। লক্ষণীয়, এগুলির মধ্যে ওড়িয়া, হিন্দি, উর্দু ও অন্ধ্রবাসীদের নিজস্ব ভাষায় কয়েকটি গ্রন্থাগার আছে।

১৯৭৭ সালে সরকার-অনুমোদিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ৫৯। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সেই সংখ্যা বেড়ে আড়াই গুণেরও বেশি হয়েছে। তবে এখনও প্রার্থিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়নি। প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি করে গ্রন্থাগার স্থাপনের নীতিকে মান্যতা দিতে সরকার-পোষিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা কমপক্ষে ২১১ হওয়া দরকার।

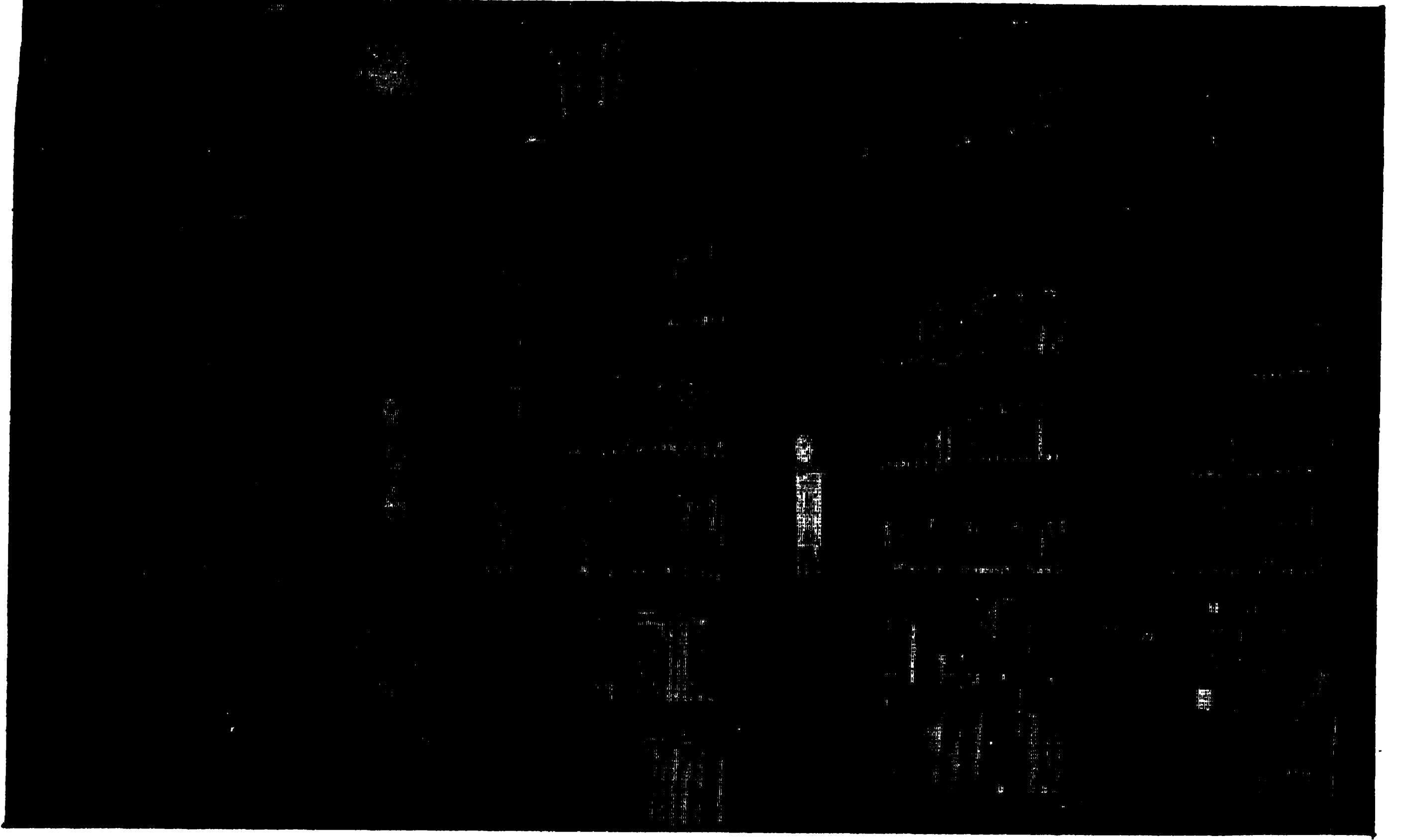
দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে গ্রন্থাগারকর্মী, যাঁরা সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে কাজ করবেন তাঁদের শিক্ষা, কর্মপরিধি, অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি নিয়ে সংগঠনের ভাবনা-চিন্তা প্রথম শুরু হয়েছিল হুগলি জেলাতেই। তার ফলশ্রুতিতে 'হুগলি জেলা গ্রন্থাগারিক ও কর্মীসভা' গড়ে উঠেছিল ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন হুগলি জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের তদানীন্তন গ্রন্থাগারিক ও সমিতি স্থাপনকল্পে সংগঠন প্রক্রিয়ার অন্যতম কর্মী অনিলকুমার দত্ত। এ ক্ষেত্রে সমিতির রাজ্য কমিটি গঠিত হয়েছিল আরও তিন বৎসর পরে।

এ কথা বিশেষভাবে স্মরণীয় যে হুগলি জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগঠকবৃন্দ গ্রন্থাগার ও তার কর্মীগোষ্ঠী—দুটি দিক নিয়েই চিন্তা করেছিলেন। জেলা সংগঠনের বড় অবদান 'লাইব্রেরি ম্যানুয়েল' ও 'ইউনিয়ন ক্যাটালগ অব বেঙ্গলি বুকস্ ও পিরিওডিক্যালস'। তাছাড়া ১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয়েছে গ্রন্থাগার নিয়ে প্রবন্ধ সঙ্কলন 'বিষয় : সাধারণের গ্রন্থাগার', যার গ্রন্থস্বত্ব পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি, হুগলি জেলা শাখার।

১৯৭৯ সালে গ্রন্থাগার আইন চালু করার পরে ১৯৮২ সালে দ্বিতীয়বার ক্ষমতালাভের পর বামফ্রন্ট সরকার পৃথক গ্রন্থাগার দপ্তর সৃষ্টি করলেন, রাজ্য ও জেলা গ্রন্থাগার প্রশাসনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনলেন এবং জেলা গ্রন্থাগার অধিকার বা লোক্যাল লাইব্রেরি অথরিটি গঠিত হল। শেষোক্ত সংস্থা (Local Library Authority, সংক্ষেপে L.L.A.) জেলা পর্যায়ে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে পরিচালনা করবেন এবং সেই ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পরিকল্পনা নেবেন। গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই সংস্থার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আগে সীমিতভাবে এ জাতীয় কাজের দেখাশুনা করতেন সমাজশিক্ষা দপ্তর। হুগলি জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক জ্ঞানী ও গুণীজনের অবদান আছে। তাঁদের মধ্যে গণ-আন্দোলনের দীর্ঘদিনের কর্মী কমল চট্টোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখনীয়। জেলা সমাজ শিক্ষা পর্ষদ ও পরবর্তী কালে স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের সদস্য হিসাবে এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হুগলি জেলা শাখার সভাপতিরূপে জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

গ্রন্থাগারের উপযোগিতা সম্পর্কে গত শতকে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—"ভদ্র ভদ্র স্থানে অথবা গ্রামে-গ্রামে সর্ব সাধারণের সর্বকালীন বংশপরম্পরা উপকারার্থে... এক এক গ্রন্থাগার স্থাপন করিলে... অতুল উপকার হইবে। গ্রাম মধ্যে এমত এক-এক গ্রন্থাগার হইলে গ্রামস্থ সকলে ওই স্থানে একত্র হইয়া সংবাদপত্র পাঠ দ্বারা জগতের বৃত্তান্ত জানিতে পারেন; মনোহর কবিতা পাঠ করতঃ মনকে প্রফুল্লকরণে সক্ষম হয়েন। ইতিহাস ও পদার্থবিদ্যা পাঠ দ্বারা জ্ঞান জ্যোতিতে ভাসমান হইতে পারেন, স্ব-গ্রামের মঙ্গলোন্নতির উপায় স্থির করেন এবং এতদ্দেশের রীতিনীতির পরিশোধন চেষ্টা করেন।"[৩]

সেই উপযোগিতার এলাকা এখন অনেক বেড়েছে। সাধারণ গ্রন্থাগার মানুষের হাতে এক অসাধারণ হাতিয়ার তুলে দিয়েছে। ব্রেখটের কথা স্মরণীয়—'ভুখা মানুষ ! ধরো বই—ওটা হাতিয়ার'। কার্ল মার্কসের জীবনী লেখক হাইনরিখ গেসকোভ জানিয়েছেন ব্রিটিশ মিউজিয়াম-এর পাঠকক্ষ ছিল মার্কসের রণক্ষেত্র। সেখানে তিনি নিয়মিতভাবে সকাল নটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত 'হাতিয়ার বই' নিয়ে শোষণ মুক্তির প্রাথমিক সংগ্রামে রত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ



গ্রন্থাগার সম্পর্কে বলেছেন—'মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গায় বাঁধাইয়া রাখিয়াছে'। গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পীঠভূমি হুগলি জেলায় এমন বহু পরিত্রাণ-মন্দির আছে যেগুলির ব্যবহারের মাধ্যমে চেতনার প্রসার ঘটেছে। এখনও অবশ্য শ্লথগতিতে।

গ্রন্থাগার যে জনগণের জীবনব্যাপী শিক্ষার স্থান, পত্র-পত্রিকা গ্রন্থ যে তার বড় শিক্ষক তা মানুষের মনে গেঁথে দেওয়ার লক্ষ্যে বই নিয়ে মেলার কথা ভাবা হয়েছিল। রাজধানী কলকাতায় বইমেলার সূচনা হয়েছিল ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে। বেশ কয়েক বৎসর সেখানে দুটি করে বইমেলা হত। পরে স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক গঠিত হওয়ার পর জেলান্তরেও বই নিয়ে এমন মেলা শুরু হয়েছে। মেলার সঙ্গে নানা প্রদর্শনী, আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকে। হুগলি জেলাতেও ১৯৮২ সাল থেকে এই জাতীয় মেলা হচ্ছে। প্রথম তিন বৎসর গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল চুঁচুড়া ময়দানে। পরে শ্রীরামপুর, চন্দননগর, উত্তরপাড়া, বাঁশবেড়িয়া, রিষড়া, শেওড়াফুলি ও কোন্নগরে বার্ষিক বইমেলাগুলি আয়োজিত হয়েছে। অবশ্য নানা কারণে দু-তিন বৎসর মেলার ব্যবস্থা করা যায়নি। জেলার দ্বাদশ বইমেলা ১৯৯৬-এর জানুয়ারি মাসে মহাসমারোহে ভদ্রেশ্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ ধরনের এই মেলাগুলিতে পাঠকের সঙ্গে পুস্তকের যোগাযোগ বাড়ে, ভবিষ্যতের পাঠক তৈরি হয় এবং বইয়ের জগতের সঙ্গে সানন্দ পরিচয়ের সুযোগ আসে। 'বইমেলার মাঠকে সে সময়ে একটি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বলে মনে হয়।'

হুগলি জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে এই আলোচনার শেষে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৪২ সালের আশ্বিন সংখ্যা থেকে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষণের কিয়দংশ উল্লেখ করছি। কোন্নগর পাঠচক্রের এক সভায় তিনি বলেছিলেন—"ইউরোপের গ্রন্থাগারের অবস্থা যে রকম উন্নত, সে রকম অবস্থা যে আমাদের দেশে কবে হবে—তা কল্পনাও করা যায় না। তবে যেটুকু হওয়া সম্ভব, তার জন্যে আমাদের চেষ্টা করা উচিত।"

"যাঁর যে পরিমাণ শক্তি লাইব্রেরি আন্দোলনের জন্য তাই দেন ত দেশের কাজ অনেক এগিয়ে যাবে।" সেই 'এগিয়ে যাওয়া'র পথে যাত্রা শুরু হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের সমবেত চেষ্টায় ও নিষ্ঠায় গ্রন্থাগার যেন প্রকৃতই জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে—তার মধ্যে মানুষ যেন 'আপনার পরিত্রাণ'কে প্রত্যক্ষ করতে পারে। গ্রন্থাগার-আন্দোলন প্রকৃত অর্থে সার্থকতা লাভ করবে যদি সাধারণ গ্রন্থাগার এমন সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে পারে।

তথ্যসূত্র :

১। উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল (যোগেশচন্দ্র বাগল স্মৃতিরক্ষা কমিটি), চঞ্চলকুমার সেনগুপ্ত লিখিত প্রবন্ধ 'গ্রন্থাগার ও যোগেশচন্দ্র', পৃ. ৮৮-৮৯।

২। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র—বিনয় ঘোষ, তৃতীয় খণ্ড (১৯৬৪), পৃ. ৫২২-২৩।

৩। দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (১৯৮১), পৃ. ৪৩৩।

হুগলি জেলার সংবাদপত্র সাময়িকী

এম এম ইয়াসিন

পূর্বাহ্নেই বলে নেওয়া ভাল, এই রচনার উদ্দেশ্য কিন্তু হুগলি জেলার পত্র-পত্রিকার সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করা নয়। কারণ নির্ধারিত পরিসরে সে কাজ যেমন অসম্ভব তেমনই স্বল্প আয়াসে তা করাও দুঃসাধ্য। তাই আমরা আলোচনার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছি হুগলির পত্র-পত্রিকার উত্তর-সত্তর দশকীয় বিবর্তন ও পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় বর্তমান অবস্থাটুকু তুলে ধরার। এখানে প্রয়োজনবোধে কিছু কিছু পত্র-পত্রিকার নাম স্বাভাবিকভাবেই উল্লিখিত হবে তবে অনুল্লেখের তালিকায় যারা পড়বে তাদের ক্ষোভ প্রশমনার্থে এটুকু বলা দরকার যে, হুগলি জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে শুরু করে শহরতলি ও শিল্পাঞ্চল জুড়ে অজস্র পত্র-পত্রিকার প্রকাশ। অর্ধ-সাপ্তাহিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক, বাৎসরিক সংবাদপত্র ও সাময়িকী, বিভিন্ন সংস্থার মুখপত্র, উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিবিধ সংকলন ইত্যাদির নিয়মিত-অনিয়মিত প্রকাশনার সংখ্যা প্রায় দেড় থেকে দু-হাজারের কাছাকাছি। তাই সকলের বিবরণ দাখিল করা অন্যতম গবেষণাকর্মের বিষয়। তবুও আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকবে অনেককে ছোঁয়ার।

সত্তর দশকের গোড়ায় "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় সুধীরকুমার মিত্র লিখেছেন— "উনিশ শতকে বাঙ্গলা দেশে পত্র-পত্রিকার জনক-জননী

ছিল হুগলী জেলার শ্রীরামপুর ও চুঁচুড়া।* কিন্তু বর্তমানে সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশে হুগলীর গৌরব এখন কলকাতা গ্রহণ করিয়াছে। ইহার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথম কারণ কলিকাতায় বহু লোকের বাস ও বহুবিচিত্র রুচির পাঠকের সমাবেশ এবং দ্বিতীয় কারণ কাগজ ছাপাখানা প্রভৃতির প্রাচুর্য ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহের সুবিধা। ইহার ফলে বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান এবং সংবাদপত্রের জনক হুগলী আজ তাহার পূর্ব গৌরব ধীরে ধীরে হারাইয়া ফেলিতেছে"।

সুধীরবাবুর এই বক্তব্যের জের টেনেই বলা যায় হুগলি জেলার পত্র-পত্রিকার (সব জেলাভিত্তিক কাগজেরই এক অবস্থা) পথের বাধা মূলত অর্থনৈতিক অপ্রতুলতা। জেলাকেন্দ্রিক পত্র-পত্রিকার নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশনা ধরে রাখতে তাই সম্পাদকদের হিমসিম খেতে হয়। তার উপর যদি পত্র-পত্রিকা পাঠককে টানতে না পারে এবং যদি সাহিত্য সেবার জন্য, তার উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে তা না হয়ে কেবলমাত্র 'পত্রিকার জন্য পত্রিকা' বা 'সম্পাদক হবার জন্য পত্রিকা' হয় কিংবা শুধুমাত্র বিজ্ঞাপন ধরার ছাঁকনিজালে তা পরিণত হয় তবে সে-সব পত্র-পত্রিকার জীবন সংশয়ের আশংকা থেকেই যায়। হুগলি জেলার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই।

উনিশ শতকীয় নবজাগরণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তথা বাঙালির মননে-চিন্তনে-শিক্ষা ও চেতনের জগতে যে আন্তঃ ও বাহ্য পরিবর্তনের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল তার উৎস ভূমি হিসাবে হুগলি জেলা ইতিহাসে সোনার আসন দখল করেছে। হুগলি জেলা বাঙালি জাতিকে দিয়েছে ভাব প্রকাশের উপযুক্ত গদ্য ভাষা, বাংলা সাহিত্য নির্মাণকারী অজস্র বরেণ্য মনীষা, বিদ্যাবিস্তারের জন্য মুদ্রাযন্ত্র আর জনমানসের ভাব-ভাবনা প্রতিফলিত করার লেখদর্পণ হিসাবে সাময়িক পত্রিকা ও সংবাদপত্র। ১৮১৮-তে প্রথমে 'দিগ্দর্শন' ও প্রায় এক মাসের মধ্যে প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ' দিয়ে বাংলা ভাষার সাময়িকী-শৈশব শুরু। তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে খ্রিস্টান মিশনারিদের হাত ধরেই সে বাংলার আঙিনায় প্রথম পা-পা করে হেঁটেছিল। তারপর নানা রূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ একবিংশ শতকের চৌকাঠে পৌঁছে তার কতই না সাজসজ্জা।

কিন্তু যে মূল প্রবাহ হুগলি জেলার উৎসস্থল থেকে কলকাতা মহানগরী তথা সমগ্র বঙ্গদেশকে প্লাবিত করেছিল সেই সাময়িকীর গঙ্গোত্রী হুগলি আজ ক্ষীণবাহ। যদিও অজস্র ছোট-বড়-মাঝারি পত্র-পত্রিকার ঢেউ তাকে আন্দোলিত করার চেষ্টা করছে, তবুও তার গভীরতার অবসান ঘটেছে। তাই হুগলির প্রজ্ঞা-মনীষার সপ্তডিঙা আজ মনপবনের নাও হয়ে কলকাতাকেন্দ্রিক ভাবপ্রবাহে তার স্বচ্ছন্দ বিহারের প্রয়াস পায়।

হুগলি জেলার পত্র-পত্রিকার জগতে এখনও শ্রীরামপুর, চন্দননগর ও চুঁচুড়ার প্রকাশনা সংখ্যাধিক্যে সবার শীর্ষে। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে নব্বইয়ের দশকের গোড়া পর্যন্ত এই ত্রয়ী পিতৃভূমির সঙ্গে তাল রেখে সমগ্র হুগলি জেলা থেকেই পত্র-পত্রিকা প্রকাশের বন্যা বয়ে গেছে। এদের মধ্যে অনেকেরই বাল্যে বা কৈশোরে মৃত্যু ঘটেছে, আবার অনেকেই বাঞ্ছিত যৌবনের সময়কে ছুঁয়ে ফেলার গৌরব দাবি করতে পারে।

* এ বিষয়ে একটি তালিকা প্রবন্ধের পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

. উত্তরপাড়া থেকে শুরু করে চুঁচুড়া হয়ে বাঁশবেড়িয়া পৌরাঞ্চল পর্যন্ত উল্লিখিত সময়ের মধ্যে দুই শতাধিক পত্র-পত্রিকার জন্ম ও তার মধ্যে কিছু কিছুর মৃত্যুও ঘটেছে। এই সময়ে প্রাগুক্ত ঈষৎ বক্র সরলরেখায় অবস্থান করা পত্র-পত্রিকাগুলির যতটা সম্ভব সংগৃহীত তালিকা হল নিম্নরূপ।

উত্তরপাড়া : সংহতি চেতনা, মফঃস্বল বাণী, উত্তরপাড়া সংবাদ, চেতনা, মহুয়া, লিপিমিতা, আনন্দ, যত্রতত্র, ঘাসপাতা, চিকন, লেখা, উত্তরাণ, লিটল্ ম্যাগাজিন।

হিন্দমোটর : অনির্বাণ, কবি, প্রগতি, সহবাস, পূষণ, কেন।

কোন্নগর : নাগরিক, দর্পণ, গদ্যপদ্য, মৃন্ময়ী, উন্মেষ, কৃষ্টিদীপ, বন্ধু, বন্দনা, চাষবাস।

রিষড়া : পত্রী, রিষড়া-সমাচার।

শ্রীরামপুর : সত্যালোক, শ্রীরামপুর সমাচার, ঐকতান, শহরতলী, সারথী, শিশুপ্রিয়, ত্রিবেণী, শীর্ষবিন্দু, যুবস্বপ্ন, সময়, সংলাপ, কণ্ঠস্বর, বাইসন, পল্লীচাষ, মানচিত্র, অভিনব অগ্রণী, অভিজ্ঞান, রক্তিমা, পল্লীডাক।

শেওড়াফুলি : কেয়া, ক্যাকটাস।

বৈদ্যবাটি : সন্দীপন, যোগাযোগ, শাব্দিক, চুলোর্মি, মৌন, শতরূপা, সাহিত্যপত্র।

ভদ্রেশ্বর : শব্দস্রোত, শব্দবর্ণ, অনিকেত, দিনাদি, সৈকত।

চন্দননগর : গোধূলিমন, মফঃস্বল, লেখনী, বর্তমান ভারত, প্রগতি, সমাচার, সম্ভাবনা, ধারাপাত, ভুবন, কুঁড়ি, অংকুল, ঝর্ণা, দূর্বা, স্বতন্ত্র জোয়ার, দ্বন্দ্বশৃক।

চুঁচুড়া : চুঁচুড়া বার্তাবহ, উৎসাহ, কোরক, সায়ক, সংকেত, সংকেতে অনুভূতির সেতু, হুগলী ডাক, পরিস্থিতি, ভাগীরথী এক্সপ্রেস, আরবান টাইমস্, মনোতর্পণ, রাজ্য আলেখ্য, তরঙ্গ, জ্যোতিষ্ক, কুঁড়ি কোরক, অণুসংহিতা, বিংশ শতকের পদাবল্লী, সংহতি, কেন্দ্র বার্তা, অনন্ত।

হুগলি : ভ্রমণবার্তা, হুগলী সংবাদ, উষালোক, সমাধান, মুখপত্র, মনকমল, দোলা, ডেলী প্যাসেঞ্জার, অঙ্গীকার, আজকের হুগলি।

ব্যাণ্ডেল : চরাচর, মনমধুকর।

দেবানন্দপুর : পাণ্ডুলিপি।

খন্যান : মেঠোদর্শন।

বাঁশবেড়িয়া পৌরাঞ্চল (ত্রিবেণী-সাহাগঞ্জ) : সাহিত্যসেতু, জনতার কথা, দেহলী, ছররা, ঐশ্বর্য, সোপান, দিবাকর, নবজাগরণ, ধূমকেতু, অর্ণব, ঝংকার, মুক্তংনী, অশনি, পরিবর্তক, ছড়াছড়ি, চিত্রধ্বনি, মুখপত্র, নাবিক, পাড়ি, কোয়েল, স্বপ্নসবুজ, সবুজ নক্ষত্র।

পাশাপাশি সিঙ্গুর থেকে তারকেশ্বর, ডানকুনি থেকে বেলমুড়ি হয়ে ধনিয়াখালি পর্যন্ত প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলির তালিকা হল এরূপ—

সিঙ্গুর : দীপ্তি, শিশুতীর্থ, সবুজ সংকেত, মিতালী, দ্রাঘিমা-৮৮।

নালিকুল : উন্মেষ, খেয়া, সবুজ, জঙ্গম, প্রতীতি।

হরিপাল : যুগসন্ধানী, প্রয়াস, ঊর্মি (প্রথমে কামারকুণ্ডু), ধ্রুবতারা, অভিজ্ঞান, পাঞ্চজন্য, পল্লীশ্রী, ভাগীরথী, মালঞ্চ, পরিবেশ প্রকৃতি, সূর্যোদয়, সমাধানের খোঁজে।

লোকনাথ : উদ্বাস্তু।

তারকেশ্বর : পঞ্চায়েত, মহুয়া, পল্লীজোয়ার।

ডানকুনি : সঞ্চারী, প্রত্যয়, পান্থতৃষা, বিদগ্ধ বৈশাখ, পান্থ পিপাসা।

বারুইপাড়া : অরুণোদয়।

বেগমপুর : মণিমুক্তা।

বলরামবাটী : কালের যাত্রার ধ্বনি, যুব অভিযান, রাবণ।

বেলমুড়ি : প্রতিম্বিক

ধনিয়াখালি : হুগলী কথা, লিপিকা, সূর্য্যশিখা, অঙ্গীকার।

সিয়াখালা : পথের দাবি।

আরামবাগ থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলি হল—নিম্ন দামোদর বার্তা, উত্তর দ্বারকেশ্বর বার্তা, খানাকুল বার্তা, মহাজন্মের লগ্ন, আরামবাগ পত্রিকা, আরামবাগের কথা, আলিঙ্গন, রাজহাটি বন্দর থেকে রাণীরঞ্জন, দিশারী, সারথী, নন্দপুর থেকে সোনালী রোদ, বেঙ্গাই থেকে সাহিত্য জগৎ, পলাশী থেকে প্রভাতী, আঁটপুর থেকে রূপসী ধরিত্রী, রাজবলহাট থেকে অনির্বাণ, মৌ, জাঙ্গীপাড়া থেকে তর্জনী, রামপাড়া থেকে কোরাস, বাহিরগঞ্জ থেকে মালঞ্চ, অন্য দিকে দ্বারহাট্টা থেকে কাকলী, হান্দড়া থেকে পল্লীমানস, মশাট থেকে বাংলার মুখ, চণ্ডীতলা সংবাদ, সোমড়া থেকে বলাগড় বার্তা, মল্লিকা মাধুরী, বাঁদপুর থেকে ছন্দক, জবাব, চাঁপাডাঙা থেকে তারকেশ্বর বার্তা, জগমোহনপুর থেকে চলন্তিকা, পথ, আকুনী থেকে সবুজ ছড়াকার্ড, অগ্রণী, ফুরফুরা থেকে ফুরফুরা বার্তা, বৈঁচী থেকে বঙ্গবার্তা, এবং অর্জুনগেড়িয়া থেকে পল্লীপ্রতিভাও এই সময়ের মধ্যেই প্রকাশিত।

এই গেল মোটামুটিভাবে সংগৃহীত একটা তালিকা, যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, হুগলির মাটিতে পত্র-পত্রিকা জন্মাবার মতো অনুকূল পরিস্থিতি আজও রয়েছে। তবে তার লালন পালন-পরিচর্যার বিষয়টি কিন্তু আজ দারুণভাবেই উপেক্ষিত—এ কথা বলতে কোনও বাধা নেই।

উত্তর-সত্তর দশকে হুগলির পত্র-পত্রিকাগুলোর আঙ্গিক অবয়ব এবং বিষয়-বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কেউ শুধুমাত্র শিশুদের জন্য, কেউবা কেবলই চাষবাস পোলট্রি-ডেয়ারি কেন্দ্রিক, আবার কেউ ভ্রমণ, কেউ বিজ্ঞান, কেউবা ছড়া, আর কেউ কেউ শুধুই সৎ সাহিত্যের কারবারী। আবার প্রগতিশীল সাহিত্য চর্চার প্রয়াসও দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু পত্র-পত্রিকায়।

শুধুমাত্র সাহিত্য পত্রিকার নিরলস সম্পাদনা অব্যাহত রয়েছে জেলার মধ্যে এমন প্রতিনিধি-স্থানীয় হবার দাবি রাখে যে পত্র-পত্রিকাগুলি তাদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় ৩৬ বছর ধরে চলা চন্দননগরের গোধূলিমন পত্রিকার। হুগলি জেলার আধুনিক পত্র-পত্রিকার জগতে প্রথম থেকেই ইলাস্ট্রেশন সহযোগে মূল্যবান লেখা ছাপায় অগ্রণী, অশোক চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত এই পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের ক্ষেত্রেও অনন্য। বিভিন্ন সময়ে সাহিত্যের আড্ডা বসানো, সম্মেলন করা ইত্যাদি কাজে বিশিষ্ট ভূমিকা আছে এই পত্রিকার। এদের সাম্প্রতিকতম বিশেষ সংখ্যায় চন্দননগর ও জগদ্ধাত্রী পূজার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

এর পর নাম করতে হয়, ডঃ জগবন্ধু কুণ্ডুর সম্পাদনায় বাঁশবেড়িয়া থেকে প্রকাশিত সাহিত্যসেতুর। ২১ বছর ধরে চলা এই পত্রিকাও বাৎসরিক কবি সম্মেলনে সারা বাংলাকে এক সঙ্গে ধরার চেষ্টা করে। মাঝে মাঝেই মহা মূল্যবান বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর সাম্প্রতিকতম শক্তি চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা বিশেষ সমাদৃত হয়েছে। প্রতি বছর একজন বাংলা ভাষার ও একজন ভারতীয় অন্য ভাষার সাহিত্য সেবককে এঁরা পুরস্কৃত করেন।

বৈদ্যবাটীর সন্দীপন পত্রিকা ২৭ বছর পার করে দিয়েছে। কাশীনাথ ঘোষের সম্পাদনায় এই পত্রিকায় প্রতিবছর ১৫ আগস্টের বাৎসরিক সাহিত্য সম্মেলন এবং সংবর্ধনা অনুষ্ঠান জেলা ও জেলান্তরের কবি-সাহিত্যিকদের বুকে ঢেউ তোলে। এ রকমই হরিপাল থেকে প্রকাশিত দীপালি দে সরকার সম্পাদিত উর্মি পত্রিকা নির্ভেজাল সাহিত্য সেবায় ব্রতী। বাৎসরিক সাহিত্য অনুষ্ঠান, সংবর্ধনা, বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে, এটিও অগ্রণী। রজত জয়ন্তী বর্ষে তার প্রবন্ধ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

হুগলির নন্দনপুর থেকে প্রশান্ত মালিক সম্পাদিত সোনালী রোদ একযোগে হাওড়া ও কলকাতা থেকে বাইশ বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। সাহিত্য সভা, সংবর্ধনা এবং সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করে এটিও সকলের দৃষ্টি কেড়েছে। ভ্রমণ সাহিত্য সৃষ্টিতে দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর নিরলস পরিশ্রম চালিয়ে যাচ্ছেন প্রমোদাদিত্য মল্লিক তাঁর ভ্রমণ বার্তা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করে। উত্তরপাড়ার লেখা পত্রিকা ঋত্বিক সংখ্যা প্রকাশ করে এখনও বিশেষ সংখ্যার জগতে সুনামের অধিকারী হয়ে আছে।

সাহিত্য পত্রিকাকে জনচেতনার বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা এবং প্রগতিশীল সাহিত্যচর্চা ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক ও আন্তর্দেশীয় সমস্যা, বিজ্ঞান-অপবিজ্ঞানের পার্থক্যজনিত সমস্যা, যুবমননের অবক্ষয় প্রতিরোধ, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে উত্থান-পতনে পশ্চিমবঙ্গবাসীর অবস্থা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ে একাধিক পত্রিকা দশ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে লড়াই করে যাচ্ছে বলা চলে। এদের মধ্যে আছে প্রবীর রায়চৌধুরীর সংকেত, অমর পাল-জগবন্ধু দাসের যুব অভিযান, দীপন গোষ্ঠীর অঙ্গীকার এবং উন্মেষ, ঐকতান বাংলার মানুষ প্রভৃতি পত্রিকাগুলি। ছোটদের পত্রিকাগুলির মধ্যে দিলীপ বাগের অভিনব অগ্রণী ও চাতরার শিশুপ্রিয়র নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই হবে।

এ রকমই কিছু সাপ্তাহিক-পাক্ষিক-মাসিক কিছু সংবাদপত্র যারা সাধারণ মানুষের কাছে নতুন যুববার্তা পৌঁছে দেবার ব্রত নিয়ে কাজ করছে, মানুষের নানা সমস্যাকে তুলে ধরে বা সমাধানের পথে এগিয়ে দিচ্ছে, সর্বোপরি মানুষের বাঁচার লড়াইয়ে এরা সহযোদ্ধার ভূমিকা পালন করছে। এদের মধ্যে নাম করা যায় কৃষ্ণচন্দ্র ভড়ের সত্যলোক, বলাগড় বার্তা, চণ্ডীতলা সংবাদ, নিম্ন দামোদর বার্তা খানাকুল বার্তা ইত্যাদির।

উত্তর সত্তরে অণু বা মিনি পত্রিকার এক সময় খুব চল হয়েছিল, বেড়িয়েছিল কিছু ছড়া কার্ডও। দীপালি দে সরকারের উর্মি,

এম এম ইয়াসিনের ছন্দক, উত্তরপাড়ার উত্তরাণু, মামুদপুরের রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপসী প্রভৃতি সাময়িক দাগ কেটে ছিল। তেমনই মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডুর ছররা আর কাজী সামাদাৎ আলির সবুজ ছড়া কার্ড বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। দীর্ঘ বছর ধরে বলরামবাটী থেকে সতী চট্টোপাধ্যায় সম্পূর্ণ হাতে লিখে ফুলস্কেপ কাগজে চার-ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকা কালের যাত্রাধ্বনি বের করছেন একক পরিশ্রমে, অকাতরে তরুণ সাহিত্যসেবীদের মধ্যে তা বিলি করছেন। সাহিত্য সংস্কৃতির যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে এই পত্রিকার জুড়ি নেই।

হুগলি জেলার পত্র-পত্রিকাগুলির কাজের পরিধিও এই সময়ের মধ্যে নানাভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রক্তদান শিবির, বিনা মূল্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানো, এলাকার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ, জেলা ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণ এ সব তো আছেই। তা ছাড়াও নানা বিচিত্র কাজের মধ্যে এরা জড়িয়ে পড়েছে। সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণে এদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

পত্র-পত্রিকার ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সাহিত্য সমাবেশের পাশাপাশি শুধুমাত্র সাহিত্যচর্চার জন্য সাহিত্য সংস্থা হিসাবে চলন্তিকা সাহিত্যবাসর এবং ডানকুনি সাহিত্যবাসর কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিল। এদের মুখপত্র হিসাবে দুর্গাপদ মান্নার সম্পাদনায় চলন্তিকা এবং দীপংকর বিশ্বাস, চিরঞ্জীব দাস, মুকুল বাগচী ও কর্ণ চক্রবর্তীর সম্পাদিত সঞ্চারী কিছু সাহিত্যিক তৈরির কৃতিত্বের দাবিদার।

পরিশেষে এ প্রশ্নও উঠে পড়ে সাহিত্যিক উৎকর্ষ কতটা সাধিত হয়েছে এই সময়ের মধ্যে। সে বিষয়ে পত্র-পত্রিকাগুলি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় হুগলির পত্র-পত্রিকাগুলির মান বহু প্রকাশের কৃত্রিমতায় অনেকটাই নিম্নগামী; তবুও কিছু কিছু লেখক হুগলির পত্র-পত্রিকাতেই পরিপুষ্ট হয়েছেন এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিবিধ ধারায় নিজেদের বৈশিষ্ট্যজনিত সুযোগ এবং স্থানও লাভ করেছেন।

শেষ কথা, এই আলোচনা স্বয়ং-সম্পন্ন নয়, ভবিষ্যতের পরিপূরক আলোচনা হুগলি জেলার পত্র-পত্রিকার ইতিহাস নির্মাণে সহায়ক হবে—এই আশা রাখি।

পরিশিষ্ট

উনিশ শতকে প্রকাশিত পত্রিকার তালিকা

	পত্রিকার নাম	প্রথম প্রকাশকাল	সম্পাদকের নাম
	শ্রীরামপুর থেকে		
১।	দিগ্দর্শন (মাসিক)	এপ্রিল ১৮১৮	জে মার্শম্যান
২।	সমাচার দর্পণ (সাপ্তাহিক)	২৩ মে ১৮১৮	জে মার্শম্যান
৩।	বাঙ্গাল গেজেটি (সাপ্তাহিক)*	জুন (?) ১৮১৮	গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য
৪।	গভর্নমেন্ট গেজেট (সাপ্তাহিক)	১ জুলাই ১৮৪০	জে সি মার্শম্যান
৫।	মঙ্গলোপাখ্যান পত্র (মাসিক)	জানুয়ারি ১৮৪৩	জে রবিনসন
৬।	উপদেশক (মাসিক)	জানুয়ারি ১৮৪৭	জে ওয়েঙ্গার
৭।	সত্যপ্রদীপ (সাপ্তাহিক)	৪ মে ১৮৫০	মেরিডিথ টৌনেন্ড
৮।	জ্ঞানারুণোদয় (মাসিক)	৩১ জানুঃ ১৮৫২	কালিদাস মৈত্র ও যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়
৯।	সংবাদ শশধর (সাপ্তাহিক)	৬ জুলাই ১৮৫২	কালিদাস মৈত্র
১০।	অরুণোদয় (পাক্ষিক)	আগস্ট ১৮৫৬	লালবিহারী দে
১১।	বিজ্ঞানমিহিরোদয় (মাসিক)	এপ্রিল ১৮৫৭	নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
১২।	Friend of India	৩০ এপ্রিল ১৮১৮	উইলিয়ম কেরী

এ ছাড়া, আরও কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল 'দিগ্দর্শন'-এর ইংরেজি সংস্করণ ও 'সমাচার দর্পণ'-এর ফার্সি সংস্করণ কিছুকাল প্রকাশিত হত।

	পত্রিকার নাম	প্রথম প্রকাশকাল	সম্পাদকের নাম
	হুগলি-চুঁচুড়া থেকে		
১।	সুবোধিনী (পাক্ষিক)	১৮৫৮	রামচন্দ্র দিচ্ছিত
	ঐ (সাপ্তাহিক)	১২৯৭ বঙ্গাব্দ	ব্রজবল্লভ রায়
২।	এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ	৪ ডিসেঃ ১৮৬৮ (নবপর্যায়)	ভূদেব মুখোপাধ্যায়
৩।	শিক্ষা দর্পণ ও সংবাদসার (মাসিক)	মার্চ ১৮৬৪	ভূদেব মুখোপাধ্যায়
৪।	চিকিৎসা দর্পণ (মাসিক)	১২৭৮ বঙ্গাব্দ	যদুনাথ মুখোপাধ্যায়
৫।	Bengal Magazine (মাসিক)	১৮৭২	লালবিহারী দে
৬।	সাধারণী (সাপ্তাহিক)	১২৮০ বঙ্গাব্দ	অক্ষয়চন্দ্র সরকার
৭।	ভারত দর্পণ ও পুলিশ বার্তাবহ (পাক্ষিক)	১২৮০ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত
৮।	আজীবন নেহার (মাসিক)	১২৮১ বঙ্গাব্দ	মীর মশাররফ হোসেন
৯।	কুমুদিনী (মাসিক)	১২৮১ বঙ্গাব্দ	হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১০।	প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ (মাসিক)	১২৮১ বঙ্গাব্দ	সারদাচরণ মিত্র ইত্যাদি
১১।	সাহিত্য কুসুম (মাসিক)	১২৮২ বঙ্গাব্দ	বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়
১২।	দৈনিক বার্তা	১ আগস্ট ১৮৮৩	গিরীন্দ্রলাল চৌধুরী (প্রকাশক)
১৩।	বয়স্য (মাসিক)	১২৯১ বঙ্গাব্দ	অরুণকুমার দত্ত
১৪।	ভারত সঞ্জীবন (মাসিক)	১২৯৫ বঙ্গাব্দ	ভূপতিনাথ দাস
১৫।	পূর্ণিমা (মাসিক)**	১৩০০ বঙ্গাব্দ	ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬।	চুঁচুড়া বার্তাবহ (সাপ্তাহিক)	১৩০০ বঙ্গাব্দ	দীননাথ মুখোপাধ্যায়
১৭।	বাসনা (মাসিক)	১৩০১ বঙ্গাব্দ	কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়
১৮।	জ্যোৎস্না হার (মাসিক)	১৩০১ বঙ্গাব্দ	সিদ্ধেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়
১৯।	দর্শক (সাপ্তাহিক)	১৩০১ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত
২০।	সনাতন ধর্মকথা (মাসিক)	১৩০৪ বঙ্গাব্দ	দুর্গাদাস রায়
২১।	জননী (মাসিক)	১৩০৫ বঙ্গাব্দ	প্রসাদদাস গঙ্গোপাধ্যায়
২২।	প্রতিমা (মাসিক)	১৩০৫ বঙ্গাব্দ	বামাচরণ বসু

*বাঙ্গাল গেজেটির কোনও কপি পাওয়া যায়নি; বড়া গ্রামস্থ সম্পাদকের পত্রিকা মনে হয় শ্রীরামপুরের প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

**পূর্ণিমা হুগলি থেকে মুদ্রিত ও বাঁশবেড়িয়া থেকে প্রকাশিত।

সাক্ষরতার আলোকে হুগলি জেলা

জয়কুমার ঘোষ, সুলেখা মুখোপাধ্যায় ও অক্ষয় বন্দ্যোপাধ্যায়

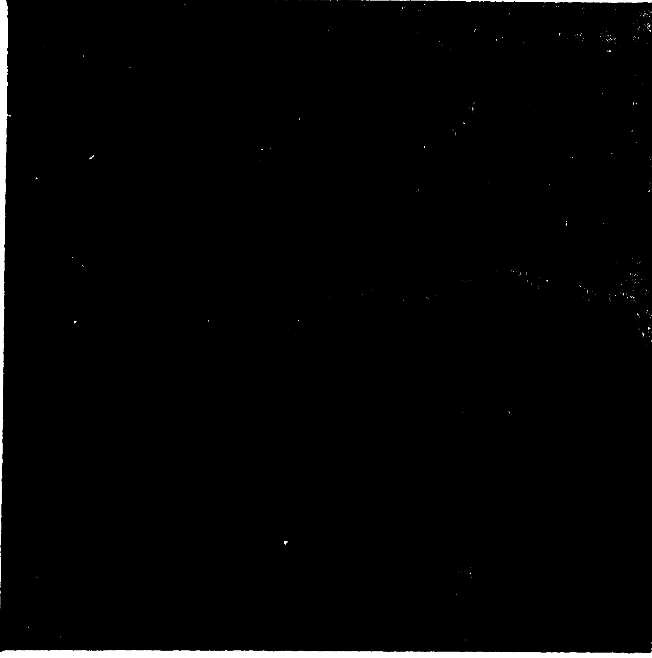


পশ্চিমবঙ্গের একটি ছোট জেলা হুগলি। গঙ্গা, দামোদর ও বহু নদীর পলিতে উর্বর এই হুগলির ইতিহাসও সুপ্রাচীন। প্রাচীনকাল থেকেই এর ঐশ্বর্য বিদেশিদের আকর্ষণ করেছে। ফলস্বরূপ এর ধর্ম, শিক্ষা এবং সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করেছে। হুগলির কথা বলতে গেলে এর শিক্ষার ঐতিহ্যের কথায় আসতেই হবে। আজও 'খনার বচন' লোকের মুখে মুখে ফেরে।

নবসংস্কৃতি পথিকৃৎ ও বাংলা গদ্যসাহিত্যের পথিকৃৎ রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর হুগলিরই দুই মহান সন্তান। সকল ধর্মের মূল কথা সাধারণের কাছে সরলভাবে তুলে ধরার অসীম ক্ষমতার অধিকারী রামকৃষ্ণও এই হুগলির সন্তান। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, অ্যানি বেসন্ত এবং বহু গুণীজনের জ্ঞানে ও দানে সুসমৃদ্ধ এই হুগলি।

এই হুগলির নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টাও স্বাভাবিকভাবেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং নিরলস—

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আসে বিদ্যাসাগরের কথা। তাঁর সময়েই যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, শ্রমজীবী মানুষের সন্তানদের শিক্ষা দিতে হলে শিক্ষাকে অবৈতনিক হতে হবে। তিনি ১৮৫৩ সালে বীরসিংহ গ্রামে নিজ ব্যয়ে একটি অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, সাধারণ মানুষের শিক্ষার জন্য বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষার জন্য 'বর্ণপরিচয়' রচনা করেন—এ সবই তাঁর কালজয়, বৈপ্লবিক মানসিকতার পরিচয়।



'লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের' ভিত্তিপ্রস্তরের আবরণ উন্মোচন করছেন হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

চীনা ছাত্রদের গণশিক্ষা অভিযানের প্রেরণায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন ১৯৩৬—৩৮ সালে যুক্ত বাংলার হুগলি জেলা ও উত্তরবঙ্গে 'নিরক্ষরতা দূরীকরণ' কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। ১৯৩৭ সালে ডুবিরভেড়িতে গণশিক্ষার কাজ শুরু হয়। একটি নৈশ বিদ্যালয়ও খোলা হয়, এই কাজ দিন পনের চলে। ১৯৩৮-এর ১ মে থেকে ৩ জুন পর্যন্ত রাঘবপুর গ্রামকে কেন্দ্র করে গণশিক্ষা অভিযান চলে। নানা বাধার মধ্যেও তৎকালীন ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক কমল চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাঘবপুর ও ছিনামোড়ে দুটি নৈশ বিদ্যালয় চালান মোহিত মুখার্জি, শরদিন্দু গাঙ্গুলি, উমেশ নন্দী, মধু বসু, অজিত ঘোষ, সুশীল ঘোষ, মদন সুর। প্রাচীর সংবাদপত্র, পোস্টার, বিভিন্ন বিষয়ে ম্যাজিক লণ্ঠন অনুষ্ঠান, গান, নাটক ইত্যাদি দ্বারা শেষ পর্যন্ত গ্রামের মানুষের মন জয় করে ওই ছাত্রদল।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হলে দেশ ভাগকে মেনে নিয়েই। সংবিধানে থাকে দশ বৎসরের মধ্যেই সকলের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার বিধান। যা আজও কাগজে-কলমেই রয়েছে। স্বাধীন ভারতে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কিছু সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হয়—১৯৬২ সালে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্টের, সোসাল এডুকেশনের আওতায় এক বয়স্ক সাক্ষরতা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। ওইগুলি ক্লাব বা সমিতির মাধ্যমে চালিত হত। পড়াশুনার সঙ্গে গান-বাজনার ব্যবস্থাও ছিল। সরকারি তরফে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন মুখ্যসেবিকা ও সোসাল এডুকেশন অরগানাইজার। ১৯৬২-তে এই প্রকল্প বন্ধ হয়ে যায়। ওয়ান টিচার পাঠশালা প্রচলিত হয়। এই ব্যবস্থায় শিক্ষকদের ৩০ টাকা ভাতা দেওয়া হত। ১৯৬৫ সালে কৃষি ব্যবহারিক শিক্ষা পরিকল্পনা (F F L P) চালু হয়।

১৯৬৫, ৮ মে থেকে ১৯ মে তেহেরানের শিক্ষা সম্মেলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রথমে N.A.E.P. এবং ১৯৭৮ সালের ২ অক্টোবর জাতীয় সাক্ষরতা মিশন (N.L.M.) গঠিত হয়। বিধিবদ্ধ শিক্ষার বাইরে শিক্ষা কর্মসূচি প্রয়োগ করে ১০ কোটি লোককে সাক্ষর করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ১৯৮০ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার এই প্রকল্প গ্রহণ করে। এই প্রকল্প পাশাপাশি দুটি করে ব্লক নিয়ে গঠিত হত। প্রত্যেক প্রকল্পের ৩০০টি কেন্দ্র ছিল। শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষকদের ভাতা ছিল ১২৫ টাকা। ৩০টি করে কেন্দ্র দেখার জন্য পর্যবেক্ষক নিযুক্ত ছিল। হুগলি জেলায় এইরূপ চারটি প্রকল্প চালু হয়—

তারকেশ্বর-হরিপাল, পাণ্ডুয়া-বলাগড়, চণ্ডীতলা-জাঙ্গিপাড়া ও গোঘাট ১-গোঘাট ২।

সরকারি প্রচেষ্টা ছাড়াও দানা বেঁধে উঠছিল আর এক সাক্ষরতা আন্দোলন। ১৯৭২ সালে বাঁকুড়া কাউন্সিল সভায় তখনকার যুব ফেডারেশন নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সুসংবদ্ধ প্রস্তাব গ্রহণ করে—উন্নয়নের সঙ্গে সাক্ষরতা কর্মসূচিকে যুক্ত করে। আবার ১৯৮৭ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ২৩তম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও ৪৩তম স্বাধীন উত্তর ভিয়েতনামের সাক্ষরতার জন্য ডিগ্রি জারির দিন বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতিও গঠিত হয়।

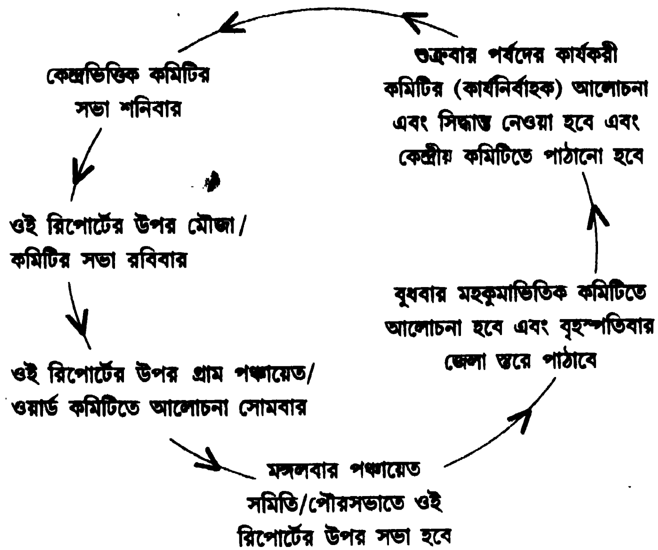
হুগলি জেলাই ১৯৭২ পরবর্তীকালে, প্রথম যুব ফেডারেশনের কর্মসূচিকে রূপ দিতে সচেষ্ট হয়। সমস্ত গণ-সংগঠনের সহায়তায় হুগলি জেলা নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও জনশিক্ষা প্রসার সমিতি গড়ে ওঠে। প্রথম সভাপতি হন দীনেশ ভট্টাচার্য। সহ-সভাপতি হন কমল চট্টোপাধ্যায়। যুগ্ম সম্পাদক হন জেলা যুব সম্পাদক সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় ও জেলা গণনাট্য সম্পাদক অমিয় নন্দী। কমিটি গঠিত হয় ১৯৭৪-এর নভেম্বরে। পরিকল্পনামতোই ভূমি সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী লড়াকু কৃষকদের প্রথমে অভিযানের আওতায় আনা হয়। বলাগড়ের শ্রীকান্ত গ্রামে প্রথমে শিবির হয়। তারপর পরপর খানাকুল, পাণ্ডুয়া, চণ্ডীতলা, হরিপাল, পোলবা থানাগুলিতে শিবির সংগঠিত হয়। এই কাজে প্রথম যে ছাত্র ও যুবকেরা নিজেদের যুক্ত করেন তাঁরা হলেন—স্বপ্না দাস, মিত্রা ভট্টাচার্য, প্রদীপ, বিজয়, অরুণ, জ্যোতি, শ্যামল, দিলীপ, জয়ন্ত, দেবু, রমেন, স্বপন, পুলক, মানু, অতনু। ২১ দিনের মধ্যেই এই শিবিরের পড়ুয়ারা 'গণশক্তি' পড়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছিল। এর পর নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ চলে বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির মাধ্যমে।

জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের উদ্যোগ এবং পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচি গ্রহণ করার পর ১৯৯০ সালে ২২ সেপ্টেম্বর বিশাল জনসভায় দলমতনির্বিশেষে সকলে শপথ নেন 'হুগলি জেলাকে নিরক্ষরতা মুক্ত করার'। নেতৃত্ব থাকে হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও হুগলি জেলাশাসক এ কে সিংয়ের উপর। তৈরি হয় 'হুগলি জেলা সার্বিক সাক্ষরতা ও জনস্বাস্থ্য শিক্ষা পর্ষদ'। ঠিক হল এখন থেকে সরকারি, বেসরকারি, বঙ্গীয় সাক্ষরতা সমিতির উদ্যোগে যে সকল সাক্ষরতা প্রকল্প চলছিল, তা বন্ধ থাকবে। সকলের উদ্যোগ যুক্ত হবে হুগলি জেলা সার্বিক সাক্ষরতা ও জনস্বাস্থ্য শিক্ষা প্রকল্পের সঙ্গে। উপদেষ্টামণ্ডলী গঠিত হয় প্রাক্তন মন্ত্রী ও বর্ষীয়ান নেতা ভবানী মুখোপাধ্যায়, তখনকার বিদ্যুৎ ও জনস্বাস্থ্য কারিগরিমন্ত্রী প্রবীর সেনগুপ্ত এবং বর্ধমান বিভাগের কমিশনারকে নিয়ে। পর্ষদের

সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহ-সভাধিপতি। যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন জেলাশাসক ও জেলা পরিষদের শিক্ষা স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ। পর্ষদের সদস্য হলেন সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব, গণ-সংগঠনের প্রতিনিধি, জেলার সকল সাংসদ এবং বিধায়ক, পুরসভা ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিগণ, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের জেলা পর্যায়ের আধিকারিকগণ, জেলা পরিষদের সচিব ও সমস্ত সদস্য, বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি, আধা-সরকারি সংস্থার প্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

প্রতিদিনের কাজের সমন্বয় ও তত্ত্বাবধানের জন্য জেলাগতভাবে পর্ষদের কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে একটি কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার এই কমিটিসভার জন্য নির্ধারিত হয়। পর্ষদের কার্যালয় জেলা পরিষদ ভবনেই হয়।

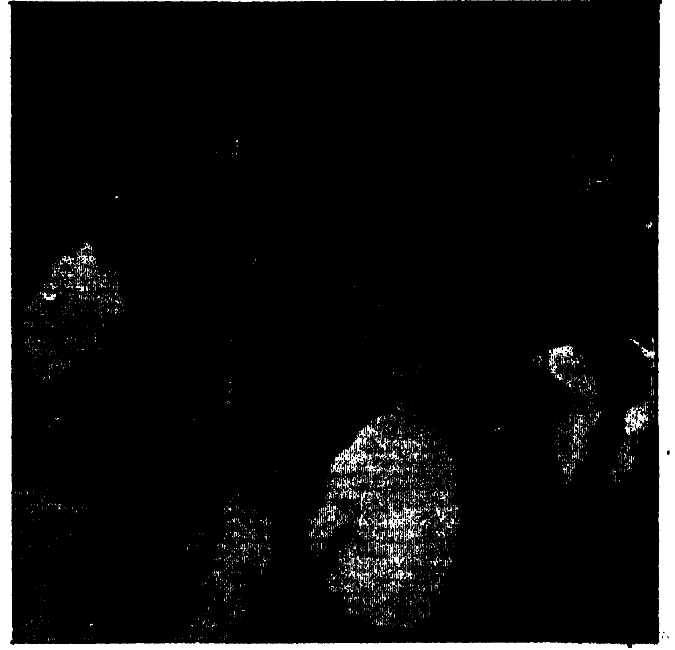
জেলার ধাঁচেই মহকুমা, ব্লক/মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েত/ওয়ার্ড, মৌজা এবং পড়ুয়াদের কেন্দ্রীয় কমিটিগুলিও গঠিত হয়। বিভিন্ন স্তরের কার্যনির্বাহক কমিটিগুলির সভা ও তাদের মধ্যে সমন্বয় হত এই ভাবে—



স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও আদর্শউদ্বুদ্ধ অসংখ্য কর্মিবাহিনী প্রয়োজন নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য, যাঁরা হবেন এই সাক্ষরতা কর্মের প্রাণ।

হুগলি জেলা সার্বিক সাক্ষরতা ও জনস্বাস্থ্য শিক্ষা পর্ষদ প্রায় একযোগে নিম্নলিখিত কাজগুলি শুরু করে—

প্রথমত—জেলাব্যাপী দ্রুত ও ব্যাপক সমীক্ষা পরিচালনার পরিকল্পনা হয়, নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা, তার অবস্থান, নারী, পুরুষ, শিশু প্রভৃতি নিয়ে—এই দায়িত্ব পালন করে গ্রাম পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলি। এর ফলে হুগলি জেলার নিরক্ষরতার চিত্র



এইরূপ—

	বয়ঃক্রম		জনসংখ্যা
	৯ — ৫০	=	৮,০৩,২৩৪
১।	৯ — ১৪	=	১,৩৯,৮৭৩
২।	১৫ +	=	৬,৬৩,৩৬১
৩।	পুরুষ	=	৩,৩০,০৯২
৪।	স্ত্রী	=	৪,৭৩,১৪২

দ্বিতীয়ত—স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষণ। তিন শ্রেণীর প্রশিক্ষক—কি পারসন (Key persons), মাস্টার ট্রেনার (M.T.) ভলেন্টিয়ার ইনস্ট্রাক্টর (V.I.),। তিন ধাপে প্রশিক্ষণ হয়। Key persons এবং resource persons-দের প্রশিক্ষণ দেন পঃবঃ S.R.C. ও উড়িষ্যা S.R.C.,। কি পারসনস বা M.T.-দের এবং M.T.-রা V.I.-দের প্রশিক্ষণ দেন। ফলে জেলায় তৈরি হয়—

Key person	=	৫৬ জন
M.T.	=	১,৪৮৭ জন
V.I.	=	৬৮,৬৮৯ জন
Resource persons	=	২৫১ জন

তৃতীয়ত—কেন্দ্র খোলা এবং এর জন্য পরিবেশ তৈরি। ইতোমধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি তাদের নিরক্ষরতার কেন্দ্রসংখ্যা এবং বিভিন্ন কেন্দ্রের জন্য V.I.-দের নির্দিষ্ট করে। ১৯৯০-এর নভেম্বর থেকেই হুগলি জেলার প্রায় সর্বত্র সাক্ষরতা কেন্দ্র চালু হয়ে যায়। হুগলিই প্রথম জেলা যেখানে বাংলা, হিন্দি, উর্দু, তেলুগু ও ওড়িয়া—এই পাঁচ ভাষায় সাক্ষরতা কার্যক্রম চলেছে। পাঠ্যপুস্তক পঃবঃ S.R.C., জামিয়া মিলিয়া S.R.C.; বিহার ও ওড়িশা NCRT থেকে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ভদ্রেশ্বর মিউনিসিপালিটি



যেখানে পাঁচ ভাষাতেই একসঙ্গে সাক্ষরতা কেন্দ্র চলেছে, তারা নিজেরাই অন্য ভাষার পাঠ্যপুস্তক অনুবাদ করে প্রাথমিক কাজ চালায়।

সাক্ষরতা কেন্দ্রগুলি ১০ থেকে ১৫ জন নিরক্ষর পড়ুয়া নিয়ে তৈরি হয়। হুগলি জেলা সার্বিক সাক্ষরতা ও জনস্বাস্থ্য শিক্ষা পর্ষদ প্রত্যেক পড়ুয়াকে পাঠ্যবই, খাতা, স্লেট, পেন্সিল, প্রত্যেক কেন্দ্রে বোর্ড, চক, কেরসিন তেল, হাজিরা খাতা আর প্রত্যেক V.I.-কে স্বেচ্ছাসেবক নির্দেশিকা ও জনস্বাস্থ্য নির্দেশিকা-(হুগলির নিজস্ব তৈরি) সরবরাহ করে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পৌরসভার মাধ্যমে।

সাক্ষরতা কেন্দ্রগুলিকে সজীব ও কেন্দ্র খোলার কাজ দ্রুততর করার জন্য দুটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়, নিয়মিত তদারকি ও পরিবেশ তৈরি। এই জেলার সকল সরকারি, বেসরকারি কার্যালয়, কল-কারখানা, ক্লাব, সকল সাংস্কৃতিক মঞ্চ, বিজ্ঞান মঞ্চ, সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এই কার্যে যুক্ত হতে আহ্বান জানানো হয় এবং যুক্ত করা হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে এবং এককভাবে পঞ্চায়েত সমিতি/ পৌরসভা/ গ্রাম পঞ্চায়েত সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে।

কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক দিকটি শঙ্কর মুখোপাধ্যায় আন্তরিকতার সঙ্গে পরিচালনা করেন। কেন্দ্রীয়ভাবে জেলার সকল লোকশিল্পীকে নিয়ে কর্মশালা পরিচালনা করা হয়। নাটক কর্মশালাও পরিচালিত হয়। জেলার সর্বত্র এদের দ্বারা অনুষ্ঠান করা হয়।

কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, ভদ্রেশ্বর পৌরসভা এবং আরামবাগ মহকুমা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে নিপুণভাবে প্রয়োগ করে সাক্ষরতার কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

কর্মশালাগুলি পরিচালনা ও পরিকল্পনাকে পঃবঃ S.R.C. সব সময় সাহায্য করে। বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির রাজ্য সম্পাদক সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষরতা কর্মসূচির প্রতি অধ্যায়ে করণীয় কাজগুলি মনে করিয়ে দিয়ে সঠিক পথে এগোতে সাহায্য করেন। আর শিক্ষণপ্রণালী সঠিকভাবে করার প্রয়োজনীয়তা পঃবঃ S.R.C.-র শক্তি মণ্ডল সাক্ষরতাকর্মীদের বোঝাতে সক্ষম হন। B.J.V.J. পরিচালনায় অডিও (Audio) ক্যাসেট তৈরি হয় ও প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে দেখানও হয়। সাক্ষরতা নিয়ে ভিডিও (documentary) তৈরি হয় ও দেখান হয়। লোকশিল্পী যেমন— বাউল, তর্জা, মনসা-মঙ্গল, পীরের গীত—সবকিছুকেই সাক্ষরতাকে প্রচারের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

পড়ুয়াদের উৎসাহিত করার জন্য খেলাধুলা, গান, নাটক ইত্যাদির প্রতিযোগিতা পরিচালিত হয় সমগ্র সাক্ষরতা কর্মসূচি চলাকালীন। এর ফলেই রাজ্য স্তরে নবসাক্ষররা ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ১৯৯৪-১৯৯৫ সালে অংশগ্রহণ করে। হুগলি জেলার সাফল্য উল্লেখযোগ্য। যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিল।

পোস্টার, দেয়াল লিখন, হোরডিং, ব্যানার সারা হুগলি জেলায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বহু পদযাত্রা, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষকে নিয়ে হয়। সাইকেল মিছিল, মানববন্ধন, জনসভা, স্বাস্থ্য জাঠা, বিজ্ঞান জাঠা লাগাতার সংগঠিত করা হয়। ১৯৯০-এর জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত B.J.V.J. ১৭১টি শো দেখায়। জেলার সমস্ত সিনেমা হলে সাক্ষরতা স্লাইড দেখানো হয়। রেডিও এবং টিভিতে ও কভারেজ করে। সাংবাদিক সম্মেলন হয়।

হুগলি জেলার ৪২টি কারখানাকে এইভাবে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয়। কারখানার ১৮,০০০ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা কেন্দ্রে আনা সম্ভব হয়। কারখানার ভেতরেই সাক্ষরতা কেন্দ্র চলে। এমন কি জেলখানার ভিতরেও সাক্ষরতা কেন্দ্র খোলা সম্ভব হয়।

কেন্দ্র খোলা ও তাকে উজ্জীবিত রাখার দ্বিতীয় শক্তি নিরবচ্ছিন্ন সাক্ষরতা কেন্দ্রগুলির পরিদর্শন। এইদিকে হুগলি জেলা সাক্ষরতা ও জনস্বাস্থ্য শিক্ষা পর্ষদ বিশেষ লক্ষ রেখেই সাক্ষরতা সেল

তৈরি করে। এর সদস্য—মহকুমা, ব্লক ও পৌরসভার সরকারি আধিকারিগণ। মহাপ্রশিক্ষকদের (M.T.) উপর দায়িত্ব পড়ে ৩০টি করে কেন্দ্র রোজ তদারকি করার। আর একটি বিশেষ তদারকি ব্যবস্থা হল এরিয়া ম্যান (Area man) নিযুক্তিকরণ। এই ব্যবস্থায় সাক্ষরতা পর্ষদের প্রত্যেক সদস্যকে তার পছন্দমতো কোনও ওয়ার্ড বা গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব নিতে বলা হয়। এই ব্যবস্থায় সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে সাক্ষরতা কর্মসূচিতে নতুন মাত্রা সংযুক্ত হয়।

কেন্দ্র খোলার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি দেওয়া হয় নিরক্ষরতার উৎসমুখ বন্ধ করার দিকে। ৬-৯ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তির জন্য উৎসাহিত করা হয়। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পায়—

১৯৮৯ সালে	—	১,২৩,২২৩ জন ছাত্র
১৯৯০ সালে	—	১,২৭,২৭২ জন ছাত্র
১৯৯১ সালে	—	১,৮২,৪৫৪ জন ছাত্র
১৯৯২ সালে	—	২,৭৮,০৩৬ জন ছাত্র

হুগলি জেলায় সাক্ষরতা কর্মসূচির সঙ্গে স্বাস্থ্য, শিক্ষা যুক্ত করার ফলে জেলার স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব লক্ষিত হয়।

সম্প্রদায় সম্প্রীতির স্থান হয়ে ওঠে কেন্দ্রগুলি।

জাতীয় সাক্ষরতা মিশন নির্ধারিত পাঁচ মাসের মধ্যে বহির্মূল্যায়নে যেতে সক্ষম হয়নি হুগলি জেলা। প্রাকৃতিক বাধা, কৃষি, ভোট এবং আরও অনেক কেন্দ্রই মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায়। কোথাও নিভু-নির্ভুলভাবে চলে।

আবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পদযাত্রা ইত্যাদি জোরদার করা হয়। এই পর্যায়ে তদারকি ব্যবস্থাকে প্রচণ্ডভাবে কাজে লাগান হয়। পূর্বে উল্লিখিত সাক্ষরতা সেল, পর্ষদের সদস্য ও বিভিন্ন এলাকার উপযুক্ত ব্যক্তিত্বদের নিয়ে তদারকি টিম তৈরি হয়, নাম হয় 'Crash Team'। এই টিমের অভিমত ও সুপারিশ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পৌরসভাগুলিতে সরবরাহ করা হয়। এর ফলে সারা জেলায় সাক্ষরতার কাজে বিশেষ উদ্যমের সৃষ্টি হয়।

এর পর হুগলি জেলা সার্বিক সাক্ষরতা ও জনস্বাস্থ্য শিক্ষা পর্ষদ এই সময় বহির্মূল্যায়নের কথা ভাবতে শুরু করে। এর প্রস্তুতি হিসাবে হুগলি জেলা অনেকগুলি মধ্যবর্তী মূল্যায়নের ব্যবস্থা করে—

পরমেশ আচার্য মহাশয় ২০.৯.৯১ থেকে ১২.১০.৯১ পর্যন্ত তাঁর মনমতো অঞ্চলের কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং বহির্মূল্যায়নের পূর্বে করণীয় বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ দেন।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডাল্ট এডুকেশন বিভাগের ডিরেক্টর রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য ও তাঁর টিম ২.১০.৯১ থেকে ১২.১০.৯১ পর্যন্ত মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করেন। এই সময় পাঁচটি ভাষাতেই এই মূল্যায়ন কার্য হয়।

J.R.S.-এর মাথুর মহাশয়ও তাঁর পরামর্শ দেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার মিঃ ভি জে টমাস ২.৩.৯২ থেকে ৬.৩.৯২ হুগলি জেলার বিভিন্ন স্থানের সাক্ষরতা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

এই সকল মূল্যায়ন পর্ষদকে তার পরবর্তী কাজ নির্ধারণ করতে সহায়তা করে। যেমন রত্নেশ্বর ভট্টাচার্যের পদ্ধতিতে M.T. ও Key person-রা প্রশিক্ষণ পান—কিভাবে মাঝপথে থেমে যাওয়া কেন্দ্রগুলির পাঠ কি করে দ্রুতগতি করা যায়। প্রয়োজনমতো V.I.-দের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এতে V.I. এবং পড়ুয়াদের মধ্যে উৎসাহ ও সাহস বৃদ্ধি পায়।

হুগলি জেলা এইভাবে জাতীয় শিক্ষা মিশনের বহির্মূল্যায়নের জন্য তৈরি হয়। চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি হয়—ডঃ পবিত্র সরকার ভি সি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, অরুণচন্দ্র দত্ত সভাপতি পঃবঃ I.D.C., সত্যেন মৈত্র, ডিরেক্টর রাজ্য উপকরণ কেন্দ্র (W.B.S.R.C.), ভবেশ মৈত্র সভাপতি পঃবঃ বোর্ড অব প্রাইমারি এডুকেশন, ডঃ আর এস মাথুর ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাডাল্ট এডুকেশন, মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর ভারত সরকার, ডঃ রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য, তুষার মুখোপাধ্যায় প্রিন্সিপাল শ্রমিক বিদ্যাপীঠ কলকাতা এঁদের নিয়ে।

কলকাতা ISI-এর সুবীর মিত্র মহাশয়ের উপদেশমত কম্পিউটারে সামপ্লিং পদ্ধতি দ্বারা বহির্মূল্যায়নের কেন্দ্র বাছাই করা হয়। রবীন্দ্রভারতী ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা চিহ্নিত সাক্ষরতা কেন্দ্রগুলিতে বহির্মূল্যায়নে অংশ নেয়। বহির্মূল্যায়নের পত্র তৈরি করেন সত্যেন মৈত্র ও রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য। চূড়ান্ত রূপ দেয় বিশেষজ্ঞ কমিটি। পঠন-লিখন ও গণিত প্রত্যেকটিতে সমান জোর দেওয়া হয়। প্রত্যেকটির উত্তীর্ণ মান ধরা হয় ৫০% এবং তিনটি বিষয়ে একত্রে উত্তীর্ণ যোগ্যতা ধরা হয় ৬০%। বাংলা ভাষার মূল্যায়নপত্র ছাত্ররা পরীক্ষা করার পর কম্পিউটারে মূল্যায়ন হয় ১৭ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ, ১৯৯২। চূড়ান্ত মূল্যায়নের ফলাফল—

ভাষা	কেন্দ্রে উপস্থিত পড়ুয়ার সংখ্যা	উত্তীর্ণ পড়ুয়ার সংখ্যা	%
বাংলা	৫৬৭৭	৪৯৯১	৮৭.৯১
হিন্দি	১০২২	৯৫৫	৯৫.০০
উর্দু	৩৪১	২৯৮	৮৭.৫
ওড়িয়া	৭০	৬৯	৯৪.৫
তেলেগু	২৬	২৫	৯৬.১৫

চূড়ান্ত বহির্মূল্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে চূড়ান্ত আন্তঃমূল্যায়নও চলছিল এর আওতায়। ছিল ৫৫,৫৯৭ জন পড়ুয়া। এদের মূল্যায়ন সাক্ষরতা কেন্দ্রে V.I. ও M.T. নেন ; বি ডি ও, এস ডি ও, সরকারি আধিকারিক এবং পর্ষদের পর্যবেক্ষণে পরিচালিত হয়।

মূল্যায়নের ফল—

	মূল্যায়নে অংশগ্রহণকারী পড়ুয়ার সংখ্যা	উত্তীর্ণ পড়ুয়ার সংখ্যা	%
শহর এলাকা	১৩,৯৭৫	১২,০৭০	৮৬.৩৭
গ্রাম এলাকা	৪১,৬২৩	৩৫,৭৮৪	৮৬.১৭



২০১টি বর্তমানে ২১১ গ্রাম পঞ্চায়েত ও ১২টি পৌরসভায় মূল্যায়ন থেকে দেখা যায় N.L.M.-এর নির্দেশানুসারে উত্তীর্ণ পড়ুয়ার সংখ্যা = ৬.৪৩ লক্ষ (৯—১৪ বছর বয়সসীমার ০.৩৩ লক্ষ যাদের স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে তাদের নিয়ে)।

পড়ুয়াদের সে সীমায় পৌঁছয়নি তাদের সংখ্যা	=	০.৭৩ লক্ষ
কেন্দ্রে ধরা গেল না যাদের, তার সংখ্যা	=	০.৮৭ লক্ষ
		৮.০৩ লক্ষ

অর্থাৎ ৮.০৩ লক্ষ নিরক্ষর পড়ুয়ার মধ্যে এই সাক্ষরতা অভিযান চালিয়ে হুগলি জেলা ৮০% এর বেশি পড়ুয়াকে N.L.M-এর সিদ্ধান্তমতো সাক্ষর করতে পেরেছে। এর ফলে সঠিকভাবেই ১৯৯২-এর ৩০ মার্চ কলকাতায় বহির্মূল্যায়ক অনিল বোরদিয়া ইউনিয়ন সেক্রেটারি, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ভারত সরকার, শ্রীমতী কউন্যাল ডেপুটি সেক্রেটারি শিক্ষা দপ্তর ভারত সরকারের উপস্থিতিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে হুগলি জেলাকে 'পূর্ণ সাক্ষর' ঘোষিত করা হয়।

এই অভিযানে হুগলি জেলার পৌরসভাগুলির মধ্যে ভদ্রেশ্বর একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। পৌর চেয়ারম্যান দেবগোপাল চক্রবর্তীর যোগ্য নেতৃত্বে সাক্ষরতা অভিযান ও আন্দোলনের এক আদর্শ চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে, সাক্ষরতা অভিযান চলাকালীনই হুগলি জেলায় বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি গঠিত হয়। দেবগোপাল চক্রবর্তী হলেন প্রথম সম্পাদক এবং প্রয়াত বিজয়কৃষ্ণ মোদক হন সভাপতি এবং সহ-সভাপতি হন কমল চট্টোপাধ্যায়।

গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে বহু গ্রাম পঞ্চায়েতেই এই সাক্ষরতা কার্যক্রম সুন্দরভাবে চলেছিল। কানাইপুর তার মধ্যে একটি। এই সফলতার সকল প্রশংসাই প্রাপ্য হুগলি জেলার সকল V.I.-এর। এর মধ্যে ব্যাণ্ডেল অঞ্চলের কয়েকজন V.I. ব্রত হিসাবে নিয়েছিলেন সাক্ষরতার কাজটি। V.I.-এর অভাব পূরণ করার জন্য এক-একজন ৫০, ৭০ এমন কি ১০০ জন পড়ুয়ার সাক্ষরতার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিয়েছিল। পড়ুয়াদের বসার জায়গা শোবার খাট থেকে বাইরের দরজা পর্যন্ত থাকত। পরিবারের সকলে সেটা মেনেও নিয়েছিলেন। এইরূপ একটি কেন্দ্রে এসে ভবেশ মৈত্র মহাশয় মুগ্ধ বিস্মৃত হয়ে পড়েন। সামগ্রিকভাবে আরামবাগ মহকুমা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।

'পূর্ণ সাক্ষর' হুগলি জেলায় এখন সাক্ষরোত্তর পর্ব চলছে। দুঃখের সঙ্গে বলতেই হয়, এই পর্যায়ে এখনও হুগলি জেলা সফলকাম হতে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় নিচ্ছে, যদিও দুটি অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন হয়েছে।

হুগলি জেলা সার্বিক সাক্ষরতা ও জনস্বাস্থ্য শিক্ষা পর্ষদের চেষ্টার সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি। ভাবনা-চিন্তা চলছে, কিভাবে এই কাজে হুগলি তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবে।

হুগলির সাক্ষরোত্তর পর্বের কাঙ্ক্ষিত ফল পেতে দেরি হবার একটি কারণস্বরূপ বলা যায় যে, V.I. ও M.T. সহ বহু সাক্ষরতা কর্মীই এই কাজকে একটি সীমিত (পাঁচ মাস) সময়ের কাজ ভেবেই এই অভিযানে সামিল হয়েছিলেন। কিন্তু এই আন্দোলনের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে যুক্ত হওয়ার মানসিকতা তাঁরা রাখতে পারছেন না। কিন্তু এখন নেতৃত্বের শিক্ষণের ফলে ধীরে হলেও যে কর্মিবাহিনী তৈরি হচ্ছে, তাঁরা সঠিকভাবে বুঝেই সাক্ষরতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। সাক্ষরতা অভিযানের যে জোয়ারের স্রোত মরুপথে পথ হারিয়েছে, সেই স্রোতধারাকে সঠিক পথে আনতে ব্রতী হুগলি জেলা সার্বিক সাক্ষরতা ও জনস্বাস্থ্য শিক্ষা পর্ষদ। আলোর পথযাত্রী থামতে জানে না। হুগলি জেলা তার সাক্ষরোত্তর পর্বের বহির্মূল্যায়নের পথ ধরে দ্রুত জনশিক্ষা নিলয়মের দিকে পা বাড়িয়েছে।

হুগলি জেলার লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন

প্রবীরকুমার রায়চৌধুরী

ম্যাগাজিনের অর্থ—বন্দুকের যে অংশে গুলি মজুত থাকে সেই আধারটি। সেই রকম, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিস্ফোরক মুদ্রিত আকারে যে পত্রিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাকেই আমরা বলে থাকি লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন। যে পত্রিকা সামাজিক দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করে না, মানুষের প্রতিনিয়ত সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সমসময়কে আত্মস্থ করে সুস্থ সংস্কৃতির আনন্দে সৃষ্টিশীল—তাকেই বলা যেতে পারে লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন। নামে ক্ষুদ্র হলেও এর প্রতিক্রিয়া ব্যাপক। কোনওরূপ সৌখিমতা লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের চরিত্র বিরোধী। লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের আঁতুর ঘরেই মহতী লেখকদের জন্ম হয়। সুতরাং প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে, লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন আন্দোলন এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া দ্বারা সমসময়ের এবং নিজভূমির সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করে চলেছে।

সমস্ত রকম বাণিজ্যিক প্রলোভনকে উপেক্ষা করে এইসব পত্র-পত্রিকাগুলি ত্যাগ-নিষ্ঠা-আন্তরিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে চলে। নিঃসন্দেহে বলা যায়—লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন, যে কোনও দেশের তার নিজস্ব সময়ের এক সৌন্দর্যবোধের স্বচ্ছ পবিত্রধারা। পৃথিবী বা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের কথা বাদ দিলেও, শুধুমাত্র বাংলাভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার

সংখ্যা কয়েক হাজার। সবগুলি গুণগতভাবে ধনী না হলেও পরিশ্রম বা আন্তরিকতার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় না। এই লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনগুলির প্রতিটি কোষ উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে সত্যসন্ধানী হৃদয়বান যুবক-যুবতীর রক্তের হরফে।

পুঁজিবাদী সভ্যতার ঠিক বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন কী ভীষণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এইসব পত্র-পত্রিকা। গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ দ্বারা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিষয় বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়ে নতুন করে উপস্থাপনা করার প্রবল ইচ্ছা—সমকালীন সাহিত্যে নতুন মাত্রা যোগ করে দেয়। সময়ের তাপ উত্তাপ অবশ্যই তাকে স্পর্শ করবে। যেমন খুশি লেখা সম্বলিত মুদ্রিত কিছু কাগজের গোছা লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন অভিধা পেতে পারে না। গর্ভযন্ত্রণার অনুরূপ এক মহান আদর্শকে ভূমিষ্ঠ করার মহৎ ইচ্ছা যেন সদাসর্বদা জাগ্রত থাকে একটি লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন প্রকাশের তাগিদে।

১৯৬৯ সালে উত্তর কলকাতায় এক গৃহভৃত্য সম্পাদিত প্রথম সাহিত্য পত্রিকা 'তিলোত্তমা' প্রকাশিত হয়েছিল এই রকম গর্ভযন্ত্রণার মাধ্যমে। আর্থিক অনটনের মধ্যেও দুবছর ধরে বহু কষ্টেসৃষ্টে 'তিলোত্তমা'র আটটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। এই তো হল লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন।

আমাদের এই শিল্পসমৃদ্ধ হুগলি জেলায় লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ও সংখ্যাতত্ত্বের দিক নিয়েই আজকের এই আলোচনার উদ্দেশ্য। প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, সারাদেশে নিয়মিত বা অনিয়মিত বহু সাধারণ বা অসাধারণ পত্রিকা প্রকাশিত হলেও পৃথিবীর কথা জানা নেই, কিন্তু এই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রথম এই হুগলি জেলায় ৯ নভেম্বর ১৯৯১-এ জেলাগতভাবে লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন সম্মেলন ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। 'সংকেত', 'অর্চি', 'বাতিঘর', 'ইউটোপিয়া', 'বিচিত্রা', 'ঋদ্ধি', 'পল্লবী' প্রভৃতি পত্রিকার উদ্যোগে। এ এক ইতিহাস। এটা সম্ভব হয়েছে হুগলি জেলার শিল্প-সাহিত্যের যে ঐতিহ্যশালী প্রবহমানতা তার উপর নির্ভর করেই এবং লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন লাইব্রেরির কর্ণধার সন্দীপ দত্তের সহৃদয় সহযোগিতায়। সেই পবিত্রধারা দীর্ঘপথ অতিক্রম করে কিভাবে এগিয়ে চলেছে এবার সেই আলোচনায় আসি।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে আজ পর্যন্ত এই নিবন্ধকে সীমাবদ্ধ রাখা হচ্ছে। ১৮৫৮ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে হুগলি জেলায় প্রায় ২৫টি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই অর্থে লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের ভাবনা ছিল না এদের। তবে এগুলি প্রায় সবই ছিল সাহিত্য ঘেঁষা পত্রিকা। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হুগলি-চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত গিরীন্দ্রলাল চৌধুরীর 'নবজীবন'। পরবর্তী কালে পত্রিকাটির সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার। সালটা ছিল ১৮৮৭। তার পূর্বে ১৮৭৭-এ মীর মশারফ হোসেন সম্পাদিত 'আজীবন নেহার' প্রকাশিত হয়েছিল। আরও অনেক পরে ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয় নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'শিল্প সাহিত্য' নামে মাসিক পত্রিকাটি। তবে এই সব পত্রিকাগুলি লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন অভিধা পেতে পারে কিনা সে বিতর্ক আজ উঠতেই পারে।

জেলা সদর চুঁচুড়া শিল্প-সাহিত্যের এক ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান। একে ঘিরেই হুগলি জেলার পত্র-পত্রিকা এবং সাহিত্য বিস্তার লাভ করে। তাই এই সদর মহকুমা থেকেই আলোচনাটি শুরু হল।

দেশ স্বাধীনের পূর্বে লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের প্রাবল্য সেভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। স্বাধীনতার পরে লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন আন্দোলন বিশেষ গতি পায়। ১৯৫৩ সালে শহর চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত হয় সুনীল বসু সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'নতুন পাথেয়'। বেশ সাড়া ফেলে দেয়। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে অবধূতের 'মরুতীর্থ হিংলাজ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে লাগল। কিন্তু দুঃখের বিষয়—তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশ হবার পর পত্রিকাটির মৃত্যু ঘটে। এই রকম আরও অনেক পত্রিকা এই সদর মহকুমায় আত্মপ্রকাশ করে হারিয়ে গেছে।

শক্তি মণ্ডল ও রাম রায়ের হাতে লেখা পত্রিকা 'ঝিনুক' পঞ্চাশের শেষের ঘটনা। ষাটের দশকে মদনমোহন বিশ্বাস, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তি মণ্ডলের ও দীপক রায়ের সম্পাদনায় এক যুগান্তরকারী ঘটনা ঘটিয়ে প্রকাশ হতে লাগল 'কবিতা দৈনিক'। ব্যবসায়ী হীরেন্দ্রনাথ কুণ্ডুর আর্থিক আনুকূল্যে এবং উৎসাহে। প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হল ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের ১৫ বৈশাখ। দৈনিক প্রকাশিত এই কবিতা পত্রটি ৩৫ দিন ধরে প্রকাশিত হবার পর বন্ধ হয়ে যায়। আনন্দবাজার এবং স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় এই ঘটনাটিকে 'পৃথিবীর সর্বপ্রথম' বলে সেই সময় উল্লেখ করলেও পরে জানা যায়—সেটা ছিল পৃথিবীর চতুর্থ কবিতা দৈনিক। এই ঘটনার প্রায় পর পরই মদনমোহন বিশ্বাসের সম্পাদনায় 'অলক্তক'-এর গোটা পাঁচেক সংখ্যা প্রকাশ পায়। তারপর থেমে যায়। এই সময়ই প্রাক্তন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী প্রয়াত শম্ভু ঘোষের উদ্দীপনায় 'পদক্ষেপ' নামে একটি ক্ষণস্থায়ী পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছিল। এর অনেক পরে সত্তর ও আশির দশকে—নিরঞ্জন সিকদারের 'অনুসংহিতা', অনিলবরণ চক্রবর্তীর 'মৌসুমী', শুকদেব চট্টোপাধ্যায়ের 'সৈন্য', শীতল চৌধুরীর 'বরণন', অসিত রায়ের 'সংকেত অনুভূতির সেতু', মহানাদ থেকে অরুণাংশু ভট্টাচার্যর 'পাণ্ডু', শ্যামলজিৎ সাহার 'সায়ক', কৈলাস মুখোপাধ্যায়ের 'ঢেউ', শংকর দাশগুপ্তর 'ধারাপাত' প্রকাশিত হয়ে এক সময় বন্ধ হয়ে যায়। এগুলির মধ্যে শুকদেব চট্টোপাধ্যায়ের 'সৈন্য'র আয়ুই ছিল সবচেয়ে বেশি দিন।

সত্তর দশকে বাঁশবেড়িয়া থেকে কৃষ্ণসাধন নন্দী কর্তৃক সম্পাদিত 'পাড়ি' এবং 'সোপান' খুবই ক্ষণস্থায়ী হয়। ১৯৭৫ সালে ওখান থেকেই প্রকাশিত হয় মিঠু মুখোপাধ্যায়ের 'সাবর্ণ', তিনটি সংখ্যার পর ইতি। ৮০ দশকে মানব বিশ্বাসের 'পথের ঠিকানা', কৌশিক মুখোপাধ্যায়ের 'সুভাষিত' এবং মিহিরনন্দন প্রমুখের 'আজকের সাহিত্য' আশা জাগিয়েও নিভেই গেছে বলা যায়।

হুগলি জেলার লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে আশির দশক একটি উল্লেখযোগ্য সাড়া জাগানো দশক। এই দশকে সবচেয়ে বেশি পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছে এবং ফুরিয়েও গেছে। শহর চুঁচুড়া থেকে আশির প্রশান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পল্লবী' কার্তিক চট্টোপাধ্যায় ও প্রভাতকুমার মিশ্রর ছিমছাম পাক্ষিক কবিতার কাগজ 'প্রতিপক্ষ', সনৎ দের ত্রৈমাসিক 'সন্ধিলগ্ন' এবং ময়নাডাঙা থেকে অরবিন্দ সেনের 'সংগত'

এক রকম লুপ্তই বলা যায়। লুপ্ত অরুণ মণ্ডলের 'যুবমুক্তি' (রবীন্দ্রনগর)।

সাবেক পশ্চিমদিনাজপুর, অধুনা চুঁচড়োর রাজু বণিকের পত্রিকা 'তোর্সা থেকে গঙ্গা', শিশির দত্তর 'কল্পসূত্র', গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়ের ১৭ বছরের কাগজ 'কোরক', অভিজিৎ চক্রবর্তীর 'ঋদ্ধি', পাণ্ডুয়া থেকে অমল মুখোপাধ্যায়ের ১৮ বছরের 'উত্তরণ' এবং ব্যান্ডেল থেকে দিলীপ সাহার 'সাঁকো', শুভাশিস দত্তর 'ইউটোপিয়া' ও রাজীব চট্টোপাধ্যায়ের 'অনুভব'-এ অঘোষিত লক্ আউট। অনিয়মই লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সেই সুবাদেই আশা করা যায় খানিক বিরতির পর এই পত্রিকাগুলি আবার স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠবে। সেই রকম খোঁজ মেলে না এখন—ভাস্তারার উপপদ রায়চৌধুরীর ১১ বছরের 'দুর্বার' এবং ১৯৮৮তে নসীবপুর থেকে প্রকাশিত পঙ্কজ চক্রবর্তীর 'অমিতায়ু'র।

একই ভাবে লুপ্তপ্রায় নব্বইয়ের গোড়ায় চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত ছোটদের কাগজ 'পুঁথি', প্রশান্ত মাল ও বহ্নিবরণ ঘোষ সম্পাদিত গল্প পত্রিকা 'বিবর্ত', অরূপ সেনগুপ্তর আবৃত্তি বিষয়ক পত্রিকা 'শব্দস্বর' এবং উত্তর চন্দননগর থেকে শংকর দাশের কবিতার কাগজ 'রক্তকরবী'।

এতো গেল বিরহ বিষাদের কথা! এত সব পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলেও, থেমে যায়নি লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন আন্দোলনের গতি। এখনও ঘাম-রক্ত ঝরিয়ে বেশ কিছু পত্রিকা এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। পত্রিকাগুলির প্রকাশকাল নির্দিষ্ট থাকলেও অধিকাংশই অনিয়মিত। গুণগত উৎকর্ষের দিক দিয়ে সবাই সমান না হলেও আন্তরিকতা ও নিষ্ঠায় এদের তুলনা মেলা ভার।

উল্লেখ করা যেতে পারে চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত দীর্ঘদিনের একটি প্রথমশ্রেণীর পত্রিকা 'পাণ্ডুলিপি'র কথা। প্রবীণ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি প্রফুল্ল গুপ্ত এটির সম্পাদক। শিশু ও কিশোরদের পত্রিকা 'কুঁড়ি কোরক' বিগত কুড়ি বছর ধরে এই শহর থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে। প্রয়াত পাঁচুগোপাল দাসের পরে কৃষ্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় পত্রিকাটির হাল ধরেন। পূর্বে মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত হলেও বর্তমানে এখানে আশির শেষ থেকে জারি আছে প্রভাতকুমার মিশ্রের 'প্রতিমা'। মার্কণ্ড লেন, চুঁচুড়া থেকে প্রায় পনের বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে সিদ্ধার্থ সেনের 'বাতিঘর', তার আগে পত্রিকাটি কাঁচড়াপাড়া (২৪ পরগনা) থেকে প্রকাশিত হত সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাগজটির নজরকাড়া চেহারা। কবি অরুণ মিত্রকে নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা বিদগ্ধ মহলে বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে। আর একটি কবিতা প্রধান কাগজ—রমাপ্রসাদ মিত্রর 'বিচিত্রা'। এর বয়স প্রায় বারো বছর। বেশ উঁচুমানের পত্রিকা এটি। এখান থেকেই অশোক চট্টোপাধ্যায়ের মাসিক পত্রিকা 'মন তর্পণ' বারো বছর অতিক্রম করেছে। প্রতি মাসে একটি পত্রিকা নিয়মিত করার মতো কঠিন কাজটি সম্পাদক করলেও পত্রিকাটি আধুনিক ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। রবীন্দ্রনগর থেকে বার হচ্ছে উদ্যমী যুবক বিশ্বনাথ সরকারের সম্পাদনায় একটি আন্তরিক কাগজ 'অর্চি', সংখ্যাগুলি হাতে নিলে বোঝা যায়—প্রতিনিয়তই নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা রয়েছে সম্পাদকের মগজে।

প্রতাপপুর, হুগলি থেকে প্রবীরকুমার রায়চৌধুরী সম্পাদিত কবিতা-গল্প-প্রবন্ধের পত্রিকা 'সংকেত' প্রকাশিত হয়ে আসছে। ১৯৮৫ সালের গোড়া থেকে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যাগুলি হল—'এলিয়ট সংখ্যা', তিনটি বিশেষ গল্প সংখ্যা', 'কবিতা সংখ্যা', 'প্রবন্ধ-আলোচনা সংখ্যা', 'রবীন্দ্র সংখ্যা', 'রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী সংখ্যা'।

ধনিয়াখালি থেকে স্বপন কুণ্ডুর পনেরো বছরের 'অঙ্গীকার', গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের 'জাতক', জয় মুখোপাধ্যায়ের 'বিকল্প' ক্রমাগত নিজেদের আরও সমৃদ্ধ করে তোলার প্রচেষ্টায় ব্রতী। বাঁশবেড়িয়া থেকে জগবন্ধু কুণ্ডুর 'সাহিত্য সেতু' পত্রিকাটি দীর্ঘ সাতাশ বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। সংখ্যাগুলি দেখলে বোঝা যায় শিল্প-সাহিত্যের ধ্যান-ধারণা সম্পাদকের মোটেই স্বচ্ছ নয়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যাগুলির মধ্যে যেমন আছে 'সমরেশ বসু', 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সংখ্যা, তেমনি 'শিক্ষা সাক্ষরতা সংখ্যা', 'পৌর সংখ্যা', 'বাঁশবেড়িয়া কার্তিকপূজা সংখ্যা' প্রভৃতি। কিন্তু কোনও সংখ্যাটিই সংগ্রহে রাখার মতো সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেনি। পাঁচমিশেলী চিন্তাভাবনায় আক্রান্ত এই পত্রিকাটির এতদিনেও তাই কোনও চরিত্র গড়ে ওঠেনি। তবে একটি পত্রিকার জন্য সম্পাদকের উৎসর্গীকৃত প্রাণ প্রেরণা দেয়। পত্রিকাটি এখন পাঁচ-ছয় পৃষ্ঠায় মাসে দুবার প্রকাশ পায়। কাছাকাছি ডানলপ থেকে ওড়িশাবাসী নিরঞ্জন জেনার ৫ বছরের বাংলা পত্রিকা 'প্রণব' একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ওড়িয়া সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের আরও বেশি করে পরিচিত হবার সুযোগ করে দিচ্ছে। নন্দনপুর থেকে প্রশান্ত মানিকের সত্তর দশকের কাগজ 'সোনালী রোদ' পড়ে এসেছে।

প্রচুর সংখ্যক লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের অকাল মৃত্যুর কথা জানার পরও হতাশ না হয়ে উদ্দীপ্ত হওয়া যায় যখন দেখি—নতুন করে আরও অনেক পত্রিকার জন্ম হচ্ছে। যদিও অনেক সময় সম্পাদক হবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় বা নিজের লেখা ছাপা অক্ষরে দেখার বাসনায় কিংবা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের রেষারেষিতে এক একটি পত্রিকার জন্ম হয়। তবে তা নগণ্য।

এই নয়ের দশকেও, কলকাতার বাস তুলে দিয়ে চুঁচুড়ায় এসে ভিড়ল 'জনপদ'। নতুন সম্পাদক বিকাশ শীলের ঠিকানায়। তেমনই আবার চুঁচুড়া স্টেশনের দেয়াল পত্রিকা থেকে রূপান্তরিত হয়ে এই শহরে ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসাবে জন্ম নিল 'অন্বেষণ'। প্রথম সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন মুনীকেশ শীল। দ্বিতীয় সংখ্যার সম্পাদক তথাগত মৌলিক। আরও একটি নতুন পত্রিকা, আয়তনে সামান্য হলেও অসাধারণ, তা হলো শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আধুনিক সময়'। অভিজিৎ সিংহরায়ের 'বিবৃতি'র প্রবন্ধের অংশ বড়ই সমৃদ্ধ। অনিমেষ মুখোপাধ্যায়ের 'আকাশ'-এর আরও বড় হবার ইচ্ছা লক্ষ্য করা যায়। ওদিকে বাঁশবেড়িয়া থেকে ঝর্ণা চক্রবর্তীর 'সেঁজুতি' এবং মহীতোষ মণ্ডলের 'প্রাচিন' বেশ আশার সঞ্চার করেছে। আর একটির কথা না বললে অন্যায় হবে। কিশোর অমিত রায়ের হাতে লেখা পত্রিকা 'গোলক' হাতে নিলে বোঝা যায় কি পরিশ্রম ও নিষ্ঠায়

গড়া একটি কাগজ। কিছু ক্ষুদ্র সংবাদপত্র সাহিত্য নির্ভর বিশেষ কিছু সংখ্যা প্রকাশ করে থাকে। তখন সেই বিশেষ সংখ্যাটি এক একটি লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন হয়ে ওঠে। যেমন—গোরাচাঁদ আঢ্যর 'পরিস্থিতি', পারুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হুগলী ডাক', প্রভাস পালের 'চণ্ডীতলা সংবাদ' এবং ত্রিবেণীর জগবন্ধু মাহান্তির 'পরিবর্তক' ইত্যাদি।

চুঁচুড়া মহকুমার লাগোয়া চন্দননগরের সাহিত্য চর্চা এবং লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন আন্দোলনের ক্ষেত্রও বেশ বিস্তৃত। প্রথমেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় সিঙুর থেকে সতী চট্টোপাধ্যায়ের হাতে লেখা পত্রিকা 'কালের যাত্রার ধ্বনি' কে। কি নিদারুণ নিষ্ঠা সহকারে প্রায় কুড়ি বছর ধরে বৃদ্ধ মানুষটি পত্রিকাটি চালিয়ে যাচ্ছেন। অশোক চট্টোপাধ্যায়ের 'গোধূলি মন' প্রায় চল্লিশ বছরের মাসিক পত্রিকা। পত্রিকাটি জেলার গর্ব বলা যায়। এখান থেকেই সত্তরের শুরুতে প্রকাশিত হয় কৃষ্ণা বসুর 'অনিকেত'। গোটা পাঁচেক সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায় এবং এই সময়ই সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীপক রায়ের সম্পাদনায় 'কবিতা' পত্রিকার মাত্র দুখানি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।

হরিপাল থেকে চির মিত্রর 'রূপসী ধরিত্রী' এবং দীপালি দে সরকারের 'উর্মি' দীর্ঘদিনের অবিরাম এক আন্দোলন। বলরামবাটি থেকে জগবন্ধু দাশের 'যুব অভিযান', বৈদ্যবাটির অশোক মুখোপাধ্যায়ের 'শাব্দিক' অথবা কাশীনাথ ঘোষের সাতাশ বছরের 'সন্দীপন' পত্রিকা নিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্তত প্রশংসা দাবি করতেই পারে। এখানে তিনজন ব্যক্তির কথা উল্লেখের প্রয়োজন। প্রথম জন সরিৎ শর্মা। অপর দু-জন হলেন—ভদ্রেশ্বর থেকে প্রকাশিত 'শব্দবর্ণ' পত্রিকার সম্পাদক প্রয়াত রমানাথ চট্টোপাধ্যায় এবং ছোট পত্রিকার জন্য নিবেদিত প্রাণ তারক ভড় মহাশয়। যাঁদের প্রেরণায় জেলার সাহিত্যচর্চা ও লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন আন্দোলন গতি পায়। এঁদের মতোই চন্দননগরের 'গন্ধমেলা'র আশিষ ভট্টাচার্য-গৌর বৈরাগী-সৌমদেব বসুরা।

সিঙুর থেকে প্রকাশিত 'দ্রাঘিমা' সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরীর 'উবুদশ' এবং ভদ্রেশ্বরের চন্দন বসুদের 'নাইয়া' তিনটি উত্তীর্ণ কাগজ। সত্তর দশকের বেশ ভাল একটি পত্রিকা 'দ্বন্দ্বশুক' অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় চন্দননগর থেকে প্রকাশিত হত। ভদ্রেশ্বরে অলোক ভট্টাচার্যর 'দিশারী'ও আর নেই। কিন্তু ১৯৯৫-এ অনেক আশা জাগিয়ে চন্দননগর থেকে প্রকাশিত হল কমলকুমার দত্ত সম্পাদিত 'দাহপত্র'। রুচিশীল সুন্দর কাগজ।

এবার আসা যাক শ্রীরামপুরে। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে গৌরবের সঙ্গে প্রকাশিত হয়ে আসছে শিশু ও কিশোরদের পত্রিকা 'অভিনব অগ্রণী'। সম্পাদক দিলীপ বাগ। কিন্তু লুপ্ত প্রায়—মলয় আদকের 'অগ্নী', শ্যামল মুখোপাধ্যায়ের আশির 'ঋত্বিক', কেশব বণিকের 'অথ সময়', যতীন লাহিড়ীর 'প্রত্যয়', প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় ও অদ্রীশ বিশ্বাসের 'বিদিশা', মলয় রায়ের 'মনের ফসল', মঞ্জু মুখোপাধ্যায়ের 'সঙ্গীত ও স্বরলিপি', কৃষ্ণচন্দ্র ভড়ের পঁচিশ বছরের 'শিশুপ্রিয়' পত্রিকা। এই মহকুমার কোন্নগর থেকে আশির দশকের আলিঙ্গন চক্রবর্তীর 'অনুক্রম' ও 'দ্বিব্রতী', অমরনাথ পাণীর 'বন্দনা সাহিত্য আসর', তাপস মুখোপাধ্যায়ের 'পদক্ষেপ' অথবা মনোজ চাকলাদারের 'মানসভূমি'র পরিণতির কথা জানা যায় না। কিন্তু এখান থেকেই সগৌরবে এগিয়ে চলেছে বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমন্বয়'। এগিয়ে চলেছে ডানকুনি থেকে দীপঙ্কর বিশ্বাসের 'বিদগ্ধ বৈশাখ'। কিন্তু আর নেই সত্তরের 'প্রত্যয়'। রিষড়া থেকে গৌতম দাসের 'প্রয়াস' চলছে। চলছে চাতরা থেকে রবীন্দ্রনাথ পালের আন্তরিক কাগজ 'রক্তিমা'। উত্তরপাড়ার 'ইজেল', ও বিশ্বজিৎ পালদের 'শত জল ঝরণার ধ্বনি' এত স্তিমিত যে, আর তার ধ্বনি সে রকমভাবে শুনতে পাওয়া যায় না। শ্যাওড়াফুলি থেকে অলক সরকারের 'শব্দলীলা' বা গৌতম সরকারের 'ক্যাকটাস'-এর চারাগাছটি আজ মৃতপ্রায়। শ্যামসুন্দর ভাওয়ালের 'সংবর্ত' বর্তমানে অবলুপ্তর তালিকায়। কিন্তু অনেক প্রতিশ্রুতি রেখে এখান থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছে সুব্রত সিনহার 'অন্বয়' এই নব্বইয়ের শুরুতে। আর একটি ভাল পত্রিকা—শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত 'শীর্ষবিন্দু' সাময়িক কিছুটা ম্রিয়মান হলেও, অসিত দত্তর 'অভিজ্ঞান' এবং ভীষণ উদ্যম যুবক রামকিশোর ভট্টাচার্যর 'মউল' বেশ হই চই ফেলেছে।

লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন আন্দোলনের ক্ষেত্রে আরামবাগ তুলনামূলকভাবে অনেক পিছিয়ে পড়া মহকুমা। কিছু কিছু পত্রিকা বিভিন্ন সময় আত্মপ্রকাশ করলেও আর্থিক অনটন এবং অধ্যবসায়ের খামতিতে তারা এক সময় হারিয়ে যায়। এই রকমই একটি সত্তর দশকের পত্রিকা বিদ্যুৎ ভৌমিক সম্পাদিত 'মহুয়া মন'। লুপ্তপ্রায় আরও একটি ভাল কাগজ গৌতম মুখোপাধ্যায়ের 'নট্রে'। খোঁজ পাওয়া যায় না আশির দশকে অর্জুনগেড়িয়া থেকে প্রকাশিত সঙ্গীত মল্লিকের 'পল্লীপ্রতিভা', ডহরকুণ্ড থেকে ভরত মণ্ডলের "বাংলার মানুষ", বলপাই থেকে উত্তম পালের 'মেঘদূত', গোবিন্দপুর থেকে বিশ্বনাথ মণ্ডলের 'যুগদর্পণ' এবং ঘরগোহল থেকে সরোজ নাগের 'পরশমণি' প্রভৃতি পত্রিকার। কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম সাধন বারিক। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়ে চলেছে 'আলিঙ্গন'। লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এই হল হুগলি জেলার লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের সংক্ষিপ্ত ইতিকথা। এই ভাবনা ভুল হবে যে, নিবন্ধটি সবদিক দিয়ে সম্পূর্ণ। স্বল্প পরিসরে আর বেশি আলোচনার সুযোগ নেই। অনিচ্ছাকৃত কিছু ত্রুটিও থেকে যেতে পারে।

হুগলি জেলার নতুন চ্যালেঞ্জ

ডাঃ প্রমোদরঞ্জন দাশ

কর্নাটক সরকারের প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের উপকরণ পরিদর্শন



স্বাস্থ্যই সম্পদ, কি ব্যক্তিজীবনে, কি সমাজ জীবনে। আবার এটি একটি সংবেদনশীল বিষয়ও বটে। তাই স্বাস্থ্যসম্পর্কিত সরকারি ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা, প্রচার অপপ্রচার ও বাক্‌বিতণ্ডায় ১৯৪৬ সালে ভোর কমিটির সুপারিশ থেকে বর্তমানের দুর্ভোগ, বিক্ষোভ, হাসপাতাল ভাঙচুর, চিকিৎসক নিগ্রহ, আইন-আদালতের চত্বর পর্যন্ত দৌড়ঝাঁপ—কত তুলকালাম কাণ্ডই না ঘটে যাচ্ছে চলচ্চিত্রের ছবির মতো—তার শেষ কি কোথাও আছে? আমরা সাধারণ মানুষ থেকে বিজ্ঞ বিশেষজ্ঞতক ছেলেটার ভাল হবে কিসে—তাবিজ-কবজে না ধন্বন্তরির হাতের স্পর্শে, তা আজও বোধকরি ঠিক করে উঠতে পারিনি।

ইতিমধ্যে নয় নয় করে স্বাধীনতা লাভের পর প্রায় অর্ধশতাব্দীর মতো কাল গড়িয়ে যেতে বসেছে। পর্বতের মূষিক প্রসব যে একেবারে হয়নি তা বলা যাবে না। জাতীয় সমীক্ষার লেজ ধরে সারা দেশ জুড়ে পশ্চিমবঙ্গ সর্বভারতীয় মাপকাঠিতে কতটা পেছিয়ে আছে, কি এগিয়েছে তা নিয়ে তত্ত্বতালাশের অন্ত নেই। আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশ্বায়ন নাকি মুক্ত কচ্ছ মুক্তবাজার অর্থনীতি—যার অস্যার্থ 'ফ্যাল কড়ি মাখ তেল' তো হালফিলের সংযোজন। কিন্তু মুস্কিল আসান হবে কিসে? জিনিসপত্রের দরদাম চড়চড়িয়ে বাড়ছে, আর

মানুষের ক্রয়ক্ষমতা তরতরিয়ে নামছে। অসুখ হয়েছে? ডাক্তার দেখাও। ওষুধ কেনো। প্রেসক্রিপশন হাতে নিয়ে ওষুধের দোকানে দৌড়ঝাঁপই সার। ওষুধ কেনার সামর্থ্য কয়জনের? ছোটো হাসপাতাল। ডাক্তারের ফিটা তো বাঁচবে। তা না হয় হল। সেখানেও তো ভাঁড়ে মা ভবানী। এতো আর অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার নয়, যত খুশি বিলাও, শেষ নেই ভাণ্ডারের। অতঃপর ভরদিনের হয়রানি। রোজগার বন্ধ। কপাল মন্দ থাকলে বাড়ি ফিরে পেটে বালিশ।

আমরা তাই ভেবে ভেবে সারা। সমস্যার কূল-কিনারা নেই, অকূল পাথার। সে কারণে পরশ পাথর খোঁজারও শেষ নেই। খ্যাপার মতো নিষ্ফল যান্ত্রিকতায় নয়, অতীত অভিজ্ঞতায় সতর্ক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বুঝিবা অবশেষে সেই পরশপাথর খুঁজে পেয়েছি আমরা। এই হুগলি জেলাতেই। না, গালগপ্পো নয়। সেই প্রসঙ্গেই আজকের পদচারণা। হুগলি জেলার দু-শ বছর পূর্তি উপলক্ষে।

স্বাস্থ্য : জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি

'অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু, চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু'—বিশ্বকবির এই দুটি লাইনেই জনস্বাস্থ্যের মূল তাৎপর্য নিহিত। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থারও মতে স্বাস্থ্য শুধুমাত্র রোগের অনুপস্থিতিই নয়। স্বাস্থ্য বলতে—'শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক সামাজিক সুস্থতা ও স্বাচ্ছন্দ্যবিধান' বুঝায়। তাই রোগ হলে চিকিৎসাটাই সব নয়। যাতে রোগ না হয়, সেই ব্যবস্থাই গুরুত্বপূর্ণ। আর এখানেই জনস্বাস্থ্য তথা স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচির মূল অভিমুখ।

হুগলির নতুন চ্যালেঞ্জ

হুগলি জেলায় ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে—'নিবিড় ও সুসংহত স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচী'র কাজ। হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতির কথায়—'মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলাই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। হুগলি জেলার ক্ষেত্রে সেটা প্রমাণ করার একটা সোনালি সুযোগ আমরা পেয়েছি। আর সে কারণে এটা আমাদের কাছে একটা বড়সড় চ্যালেঞ্জও বটে। হুগলি জেলায় শুরু হয়েছে নিবিড় ও সুসংহত স্বাস্থ্যবিধান প্রকল্প। এটির জন্য আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে ইউনিসেফ। হুগলি জেলায় এই প্রকল্প পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে রূপায়িত করা হচ্ছে। এর আগে সারা দেশে বা পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোথাও এই প্রকল্প পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। সেদিক থেকে হুগলি জেলা দিশারীর ভূমিকা পালন করার এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও চমৎকার সুযোগ পেল। আর আমরা পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই এই দায়িত্ব বহন করেছি।........ এই উৎসাহ ও ঐকান্তিকতায় মূল সুরটি বেঁধে দিয়েছে হুগলি জেলার সাক্ষরতা আন্দোলনের বিরাট সাফল্য।....... সমবেত চেষ্টায় যে কোন মহতী প্রয়াসে সাফল্য সম্ভব।'........

স্বাস্থ্যবিধান বলতে কী বুঝি

স্যানিটেশনের বাংলা হল স্বাস্থ্যবিধান। স্বাস্থ্যবিধানের বিভিন্ন দিক—

(১) মলমূত্রত্যাগ ও মানুষের ব্যবহৃত বর্জিত জল বা আবর্জনার স্বাস্থ্যসম্মত অপসারণ ব্যবস্থা।
(২) ব্যক্তিগতভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা। পরিবেশ দূষণ রোধ করা।
(৩) স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বহু নিয়ম মেনে চলা ইত্যাদি।
(৪) নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার আবশ্যিক শর্ত—নিরাপদ পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার। এর ফলে রোগের প্রকোপ কমবে। অর্থনৈতিক বিকাশে মানুষকে সাহায্য করবে। চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর চাপ কমবে। চিকিৎসার জন্য বাড়তি খরচ সাশ্রয় হবে। আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা এই যে সারা ভারতে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো থেকে শক্তিশালী হয়েও স্বাস্থ্যের মানদণ্ডে তেমন উল্লেখযোগ্য সাফল্য আমরা পাইনি। তাই আমাদের সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার ওপর এবং শিক্ষার প্রসার ও জনস্বাস্থ্য সচেতনতা প্রসারের ওপর।

কেন গণ-উদ্যোগ জরুরি

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে সরকারি যোজনাগুলিতে জনগণ ছিলেন নিষ্ক্রিয়। প্রতিটি কর্মকাণ্ডে তাঁদের সম্পৃক্ত করার কোনও উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। জনগণের মনে যে হারে সরকার-নির্ভরশীলতা বেড়েছে, সেই হারে সচেতনতা ও সক্রিয়তা কমেছে। সারা পৃথিবীতে ১৯৮১-১৯৯০-এর দশককে নিরাপদ জল ও স্বাস্থ্যবিধানের দশক হিসাবে চিহ্নিত করা হলেও ভারতবর্ষে এই কর্মসূচি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। গণউদ্যোগ সৃষ্টি না করাই এর মূল কারণ।

তাই বামফ্রন্ট সরকারের জনকল্যাণমুখী নীতির অংশীদার হিসাবে হুগলিতে গণ-উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন গণ-সংগঠন সংস্থা, ক্লাব, রাজনৈতিক দল, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা—সকলকে নিয়েই আলাপ-আলোচনাসভা বৈঠক মিছিল জাঠা ইত্যাদি সংগঠিত করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের তাৎপর্য, প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আশাব্যঞ্জক সাড়াও মিলেছে।

কেন মহিলাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

স্বাস্থ্যবিধান ঘর-সংসারের বাইরে নয়। এর অভাবে মেয়েদেরই দুর্ভোগ বেশি হয়। নানা অসুখ-বিসুখ হয়। অনেকেই কুড়িতে বুড়ি হয়ে যায়। তাছাড়া শিশুকে লালন-পালন করার ভারও তাদের উপর। এই জন্যই এই প্রকল্পে মেয়েদের সামিল করা খুব জরুরি। জল প্রকল্পেও মেয়েদের সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।



গ্রামাঞ্চলে 'জল কমিটির' মহিলা প্রতিনিধিবৃন্দকে তারা হ্যান্ডপাম্প (টিউবওয়েল) সারাই প্রশিক্ষণ শিবির

নলকূপ কোথায় বসবে, খারাপ হলে তার সারাই করা নিজেদেরই সঞ্চিত অর্থে যাতে দ্রুত সম্ভব হয় ইত্যাদি সব কিছুই মেয়েদের নিয়ে। পরনির্ভরশীলতা কাটাবার জন্য 'জল কমিটি' মেয়েদের নিয়েই গঠিত হয়েছে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষ কী কী পাবেন

(১) স্বাস্থ্যসম্মত, আর্থিক সংগতি অনুযায়ী বিভিন্ন মডেলের শৌচাগার। (২) ধোঁয়াহীন চুল্লি। (৩) সুলভ স্নানাগার। (৪) স্নানের চাতাল। (৫) জলশোষক গর্ত। (৬) আবর্জনার গর্ত। (৭) স্বাস্থ্য অভ্যাস গড়ার আন্দোলন এবং (৮) জলপ্রকল্পের কর্মসূচি।

হুগলি জেলার কিছু বৈশিষ্ট্য

(১) প্রকল্প শুধুমাত্র পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে। একমাত্র গোঘাট-১ ব্লকে তিনটি গ্রামে করবেন সার্বিক বিবেকানন্দ গ্রাম সেবাসংস্থা—পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে। (২) কোনরকম ভরতুকি নয়। (৩) অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহ সকলেই মোটিভেটরের কাজ করতে পারবেন। (৪) যে কোনও প্রতিষ্ঠান ৫,০০০ টাকা জমা দিলে ১০,০০০ টাকা মূল্যের শৌচাগার পাবেন। (৫) যে সমস্ত গ্রামে শতকরা ৮০-১০০ ভাগ কাজ হবে, সে সমস্ত 'আদর্শ গ্রামে' প্রতি পরিবারে ১টি করে ধোঁয়াহীন চুল্লি বিনামূল্যে দেওয়া হবে এবং প্রতিটি কলতলার চাতাল পাকা করে দেওয়া হবে। উল্লেখযোগ্য, গোঘাট-১ ব্লকে গ্রাম 'আদর্শ গ্রাম' বলে চিহ্নিত হয়েছে।

প্রকল্প রূপায়ণে হুগলি কীভাবে অগ্রসর হয়েছে

(১) **সমীক্ষা**—যে কোনও প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে নিষ্ঠার সঙ্গে সমীক্ষার কাজ সেরে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। সার্বিক সাক্ষরতা অভিযানেও আমরা সমীক্ষা দিয়েই শুরু করেছিলাম। সমীক্ষার মূল বিষয়—(ক) প্রতিটি গ্রামে কত শতাংশ বাড়িতে শৌচাগার নেই। (খ) প্রতি পরিবারের জনসংখ্যা। (গ) শৌচাগার তৈরি করতে ইচ্ছুক কিনা ও কত টাকা ব্যয় করতে সমর্থ।

(২) **প্রকল্পের জন্য বিশেষ সেল গঠন**—(ক) জেলা পরিষদ স্তরে, (খ) পঞ্চায়েত সমিতিস্তরে, (গ) গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রতি মাসের দুই তারিখে জেলা স্তরে সভা হবে। পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের সেলগুলি তার পূর্বেই বসবে। যাতে কাজে অগ্রগতি, সমস্যা, ইত্যাদি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টের ভিত্তিতে জেলার সভায় পরবর্তী পদক্ষেপ নির্দিষ্ট করা যায়।

(৩) **সচেতনতার শিবির**—জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারদের সম্পূর্ণ বিষয়টির আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কাজের পদ্ধতি-প্রকরণ সম্পর্কে যথাযথ অবহিত করার জন্য এই শিবিরের আয়োজন করা হয় ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ সালে, যাতে তাঁরা নিজ নিজস্তরে ফিরে গিয়ে গ্রামীণ সাধারণ মানুষের মধ্যে বিষয়টি রূপায়ণে প্রণোদিত করতে পারেন। ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে সচেতনতার পরিমণ্ডল গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে দেওয়াল লিখন, হোর্ডিং, প্রচারপত্র, পথনাটক, গান, সভা, বৈঠক, জাঠা, মিছিল, ইত্যাদি সংগঠিত করার কর্মসূচি গৃহীত হয় এ ছাড়াও গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যমেলা ও তার প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

(৪) **প্রশিক্ষণ শিবির**—(ক) জেলাস্তরে মাস্টারম্যান বা হেড রাজমিস্ত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, (খ) গ্রামের রাজমিস্ত্রিদের

প্রশিক্ষণ দেন মাস্টারম্যানগণ, (গ) 'জল পরীক্ষা' প্রশিক্ষণ শিবির : নিরাপদ পানীয় জলের ব্যাপক প্রসারের জন্য All India Institute of Public Health and Hygiene-এর সহযোগিতায় এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে জেলা স্তরে প্রতি ব্লক থেকে ২ জন করে। তারপর ব্লক স্তরে প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ৫ জন করে ও পঞ্চায়েত সমিতির ৫ জন করে। এই বছরে ১৮ ব্লকের ৯০টি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে—ইতিমধ্যেই ৬৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই প্রশিক্ষণ হয়ে গেছে।

(৫) ব্লক নির্বাচন—স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার তৈরির জন্য Pilot Project হিসাবে প্রথমদিকে ৬টি ব্লকে কাজ শুরু করার জন্য স্থির হয়। (১) বলাগড়, (২) পাণ্ডুয়া, (৩) সিঙ্গুর, (৪) চণ্ডীতলা, (৫) গোঘাট-১, (৬) গোঘাট-২। বর্তমানে তার বিস্তার ঘটিয়ে মোট ১৪টি ব্লকে কাজ চলছে।

নিবিড় জলপ্রকল্পের জন্য Pilot Project হিসাবে ৬টি ব্লকে—পুড়শুড়া, ধনিয়াখালি, পোলবা-দাদপুর, পাণ্ডুয়া, গোঘাট-১, গোঘাট-২। এই কাজও এখন অন্যান্য ব্লকে শুরু হয়ে গেছে।

এছাড়াও বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরীক্ষামূলকভাবে পাণ্ডুয়ার পালপাড়া গ্রামে এটি চালু করা হয়েছে গোবরগ্যাস ও শৌচাগারের গ্যাস থেকে মিলিতভাবে এই বিশেষ বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের সাহায্যে বিকল্প বিদ্যুৎ উৎপাদন তৈরির প্রকল্প সাফল্যলাভ করলে আগামী দিনে তা প্রতিটি গ্রামেই ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে।

প্রচারে যে যে বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে

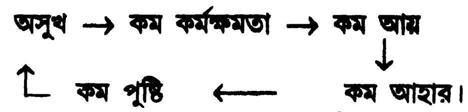
(১) ভারতে শতকরা ৮০ ভাগ রোগ দূষিত জলের জন্য। শিশুরাই ভোগে বেশি।

(২) ভারতে প্রতি বছর পাঁচ বছরের কম বয়েসী ১৫ লক্ষ শিশু মারা যায় পেটের রোগে। কারণ নিরাপদ জলের অভাব। স্বাস্থ্যবিধানের অভাব।

(৩) যেভাবে রোগজীবাণু শরীরে ঢোকে : দূষিত জল, যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করা, কাঁচা শাকসবজি-ফলমূল না ধুয়ে খাওয়া, অপরিষ্কার হাত, মশা-মাছি।

(৪) রক্ষা পাবার উপায় : যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ না করা, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহার করা, মশা-মাছির বংশবৃদ্ধি রোধে যেখানে সেখানে আবর্জনা না ফেলা, স্বাস্থ্যসম্মত আবর্জনা ও সারের গর্ত ব্যবহার করা, দূষিত জল ব্যবহার না করা, সর্বদা কলের জল ব্যবহার করা, নোংরা হাতে না খাওয়া, খাবার আগে বা মলত্যাগের পরে হাত সাবান বা ছাই দিয়ে ধোয়া।

(৫) দারিদ্র্যচক্র কী ?



(৬) স্বাস্থ্যবিধান প্রকল্পে যোগ দিন। দারিদ্র্যচক্রের হাত থেকে নিজেকে বাঁচান ইত্যাদি। এ ছাড়াও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের বিভিন্ন মডেলের ছবি, ধোঁয়াহীন চুলা ইত্যাদির প্রচার। এতদ্ব্যতীত জেলা পরিষদ থেকে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে বহু বিশদ তথ্য ও চিত্রসহ প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে যা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। হুগলি জেলায় আই এস পির কাজের মোটামুটি একটি চিত্র তুলে ধরার উদ্দেশ্যে কিছু তথ্য সংযোজিত হল। মনে রাখতে হবে, এ তালিকাপত্র ডিসেম্বর ১৯৯৫-এর। তারপর কাজের অনেকটাই অগ্রগতি হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট আসবে সামনের মাসে (অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি দুই তারিখে)।—

নিবিড় ও সুসংহত স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচির পর্যালোচনায় হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ



হুগলি জেলা পরিষদ

আই এস পি ।। (ডিসেম্বর'৯৫ পর্যন্ত)

(১) ট্রেনিং এবং ওরিয়েন্টেশন

	কোর্সের নাম	মোট কোর্সের সংখ্যা	মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১।	মোটিভেটর প্রশিক্ষকের ট্রেনিং	১	২২
২।	হেড রাজমিস্ত্রি ট্রেনিং	২	২৭
৩।	গ্রামের রাজমিস্ত্রিদের ট্রেনিং	১৫	১৮৮
৪।	আই এস পি হিসাবরক্ষণের শিক্ষা	১	৯০
৫।	ধোঁয়াহীন চুলা তৈরির ট্রেনিং	৬	১১৪
৬।	পঞ্চায়েত সদস্যদের প্রশিক্ষণ	৬০	৮০৮৪
৭।	প্রকল্প কর্মীদের প্রশিক্ষণ	২	২০
৮।	আই এস পি গানের ট্রেনিং	১	৫০০
৯।	বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের রাজমিস্ত্রি ট্রেনিং	—	—
১০।	মোটিভেটর ট্রেনিং	২০	৬০০

(২) সচেতনতার শিবির

	কোর্সের ট্রেনিং	মোট কর্মসূচির সংখ্যা	মোট অংশগ্রহণকারী
১।	মোটিভেশন ক্যাম্প/গ্রুপ মিটিং	৪৭৭	২১,৩০৪
২।	প্রদর্শনী/ মেলা	৮	১১,৩০০
৩।	দেওয়াল লিখন	৯৯৪	—
৪।	ভিডিও/স্লাইড শো/ ম্যাজিক শো	৩৩	৫,৮৫০
৫।	গানের স্কোয়াড কর্মসূচি/নাটক	৮	২৭৫
৬।	বাড়ি বাড়ি যাওয়া	—	২৫,৫১০

(৩) স্বাস্থ্যবিধানের বিভিন্ন উপকরণ তৈরি

	উপকরণ	মোটসংখ্যা
১।	ব্যক্তিগত শৌচাগার	৫৫৮৮
২।	প্রতিষ্ঠানের শৌচাগার	১০০
৩।	উন্নত চুল্লি	২৩
৪।	জলের উৎসের উন্নয়ন	২৬০০
৫।	উপকরণ তৈরির কেন্দ্র	১৪
৬।	বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট	১
৭।	শোষকগর্ত/আবর্জনার গর্ত/ স্নানের চাতাল ইত্যাদি	—

(৪) আই এস পি আওতাভুক্ত অঞ্চল

১।	ব্লকের সংখ্যা	১৪
২।	কর্মরত পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যা	১৪
৩।	কর্মরত গ্রাম পঞ্চায়েত সংখ্যা	১৫৬
৪।	প্রকল্পের আওতাভুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা	১৫৫
৫।	কর্মরত বেসরকারি সংস্থার সংখ্যা	১

এই প্রকল্পের সৌন্দর্য

(১) **শৌচাগার সম্পর্কে :** হুগলি জেলায় কোনরকম ভরতুকি নয়—অতীতের অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষাই দেয় ভরতুকি দিয়ে কোনও কাজ জনমানসে মমত্ববোধের সঞ্চার করে না। ভারতবর্ষের অন্যত্র এই প্রকল্পের অধীনে নির্মিত শৌচাগারগুলি বহু ক্ষেত্রে অব্যবহৃত থেকেছে এই কারণেই। আর্থিক সংগতি অনুযায়ী ক্রেতাগণ বিভিন্ন মডেল ২৭০ থেকে ২৬০০ টাকার মধ্যে সংগ্রহ করতে পারবেন। তাছাড়া শৌচাগার নির্মাণে কারিগরি ও অন্যান্য পরামর্শ ও সহযোগিতা পাওয়া যাবে। এই শৌচাগার থেকে বায়ুদূষণ হবে না। জৈব সার পাওয়া যাবে। ব্যবহারকারীরা নিজেরাই শৌচাগার ব্যবহারযোগ্য রাখতে পারবেন। এর জন্য আনুষঙ্গিক বাড়তি খরচ হবে না। মশার বংশবৃদ্ধি হবে না। কাছাকাছি পানীয় জলের উৎস দূষিত হবে না। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আরামবাগের বিগত বন্যায় এটা প্রমাণিত হয়েছে।

(২) **জলপ্রকল্প :** মহিলাদের নিয়ে স্থানীয়ভাবে জলকমিটি গঠন। দুজন প্রতিনিধি এর দায়িত্বে থাকবেন। তাঁদের কারিগরি শিক্ষা দিয়ে সারাবার যন্ত্রপাতির কিট্‌স দেওয়া হবে, যাতে বিকল নলকূপ দ্রুত সারিয়ে নিতে পারা যাবে। এ ছাড়া ব্যবহারকারীগণ মাসিক ৫০ পয়সা চাঁদা দেবেন। একটি ব্যাংক অ্যাক্যাউন্টে তা জমা হবে। অপারেটকারী হবেন জলকমিটির প্রতিনিধিবৃন্দ। স্পেয়ার পার্টস পাওয়া যাবে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে নগদ মূল্যে। অর্থাৎ গোটা বিষয়টা জনগণের স্বার্থে, তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে। 'জল পরীক্ষার' ব্যাপারে প্রতি পঞ্চায়েতের ট্রেনিংপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে দ্রুত তা করতে সক্ষম হবে। সরকার-নির্ভরশীলতা নয়, আত্মনির্ভরশীলতা তৈরিই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

(৩) সমগ্র প্রকল্পের কাজ গ্রামাঞ্চলে অপরিমেয় শ্রমদিবস তৈরি করছে। এর দ্বারা গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশে নিশ্চিতভাবেই যথেষ্ট সাহায্য করছে।

শেষের কথা : শেষ কথা নয়, শেষের কথাটুকুই বলব। এই প্রকল্পের বহু প্রয়োজনীয় বিষয় স্থানাভাবে দেওয়া গেল না। এক বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হুগলি জেলা। যুগ যুগ ধরে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার, আর সামাজিক অবিচারের জগদ্দল পাথরটাকে হটানোয় কিছু মানুষের সদিচ্ছা বা আন্তরিক প্রয়াসেই যথেষ্ট নয়। এর জন্য ব্যাপক গণচেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে। স্বাধিকার রক্ষার আন্দোলন, রুটি-রুজির আন্দোলন, সাক্ষরতার জনস্বাস্থ্য সচেতনতার লাগাতার আন্দোলন প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ ও হুগলি জেলার সংগ্রামী ঐতিহ্যই আমাদের নিরন্তর প্রেরণা জোগাবে এবং আমরা অভীষ্টপূরণে সফল হব—এ আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়। কবি সুকান্তের কথা দিয়েই শেষ করছি—'চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ/প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল/এ বিশ্বকেও শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাবো আমি/নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার/....তারপর হব ইতিহাস।'

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত 'নিবিড় ও সুসংহত স্বাস্থ্যবিধান প্রকল্প' পুস্তিকা।

- হুগলি জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রচার-পুস্তিকা।
- শ্রীমতী অর্চনা মণ্ডল—স্থায়ী কর্মাধ্যক্ষ, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ।
- শ্রীসত্যগোপাল দাশ উপদেষ্টা। আই এস পি সেল, হুগলি জেলা পরিষদ এবং শ্রীপ্রবীরকুমার সরকার।



হুগলি জেলার স্বাস্থ্যচিত্র

প্রবুদ্ধকুমার ঘোষ



"Each other place is as hot as hall,
When breezes Fan you at Bandel,
Had I ten houses, all I'd sell
And live entirely at Bandel."

"কলিকাতা গেজেট"এ প্রকাশিত কবিতার উপরে উদ্ধৃত লাইনগুলি তৎকালীন হুগলি জেলার স্বাস্থ্য সমুজ্জ্বলতার অনবদ্য চিত্রায়ন সেকালে ইউরোপীয়রা হুগলি জেলায় বিশেষ করে এর উত্তর পূর্বাংশে স্বাস্থ্যোদ্ধারে আসতেন, রবীন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তিত্বের চন্দননগরে স্বাস্থ্যভ্রমণ সর্বজনবিদিত। সে সময় প্রকৃতির অকৃত্রিম দানে স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ ছিল এই ভূখণ্ড—কিন্তু কোনও রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা ছিল না।

অন্যান্য বিষয়ের মতো স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও, বিগত দুশো বছরের তিনটি ভাগ সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়—প্রাক-স্বাধীনতা কাল স্বাধীনতার পর প্রথম ত্রিশ বছরও সাম্প্রতিক কাল।

প্রাক-স্বাধীনতার স্বাস্থ্যচিত্র

ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে জেলার প্রকৃতি স্বাস্থ্যসম্পদের প্রাচুর্য ক্রমাগত ক্ষয় পেতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, পূর্ব অস্তিত্বমান দারিদ্র্যকে আরও

প্রকট করে তোলে। ফলে দেখা দেয় বিরাটসংখ্যক মানুষের অনাহার ও অর্ধাহারজনিত অপুষ্টি, এর সঙ্গে দেখা দেয়, বছরে বছরে সংক্রামক রোগের আক্রমণ। শিল্পায়ন ও রেললাইন পাতার কাজ যদৃচ্ছভাবে চলতে থাকে। দেশের মানুষের স্বাস্থ্যের প্রশ্ন অবহেলিত হয়। পরিবেশ হয়ে উঠে বিষাক্ত। ১৮৭২ সালের জনগণনার পর ৯ বছরে শতকরা ১৩ জন মানুষ উজাড় হয়ে যান "বর্ধমান জ্বরে" অর্থাৎ ম্যালেরিয়ায়। গঙ্গাতীরের কারখানাগুলি গঙ্গাকে দূষিত করে পরিবেশকে কলুষিত করে তোলে।

সময়ের এইভাগে বিজ্ঞানভিত্তিক দেশীয় পদ্ধতি এবং অবৈজ্ঞানিক জড়িবুটি যন্ত্রতন্ত্রের পাশাপাশি পশ্চিমী চিকিৎসা পদ্ধতির পদার্পণ ঘটে। এতে চিকিৎসায় কিছু উন্নতি ঘটলে ও সামগ্রিক স্বাস্থ্য অনুপস্থিত থেকে যায়। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এ সময়ে ছিল না বললেই চলে। চন্দননগরে ফরাসীরা হাসপাতাল স্থাপন ছাড়াও কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিলেও তা প্রয়োজনানুগ ছিল না।

স্বাধীনতার প্রথম ত্রিশ বছর

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও স্বাস্থ্যচিত্রে কোনও উন্নতি দেখা যায়নি। কোনও স্বাস্থ্যনীতিই প্রবর্তিত হয়নি। সংবিধানে স্বাস্থ্যের অধিকার স্বীকৃতি পায়নি—আজও নেই। স্বাস্থ্যখাতে কেন্দ্রীয় বাজেট ক্রমাগত কমেই চলেছে। নতুন হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলেও, চিকিৎসা পদ্ধতিতে কিছু উন্নতি ঘটলেও—রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা অকিঞ্চিৎকরই থেকে যায়। শতকরা মাত্র ২০ ভাগ মানুষ আংশিকভাবে স্বাস্থ্যব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারেন।

অপুষ্টিজনিত রোগ ও সংক্রামক ব্যাধি অপ্রতিহত থেকে যায়। গ্রাম-শহরের নিম্নবিত্ত মানুষের অর্থনৈতিক ক্রমাবনতি এবং সাক্ষরতা ও স্বাস্থ্যশিক্ষার নিম্নমান স্বাস্থ্যচিত্রকে আরও বেদনাদায়ক করে তোলে। পরিবেশ ও স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার চিন্তা ছাড়াই শিল্পাঞ্চলে অবাধে দূষণ চলতে থাকে।

জেলার বেশিরভাগ মানুষই গ্রামে বাস করেন। বেশিরভাগ রোগই প্রতিরোধযোগ্য। হাসপাতাল ও প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসা ব্যবস্থার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধে বিশেষ গুরুত্ব, পরিবেশ সংরক্ষণ, সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত মানোন্নয়ন, গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থায় গণউদ্যোগের সঙ্গে ভূমিসংস্কার স্বাস্থ্যের জন্য এই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি, জনকল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে অবহেলিত হতে থাকে। জেলার স্বাস্থ্যের দুরবস্থা চরম সীমায় পৌঁছায়।

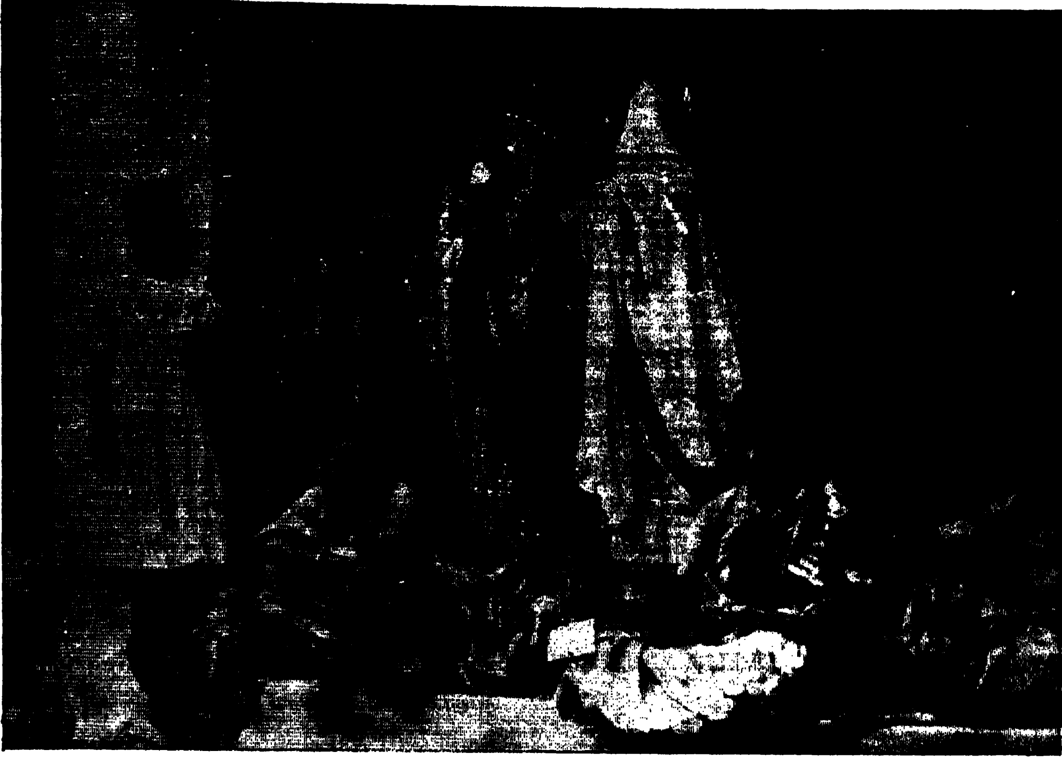
সাম্প্রতিক চিত্র

১৯৭৭ সালের পর পশ্চিমবাংলায় ঘটল ঐতিহাসিক পটপরিবর্তন। এই পরিবর্তিত চিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি হল পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার প্রবর্তন, ভূমিসংস্কার, শহরাঞ্চলে পুরসভাগুলিকে লুপ্ত গণতন্ত্রের পুনঃ-প্রবর্তন ও পরিবর্ধন এবং যোজনা খাতে শতকরা ৫০ ভাগ খরচের বিকেন্দ্রিত পরিকল্পনা ও প্রয়োগ।

গণমুখী পদক্ষেপ—পশ্চিমবাংলার পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থা একদিকে যেমন গণউদ্যোগের পরিমণ্ডল তৈরি করেছে, অন্যদিকে তেমনি প্রবর্তিত হয়েছে জনমুখী, বিজ্ঞানভিত্তিক নূতন দৃষ্টিভঙ্গি সীমিত আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে রাজ্যের অন্য অংশের মতো হুগলি জেলাতেও নূতননীতি—নূতন স্বাস্থ্যসম্ভাবনা তৈরি করেছে, গ্রামাঞ্চল গুরুত্ব পেয়েছে, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ চিকিৎসা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টাতে স্পষ্ট সুফল দেখা দিয়েছে। বহুমুখী প্রকল্পে নিযুক্ত কর্মীরা রোগ প্রতিরোধে মানুষকে সচেতন করা, টিকাদান, পরিবার কল্যাণ, ছোট ছোট অসুখের চিকিৎসা, পরিবেশ সংরক্ষণ, গর্ভবতী মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরিচর্যা ইত্যাদির দ্বারা স্বাস্থ্যকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। এঁরা সরকারি ব্যবস্থার সঙ্গে মানুষের যোগসূত্রের কাজ করছেন। কোন অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে—সে বিষয়ে মানুষকে সাহায্য করছেন। শহরাঞ্চলে এই কাজ করছেন ১৪টি সি ইউ ডি পি ক্লিনিকের কর্মীরা। নিম্নবিত্ত মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে এঁরা গর্ভবতী মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য তদারকী, টিকাদান, ছোট-ছোট অসুখের চিকিৎসা এসব করছেন—এতে হাসপাতালে ভিড় কমছে। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে হাসপাতালে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার জন্য মানুষকে এঁরা পরিচালিত করছেন।

চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান—পূর্বে গঙ্গাতীর থেকে পশ্চিমে বাঁকুড়া সীমান্তে গোঘাট এবং উত্তরে বলাগড় ধনিয়াখালি থেকে দক্ষিণে উত্তরপাড়া চণ্ডীতলা এবং জাঙ্গীপাড়া পর্যন্ত জেলার বিস্তারে লোকসংখ্যা সাড়ে তেতাল্লিশ লক্ষ—জনসংখ্যায় এ জেলা রাজ্যে তৃতীয়। ত্রিশ লক্ষ লোক গ্রামে আর সাড়ে তেরো লক্ষ লোক শহরাঞ্চলে বাস করেন। জেলার সদর হাসপাতাল, তিনটি মহকুমা হাসপাতাল ও একটি রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল নিয়ে মোট পাঁচটি বড় হাসপাতাল ছাড়া তিনটি ই এস আই হাসপাতাল ও দুটি টি বি হাসপাতাল আছে। এ ছাড়া আছে ৬টি গ্রামীণ হাসপাতাল। ১১টি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ৫৫৫টি সক্রিয় উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র। প্রতিটি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১ জন পুরুষ এবং ১ জন মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী এবং প্রতি ৬টি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য একজন স্বাস্থ্য পরিদর্শক কাজ করছেন। গ্রামাঞ্চলের জন্য চিকিৎসক না পাওয়ার অবস্থার অনেকটাই উন্নতি ঘটেছে। শহরাঞ্চলে ৪টি সি এম ডি এ ক্লিনিক এবং গ্রামাঞ্চলে জেলা পরিষদের ১৬টি ক্লিনিক স্বাস্থ্যসেবায় উল্লেখযোগ্য অংশ নিচ্ছে। এ ছাড়া রিষড়া সেবাসদনের মতো বেসরকারি হাসপাতাল এবং হুগলি রেডক্রশের মাতৃসদন নার্সিংহোমগুলিতেও উন্নতমানের চিকিৎসা মানুষ পাচ্ছেন। People Relief Committee-র শাখাগুলি, আই এম এর শাখাগুলি, রেডক্রশ, লায়ন্স ক্লাব, রোটারি ক্লাব ইত্যাদি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য কর্মকাণ্ডও উল্লেখযোগ্য। আই এম এ তারকেশ্বর শাখার শিশু-স্বাস্থ্যকেন্দ্র বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। অবশ্যই সরকারি ব্যবস্থাই প্রধান ব্যবস্থা। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে পশ্চিমবাংলায় সরকারি স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ নেন শতকরা ৭৬ ভাগ মানুষ যে ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্য ২৪-৬০ ভাগ। হুগলি জেলার চিত্র পশ্চিমবাংলার চিত্রানুগ এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

জেলার ব্লাড ব্যাঙ্ক আছে ৪টি। একটি সদর হাসপাতাল এবং বাকি ৩টি মহকুমা হাসপাতালগুলিতে।



লক্ষণীয় ফলাফল : সরকারি বিভাগীয় কাজকর্ম এবং জনপ্রতিনিধিদের নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে, WHO নির্দেশিত পথে জনস্বাস্থ্যের অনেকগুলি কর্মসূচি সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। গর্ভবতী মায়েদের টিটেনাসের টিকাদান লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ১২২.০১% সফল হয়েছে। শিশুদের ডিফথেরিয়া, হুপিং কাশি, টিটেনাসের ত্রিটিকা এবং হাম ও টি বি-র টিকাদানে শতকরা ৮০-৯০ ভাগ সাফল্য এসেছে। পোলিও-র টিকাদানের সাধারণ কর্মসূচি এবং জাতীয় দিবস হিসাবে পালিত পালস্ পোলিও কর্মসূচি সম্পূর্ণ সফল হয়েছে।

শিশুমৃত্যুর হার এই জেলাতে ১৯৮৬ সালেই নামিয়ে আনা গেছে প্রতি হাজারে ৭২-এ। এই হার হ্রাসের গতি "২০০০ সালের মধ্যে ৬০-এর কম" এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণের পথে, গর্ভবতী মায়ের মৃত্যুহার বর্তমানে প্রতি হাজারে ৩। ২০০০ সালের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ২-এর কম।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এ জেলায় বন্ধ্যাকরণসহ জন্মনিয়ন্ত্রণের অন্যান্য পদ্ধতির ১৯৯৪-৯৫ সালে ৮০-৯৫% লক্ষ্যমাত্রায় পূরণ হয়েছে। সুদূর গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত সাধারণভাবে সচেতনতার বিস্তার লক্ষ করা যায়। জন্মহার ১৯৮৬তে ছিল প্রতি হাজারে ২৯.৮। এই পশ্চিমবাংলা এবং সর্বভারতীয় অঙ্ক ছিল যথাক্রমে ২৯.৫ এবং ৩২.৪। ১৯৯৪-৯৫তে এ জেলায় জন্মহার ছিল ২২.২। ২০০০ সালের মধ্যে সর্বভারতীয় লক্ষ্যমাত্রা ২১।

ভূমিসংস্কার দ্বারা জেলার নিম্নবিত্ত গ্রামীণ মানুষের আর্থিক অবস্থার এবং সেই সঙ্গে পুষ্টির উন্নতি দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞদের প্রশংসা অর্জন করেছে। ব্যাপক স্বাস্থ্য প্রচার আন্দোলন সংক্রামক এবং অপুষ্টিজনিত রোগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিয়েছে। উপযুক্ত পানীয়জল ব্যবহার ও স্বাস্থ্যবিধিসম্মত পায়খানার ব্যবস্থায় জেলার ব্যাপক কর্মসূচি জেলার স্বাস্থ্য উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা ইতিপূর্বে প্রায় শূন্যের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। এক সময় রেডক্রশের অ্যাম্বুলেন্স ছাড়া এই সেবা পাওয়াই যেত না। এখন স্বাস্থ্য বিভাগ এবং ই এস আই-এর অ্যাম্বুলেন্স ছাড়াও ১২টি পুরসভার এবং বেশ কয়েকটি বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স মানুষের প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে চলেছে। হাসপাতালগুলির প্রান্তিক উন্নতি অনেক ক্ষেত্রেই মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি, বেশ কিছু ক্ষেত্রে মানুষের বিক্ষোভ আছে। তবে ওষুধ সরবরাহ বর্তমানে যথেষ্ট কার্যকরীভাবে চাহিদা মেটাচ্ছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ : জেলার পরিকল্পনা সংস্থা এবং সভাধিপতির নেতৃত্বে স্বাস্থ্য হাই পাওয়ার কমিটি অনেকগুলি উন্নয়ন প্রস্তাব এবং সেই সঙ্গে কার্যকরী পদক্ষেপ নিচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হাসপাতাল ভবনগুলির সংস্কার ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে নতুন নির্মাণ। এ ছাড়া হুগলিতে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট সংক্রামক রোগের হাসপাতাল। ২০ শয্যার কুষ্ঠরোগের হাসপাতাল এবং আরও গ্রামীণ হাসপাতাল স্থাপন, কয়েকটি ব্লক হাসপাতালে মানোন্নয়ন এবং ব্লাড ব্যাঙ্ক সেবার উন্নতি ও পরিবর্ধন। হাসপাতালগুলিতে যথোপযুক্ত সংখ্যায় চিকিৎসক ও অন্যান্য কর্মীর সমাবেশ করার রাজ্যস্তরের পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন মহল সবিশেষ উদ্যোগী। হাসপাতাল পরিচালন কমিটিগুলি

তাদের যথোপযুক্ত ভূমিকা পালনে সক্রিয় হয়ে উঠছে—আরও সক্রিয় হলে অনেকগুলি সমস্যাকে ধরা এবং তার নিরসন অনেক সহজ হয়ে যাবে।

পশ্চিমবাংলার সাড়া জাগানো শিল্পায়ন প্রয়াসের ফলস্বরূপ এ জেলাতেও শিল্প গড়ে উঠছে। শুরু থেকেই এ গুলিতে দূষণ বিরোধী ব্যবস্থা যাতে কার্যকরী থাকে তার চিন্তা-ভাবনাগুলি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রয়োগ করতে হবে। পরিবেশ দূষণ বিরোধী আন্দোলন জেলাতে সক্রিয় হয়ে উঠছে।

গণ-উদ্যোগ ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা : WHO বিশেষজ্ঞরা দেশে দেশে স্বাস্থ্যোন্নয়নের জন্য যে দুটি বিষয়ে জোর দিচ্ছেন তা হল কর্মসূচিগুলি সফল করার জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং জনগণের সাগ্রহ অংশগ্রহণ। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এই দুটি উপাদানই চীনের বিরাট সাফল্যের চাবিকাঠি। চীনে একদিকে যেমন প্রযুক্তিগত সাফল্য পৃথিবীতে প্রথম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন প্রত্যেকের পুনঃসংস্থাপন সম্ভব করেছে, অন্যদিকে তেমনই প্রাথমিক স্বাস্থ্যে ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্যের লক্ষ্যমাত্রা সময়ের আগেই পূর্ণ হয়েছে।

পশ্চিমবাংলা তথা হুগলি জেলাতেও এ দুটি উপাদানের বাস্তব-সম্মত সমাবেশ ঘটেছে। এর সুফলগুলির পরিচয় আমরা বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যান সহ আগেই দিয়েছি। মানুষ অনেক বেশি অধিকার সচেতন হচ্ছেন। জেলার অধিবাসীদের অনেক আকাঙ্ক্ষা এখনও অপূর্ণ। হাসপাতালগুলির জন্য মানুষের মনে যে বিক্ষোভ আছে তা অনেক সময় অত্যন্ত স্পর্শকাতর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এই অবস্থাকে দায়িত্বজ্ঞানহীন মহলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের প্রচেষ্টা অনেক ক্ষতি করছে এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের বিচারে যে সমস্ত যুগ যুগ স্থায়ী সমস্যার ধরা হালের জন্য জেলাবাসী গর্ব করতে পারেন, সে সম্পর্কে বিচারবোধ অনেকাংশে আচ্ছন্ন করে রাখছে।

অন্তর্ঘাতমূলক অপচেষ্টারও ত্রুটি নেই। চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে কুকুরে টেনে আনা নবজাত শিশুর কাহিনী ও ঘটনা একটি জ্বলন্ত সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত। শিশুটি মায়ের পেটের মধ্যেই, জন্মের বেশ কিছুদিন আগে মৃত, এ তথ্য সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। এ ছাড়া শবব্যবচ্ছেদ প্রমাণ করেছে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই কোনও ব্যক্তি মৃত শিশুটিকে অঙ্গহানি করে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে—জীবিত শিশু কুকুরে টেনে আনেনি। তবুও রটনা হল, হাসপাতাল সম্পর্কে মানুষের স্পর্শকাতর মনকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টার বন্যা বয়ে গেল।

কৃষ্ণনগরে পোলিও টিকা খাইয়ে শিশুর মৃত্যুর দায়িত্বজ্ঞানহীন রটনা এ জেলাতেও পোলিও নিরসন কর্মসূচিকে প্রাথমিক স্তরে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। স্বাস্থ্য বিভাগের যথা সময়ে নেওয়া পদক্ষেপ এবং জনগণের সচেতন প্রয়াস শেষ পর্যন্ত পোলিও টিকাদান কর্মসূচির সাফল্য এনেছে।

জেলার স্বাস্থ্যকর্মসূচির ইতিবাচক গতি অব্যাহত তথ্যই তা প্রমাণ করেছে। আমাদের উপস্থাপিত তথ্যগুলি অবশ্যই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ড অনুসারী। এগুলি সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলে এবং রাজ্যের আর্থ-রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রাখলে একথা বুঝতে অসুবিধা হবে না—স্বাস্থ্যসহ সমস্ত কল্যাণমুখী প্রয়াসের গতি ঊর্ধ্বমুখী। হাসপাতালগুলিতে অযথা ভিড় কমানোর পিছনে রোগ প্রতিরোধমূলক কাজ এবং বহুমুখী স্বাস্থ্য প্রকল্পের আন্তরিক প্রয়োগের ভূমিকা। সচেতন দৃষ্টিতে ধরা পড়বেই।

এই অগ্রগতিকে জনগণের অংশগ্রহণ পশ্চিমবাংলার অন্যান্য অংশের মতো হুগলি জেলাতে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ পরিদর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা গণতন্ত্রকে বিকেন্দ্রিত করেছে। ফলে উদ্বুদ্ধ মানুষের খাদ্যগ্রহণ ও পানীয় জলের ক্ষেত্রে চেতনা পরিবেশের উন্নতি এবং সংরক্ষণ, সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ, টিকা গ্রহণ—এইসব সুদূর গ্রামাঞ্চলেও চোখে পড়ার মতো। ভূমিসংস্কার ঘটিয়েছে আর্থিক সংস্থানের অনেকাংশে শ্রীবৃদ্ধি—ফলে পুষ্টির উন্নতির লক্ষণ কম হলেও দেখা যাচ্ছে, জেলায় সাক্ষরতা আন্দোলনও এ বিষয়ে জরুরি ভূমিকা নিয়েছে। হুগলি জেলাতে প্রথম সাক্ষরতার সঙ্গে ব্যাপক স্বাস্থ্য আন্দোলনের প্রশ্নটি—সচেতনভাবেই যুক্ত করা হয়।

এ ভাবেই গণ-উদ্দীপনাকে কাজে লাগানো হয়েছে। এর পাশাপাশি রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রশ্নটিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচ্য। রাজ্যের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে কল্যাণমূলক প্রয়াস ও সাফল্য, কেন্দ্রীয়স্তরে এমনকি বিরোধী মহলেও অনিবার্যভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে—বিশেষ করে পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে। রাজ্যের অঙ্গহিসাবে হুগলি জেলা ও উন্নয়নের প্রশ্নে সঙ্গতি রেখে চলেছে।

জেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র

মহকুমা—..

ব্লক—..

প্রাথমিক—..

সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র—..

ই এস আই—..

সূত্র :

১। সুধীরকুমার মিত্র : হুগলি জেলার ইতিহাস ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ মিত্রানী প্রকাশন।

২। ডাঃ এস এন বসাক, সি ও এম এইচ হুগলি ব্যক্তিগত যোগাযোগ।

৩। শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : জেলা সাক্ষরতা ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলন কমিটি প্রকাশিত স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত পুস্তিকা।

৪। প্রবুদ্ধকুমার ঘোষ : চীনের স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গণশক্তি, ১০ই নভেম্বর ১৯৭২ ও গণশক্তি ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৭৩।

৫। Prabuddha Kumar Ghosh : Health for all China's Achievement your Health, March 1987. I. M. A.

৬। Prabuddha Kumar Ghosh : Editorial, Journal of I. M. A. July 1989.

৭। হুগলি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর প্রকাশিত তথ্য পুস্তিকাবলী।

৮। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর প্রকাশিত—হাসপাতালের মানোন্নয়ন-সম্পর্কিত প্রকল্প প্রতিবেদন, ১৯৯৫।

৯। Health on the March–West Bengal, 1981, 1984-85, 1986 State Bureau of Health Intelligence, D.H.S.W.B.

১০। হুগলি জেলা পরিষদ দপ্তর থেকে সংগৃহীত তথ্য।

হুগলি জেলার বিদ্যুৎ ব্যবস্থা

দিলীপ দত্ত

কোন দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান কোন পর্যায়ে বিরাজ করছে, তা নির্ভর করে সেই দেশের মানুষ মাথাপিছু কত বিদ্যুৎ ব্যবহার করে তার ওপর। সেইদিক থেকে ভারতের স্থান বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক নিচে। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য, তাই এখানকার মানুষের মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার ভারতের জাতীয় গড়ের বেশিকিছু হলেও কোনও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে বলা যাবে না। আর পশ্চিমবঙ্গের একটি ক্ষুদ্র জেলা হচ্ছে হুগলি। এই জেলাটি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র জেলাগুলির অন্যতম। এই জেলার মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কয়েকটি জেলাকে বাদ দিলে এর স্থান অন্য জেলাগুলির তুলনায় বেশি। এই জেলার উত্তরে হাওড়া জেলা অবস্থিত। দক্ষিণে বর্ধমান, পূর্বে ভাগীরথী নদী এবং পশ্চিমে বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশ অবস্থান করছে। এই জেলার আয়তন ৩৮,৭১৫ একর। এই জেলায় ১২টি পৌরসভা, ২১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ১৯৩৬টি গ্রাম ও ১৮৯১টি মৌজা আছে।

বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় এই জেলা দীর্ঘদিন ধরে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে হুগলি জেলা এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, যা বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমগ্র পূর্বাঞ্চলে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সেই উৎপাদন কেন্দ্রটি এই জেলায় অবস্থান করার জন্য এখানকার বিদ্যুৎ ব্যবস্থা অন্য জেলাগুলি থেকে স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। এ ছাড়া সিঙ্গুর, হরিপাল বিদ্যুৎ সমবায় যা জনসাধারণের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। এই সংস্থাটি এই জেলায় অবস্থান করছে। সামগ্রিক দিক দিয়ে এই জেলার বিদ্যুৎ ব্যবস্থার চালচিত্র বৈচিত্র্য বহন করলেও জনজীবনে বিদ্যুৎ ব্যবহারের চিত্র দিনের পর দিন উন্নতির সোপান বেয়ে চলেছে।

ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ভাগীরথী নদীর তীরে ত্রিবেণী রেল স্টেশনের কাছে অবস্থিত। এই উৎপাদন কেন্দ্রটির উত্তরে চন্দ্রহাটি গ্রাম পঞ্চায়েত। এ ছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে বাঁশবেড়িয়া পৌরসভার কিছু অংশ অবস্থান করায় উৎপাদন কেন্দ্রটি একটি ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত। কিন্তু পূর্বদিকে ভাগীরথী নদী থাকার জন্য এর পূর্বদিকে কোনও জনবসতি নেই। এই উৎপাদন কেন্দ্রের মোট পাঁচটি বিদ্যুৎ উৎপাদন করার ইউনিট আছে। এই ইউনিটগুলির মধ্যে চারটি ইউনিট খুব পুরনো। প্রথম ইউনিটটি চালু হয় ১৯৬৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর। দ্বিতীয় ইউনিটটি চালু হয় ১৯৬৫ সালের ১৮ অক্টোবর, তৃতীয় ইউনিটটি এবং চতুর্থ ইউনিট চালু হয় যথাক্রমে ১৯৬৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি এবং ৩ আগস্ট।

এই ইউনিটগুলি স্থাপিত হয়েছিল ৮৭.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার ক্ষমতা নিয়ে, কিন্তু বর্তমানে এই ইউনিটগুলি আর ৮৭.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে না। সি ই এ (Control Electricity Authority)-র নিয়মানুযায়ী বর্তমানের পুরনো ইউনিটগুলির উৎপাদনক্ষমতা অনেক কম হওয়া উচিত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ (যার নিয়ন্ত্রণাধীনে এই বিদ্যুৎকেন্দ্র) কোনও রকম তদ্বির ও তদারকি না করার জন্য সি ই এ ১৯৭৪ সাল থেকে একতরফাভাবে ইউনিটগুলির উৎপাদনক্ষমতা ৮০ মেগাওয়াট ধরে থাকে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের অভিমত—এই ইউনিটগুলির উৎপাদনক্ষমতা ৭১ মেগাওয়াট ধরা উচিত। এ ছাড়া ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের আর একটি ইউনিট ১৯৮২ সালের ৮ অক্টোবর চালু হয়। এই ইউনিটটি পঞ্চম ইউনিট নামে খ্যাত। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকেরা একে 'পাঁচুবাবু' বলে ডাকে। এই ইউনিটের উৎপাদনক্ষমতা ২১০ মেগাওয়াট, বর্তমানে ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মোট উৎপাদনক্ষমতা (৭১ মেগাওয়াট x ৪ + ২১০ মেগাওয়াট) বা ৪৯৪ মেগাওয়াট। কিন্তু সি ই এ এই কেন্দ্রের উৎপাদনক্ষমতা (৮০ মেগাওয়াট x ৪ + ২১০) বা ৫৩০ মেগাওয়াট ধরে থাকে। সেইজন্য ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রকৃত প্ল্যান্ট লোড ফ্যাক্টর (Plant Load Factor) কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা সি ই এ যা দেখায়, তার চেয়ে অনেক বেশি।

ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে। এই কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে নানারকম প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলেও এই কেন্দ্রের শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রমিক-কর্মচারী ও অফিসার, ইঞ্জিনিয়ারদের সক্রিয় ভূমিকা উৎপাদন ব্যাহত করার সমস্ত ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করতে পেরেছে। অধিক উৎপাদন করার জন্য ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি কেন্দ্রীয় সংস্থার সি ই এ কর্তৃক বারবার পুরস্কৃত হয়েছে, প্রশংসা অর্জন করেছে বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে। এই কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্থিতিশীলতা শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, সামগ্রিক পূর্বাঞ্চলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত ভূমিকা পালন করে আসছে। এই কেন্দ্রের উৎপাদন নিম্নরূপ:

সাল (মার্চ-এপ্রিল)	মোট উৎপাদন (মেগাওয়াট)	প্রকৃত পি এল এফ শতকরা হিসাব
১৯৭৩-৭৪	১,৭৩,৩৬০	৫৯.৯৭
১৯৭৪-৭৫	১৩,৭৬,৭৬০	৪৯.১১
১৯৭৫-৭৬	১২,০৮,৫৫০	৪৩.০০
১৯৭৬-৭৭	১৫,৭১,৪৪০	৫৬.০৬
১৯৭৭-৭৮	১৪,৪৭,১১০	৫১.৬২
১৯৭৮-৭৯	১৫,৯৪,৭০০	৬৪.১০
১৯৭৯-৮০	১৫,৪৯,৭৬০	৬২.১২
১৯৮০-৮১	১৬,৮৭,৮২০	৬৭.৮৪
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
১৯৯২-৯৩	১২,৬৪,১৯৪	২৯.২১
১৯৯৩-৯৪	২২,৪১,১২৫	৫১.৭৯
১৯৯৪-৯৫	২৩,২৯,৭১২	৫৩.৮৪

১৯৭৫-৭৬ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ইউনিটগুলি একনাগাড়ে দীর্ঘদিন রক্ষণাবেক্ষণ না করার জন্য উৎপাদন বেশ কমে যায়। তাছাড়া ১৯৯২-৯৩ সালে ব্যাণ্ডেল ৫ম ইউনিটের ট্রান্সফরমারটি দীর্ঘদিন খারাপ থাকার জন্য উৎপাদন কম হয়। তাছাড়া এই কেন্দ্রটি উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বহন করে আসছে এবং সমগ্র পূর্বাঞ্চলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা রাখতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

এই কেন্দ্রের Low system Demand Loss (অর্থাৎ উৎপাদন করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও চাহিদা না থাকার জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় না।) খুব বেশি।

সাল (এপ্রিল-মার্চ)	উৎপাদন করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন করা যায়নি চাহিদা না থাকার জন্য। (মেগাওয়াট, ঘণ্টা)
১৯৯১-৯২	২১,১৯,৪৫১
১৯৯২-৯৩	৭৮,৯৩২
১৯৯৩-৯৪	১৭,৭৭৫
১৯৯৪-৯৫	১,১৯,৯৮০

বামফ্রন্ট সরকারের কিছু ইতিবাচক ভূমিকা জনজীবনকে দূষণমুক্ত করেছে, তেমনই অধিক উৎপাদন বাড়াতে সহযোগিতা করেছে।

১৯৭৭ সালে জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সরকারের ভাবনা-চিন্তা মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করেছে। বামফ্রন্ট সরকার যেমন মানুষের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তেমনি কি করে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে অধিক উৎপাদন করা যায়, তার ব্যবস্থার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটির ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াতে কিছু ইতিবাচক ভূমিকা শ্রমিক-কর্মচারী, অফিসার ইঞ্জিনিয়ার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে সঠিক সময়ে ইউনিটগুলির রক্ষণাবেক্ষণ উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করেছে। এখানকার ৪টি ইউনিটে ই এস পি না থাকার জন্য (E.S.P.) বিশাল পরিমাণ ছাই বাতাসে মিশে জনজীবনকে দূষিত করত। এর ফলে মানুষ নানা রোগে আক্রান্ত হত। অপর দিকে ই এস পি না থাকার জন্য আই ডি ফ্যান (লোড বিয়ারিং ইকুইপমেন্ট) ঘন ঘন খারাপ হত। তার ফলশ্রুতি হিসাবে এই কেন্দ্রের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনও কম হত। বামফ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল ১৮ কোটি টাকা খরচ করে ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে পুরনো ৪টি ইউনিটে ই এস পি বসাবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে ইতিমধ্যে ৩টি ইউনিট ই এস পি বসানো হয়ে গেছে। বাকি ইউনিটটিতে আগামী ৬ মাসের মধ্যে ই এস পি বসানো হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, এই ইউনিটগুলিতে জন্মলগ্ন থেকেই ই এস পি ছিল না। এর ফলে ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। জনজীবনকে দূষণমুক্ত করা সম্ভব হয়েছে এবং অধিক ফসল উৎপাদনেরও সহায়তা করেছে।

ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যাণ্ডেল-দুর্গাপুর, ব্যাণ্ডেল-আদিসপ্তগ্রাম, ব্যাণ্ডেল-কল্যাণী, ব্যাণ্ডেল-রিষড়া এবং ব্যাণ্ডেল-ধরমপুর প্রভৃতি ফিডারের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়। এছাড়া ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সরাসরি ২টি ফিডারে কেশোরাম রেয়ন এবং টিস্যু কারখানায় বিদ্যুৎ যায়।

হুগলি জেলার বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থা

হুগলি জেলার বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থা প্রধানত চারটি এলাকায় বিভক্ত।

১। সি ই এস সি (Calcutta Electric Supply Corporation) এলাকা
২। সিঙ্গুর হরিপাল বিদ্যুৎ সমবায় এলাকা।
৩। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ নিয়ন্ত্রণাধীন ডি ভি সি এলাকা।
৪। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা।

সি ই এস সি এলাকা

শ্রীরামপুর, শেওড়াফুলি, উত্তরপাড়া, বৈদ্যবাটি, মানকুণ্ডু, ভদ্রেশ্বর ও রিষড়ার কিয়দংশ নিয়ে সি ই এস সি এলাকা গঠিত। এই এলাকাস্থিত সমস্ত লাইন, সাব-স্টেশন রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সি ই এস সি-র এই সমস্ত এলাকায় সমস্ত রকমের গ্রাহকদের দায়দায়িত্ব সি ই এস সি-র নিয়ন্ত্রণাধীন।

সিঙ্গুর হরিপাল বিদ্যুৎ সমবায় এলাকা

হরিপাল ও সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত সমস্ত এলাকাটি বিদ্যুৎ বণ্টনের সমস্ত দায়দায়িত্ব সিঙ্গুর হরিপাল বিদ্যুৎ সমবায়ের নিয়ন্ত্রণাধীন। সিঙ্গুর হরিপাল বিদ্যুৎ সমবায় কৈকালা ও সিঙ্গুর ৩৩/১১ কে ভি এই দুই সাব-স্টেশনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এলাকাধীন সমস্ত রকম গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বণ্টন করার দায়িত্ব এরা গ্রহণ করে।

ডি ভি সি এলাকা

ধনেখালি ও তার পাশাপাশি কিছু এলাকায় ডি ভি সি বিদ্যুৎ দিয়ে থাকে। এই এলাকাটি রক্ষণাবেক্ষণ করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ। বেলমুড়ি ৩৩/১১ কে ভি সাব-স্টেশনের মধ্য দিয়ে ডি ভি সি-র বিদ্যুৎ আসে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা

উপরোক্ত তিনটি এলাকা বাদ দিয়ে বাকি হুগলি জেলার সমস্ত এলাকায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ বিদ্যুৎ বণ্টন করে থাকে। এই এলাকাটির সমস্ত কিছু রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ন্ত্রণ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ করে থাকে।

এই জেলাতে সুষ্ঠুভাবে বিদ্যুৎ পরিবহন ও বণ্টনের জন্য নিম্নলিখিত ১৩২/৩৩/১১ কে ভি সাব-স্টেশনগুলি আছে।

সাব-স্টেশনগুলির নাম	ভোল্টেজ রেশিও (Voltage Ratio)	সংস্থাপিত ক্ষমতা
১। আরামবাগ	৪০০/২২০/১৩২/৩৩ কে.ভি.	১৬০ এম.ভি.এ ২২০/১৩২/৩১.৫ এম.ভি.এ. ১৩২/৩৩ কে.ভি.
২। আদিসপ্তগ্রাম	১৩২/৩৩ কে.ভি.	৩১.৫ এম.ভি.এ. x ৩ = ৯৪.৫ কে.ভি.
	৩৩/১১ কে.ভি.	(৬.৩ এম.ভি.এ. x ১ + ৫ এম.ভি.এ. x ২) = ১৬.৩ এম.ভি.এ.
	১৩২/২৫ কে.ভি.	১২.৫ এম.ভি.এ. x ২ = ২৫ এম.ভি.এ.
৩। রিষড়া	১৩২/৩৩ কে.ভি.	(৫০ এম.ভি.এ. x ১ + ৩১.৫ এম.ভি.এ. x ২) = ১১৩ এম.ভি.এ.
	৩৩/১১ কে.ভি.	৫ এম.ভি.এ. x ৩ = ১৫ এম.ভি.এ.
৪। বেলমুড়ি (ডি ভি সি সোর্স)		

আদিসপ্তগ্রাম ১৩২/২৫ কে ভি সাব-স্টেশন থেকে রেলওয়ে ট্রাকসনে বিদ্যুৎ দেওয়া হয়। এখানে ১২.৫ এম.ভি.এ. করে দুটি ট্রান্সফরমার আছে। এখান থেকে একমাত্র রেলওয়েতে প্রয়োজনীয় সমস্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

উপরোক্ত সাব-স্টেশনগুলি থেকে নিম্নলিখিত ৩৩/১১ কে.ভি. সাব-স্টেশনগুলিতে বিদ্যুৎ পাঠান হয়।

সাব-স্টেশনের নাম	ভোল্টেজ রেশিও	সংস্থাপিত ক্ষমতা
১। তালডাঙ্গা	৩৩/১১ কে.ভি.	২ X ৬.৩ এম.ভি.এ. = ১২ এম.ভি.এ.
	৩৩/৬ কে.ভি.	২ X ৫.০ এম.ভি.এ. = ১০.০ এম.ভি.এ.
২। ডানলপ	৩৩/৬ কে.ভি.	৩ X ১২.৫ এম.ভি.এ. = ৩৭.৫ এম.ভি.এ.
৩। কালীতলা	৩৩/১১ কে.ভি.	৩ X ৩.০ এম.ভি.এ. = ৯.০ এম.ভি.এ.
৪। খন্যান	৩৩/১১ কে.ভি.	২ X ৫.০ এম.ভি.এ. = ১০ এম.ভি.এ.
৫। পাণ্ডুয়া	৩৩/১১ কে.ভি.	২ X ৫ + ১ X ৩ এম.ভি.এ. = ১৩ এম.ভি.এ.
৬। ইনচুড়া	৩৩/১১ কে.ভি.	৩ X ৩ এম.ভি.এ. = ৯ এম.ভি.এ.
৭। বেলমুড়ি	৩৩/১১ কে.ভি.	২ X ৫ + ২ X ৩ এম.ভি.এ. = ১৬ এম.ভি.এ.

সাব-স্টেশনের নাম	ভোল্টেজ রেশিও	সংস্থাপিত ক্ষমতা
৮। রঘুনাথপুর	৩৩/১১ কে.ভি.	২ X ৫ + ১ X ৩ এম.ভি.এ. = ১৩ এম.ভি.এ.
৯। শিয়াখালা	৩৩/১১ কে.ভি.	১ X ৩.০ এম.ভি.এ. = ৩ এম.ভি.এ.
১০। জাঙ্গিপাড়া	৩৩/১১ কে.ভি.	২ X ৫ এম.ভি.এ. = ১০ এম.ভি.এ.
১১। সিঙ্গুর	৩৩/১১ কে.ভি.	৩ X ৫ এম.ভি.এ. = ১৫ এম.ভি.এ.
১২। বৈকালা	৩৩/১১ কে.ভি.	২ X ৩ এম.ভি.এ. = ৬ এম.ভি.এ.
১৩। চাঁপাডাঙ্গা	৩৩/১১ কে.ভি.	২ X ৩ + ২ X ৫ এম.ভি.এ. = ১৬ এম.ভি.এ.
১৪। মায়াপুর	৩৩/১১ কে.ভি.	২ X ৫ এম.ভি.এ. = ১০ এম.ভি.এ.
১৫। খানাকুল	৩৩/১১ কে.ভি.	২ X ৩ এম.ভি.এ. = ৬ এম.ভি.এ.
১৬। আরামবাগ	৩৩/১১ কে.ভি.	২ X ৫ এম.ভি.এ. = ১০ এম.ভি.এ.
১৭। কামারপুকুর	৩৩/১১ কে.ভি.	২ X ৩ এম.ভি.এ. = ৬ এম.ভি.এ.
১৮। গোলবা	৩৩/১১ কে.ভি.	২ X ৩ এম.ভি.এ. = ৬ এম.ভি.এ.
১৯। ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স	৩৩/১১ কে.ভি.	২ X ৩ এম.ভি.এ. = ৬ এম.ভি.এ.

এ ছাড়া বৈঁচি ও দশঘরা দুটি ৩৩/১১ কে ভি সাব-স্টেশনের কাজ চলেছে। এই দুটি সাব-স্টেশনে ৩.১৫ এম ভি এ'র দুটি করে ট্রান্সফরমার বসানো হবে।

এই সমস্ত সাব-স্টেশনের পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজনমতো স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার (যার মধ্য দিয়ে ভোল্টেজ কমানো হয়) বসিয়ে দরকারমতো বিভিন্ন ধরনের গ্রাহকদের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো হয়। হুগলি জেলার বণ্টন ব্যবস্থা স্থিতিশীল। কিন্তু কিছু কিছু এলাকা দীর্ঘদিন ধরে রক্ষণাবেক্ষণ করতে না পারার জন্য বা বিদ্যুৎ পরিবাহী তার পরিবর্তন না করতে পারার জন্য বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতা মাঝে মাঝে পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন সমস্যাও দেখা যাচ্ছে কারণ, গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ট্রান্সফরমারের ক্ষমতার (capacity)-র মধ্যে সমস্ত গ্রাহককে বিদ্যুৎ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না তার ফলশ্রুতি হিসাবে মাঝেমধ্যে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতার ঘটনাও পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং এতে জনসাধারণও অসুবিধার মধ্যে পড়ছেন। বামফ্রন্ট সরকার সীমাবদ্ধ অর্থনৈতিক ক্ষমতার মধ্যেও হুগলি জেলার বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থার আরও উন্নতি করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। সম্প্রতি রাজ্য সরকার এই জেলার বণ্টন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার জন্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে এক কোটি ষাট লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। তার কাজও চলছে।

'কাজের অগ্রগতি অব্যাহত আছে'

১৯৯৪-৯৫ সালে সেন্ট্রালাইজড এবং ডিসেন্ট্রালাইজড (Decentralised) বাল্ক (Bulk) পাওয়ার কনজিউমার্স বিদ্যুৎ সংযোগ করার লক্ষ্য হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল ১০টি, কিন্তু ৩১.৩.৯৫-এর মধ্যে ১২টি বাল্ক পাওয়ার কনজিউমার্সে (Bulk Power Consumers) বিদ্যুৎ সংযোগ করা সম্ভব হয়েছে অর্থাৎ ১৯৯৪-৯৫ সালে ঘোষিত লক্ষ্য পূরণ হয়েও আরও ২টি বাল্ক পাওয়ার কনজিউমার্সে বিদ্যুৎ সংযোগ করা সম্ভব হয়েছে। এই ১২টির মধ্যে ১টি সেন্ট্রালাইজড ও ১১টি ডিসেন্ট্রালাইজড বাল্ক পাওয়ার কনজিউমার্স।

১৯৯৫-৯৬ সালে বাল্ক পাওয়ার কনজিউমার্সের ১২টিতে বিদ্যুৎ সংযোগ করার লক্ষ্য হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল। ৩১.১.৯৬ তারিখ পর্যন্ত ১১টিতে বিদ্যুৎ সংযোগ করা সম্ভব হয়েছে।

৩১.১.৯৬ তারিখ পর্যন্ত মোট সেন্ট্রালাইজড বাল্ক কনজিউমার্সে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে ৩৭টিতে এবং ডিসেন্ট্রালাইজড বাল্ক কনজিউমার্সে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে ২৫১টিতে। উল্লেখ্য যে, যে সমস্ত বিদ্যুৎগ্রাহক ৫০ কে ভি বা তার অধিক বিদ্যুৎ গ্রহণ করে তাকে বাল্ক কনজিউমার বলে। ৫০ থেকে ৫০০ কে ভি পর্যন্ত যে সমস্ত গ্রাহক বিদ্যুৎ নিয়ে থাকে সেই সমস্ত গ্রাহককে ডিসেন্ট্রালাইজড কনজিউমার বলা হয়। ৫০০ কে ভি-র ওপরে যারা বিদ্যুৎ নিয়ে থাকে, তাদের সেন্ট্রালাইজড বাল্ক কনজিউমার বলা হয়।

নিম্ন ও মাঝারি ভোল্টেজ আওতাধীন গ্রাহকদের ৩১.১.৯৫ পর্যন্ত দরখাস্ত পড়েছিল নিম্নরূপ।

(ক)	গার্হস্থ্য/বাণিজ্যিক	—	১৫,২৭৮টি
(খ)	শিল্পে	—	৩৩৪টি
(গ)	কৃষি ও অন্যান্যতে	—	১,৪৬৯টি
			১৭,০৮১টি

নিম্ন ও মাঝারি ভোল্টেজের আওতাধীন অপেক্ষারত দরখাস্তকারীদের বিদ্যুৎ সংযোজন করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ এগোতে থাকে। ১৯৯৪-৯৫ সালে মোট ১৫,০০০ দরখাস্তকারীর বিদ্যুৎ সংযোজন হবে বলে লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়। তার মধ্যে ১৩,০৬০টি বিদ্যুৎ সংযোগ করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে নিম্ন ও মাঝারি ভোল্টেজ আওতাধীন ১৭,০০০ দরখাস্তকারীর বিদ্যুৎ সংযোগ করার লক্ষ্য হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু ৩১.১.৯৬ তারিখের মধ্যে ঘোষিত লক্ষ্যপূরণ হয়ে আরও ৩৬৩৫টি নতুনভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ করা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ ৩১.১.৯৬ তারিখের মধ্যে মোট ২০৩৬৫ জনের নতুন বিদ্যুৎ সংযোজিত হয়েছে।

হুগলি জেলায় ৩১.১.৯৬ তারিখ পর্যন্ত গার্হস্থ্য, বাণিজ্যিক, শিল্পে, কৃষিতে ও অন্যান্যতে মোট বিদ্যুৎ সংযোজিত হয়েছে ২,৩২,২৭৭টি।

কৃষিতে পাম্পসেটে বিদ্যুৎ সংযোগ করার কাজে অগ্রগতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

১৯৯৩-৯৪ সালে ৩৪০টি পাম্পসেটে বিদ্যুৎ সংযোজিত হয়েছে। ১৯৯৪-৯৫তে ১৩০টি এবং ১৯৯৫-৯৬ সালে ২৩০টি বিভিন্ন ধরনের কৃষি পাম্পসেটে বিদ্যুৎ সংযোজিত করা সম্ভব হয়েছে।

১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত হুগলি জেলাতে কৃষিকাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের পাম্পসেটে যে বিদ্যুৎ সংযোজিত হয়েছে, তা নিম্নরূপ।

(ক)	স্যালো টিউবওয়েল (Sallow Tubewell)	–	৭,৭৬৭টি
(খ)	ডিপ টিউবওয়েল (Deep Tubewell)	–	৯৬১টি
(গ)	আর এল আই (River Lift Irrigation)	–	১৮৬টি
		মোট	৮,৯১৪টি

গ্রাম্য বৈদ্যুতিকরণ

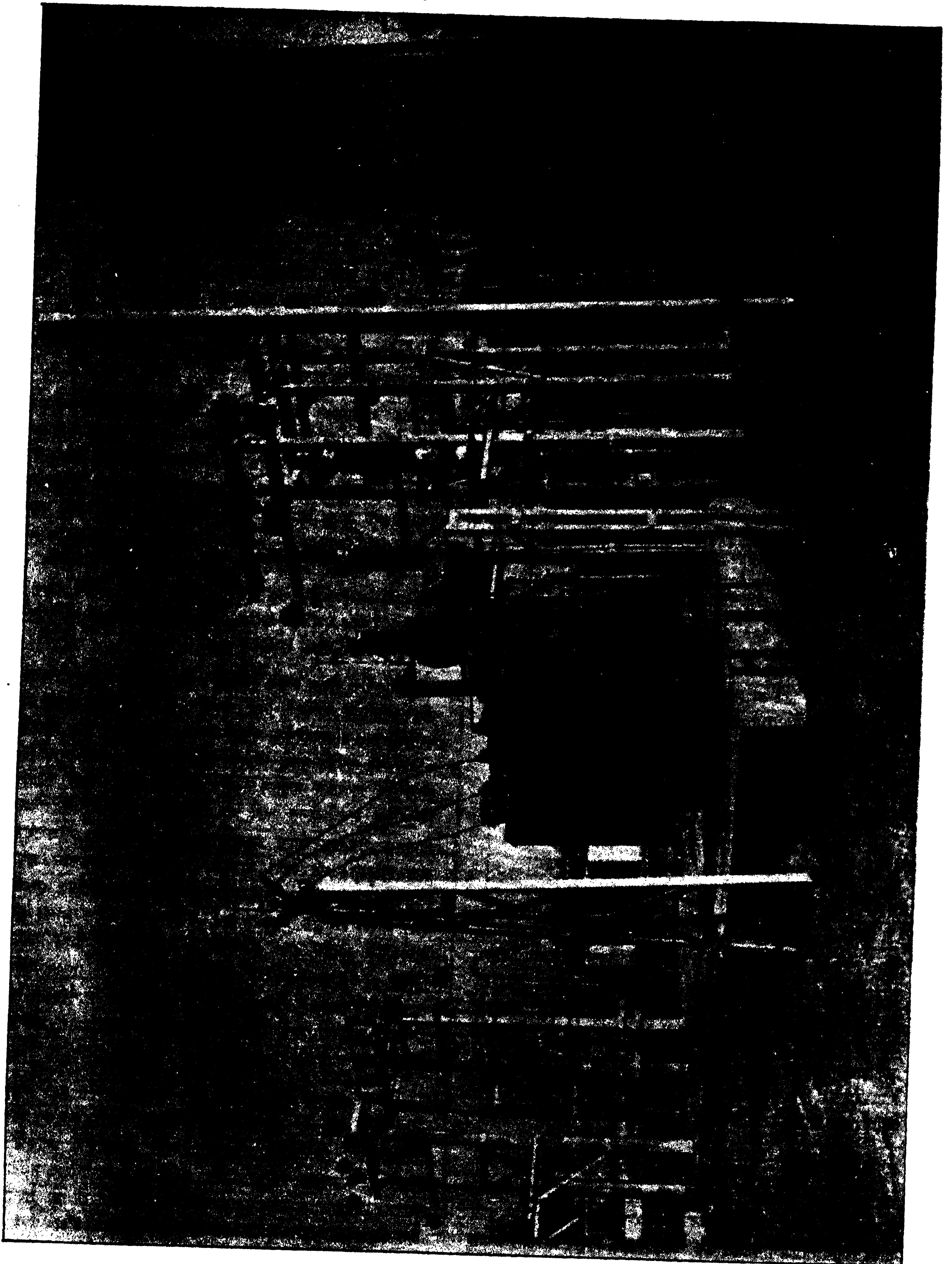
হুগলি জেলায় মোট ১৮৯৯টি মৌজার মধ্যে ১৮৯৮টি মৌজায় বিদ্যুৎ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। মৌজাস্থিত সমস্ত গ্রামেও বিদ্যুৎ সংযোগ করা সম্ভব হয়। গ্রামগুলির কোনও কোনও এলাকা (সংখ্যায় খুব অল্প) হয়তো বিদ্যুৎ না পৌঁছে থাকলেও থাকতে পারে। একমাত্র জাঙ্গিপাড়া থানার অন্তর্গত দো-গাছিয়া (জে এল নং ২৯) মৌজাটি বৈদ্যুতিকরণ করা সম্ভব হয়নি। এই মৌজা সহ মৌজাস্থিত গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোজিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। হুগলি জেলা গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছে।

লোকদীপ : সারা ভারতে কোথাও লোকদীপ ছিল না। পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার এই প্রকল্প প্রথমে চালু করে। গ্রামবাংলার হাজার হাজার গরিব মানুষ, যারা দিন আনে দিন খায়, তারা বিদ্যুৎ সংযোগ করতে ভয় পায়। কারণ, বিদ্যুৎ সংযোগ করার জন্য যে টাকার দরকার, সেই টাকা তারা জোগাড় করতে পারে না। সেই সমস্ত গরিব মানুষের বাড়িতে লোকদীপ প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ করার অভিনব এক সিদ্ধান্ত পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার গ্রহণ করে। বামফ্রন্ট সরকারের সীমিত অর্থনৈতিক ক্ষমতার মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলার সমস্ত গরিব মানুষের বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই গ্রামভিত্তিক কিছু কিছু বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছে। বিদ্যুৎ কানেকশন দেওয়ার ব্যাপারে যে সমস্ত মালপত্র লাগবে, তা বিনা পয়সায় সরবরাহ করবে বামফ্রন্ট সরকার। আর বিদ্যুৎ শ্রমিকরা কোনও রকম মজুরি না নিয়ে গরিব মানুষের বাড়িতে বিদ্যুৎ কানেকশন করে দেবেন। আর গ্রাম পঞ্চায়েত ঠিক করে দেবে কার কার বাড়িতে বিদ্যুৎ কানেকশান করা হবে। এই প্রকল্পে আদিবাসী ও তফসিলি সম্প্রদায়ের মানুষকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

এই অভিনব পদ্ধতির মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলার হাজার হাজার গরিব মানুষ যারা যুগ যুগ ধরে বঞ্চনার শিকার হয়েছিল, যারা কোনওদিন কল্পনাও করতে পারেনি তাদের বাড়িতে কোনওদিন বিদ্যুৎ সংযোগ হবে, বামফ্রন্ট সরকারের সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি হিসাবে সেই সমস্ত মানুষের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ করা সম্ভব হয়েছে। এই ব্যাপারে হুগলি জেলা পথপ্রদর্শক। ১৯৮৬ সালের ৩১ মার্চ তারিখে বামফ্রন্ট সরকারের তৎকালীন তফসিলি ও আদিবাসী কল্যাণমন্ত্রী শম্ভু মাণ্ডি মহাশয় প্রথম হুগলি জেলার পোলবা থানার মেড়িয়া গ্রামে এবং চণ্ডীতলা থানার মালিপুকুর গ্রামে লোকদীপ প্রকল্প উদ্বোধন করেন।

লোকদীপ প্রকল্প হুগলি জেলায় এখনও পর্যন্ত অব্যাহত আছে। গরিব মানুষের বাড়িতে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার যে কর্মসূচি, তার ধারাবাহিকতা হুগলি জেলা এখনও বহন করে চলেছে। ৩১.১২.৯৫ তারিখ পর্যন্ত এই জেলায় মোট ১৫৯৮৭ জনের বাড়িতে লোকদীপ প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ করা সম্ভব হয়েছে। বিদ্যুৎশিল্প জনজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই শিল্পের সামগ্রিক উন্নতির স্বার্থে জনসাধারণকে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করা দরকার। এই লক্ষ্য সামনে রেখে গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে বিদ্যুৎগ্রাহকদের মিটার রিডিং এবং বিলিং করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। হুগলি জেলার আকনা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে মগরা গ্রুপ ইলেকট্রিক সাপ্লাই এবং পোলবা গ্রুপ ইলেকট্রিক সাপ্লাই মিটার রিডিং ও বিলিং করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে হুগলি জেলাই পথপ্রদর্শক। সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রথমেই হুগলি জেলায় এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়। এতে দেখা গেছে, এই কর্মসূচি সাফল্যলাভ করেছে।

হুগলি জেলার বিদ্যুৎ ব্যবস্থা অন্য অনেক জেলার চেয়ে উন্নত শুধু তাই নয়, এই জেলা বিদ্যুৎ সংক্রান্ত অনেক নতুন প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গে পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করেছে। লোকদীপ, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মিটার রিডিং ও বিলিং এবং বিদ্যুৎ সমবায় গঠনের মাধ্যমে জনজীবনের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া প্রভৃতি দিক দিয়ে এই জেলা পথপ্রদর্শক হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।



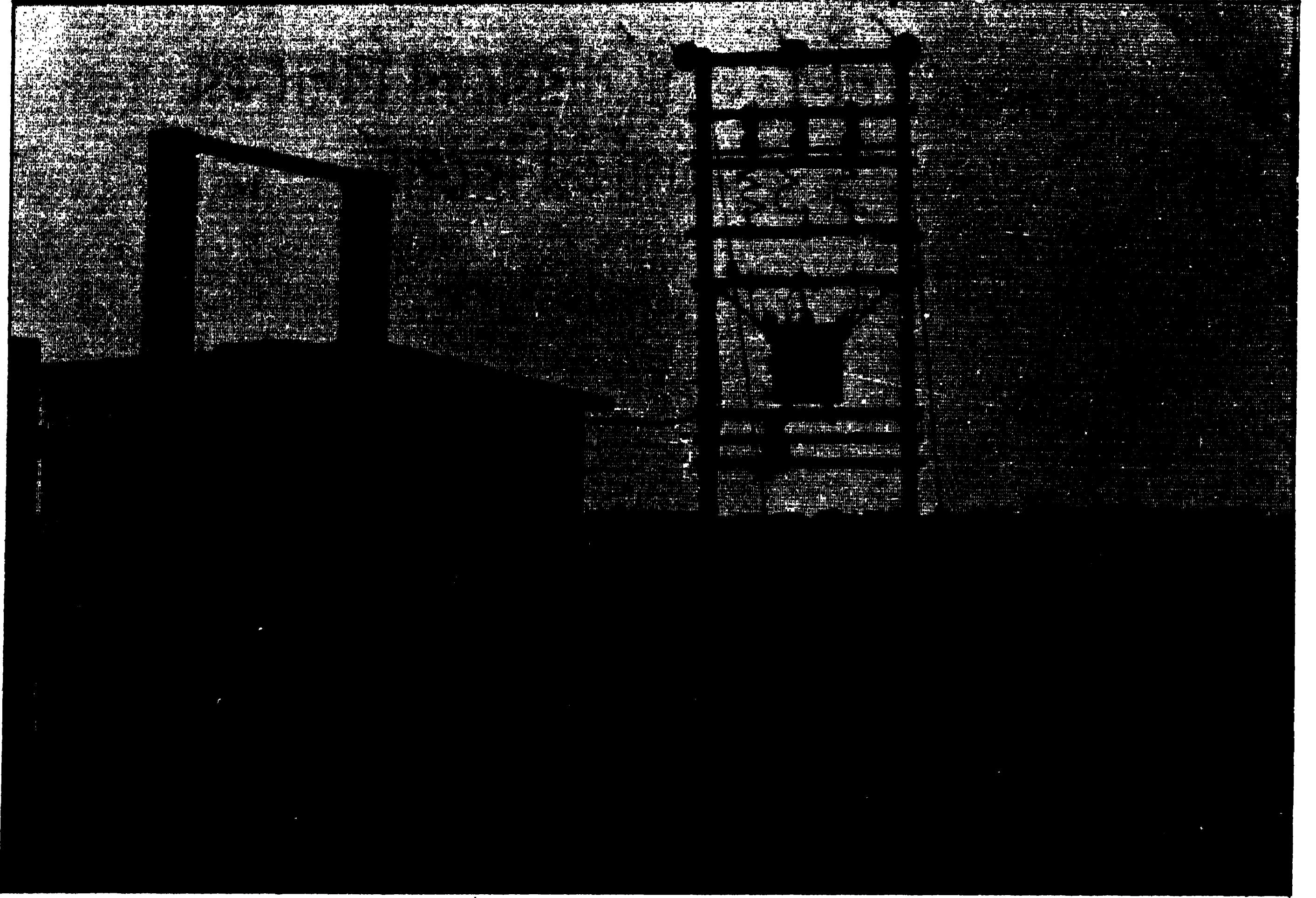
হুগলি জেলা পরিষদের বিদ্যুতের অগ্রগতির রিপোর্ট

আরতি সাঁতরা



১৯৯৫-৯৬ বর্ষে বিদ্যুতের যে অগ্রগতি হয়েছে তার মধ্যে হুগলি জেলার বরাদ্দ ছিল ইন্‌টেনসিফিকেশনের জন্য ৩৫টি মৌজা, অনুমোদিত ছিল (বিদ্যুৎ দপ্তর কর্তৃক), যেহেতু চাহিদা বেশি থাকার জন্য স্পেশাল প্রোগ্রামে আরও ৩৫টি মৌজা ইন্‌টেনসিফিকেশনের জন্য বরাদ্দ হয়েছে। রিভাইটালাইজেশনের জন্য ১০টি বরাদ্দ ছিল— স্পেশাল প্রোগ্রামে আরও ৫টি মৌজা বেড়েছে।

এ ছাড়া পাম্পসেট ২১০টি বরাদ্দ, ৩৫টি মঞ্জুরিকৃত ইন্‌টেনসিফেকেশন মৌজার মধ্যে ৮টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এবং বাকিগুলির কাজ দ্রুত চলছে—এই আর্থিক বছরে শেষ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সঠিক সময়ে মালপত্র না পাওয়ার ফলে কাজের অগ্রগতি কিছুটা বিঘ্নিত হয়েছে। স্পেশাল প্রোগ্রামের কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় মার্চ ৯৬-এর মধ্যে শেষ হবে রিভাইটালাইজেশনের জন্য ১০ + ৫টি = ১৫টি মৌজা নির্ধারণ করা হয়েছে তারও ক্ষেত্রে ১ম অবস্থাতে মালপত্র ঠিকমত সরবরাহ না হওয়ার ফলে কিছুটা বিঘ্নিত হয়েছিল,—এখন কাজ শেষ করার লক্ষ্যে দ্রুত গতিতে কাজ চলছে।



গভীর নলকূপ ॥ নবাবপুর *ছবি অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়*

ট্রান্সফরমার—জেলার বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত ট্রান্সফরমার আছে তা দীর্ঘদিন মেরামতির অভাবে ট্রান্সফরমার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুড়ে যাচ্ছে। এ ছাড়াও নূতন নূতন কানেকশন দেওয়ার ক্ষেত্রে বাড়তি ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সফরমার না দেওয়ার ক্ষেত্রে এতেও কিছু ট্রান্সফরমার পুড়ছে।

এই জেলায় ৯৫-৯৬ বর্ষে ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য মালপত্রের চুরির হার প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধির ফলে ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য মালপত্র ভীষণভাবে ঘাটতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। জেলার তরফ থেকে সমগ্র বিষয়টি পুলিশ প্রসাশনের কাছে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য লিখিতভাবে জানানো হয় কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি।

এ পর্যন্ত পুড়ে যাওয়া ও চুরি যাওয়া ট্রান্সফরমারের সংখ্যা প্রায় ১,৪০০টি।

এ ছাড়াও জেলার বিদ্যুৎ দপ্তরের সামগ্রিক কাজের উন্নতির জন্য ৬৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব আছে।

কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য ২০০টি পাম্পসেট বরাদ্দ, এ পর্যন্ত ৭৬টির কাজ হয়েছে, বাকিগুলির কাজ চলছে।

সাব-স্টেশন—৯৪-৯৫ বর্ষে গোঘাট পঞ্চায়েত সমিতিতে গোঘাট বিগদাস ৪০০ কে ভি সাব-স্টেশন চালু হয়েছে।

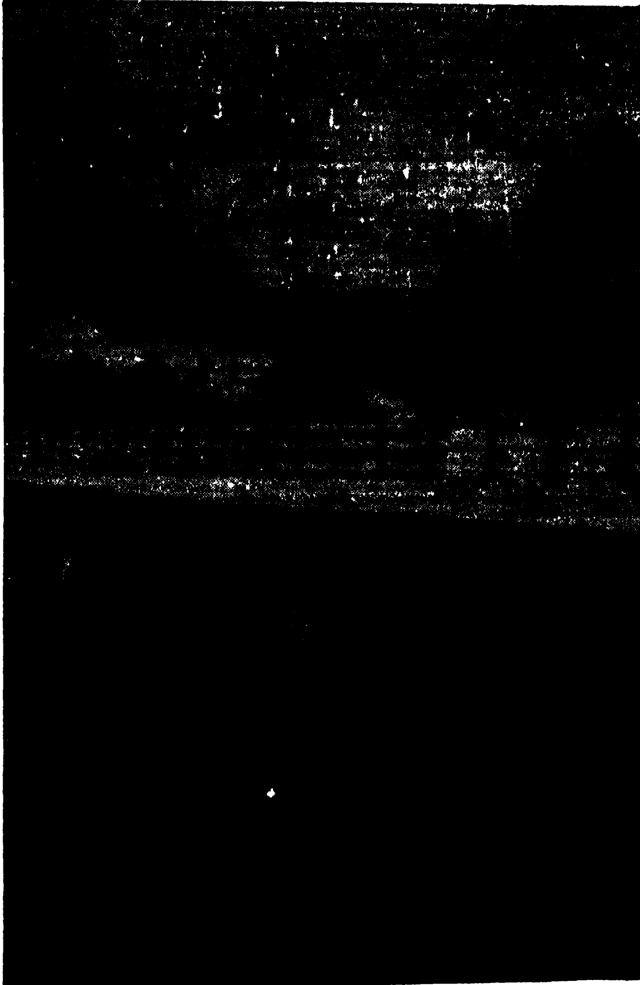
৯৫-৯৬ অ্যাগমেনটেশনে চাঁদুর, মায়াপুর, শিয়াখালা, চাঁপাডাঙা, পাণ্ডুয়ায় নিউ কানেকশন ১৫,০০০ দেওয়ার কথা তার মধ্যে ১১,০০০ দেওয়া হয়েছে। নভেম্বর-ডিসেম্বরের পর আরও ২,০০০ দেওয়ায় মোট সংখ্যা ১৩,০০০।

পেন্ডিং দরখাস্ত	৩০.১১.৯৫	২৭,৭২১
পেন্ডিং কানেকশন		১৭,৬৭৮
মোট গ্রাহক সংখ্যা	৩০.১১.৯৫	২,২৭,৯৭৪

লোকদীপ—হুগলি জেলায় লোকদীপ প্রকল্পের কাজ বিদ্যুৎ দপ্তর কর্তৃক ঠিকমত অগ্রগতি না হওয়ার জন্য বিদ্যুৎমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে জেলা পরিষদ নিজস্ব উদ্যোগে পূর্ব প্রদত্ত লোকদীপ প্রকল্পে অব্যয়িত টাকা থেকে ৩,৮১৬টি ইউনিটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়াও জেলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত আছে পাঁচ হাজার ইউনিটের লোকদীপের কাজ। এর মধ্যে বিদ্যুৎ দপ্তর কিছু কাজ আরম্ভ করেছে। দপ্তর ও জেলা পরিষদের উভয়ের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা চলছে।

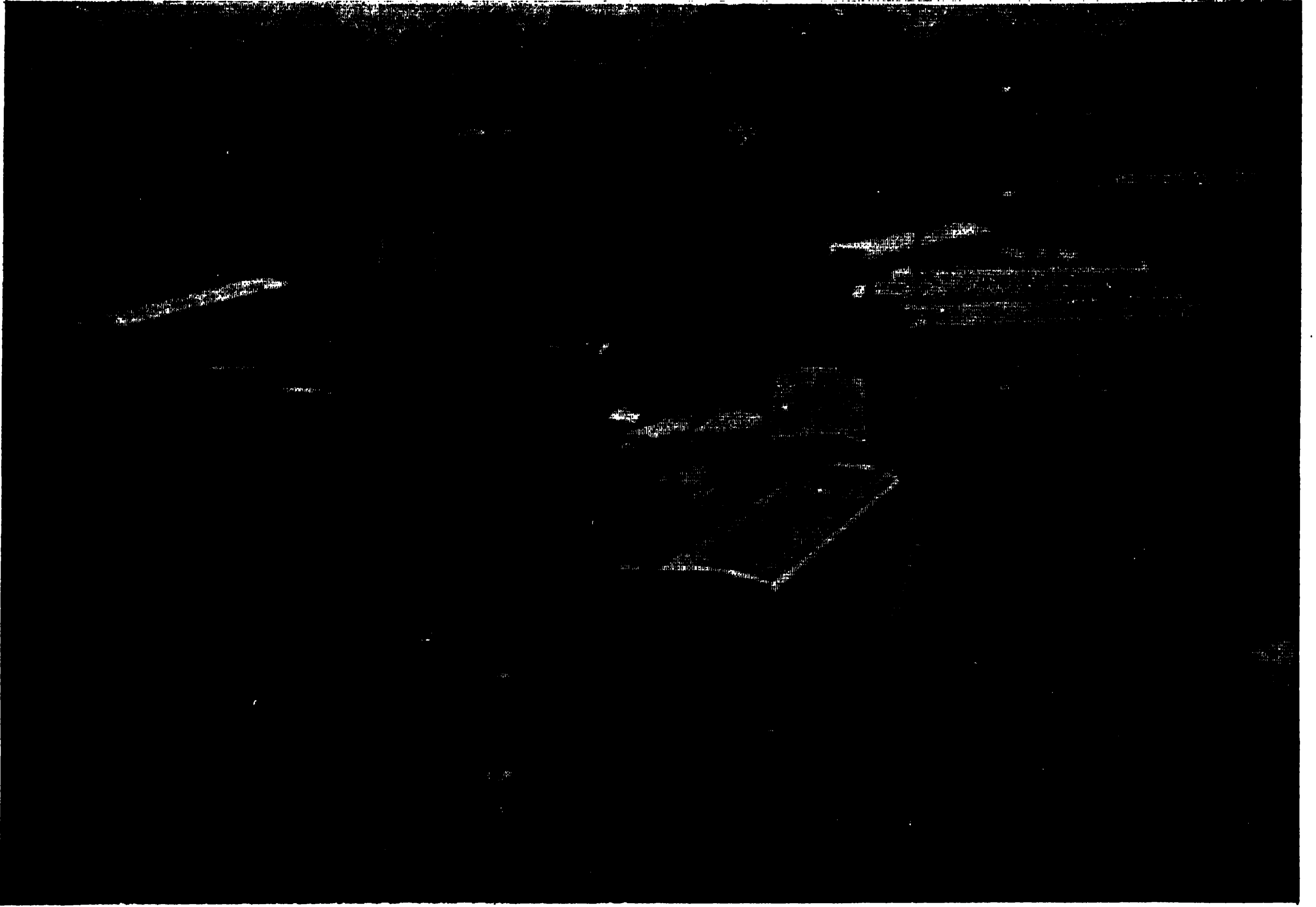
হুগলি জেলার আর্থ-সামাজিক বিকাশে রাস্তা-ঘাট ও পরিবহণ

অজয় বেরা



যে কোনও দেশ বা জাতির উন্নত সভ্যতার পরিচয় বহন করে তার সুপরিকল্পিত রাস্তাঘাট আর তার যানবাহন। ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বে তার বহু প্রমাণ আমরা পেয়েছি সুপ্রাচীনকাল থেকে এই আধুনিক সময়ে পৌঁছে তাই রাষ্ট্রশক্তির প্রধান দায়িত্ব পথ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও তার উন্নতিসাধনে। যেমন নাকি আমাদের কাছে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা। যার ব্যবস্থাপনা আধুনিক যুগেও শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তস্বরূপ। ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের শুরু থেকে রাস্তাঘাটের প্রভূত পাকা-কাঁচা নির্মাণ কাজ হতে থাকে। যদিও ব্রিটিশরাজ তার ঔপনিবেশিক স্বার্থ বজায় রাখতেই তা করেছিল। অবশ্য শের শাহের তৈরি গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড আমাদের কাছে যুগে যুগে গর্বের বস্তু। সেই গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড এই হুগলি জেলার উপর দিয়ে গেছে। বহু নিদর্শন তাকে ঘিরে তৈরি হয়েছে।

এ দেশে ১৯২৮ সালে ঔপনিবেশিক শাসকরা গঠন করেন জয়কর কমিটি। ১৯৩৪ সালে স্পেশাল অফিসার রোডস এ জে কিং সাহেব রচিত 'কিং প্ল্যান' অনুযায়ী নতুন করে রাস্তা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা হয়। তখন 'হুগলী ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ১১৮ মাইল পাকা ও ৪৭৭ মাইল কাঁচা রাস্তা পরিচালনা করতেন, কিং সাহেব ২৬৩ মাইল রাস্তা উন্নয়নের ব্যবস্থা করেন।



১৯৬৩-৬৪ সালে 'হুগলী ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড'-এর শেষ সময়ে ৯৪৪ মাইল কাঁচা ৩২ মাইল পাকা রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ করত। তখন বোর্ড সিভিল ওয়ার্কস্ খাতে ব্যয় করত ৪ লক্ষ টাকা। আর এখন সেখানে হুগলি জেলা পরিষদ গড়ে প্রতি বছর ৪ কোটি টাকা উন্নয়ন খাতে ব্যয় করে থাকে।

হুগলি জেলার কৃষ্টি-ব্যবসা-বাণিজ্যের এক গৌরবময় অতীত আছে। জলপথ ও স্থলপথ পরিবহণ অতীতে সমান গুরুত্ব পেয়েছে। আদি-সপ্তগ্রাম বন্দর, হুগলি নদী, গ্র্যান্ড ট্রাংক রোডের মতোই সমান সমাদর পেয়েছে। কালের পট-বদলের খেলায় আজ এ জেলার গুরুত্ব বেড়ে গেছে স্থলপথে। ন্যাশানাল হাইওয়ে, স্টেট হাইওয়ে নতুন করে গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে কলকাতা নিকট হওয়ায়। কল্যাণী, দুর্গাপুর রোডগুলি জি টি রোডের সাথে সমান গুরুত্ব পেয়েছে। তাই পঞ্চায়েতী রাস্তাঘাট, জাতীয় সড়ক দপ্তরের রাস্তা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পি ডব্লু ডি, পি ডব্লু ডি (রোড), পি ডব্লু ডি (কল্প), কল্যাণী হাইওয়ে ডিভিসন, পৌর, সি এম ডি এ ও অন্যান্য রাস্তা মিলিয়ে এ জেলায় আজ ১৩০০ কিমি বা তার কিছু বেশি পাকা রাস্তার পরিমাণ।

ঔপনিবেশিক শাসক ও তার পৃষ্ঠপোষকরা তাদের নিজ প্রয়োজন মেটানোর কথা মাথায় রেখে এই জেলার রাস্তা-ঘাটের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন ব্যাহত করে রেখেছিল বহুদিন। তাই ১৯৭৮ সালের পর নতুন জিলা পরিষদ তথা এ রাজ্যের ফ্রন্ট সরকার উপলব্ধি করেন জেলার বেশিরভাগ জনগণ কৃষিজীবী এবং গ্রামে বাস করেন।

জেলার কয়েকটি প্রান্তে দামোদরের এবং গঙ্গার প্রলয়ঙ্করী বন্যার প্রকোপে পড়েও মানুষজন বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপনেও বাধ্য হল বছরের অধিকাংশ সময়। উৎপাদিত ফসলের অথবা কুটির শিল্পজাত সামগ্রীর বেচা-কেনা, স্বাস্থ্য ও পরিষেবা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিস্তর বাধা পান ভালো পথ-ব্যবস্থার অভাবে। যদিও আজ আত্মতুষ্টির অবকাশ না রেখেই বলা যায় যে হুগলি জেলার বন্যাপীড়িত কিছু অংশের কথা বাদ দিলে আজ সব শহর এবং গ্রাম ভালো পথ-ব্যবস্থার সুফল পাচ্ছে।

ভৌগোলিক দিক থেকে হুগলি জেলা কলকাতা সংলগ্ন হওয়ায় বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের একাংশের কলকাতার প্রবেশপথ হিসাবে হুগলি জেলার রাস্তা-ঘাট ব্যবহৃত হয়। জলপথ মজে যাওয়া অথবা অন্য কারণে নদী সংকুচিত হওয়ার ফলে পথ

পরিবহণ যেমন বেড়েছে তেমনই ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট গঠিত হওয়ায় গ্রামাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ চাহিদাও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই রাস্তা-ঘাটের দাবিরও নতুন করে যৌক্তিকতা বাড়ছে।

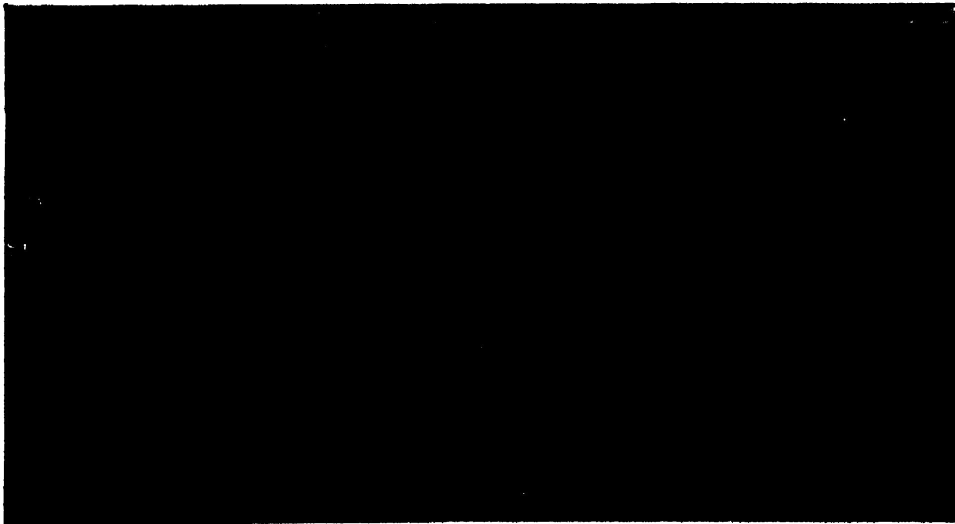
হুগলি জেলার পূর্বাংশের শহর এলাকার ধার দিয়ে বহে চলেছে ৬৯ কিমি দিল্লি রোড। সারা জেলার রাস্তা-ঘাটের এটিকে মেরুদণ্ড বললে অত্যুক্তি হয় না। এই দিল্লি রোডের মগরা পয়েন্ট থেকে বেরিয়ে গেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগকারী রাজ্য সড়ক এস টি কে কে রোড। সামনেই ঈশ্বর গুপ্ত সেতু, কল্যাণী হাইওয়ের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়েছে। দিল্লি রোড থেকে বেরিয়ে গেছে ডানকুনি থেকে আরামবাগ দিয়ে কোতুলপুর পর্যন্ত রাজ্য সড়ক। হুগলি জেলার আরামবাগ-শ্রীরামপুর মহকুমা ছাড়াও মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান জেলার কলকাতার সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী নাতিদীর্ঘ সড়ক। অন্য দিকে বৈদ্যবাটী মোড় থেকে বি টি সি রোড এই রাস্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরিবহণে গুরুত্ব বাড়িয়েছে চাঁপাডাঙা পয়েন্টে। এ ছাড়া জি টি রোড সকলেই চেনেন বালির মোড় থেকে শুরু করে কোন্নগর-উত্তরপাড়া-শ্রীরামপুর-চন্দননগর-চুঁচুড়ার মধ্য দিয়ে দিল্লি রোডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মগরা পয়েন্টে। আসলে জি টি রোডই প্রাক-স্বাধীনতা যুগে স্থল সড়কে হুগলি জেলার মেরুদণ্ড বলে কথিত ছিল। বর্তমানে ঘন জনবসতি, রাস্তার উপর জবর দখল ও জলনিকাশি সমস্যা আধুনিক পরিবহণের চাহিদা মেটাতে অক্ষমতা দেখায়। যার ফলেই জি টি রোডের বাই-পাস প্রশস্ত রাস্তা হিসাবে দিল্লি রোডের সূচনা। বর্তমানে দিল্লি সরকারের অবহেলাতে এই রাস্তাটিরও ট্রাফিক পরিবহণ ক্ষমতা ক্রমাবনতির দিকে।

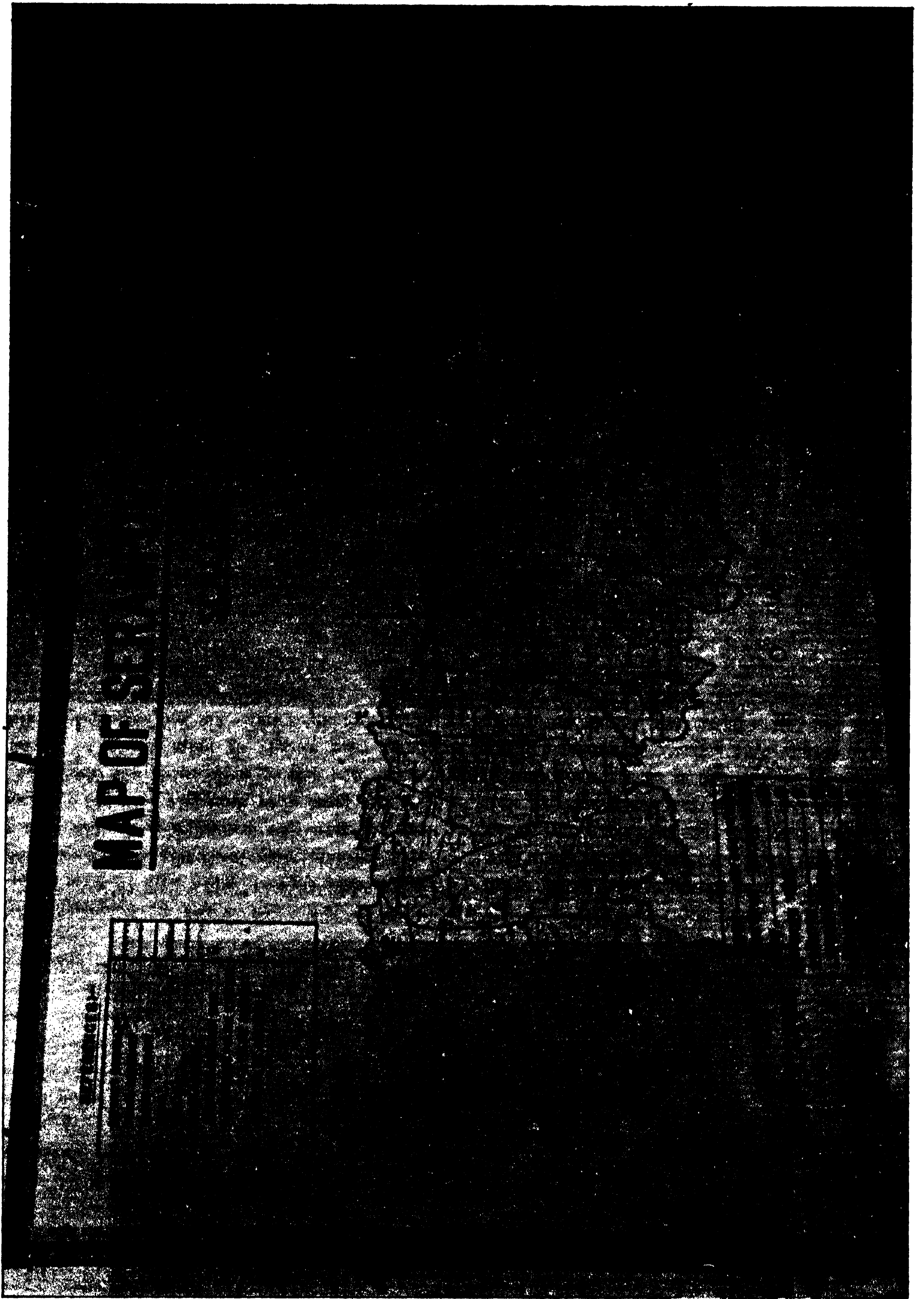
এ ছাড়া দিল্লি রোডের ট্রাফিক লোড কমানোর জন্য ডানকুনি থেকে দুর্গাপুর এক্সপ্রেস-ওয়ের নির্মাণকার্য চলছে। মূলত এই কয়টি প্রধান সড়ককে ঘিরেই ব্লক, থানা ও সরকারি অফিস-গঞ্জগুলির সঙ্গে গ্রামীণ রাস্তা অথবা লিংক রোড গড়ে উঠেছে। যার সংখ্যা হল ১২৮টি যা রাজ্য সড়ক বিভাগের অধীনে, যার দৈর্ঘ্যের পরিমাণ ৯৫৫ কিমি। এছাড়া হুগলি জেলা পরিষদের অধীনে কাঁচা-পাকা মিলিয়ে ৩১৯টি লিঙ্ক রোড আছে যার দৈর্ঘ্যের পরিমাণ প্রায় ১১০০ কিমি।

১৯৭৮ সালে নতুন পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা আসার ফলে গ্রামাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হুগলি জেলার মানুষের রাস্তা-ঘাটের যোগাযোগ চাহিদা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গিয়ে গাড়ি-ঘোড়ার সংখ্যা রাস্তাগুলির উপর প্রভূত চাপ সৃষ্টি করেছে। এবং নতুন রাস্তার দাবি প্রতিনিয়তই উত্থাপিত হচ্ছে। ভৌগোলিক দিক দিয়ে আরামবাগ মহকুমা বন্যাপ্রবণ এবং রেল যোগাযোগবিহীন হওয়ায় সড়কপথই মানুষের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ওভারলোড ট্রাক রাস্তার আয়ু দুর্বল করে দিচ্ছে। তা ছাড়া দোআঁশ ও এঁটেল মাটি রাস্তার স্থায়িত্ব আনতে পারছে না। বিশাল ঘনবসতিবহুল হুগলি জেলার রাস্তাগুলিকে শক্তিশালী করার একান্ত প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

সারা জেলার রাস্তা-ঘাট সংরক্ষণ ও উন্নতিসাধন সম্পর্কে হুগলি জেলা পরিষদের পূর্ত ও পরিবহণ স্থায়ী সমিতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে সমস্যার সমাধানের রাস্তায় এগিয়ে চলেছে। তাঁরা মনে করেন, এই বিষয়ে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণই সমস্যার সমাধানের পথ খুলে দিতে পারে। তাই জেলা পরিষদের উদ্যোগে গত ৫ জানুয়ারি চুঁচুড়া রবীন্দ্র ভবনে 'হুগলি জেলার রাস্তা-ঘাট সংরক্ষণ ও উন্নতিসাধন' বিষয়ক একটি সেমিনার হয়ে গেল। এই সেমিনারে বিষয়াভিজ্ঞ লোকজন ছাড়াও বিভিন্ন স্তরের প্রায় পাঁচশ জনপ্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন।

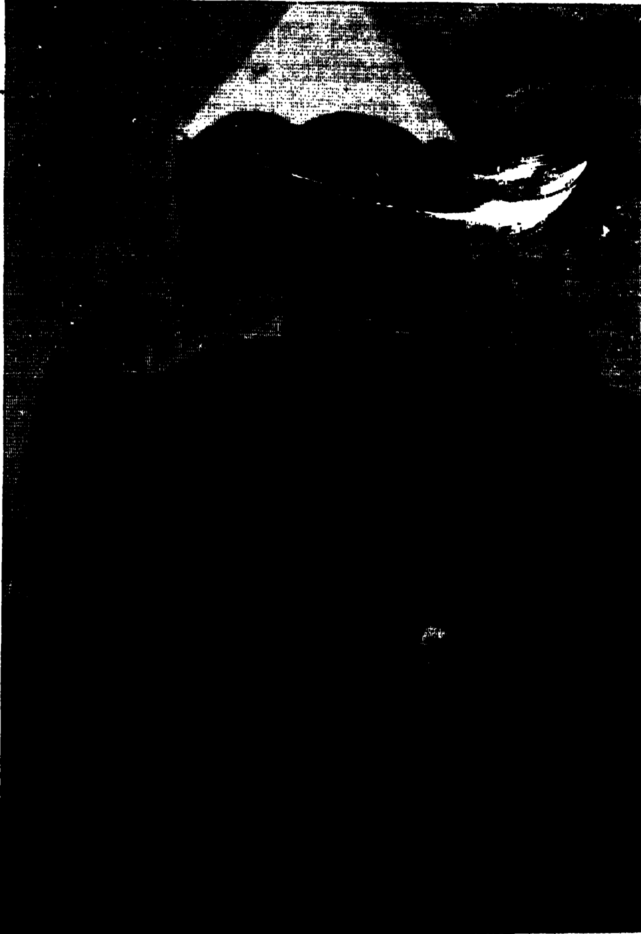
বিগত ১৯ বৎসর ধরে যানবাহন বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবহণ কর্মীর সংখ্যাও পাঁচগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। তার জন্য রাস্তা-ঘাটগুলির সংস্কার ও উন্নয়ন একান্ত দরকার। এই বিষয়ে বলতেই হয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে রাস্তা-ঘাট রক্ষণাবেক্ষণের খরচ যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার জন্য বিকল্প পথের সন্ধান দিতে পারে নিও-টেকনোলজি। এ জন্য চাই আরও উন্নত গবেষণা। কারণ স্থলপথের বিকল্প এখনও পর্যন্ত কিছু হয়নি। হুগলি জেলা মানুষের চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।




MAP OF

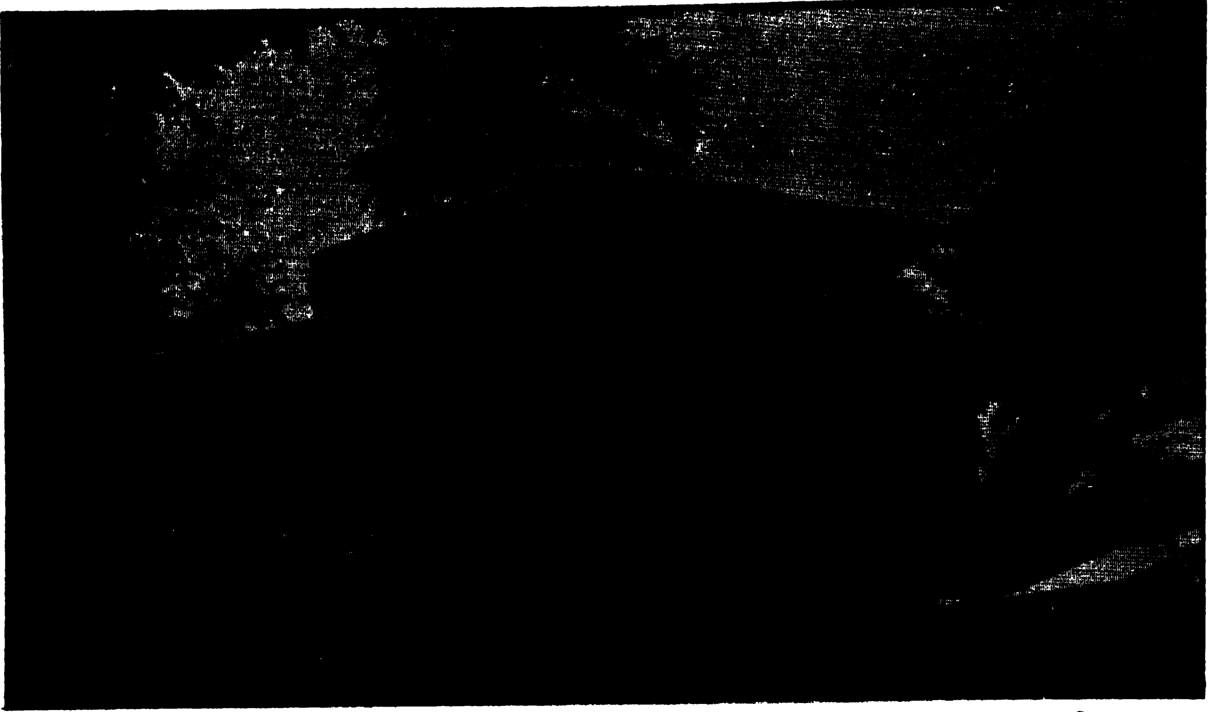
হুগলি জেলায় ভ্রমণ পর্যটন

প্রভাস পাল



মানুষ জন্মগতভাবেই সুদূরের পিয়াসী। তাই কর্মকোলাহল এড়িয়ে কিছু নিরুদ্বেগ নির্মল আনন্দ উপভোগের জন্য সে সবসময়ই ঘরের বাঁধন টুটে ছুটে যায় বনে-জঙ্গলে পাহাড় নদী সমুদ্রের ধারে। আবার 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া'—বিধায় অনেকেই খোঁজ করেন নিজের ঘরের পাশের দেখার জায়গাগুলোকে। খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেন তার অতীত ঐতিহ্য আর ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তার গুরুত্ব। এইসব মানুষই ভ্রমণের ইতিহাসে নবতম সংযোজন ঘটিয়েছেন সপ্তাশেষের ভ্রমণ কিম্বা একদিনের বেড়িয়ে আসা। কলকাতা বা হুগলির পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে হুগলি জেলার বিভিন্ন বেড়ানোর জায়গাগুলো এক-একদিনে ছুঁয়ে যাওয়া যায়।

১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে যদিও হুগলি জেলার নামকরণ তবুও এই প্রাচীন জনপদে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে কত না ঐতিহাসিক মন্দির মসজিদ গির্জা ইতিহাসখ্যাত স্থান। মহাপুরুষদের জন্মভিটা বিস্ময়ে চমৎকৃত হবার মতো টেরাকোটার সমাহার, সর্বোপরি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ। অনুভবী মানুষ থেকে শুরু করে চড়ুইভাতি করার বালখিল্যদের জন্যও বহু জায়গা রয়েছে যার মধ্যে কিছু এখানে উল্লেখ করলাম।



দুর্গেশনন্দিনী খ্যাত শৈলেশ্বরের মন্দির ॥ গড় মান্দারন　　　　ছবি প্রভাস পাল

কামারপুকুর

হুগলি জেলার কামারপুকুর এখন বিশ্বমানবের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বিশ্বমানবতার মৈত্রীবাহক লোকগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মস্থান কামারপুকুর। এইখানেই ১২৪২ সালের ফাল্গুন মাসে তিনি জন্মেছিলেন।

কামারপুকুরে এলে এখনও ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্মস্থানের স্মারক ঢেকি চুল্লি শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, রামকৃষ্ণ পিতৃদেব ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের গৃহদেবতা রঘুবীরের মন্দির, রামকৃষ্ণের ভিক্ষেমার বাড়ি, যুগীদের শিবমন্দির, লাহাবাবুদের বাড়ি, পাঠশালা, পঞ্চচূড় শিবমন্দির, হালদারপুকুর প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান এবং বনভোজন করার জন্য বিস্তৃত এলাকা ভ্রমণার্থীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়।

যাঁরা এখানে এসে থাকতে চান এবং একই সঙ্গে গড়মান্দারণ ও শ্রীশ্রীসারদামাতার জন্মস্থান জয়রামবাটী ঘরে দেখতে চান তাঁদের জন্য কামারপুকুরের তিনটি ভাল থাকা-খাওয়ার হোটেল আছে। এ ছাড়া হুগলি জেলাপরিষদের ডাকবাংলো বুক করেও আসা যায়। যোগাযোগ : তিলোত্তমা বাংলো, কামারপুকুর শ্রীপুর হুগলি।

গড়মান্দারণ

'৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন'। দুর্গেশনন্দিনীর প্রথম বাক্যটিতে বঙ্কিমচন্দ্র যে মান্দারণের কথা উল্লেখ করেছিলেন সেটাই হুগলির গড়মান্দারণ, কামারপুকুর চটি থেকে ৩ কিমি দূরে হুগলি জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। হুগলি জেলাপরিষদ এখন গড়মান্দারণকে একটি পর্যটন কেন্দ্রে রূপান্তরিত করেছে। এটি গোঘাট পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় পরে। এখন এখানে বিশাল এলাকা নিয়ে পরিকল্পিতভাবে বনসৃজন করা হয়েছে। অতীতে এখানে সাতটি গড় বা দুর্গ ছিল। এখন একটির ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। আমোদের নদীর তীরবর্তী গড়মান্দারণের পশ্চিমে আছে ভিতরগড়। পাল ও সেন বংশীয় রাজাদের আগে রাঢ়ের শাসনকর্তা শূর বংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল মান্দারণ। যেখানে আমোদের পূর্ব থেকে দক্ষিণগামী সেখানে ইসমাইল গাজীর সমাধি বা ছোট আস্তানা। পরিখা ঘেরা গড়ের উপরে আছে বড় আস্তানা।

জেলা পরিষদের প্রচেষ্টায় এখানে ডিয়ার পার্ক, অর্কিড হাউস প্রস্তুতির পথে নৌকায় ভ্রমণের সুবন্দোবস্ত আছে। বর্ষার পরেই এলে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের ঝরনার জলে পরিপূর্ণ আমোদরকে দেখার সৌভাগ্য হবে। মাছচাষের জন্য বিশাল জলাশয়ে শীতকালে অতিথি পাখিদের মেলা বসে।

পাণ্ডুয়া শরিফ

হাওড়া বর্ধমান মেন লাইনে পাণ্ডুয়া স্টেশনে নেমে বাসে বা রিকশায় দেড় কিমি এলেই পাণ্ডুয়া শরিফ বা পেঁড়োর কাছে আসা যাবে। এখানে মুসলমান যুগের বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাণ্ডুয়ার মিনার। এই বিজয়স্তম্ভটি শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ (শাহ সুফি) হিন্দু রাজ্য পাণ্ডুনগর বিজয়ের স্মারক হিসাবে অধিকার করে নবরূপ দান করেন। পূর্বে এটি ১৩৬ ফুট উচ্চ ও পাঁচটি স্তরে বিভক্ত ছিল। ভূমিকম্পের ফলে এখন মাত্র ১২৫ ফুট উচ্চতা আছে। ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে শাহ সুফির মৃত্যু হলে স্তম্ভের কাছেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়। সমাধিক্ষেত্রের অপর দিকে বাইশ দরওয়াজা নামক বিশাল সৌধের ভগ্নাবশেষ। অতীতের স্থাপত্য শিল্পের মহামূল্যবান বৃহৎ খিলানের কাজ দেখার মতো। কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত একটি সিংহাসন এখনও পুরাতত্ত্বের মহামূল্যবান স্মরণ চিহ্ন হিসাবে বর্তমান।

প্রতি বৎসর মাঘ মাসের ১লা তারিখ থেকে এখানে একমাসব্যাপী মেলা শুরু হয়। হিন্দু-মুসলমানের মিলনক্ষেত্র হিসাবে এই মেলা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বনভোজনেরও এটি উপযুক্ত জায়গা।

বাঁশবেড়িয়া

চুঁচুড়া থেকে বাসে-মিনিবাসে বাঁশবেড়িয়া আসা সহজ। এখানে দর্শনীয় স্থাপত্য শিল্পের অসাধারণ নিদর্শন ১৮১১ সালের নির্মিত হংসেশ্বরী মন্দির। শুধু হুগলি জেলা নয় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেও অতুলনীয় পুরাকীর্তি। পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সে যুগে ইট ও পাথরের সংমিশ্রণে এটি তৈরি। হংসেশ্বরী দেবীর বিগ্রহ নিম কাঠের তৈরি এবং নীলবর্ণা। অনেকটা রথের চূড়ার মতো তেরোটি মিনার ও পাঁচটি তল নিয়ে অপূর্ব স্থাপত্যরীতি। সুমুখে প্রশস্ত ময়দান।

হংসেশ্বরীর কাছেই অনন্তদেবের মন্দির বাংলার প্রাচীন মন্দিরগুলির অন্যতম। ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। সুমুখের পুরো দেওয়ালের অজস্র টেরাকোটার কাজ এর মধ্যে ইতিহাসের ও সমাজ জীবনের বহু খণ্ডচিত্র এবং পৌরাণিক চিত্রের সমাবেশ রয়েছে। এক সময় রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে শিল্পী নন্দলাল বসু এখানে একমাস অবস্থান করে এইসব পোড়ামাটির কারুকার্যময় শিল্পকর্মের ছবিগুলি এঁকেছিলেন। দ্বিতল আটচালাযুক্ত এতবড় মন্দির রাধানগর ছাড়া হুগলিতে আর কোথাও নেই।

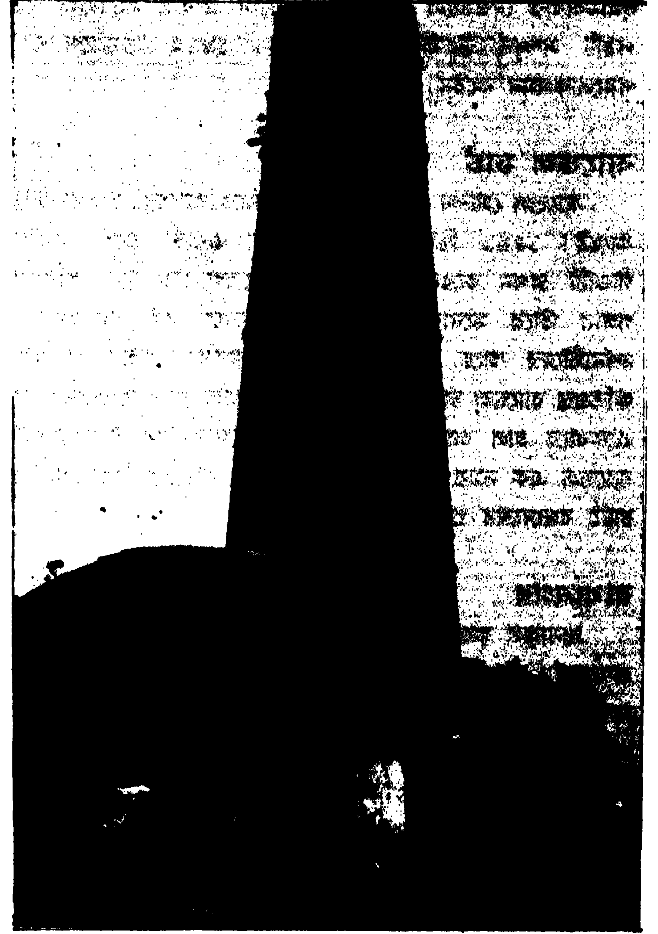
ফুরফুরা শরিফ

হুগলি জেলার ফুরফুরা শরিফ পশ্চিমবাংলার মুসলিম তীর্থগুলির মধ্যে অন্যতম। অতীতে ফুরফুরা ছিল ইসলামিক জ্ঞানচর্চার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এখানেই শতাধিক বৎসর পূর্বে জন্মেছিলেন পীর আবুবকর সিদ্দিকী। এঁকে ইসলাম ধর্মের মুজাদ্দেদ বা যুগসংস্কারক বলা হয়। একজন ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারক হিসাবে অবিভক্ত বাংলা ও আসামের বাহান্ন জেলার পীর হিসাবে তাঁর খ্যাতি ফুরফুরাকে খ্যাতিদান করেছে।

ফুরফুরা শরিফে পীর সাহেবের সমাধি আছে। মুঘল স্থাপত্যের অনুকরণে খিলান জালি গম্বুজ ও সুউচ্চ মিনার শোভিত এই সমাধিসৌধটি স্থাপত্যেরও অপূর্ব নিদর্শন। এখানে পীর সাহেবের দীক্ষাদান কেন্দ্র দরবার শরিফ আর একটি দ্রষ্টব্য বিষয়। প্রায় তিনশ বছরের বেশি বয়সের একটি মাটির মসজিদ এখানে আছে। প্রতিবছর ২১, ২২, ও ২৩ ফাল্গুন এখানে পীর সাহেব প্রতিষ্ঠিত ধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে শুচিশুদ্ধ হয়ে এসে আশীর্বাদ প্রার্থনা করা যায়। কলকাতা থেকে শ্রীরামপুর এবং শিয়াখালা হয়ে ফুরফুরা শরিফে আসা যায়। বর্তমানে এখানকার ধর্মসম্মেলনের মুখ্য তত্ত্বাবধায়ক মৌলানা মহঃ বাকিবিল্লাহ সিদ্দিকী।

চুঁচুড়া হুগলি ব্যান্ডেল

কলকাতা থেকে ২৪ মাইল দূরত্বে হুগলির সদর সহ চুঁচুড়ায় এলে একদিনে চুঁচুড়ার কিছু দ্রষ্টব্য ও হুগলির ইমামবাড়া এবং ব্যান্ডেল চার্চ দেখে বাড়ি ফেরা যায়। চুঁচুড়া শহরের কোর্ট বিল্ডিং ভারতবর্ষের একটি দীর্ঘতম বাড়ি। এর সুবিশাল গঠনপ্রণালী সুউচ্চতল স্থাপত্যের বিস্ময়কর নিদর্শন। এছাড়া চুঁচুড়ার ব্যারাকটিও আর একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা। ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দের নির্মিত আর্মেনিয়াম



ইংরেজ আমলের সার্ভে টাওয়ার ॥ দিলাকাশ ॥ ছবি প্রভাস পাল

গির্জা, ১৮১০ সালে নির্মিত হুগলি মহসীন কলেজ, ষণ্ডেশ্বর জীউর মন্দির, চুঁচুড়ার ঘড়ি মোড়, সাত বিবির সমাধি প্রভৃতি দেখার জিনিস এখানে আছে।

চুঁচুড়ার কাছে চন্দননগর আর একটি সুপ্রাচীন জনপদ। এখানে এলে গঙ্গার ধারে স্ট্যান্ড, পাতালবাড়ি, ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউটঃ প্রবর্তক আশ্রম দর্শনীয় বস্তুর সাক্ষাৎ মিলবে।

হুগলির ইমামবাড়া

চুঁচুড়া থেকে খুব কাছেই হুগলির ইমামবাড়া একটি বিখ্যাত স্মৃতিসৌধ। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যেও অন্যতম দর্শনীয় বস্তু। হুগলির বরেণ্য সন্তান দানবীর হাজি মহম্মদ মহসীনের সম্পত্তির অংশ থেকে প্রায় কুড়ি বছর ধরে তিনলক্ষ টাকা ব্যয় করে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। এর সামনে বিলেত থেকে তৎকালীন প্রায় বারো হাজার টাকা দিয়ে একটি সুবৃহৎ ঘড়ি এনে স্থাপন করা হয়েছে। মহসীনের সমাধি মন্দিরটিও দর্শনীয় বস্তু।

হাজি মহম্মদ মহসীন ছিলেন সংসারত্যাগী সাধক মানুষ ঘটনাসূত্রে তাঁর বিধবা দিদি মন্নু বেগম তাঁর বিশাল বাৎসরিক আয়ের সম্পত্তি তাঁকে দান করে যান। কিন্তু মহঃ মহসীন সমস্ত সম্পত্তি সৎকার্যে ব্যয় দানপত্র করে দিয়ে গেছেন। হুগলির

ইমামবারার দেওয়ালে ইংরেজি ও ফার্সি ভাষায় মহসীনের দানপত্রটি সম্পূর্ণ উৎকীর্ণ করা আছে। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

ব্যান্ডেল চার্চ

ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে বা চুঁচুড়া থেকে ব্যান্ডেল চার্চ মোটামুটি কাছেই। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে পোর্তুগীজরা এখানে এসে অতিবৃহৎ গীর্জাটি স্থাপন করেন এবং সেটিই ব্যান্ডেল চার্চ নামে পরিচিত। গঙ্গার তীরে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে এই ব্যান্ডেল চার্চ দর্শনার্থীদের কাছে এক চিরকালীন আকর্ষণ। বহুবার যুদ্ধবিগ্রহে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যান্ডেল চার্চ সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় পাদে পুনর্নির্মিত হয়। একেবারে হাল আমলেও তার কিছু সংস্কারসাধন করা হয়েছে। ব্যান্ডেল এক সময় স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবে পরিচিত ছিল। ব্যান্ডেল চার্চই বঙ্গদেশের প্রথম গির্জা।

রাধানগর

খানাকুল কৃষ্ণনগরের রাধানগর গ্রাম রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান। বঙ্গদেশে রেঁনেসাসের বার্তাবাহক এই মহামণীষীর জন্মস্থানে নির্মিত রামমোহন স্মৃতিসৌধ এবং কাছেই রঘুনাথপুরের শ্মশানের ধারে রামমোহনের উপসনাগৃহ, গোপীনাথের মন্দির, রাধাবল্লভের মন্দির প্রভৃতি দর্শনযোগ্য। তারকেশ্বর থেকে বাসে রাধানগর আসা যায়।

আঁটপুর

শ্রীরামপুর মহকুমার প্রত্যন্ত এলাকায় আঁটপুর একটি ছোট গ্রাম। বর্তমানে কলকাতা থেকে সরাসরি সরকারি বাসে আঁটপুর আসা যায়। এখানকার দ্রষ্টব্য বস্তুগুলির মধ্যে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জিউর মন্দির ও তার টেরাকোটার কাজ উল্লেখযোগ্য। দ্বাদশ বঙ্গাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এ রকম সুউচ্চ মন্দির হুগলি জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গে বিরল। এখানকার টেরাকোটার কাজ বিস্ময়কর। মিত্র বংশের জমিদারদের তৈরি এই মন্দিরের পাশাপাশি রয়েছে কাঁঠাল কাঠের কারুকার্য করা চণ্ডীমণ্ডপ। এতে রয়েছে বাংলার পুরাতন তক্ষণশিল্পের বহু চমৎকার নিদর্শন। এখানে বিবেকানন্দ সুহৃদ স্বামী প্রেমানন্দের জন্মভূমি। এখানে স্বামী প্রেমানন্দসহ বিবেকানন্দ মোট আট বন্ধুর সঙ্গে ধুনি জ্বালিয়ে সংসার ত্যাগ করার সংকল্প ও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সেই সন্ন্যাস গৃহটিও দর্শনীয়।

পাশেই রাজবলহাট। বাসযোগেই যাওয়া যাবে। এখানেও দর্শনীয় রাজবল্লভীর মন্দির, শীলবাড়ির মন্দির, এবং টেরাকোটার কাজ। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষার্থে পাঠাগার ও একটি প্রস্তুশালা এবং হেমচন্দ্রের জন্মভূমি গুলিটা গ্রাম দর্শন করা যেতে পারে।

চাঁদুর ফরেস্ট

হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার চাঁদুর ফরেস্ট ভ্রমণ বিলাসীদের জন্য আর একটি আকর্ষণ আরামবাগের গৌড়হাটির মোড় থেকে বর্ধমানগামী বাসে ১০ মিনিট ও ৩ কিমি পথ। ইটভাটা নামে জায়গাটির পরিচিতি। এখানে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে সেগুনের বন আছে। সমতলভূমিতে ছায়াঘেরা অরণ্যে পিকনিকের উপযুক্ত জায়গা, এখানেও ডাকবাংলো আছে। আগাম যোগাযোগ করলে ঘর পাওয়া যায়। এখানে বাংলোয় থাকতে হলে পানীয় জল সঙ্গে আনতে হবে। কাছাকাছি কোনও বাজার নেই। তাই পিকনিক পার্টিকে সবকিছুই সঙ্গে আনতে হবে। অরণ্যের প্রবেশপথে কিছু ভিন্ন গাছ থাকলেও সবটাই সেগুনে পূর্ণ। বনাঞ্চলের শেষ প্রান্তে দ্বারকেশ্বর নদী। শহর থেকে দূরে এই নিরিবিলি বনাঞ্চলে এলে এক নির্মল আনন্দে মন ভরে উঠবে।

সবুজদ্বীপ

হুগলি জেলা পরিষদের হাতে গড়া নতুন পর্যটন কেন্দ্র সবুজদ্বীপ। গঙ্গার বুকে জাগা এই চরটি এখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আবাসভূমি। হাওড়া থেকে ব্যান্ডেলে এসে কাটোয়া লোকালে সোমরা বাজার স্টেশনে নেমে হাঁটাপথে ১০ মিনিটের দূরত্বে রয়েছে এই সবুজদ্বীপ। গঙ্গার ধারে এসে নৌকা করে দ্বীপে পৌঁছানো যায়। বাসযোগে চুঁচুড়া থেকে ৮ নং বাসে কোড়লা মোড়ে নেমে মিনিট ১৫ হাঁটলেই গঙ্গার ঘাট। আবার আসাম রোড হয়ে সরাসরি গাড়ি নিয়েও আসা যায়।

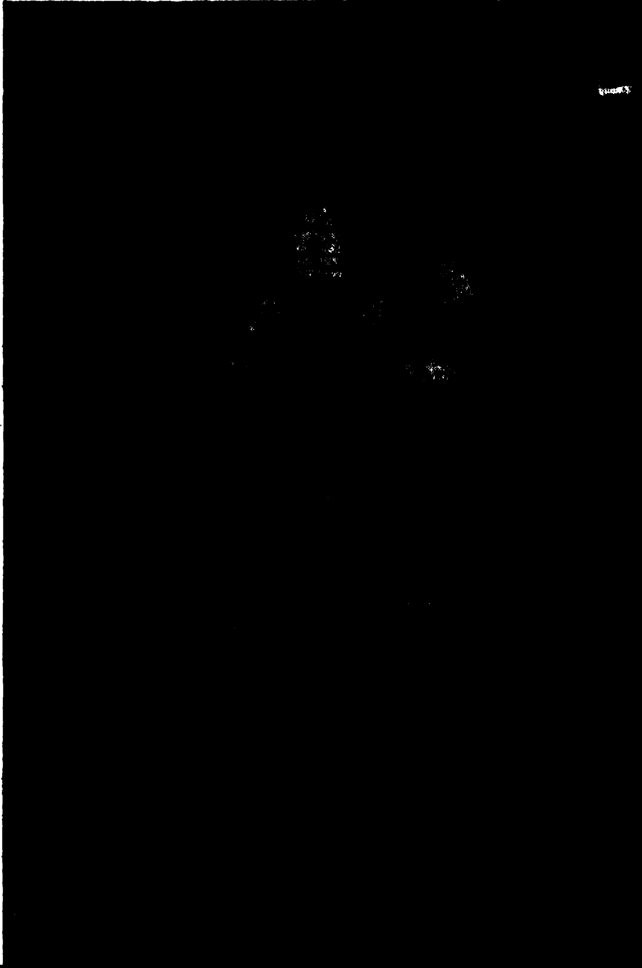
অল্প খরচে ভ্রমণের জন্য অনবদ্য জায়গা এটি। কৃষ্ণচূড়া, ইউক্যালিপটাস আকাশমণি প্রভৃতি গাছের পরিকল্পিত বনভূমিতে স্বচ্ছন্দে বেড়ানোর সব ব্যবস্থা আছে। দ্বীপে যাতায়াতের নৌকা ভাড়া ১০ টাকা। ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয়পত্র থাকলে ৫ টাকা। পিকনিক পার্টির জন্য ২০ টাকা। এখানে শৌচাগার, পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে। খোলা আকাশের নীচে রেস্টুরেন্ট; ছোটদের জন্য দোলনা আর মনোলোভা ফুলের বাগান আছে। ইচ্ছা করলে আলাদা নৌকা ভাড়া করেও গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করা যায়। দ্বীপের আকর্ষণ বাড়াতে জেলা পরিষদ আরও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন।

এছাড়াও হুগলি জেলার কিছু উল্লেখযোগ্য মেলা আছে। একই সঙ্গে মাহেশের রথ ও মেলা, তারকেশ্বরের মন্দির ও তাকে কেন্দ্র করে শিবরাত্রি, গাজন, শ্রাবণী মেলা উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও পাণ্ডুয়ার মেলা গুপ্তিপাড়া ও দশঘরার রথের মেলা, ব্যান্ডেল চার্চের বড়দিন ইলছোবার ঝাপান মেলা, গোঘাটের ফলুইয়ের গাজন মেলা বিখ্যাত। এই সঙ্গে সৃজিত মেলাগুলির মধ্যে হুগলি জেলার লোক উৎসব। চণ্ডীতলা সংবাদ আয়োজিত হুগলি মেলা মশাটের প্রতিবৎসর ২ জানুয়ারি থেকে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় এলে তথ্য ও আলোকচিত্রে অতীতের হুগলির ইতিবৃত্ত ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে খুবই মূল্যবান ও দর্শনীয়বস্তু।

হুগলি জেলাকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে চন্দননগর, চুঁচুড়া গঙ্গাতীরে ও আরামবাগে দ্বারকেশ্বরের তীরে পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় যাত্রীনিবাস গড়ে তুলতে পারলে ভালো হয়। তাতে কিছু আয়ও হবে। তা ছাড়া চুঁচুড়া মার্কেট কমপ্লেক্স গড়ে উঠলে ধনিয়াখালি, চণ্ডীতলা, জাঙ্গীপাড়ার বিখ্যাত বস্ত্রবয়ন শিল্প উৎসাহিত হবে। পাটদ্রব্য, পাটজাত কার্পেট দ্রব্যাদির সুনিয়ন্ত্রিত বাজারের মাধ্যমে জেলার অর্থনীতি শক্তিশালী হবে।

হুগলি জেলার ঐতিহ্যপূর্ণ খেলাধুলা

তথাগত মৌলিক



মানুষ সেই আদিম যুগ থেকেই জীবিকার প্রয়োজনে ক্রীড়াকে তার জীবনের এক অঙ্গ হিসাবে মেনে নিয়েছে। যখন সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন শুরু হয়নি, প্রতিটি মুহূর্তই যখন ছিল খুব অনিশ্চিত, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষকে তখন যুদ্ধ করতে হয়েছে। খাদ্যের প্রয়োজনে, বাসস্থানের প্রয়োজনে, পোশাকের প্রয়োজনে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবার প্রয়োজনে বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন হয়েছে শারীরিক পটুতা। মানুষের থেকে অনেক ক্ষিপ্র গতি সম্পন্ন জানোয়ার, অনেক বলশালী জানোয়ারকে শিকার করতে হয়েছে বুদ্ধি দিয়ে এবং ক্রীড়াকুশলতা দিয়ে। অনেক দূর থেকে পাথর নিক্ষেপ করে তীর বা বর্শা নিক্ষেপ করে লক্ষ্যবস্তু ভেদ করতে হয়েছে। মানুষের যত বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়েছে, তার জীবনধারার তত পরিবর্তন হয়েছে। মানুষ তার প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য বেশি মাত্রায় বুদ্ধিনির্ভর হয়ে উঠেছে। মানুষ পশুকে বশ করেছে, চাষ-আবাদ শিখেছে। ফলে শারীরিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল আর থাকেনি। তাই বলে মানুষ কিন্তু ক্রীড়াকে ত্যাগ করেনি। ক্রীড়াকে এখনও মানুষ তার জীবনের অঙ্গ হিসাবেই মনে করে। মানুষের জীবনে ক্রীড়া এখন আরও অনেক বড় ভূমিকা পালন করে। ক্রীড়া এখন মানুষের শুধুমাত্র শারীরিক ক্ষমতা বৃদ্ধিতেই কাজে লাগে

না, মনের বিকাশ ঘটাতে, বন্ধুত্ব বৃদ্ধিতে দেশে দেশে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে ক্রীড়া এখন এক বিশাল ভূমিকা পালন করে। একটা দেশ কতখানি উন্নত, সেই দেশের ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখে তার খানিকটা বিচার করা হয়। সারা বিশ্বব্যাপী ক্রীড়া নিয়ে মানুবের উৎসাহ-উদ্দীপনার শেষ নেই। খেলাধুলায় বিশ্বব্যাপী আসরগুলি তাই আজ এত জমজমাট এবং বর্ণময়। খেলোয়াড় তৈরির জন্য আজ দেশে দেশে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। আমাদের মতো গরিব দেশেও খেলাধুলার জন্য প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য হলেও যে টাকা ব্যয় হয় তার পরিমাণ কয়েকশো কোটি টাকা।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষের খেলাধুলা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি দেশের প্রাচীন ইতিহাস থেকে। এমন কি আমাদের দেশের দুই প্রাচীন মহাকাব্যেও আমরা নানা খেলাধুলার উল্লেখ পাই। ইংরেজরা যখন আমাদের দেশ শাসন করতে আসে, তার পরেই কিন্তু আমাদের খেলাধুলার বিশ্ব আসরে প্রবেশ। বিশ্ব আসরে স্থান পেতে হলে দেশের প্রতিটি কোণে খেলাধুলার প্রচলন হওয়া দরকার। তাই আজ রাজ্য স্তর, জেলা স্তর, শহর স্তর, গ্রাম স্তর, কলেজ স্তর, স্কুল স্তর— সমস্ত স্তরেই খেলাধুলার দেশব্যাপী এক বিশাল আয়োজন। পশ্চিমবঙ্গেরই এই জেলা হুগলির খেলাধুলার ইতিহাস খুঁজে পাওয়া কিছু তথ্যের ওপর চোখ বোলালেই এই জেলা খেলাধুলায় কতটা সমৃদ্ধ তার খানিকটা ধারণা পাওয়া যাবে।

ফুটবল : বাঙালির সবচেয়ে প্রিয় খেলা ফুটবলের ক্ষেত্রে হুগলির চুঁচুড়া শহর যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল, তা অনেক আগেই প্রায় ১৮৭০ সালের কাছাকাছি যা রাজধানী কলকাতার তুলনায় কোনও অংশেই কম উৎসাহব্যঞ্জক নয়। সিপাহী বিদ্রোহের কিছু আগে কলকাতা, ঢাকা ও চুঁচুড়ায় ফুটবল খেলা প্রথমে সীমাবদ্ধ ছিল। চুঁচুড়ার মাঠে ঢাকা মিলিটারি পুলিশ ও 'হুগলি ডিট্যাচ্‌মেন্ট' দলেরও ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হত।

কলকাতার সঙ্গে প্রায় একই সঙ্গে ১৮৭০ সালে অধুনা হুগলি মহসীন কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপাল মিঃ ই এম হুইলার মহাশয়ের উদ্যোগে চুঁচুড়ায় ফুটবল খেলা ভালভাবে প্রবর্তিত হয়। খেলা ভালভাবে জমে উঠলে ১৮৮৩ সালে এখানকার প্রাচীনতম ও ঐতিহ্যপূর্ণ 'টাউন ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতার ডালহৌসি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৮ সালে। আর আই এফ এ (কলকাতার ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন) ১৮৮৭ সালে স্থাপিত হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, আই এফ এ'র জন্মের আগেই চুঁচুড়ায় ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করেছে। বর্তমান হুগলি জেলা ক্রীড়া সংস্থার জন্ম হয় ১৯১৯ সালে।

কলকাতার মোহনবাগান ক্লাবের জন্ম হয় ১৮৮৯ সালে। তবে চুঁচুড়া ময়দানে খেলাধুলার প্রচলন সেই ১৮৭০ সাল থেকেই। চিনসুরা স্পোর্টিংয়ের জন্ম হয় ১৮৯৩ সালে। ইতিহাস থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মোহনবাগান ক্লাবের আগে জন্মলাভ করেছে চুঁচুড়া 'টাউন ক্লাব'।

সে যুগে কলকাতার আই এফ এ শিল্ডের থেকে চুঁচুড়া ময়দানের গ্ল্যাডস্টোন কাপ প্রতিযোগিতা এবং বার্নাড কাপ প্রতিযোগিতা অধিকতর জনপ্রিয় ছিল। অন্তত ইতিহাস তাই বলছে। চুঁচুড়ায় খেলতে আসত বহু সাহেবি দল।

চুঁচুড়া ময়দানে ফুটবল লিগ ছাড়াও যে কটি গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট চালু হয়, তার মধ্যে উক্ত দুটি কাপ অন্যতম। চিনসুরা স্পোর্টিং সে যুগে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি ও ক্রীড়াবিদের সমন্বয়ে যে বিখ্যাত টুর্নামেন্টটি চালু করে ১৮৯৮ সালে চুঁচুড়া ময়দানে তার নাম হল বিখ্যাত গ্ল্যাডস্টোন কাপ প্রতিযোগিতা। আর চুঁচুড়া টাউন ক্লাব ১৯১৩ সালে যে টুর্নামেন্টটি চালু করে, সেটি হল বার্নাড কাপ প্রতিযোগিতা। পরে অবশ্য এই দুটি ক্লাব উক্ত টুর্নামেন্টের সব দায়দায়িত্ব দিয়ে দেয় জেলা ক্রীড়া সংস্থার হাতে। সে যুগে চুঁচুড়ায় যে ক্লাবগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাদের কিছু নাম এখানে উল্লেখ করলাম। চুঁচুড়া টাউন ক্লাব (১৮৮৩ খ্রিঃ), রিপন এ সি (১৮৯০ খ্রিঃ), চিনসুরা স্পোর্টিং (১৮৯৩ খ্রিঃ), ভিক্টোরিয়া ক্লাব (১৮৯৫ খ্রিঃ), নবাব সাহেব একাদশ (১৮৯৬ খ্রিঃ), উডবার্ন ক্লাব (১৮৯৮ খ্রিঃ), পুলিশ এ সি (১৯০০ খ্রিঃ), ওরিয়েন্টাল ক্লাব (১৯০৬ খ্রিঃ), ইয়ং বয়েজ (১৯১০ খ্রিঃ), চিনসুরা ক্লাব (১৯২৩ খ্রিঃ), বড়বাজার ক্লাব (১৯২৮ খ্রিঃ), বেঙ্গল স্পোর্টিং (১৯৩০ খ্রিঃ)। এছাড়া আজ পর্যন্ত আরও অনেক ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার হিসাব দিতে বসলে আর অন্য কথা লেখা যাবে না; তাই উল্লেখ করছি না। চুঁচুড়া মাঠের এক ঐতিহাসিক ঘটনা সকলের জানা প্রয়োজন, তাই লিখছি। তখন ব্রিটিশ শাসন। সারা দেশ স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। বহু তরুণ তাজা প্রাণ তাঁদের জীবন বিসর্জন দিচ্ছেন দেশমাতৃকার শৃঙ্খল ভেঙে ফেলতে। সাহেবদের দেখলে যে কেউ তখন ঘৃণার চোখে দেখে। যে-কোনও ক্ষেত্রে সাহেবদের অবমাননার সুযোগ পেলে ছাড়ে না। খেলার মাঠে আই এফ এ শিল্ডের খেলায় ১৯১১ সালে মোহনবাগান ২-১ গোলে ইস্ট ইয়র্ক নামক গোরা দলকে হারিয়ে দিলে সারা দেশে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই, এর বহু আগে চুঁচুড়া ময়দানে ওই মোহনবাগান এ সি-ই ৬-১ গোলে সাহেবি দল ডালহৌসিকে হারিয়ে ১৯০৫ সালে গ্ল্যাডস্টোন কাপ জয় করে। এই ইতিহাসের কথা জানেন শৈলেন মান্না, অমল দত্ত, সাংবাদিক শ্যামসুন্দর ঘোষ, শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও প্রবীণ ব্যক্তিগণ। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কথা যেমন বাঙালি জাতি ভুলবে না, ঠিক তেমনই ১৯০৫ সালের চুঁচুড়া ময়দানের গ্ল্যাডস্টোন কাপের ফাইনাল খেলার ইতিহাসও বাঙালি কেন কোনও ভারতীয় ভুলবে না। এ তো হল প্রথমদিকের ইতিহাস। পাতা ওল্টালে দেখতে পাই আরও অনেক রোমাঞ্চকর দৃশ্য। কোনও এক সময়ে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামকেও এই চুঁচুড়া ময়দানে ফুটবল খেলতে দেখা গেছে। শুধু ফুটবল খেলাই নয়, কিছু বর্ণময় ফুটবল খেলোয়াড়ের উল্লেখও এই লেখায় রাখতে চাই। স্থানাভাবে সকলের নাম উল্লেখ করা যাচ্ছে না বলে কেউ যেন মনে না করেন ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে আঘাত দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের নাম অনুচ্চারিত থেকে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে যে, হুগলি জেলার ফুটবল খেলা যথেষ্ট ঐতিহ্যপূর্ণ ছিল। এই জেলা প্রথম যুগ থেকেই জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে বহু খেলোয়াড় সারবরাহ করেছে। সন্তোষকুমার নন্দী (গুলে নন্দী) ১৯৫১ সালে প্রথম এশিয়ান গেমসে

সোনাজয়ী ভারতীয় ফুটবল দলের সদস্য ছিলেন। উনি ১৯৪৮ সালের লন্ডন অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল দলেও খেলেছেন। এছাড়া আরও অনেক খেলোয়াড় রাজ্য এবং জাতীয় দলে খেলেছেন। পরিমল মজুমদার, বিমান লাহিড়ী, সুরজিৎ সেনগুপ্ত, বিভাস সরকার, বিদেশ বসু, প্রণব মণ্ডল, তনুময় বসু, স্বরূপ দাস, দীপক চ্যাটার্জি (লাট্টু), শিশির ঘোষ, বিজয় দিকপতি, সুধীর কর্মকার, প্রদ্যোৎ বর্মণ—এঁদের খেলোয়াড়-জীবনের কথা আজও লোকের মুখে মুখে ঘোরে। আই এফ এ শিল্ডে বিভাস সরকারের ডবল হ্যাটট্রিকের রেকর্ড তো আজও অম্লান।

আজও চুঁচুড়া শহরের ফুটবল খেলা নিয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব নেই। তবে এই খেলা আজ আর শুধু চুঁচুড়া শহরেই সীমাবদ্ধ নয়, এ খেলা ছড়িয়ে গেছে জেলার সর্বত্র। হুগলি জেলার চারটি মহকুমা এখন এই খেলা পরিচালনা করে—হুগলি সদর, শ্রীরামপুর, আরামবাগ এবং বলাগড় থানা। বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠেছে আধুনিক ফুটবলের প্রশিক্ষণ শিবির। অনেক ফুটবল প্রশিক্ষক কঠোর পরিশ্রম করে চলেছেন তাঁদের শিক্ষার্থীদের নিয়ে। আগামীদিনে ভাল খেলোয়াড় তৈরি হলেই বুঝব তাঁদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

ক্রিকেট : বিশ্বের আসরে ভারতীয় ক্রিকেট একটি উজ্জ্বল নাম হলেও আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ক্রিকেটে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বেশ পেছিয়ে। ভারতীয় ক্রিকেট দলে তাই বাংলার খেলোয়াড়দের প্রতিনিধিত্ব করার ঘটনা অন্য রাজ্যের তুলনায় বেশ কম। পশ্চিমবঙ্গের এই জেলা হুগলিতে কিন্তু এই খেলার প্রতি উৎসাহের ভাটা কখনও পড়েনি। চুঁচুড়া ময়দানে ক্রিকেটের জনক বলতে বুঝি সেই লাল টুকটুকে মানুষটিকে, যিনি হলেন টাউন ক্লাবের খেলোয়াড় সুবলচন্দ্র পাল। অতীতের স্কোর বুক থেকে লক্ষ করা যাক কেমন খেলতেন হুগলির প্রাক্তন ক্রিকেট খেলোয়াড়রা। সুবলচন্দ্র পাল ৩১/১২/১৯১৯ তারিখে ক্ল্যাসিকাল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে টাউন ক্লাবের পক্ষে নট আউট ১০৫ রান করেন। তিনিই আবার ২৪/১২/১৯২৩ তারিখে স্টুডেন্ট স্পোর্টস ক্লাবের বিরুদ্ধে ১৩৮ রানের এক ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। কানাই শীল চুঁচুড়া টাউন ক্লাবের একজন দক্ষ ক্রিকেটার ছিলেন। ১৪/১২/১৯৫২ তারিখে চিনসুরা ক্লাবের বিরুদ্ধে ২৫ রানের বিনিময়ে ৯টি উইকেট দখল করেছিলেন। এছাড়া ৪/১/১৯৫৩ তারিখে টাউন ক্লাব বনাম স্টিল কন্ট্রোল রিক্রিয়েশন ক্লাবের খেলায় কানাই শীল ১৬ রানে ১০টি উইকেট দখল করেন।

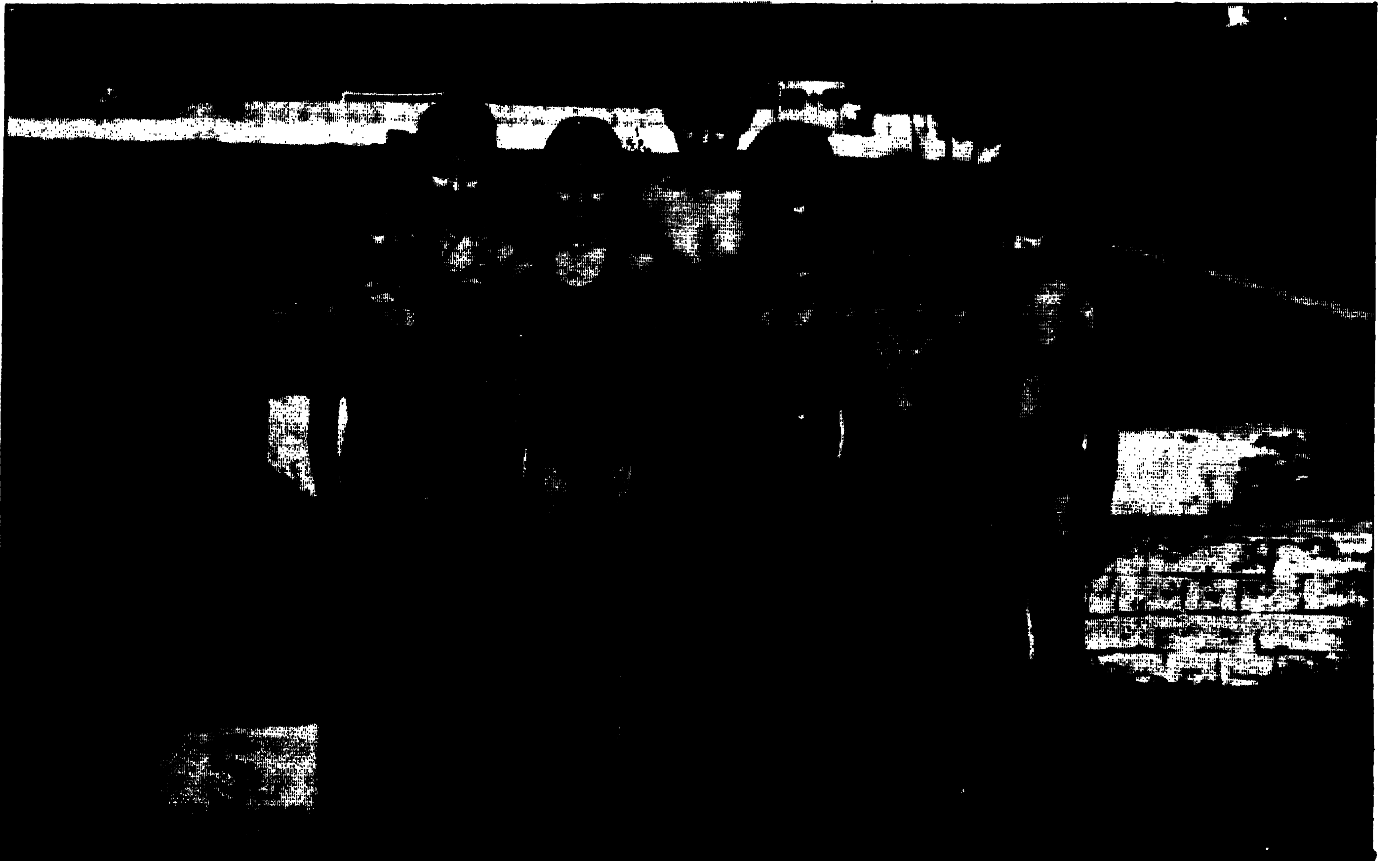
সে যুগে চুঁচুড়া টাউন ক্লাব ১৯২৮ সালে গয়াতে, ১৯২৯ সালে বেনারসে, এলাহাবাদে, ১৯৩০ সালে কটকে, ১৯৩১ সালে আগ্রাতে, দিল্লিতে, ১৯৩৬ সালে ঢাকাতে ক্রিকেট দল নিয়ে খেলতে গিয়েছিল এবং গৌরবময় ইতিহাস গড়ে এসেছে। চুঁচুড়া ময়দানের পুরনো দিনের আরেক ক্রিকেট প্রতিভার নাম নিতাইচাঁদ দত্ত। এই নিতাইচাঁদ দত্ত ময়দানে লর্ড নামে খ্যাত। তিনি গয়ায় টাউন ক্লাবের পক্ষে খেলে ৪টি উইকেট পেয়েছিলেন। কলকাতার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিরুদ্ধে ২টি খেলায় সেঞ্চুরি করেন। ১৯২৬/২৭ সালে টাউন ক্লাব দিল্লি, এলাহাবাদ ও বেনারস ভ্রমণ করে। দিল্লিতে ৩টি উইকেট দখল করেন তিনি। এলাহাবাদে ৪টি উইকেট তাঁর করায়ত্ত হয়। তিনি কাস্টমস অফিসে কাজ করতেন। কাস্টমস রিক্রিয়েশন ক্লাবের হয়ে কলকাতা ক্লাবের বিরুদ্ধে ১০টি উইকেট দখল করে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছিলেন। এই লর্ড নিতাইচাঁদ দত্তর ছক্কা মারার ঘটনা উল্লেখ করেন প্রখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক অজয় বসু যখন হুগলি জেলা ক্রীড়া সাংবাদিক সংস্থার পক্ষ থেকে লর্ডকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় সেই সময়। চুঁচুড়া ময়দানের খেলোয়াড় সঞ্জিত শীলের ক্রিকেট-জীবনও ছিল খুব বর্ণময়। তিনি চুঁচুড়ার টাউন ক্লাবের খেলোয়াড় ছিলেন। বাংলা স্কুল দলের অধিনায়কত্ব করেছেন। উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফিতে খেলেন। সঞ্জিত শীলের ক্রিকেট-জীবনের উত্থান প্রসঙ্গে রাজু মুখার্জি ১/১০/৮৩তে তাঁর লেখায় এক জায়গায় এই ক্রিকেট খেলোয়াড় প্রসঙ্গে বলেছেন—'Today although this bowler Sanjit Sil is still foundly remembered by Bishen Singh Bedi, Venkataraghavan, Ashok Mankad as well as by his team-mates in Calcutta yet unfortunately his Cricketing knowledge has not received the recognition as it deserves,' চুঁচুড়ার এক ক্রিকেটার প্রসঙ্গে এই ধরনের মন্তব্য আমাদের গৌরবে বুক ভরিয়ে দেয় বৈকি।

এছাড়া আরও যাঁরা ক্রিকেট খেলায় হুগলি জেলার নাম সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁরা হলেন—তুলসীদাস মণ্ডল, অজিত সেন, নির্মল চ্যাটার্জি, জিতেন পাল, নিতাই মণ্ডল, সুজিত শীল, অসিত সেন, প্রদীপ মণ্ডল, স্নেহময় চৌধুরী; গুপীনাথ দত্ত এঁরা ছাড়াও আরও অনেকে আছেন। তালিকা আরও করার চেষ্টা না করে একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক আজকের হুগলির ক্রিকেট খেলার উপর। এখন সারা জেলায় গড়ে উঠেছে অনেক ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প। লক্ষ করে দেখা গেছে ১০ বছরের কম বয়সের ছেলেরাও আজ ক্রিকেট শিখতে আসছে। ছোট বয়স থেকে ক্রিকেট শিখে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান ক্রিকেটার উঠে এসেছে এই জেলা থেকে। শুরু অনূর্ধ্ব ১৩ বছর বয়সের ছেলেদের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। সাব-জুনিয়ার এবং জুনিয়ার বাংলা দলে এবং রাজ্য স্কুল দলে হুগলি জেলার বহু ক্রিকেটার নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আগামীদিনে বাংলা দলের হয়ে রঞ্জি ট্রফির খেলাতেও সুযোগ করে নেবে বলে আশা করা হচ্ছে। এদের মধ্যে প্রসেনজিৎ গাঙ্গুলি, ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী, তাপস ঘোষ, সুব্রতনারায়ণ সাহা, সিদ্ধার্থ মল্লিক, ধর্মেন্দর সিং, সৌভিক মুখার্জি, নিমাই দাস, অরিজিৎ দত্ত ইতিমধ্যেই সুনামের সঙ্গে কলকাতার বিভিন্ন ক্লাবে খেলছেন। আন্তঃ জেলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতার বিভিন্ন স্তরের খেলায় হুগলি প্রতি বছরই বেশ ভাল ফল করে চলেছে।

হকি : অলিম্পিককে বলা হয় 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'। আধুনিক অলিম্পিকের ধারণার সূচনা আথেন্সে, ১৮৯৬ সালে। এই ওলিম্পিকে ১৯২৮ সালে ভারত প্রথম সোনা জয়ের স্বাদ পায় হকি খেলার জন্য। সেবার অলিম্পিকের আসর বসেছিল আমস্টারডামে। তারপর থেকে হকি খেলাতে ভারত বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠ দল বলে বিবেচিত হয়েছে অনেক কাল। মাঝের কয়েকটি বছর এই খেলাটিতে ভারত বেশ পেছিয়ে পড়লেও ইদানীং ভারত যে আবার তার হারান স্থান পুনরুদ্ধার করার জন্য অনেকটাই প্রস্তুত, তা আন্তর্জাতিক

খেলার ফলাফলগুলি দেখলেই বোঝা যায়। হকি খেলার শুরু হুগলি জেলাতে হয় ৩০ দশকের সময়। প্রথম হকি খেলা শুরু করে টাউন ক্লাব এবং স্পোর্টিং ক্লাব। পরে আরও অনেক ক্লাব এই খেলায় অংশগ্রহণ করে। বড়বাজার ক্লাব, সি ডব্লু এ ক্লাব, চিনসুরা ক্লাব, উডবার্ন ক্লাব, বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাব, ন্যাশানাল ক্লাব, ইউনিয়ন অ্যাথলেটিক ক্লাব, পুলিশ এ সি ছাড়া পরে আরও অনেক ক্লাব হকি লিগে অংশ নিত। হংস দে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে হকি খেলতেন। এই হংস দে ভারতীয় অলিম্পিক দলের অনেক খেলোয়াড়কে নিয়ে আসতেন এই চুঁচুড়া মাঠে হকি খেলানোর জন্য। ট্যাবসাল, গ্ল্যাকেন, জনসন, সাকুর, মুনিরের মত বিখ্যাত হকি খেলোয়াড়রা হুগলিতে হকি লিগ খেলে গেছেন। এ ছাড়া হুগলি জেলার যে সমস্ত হকি খেলোয়াড় সে যুগে ভাল খেলতেন, তাঁদের মধ্যে তারা দে, সুধন বিশ্বাস, সন্তোষ গাঙ্গুলি, অম্বুজাক্ষ মুখার্জি, স্নেহময় চৌধুরীর নাম এখনও অনেককে বলতে শোনা যায়। ৬০-এর দশকে পরপর ৯ বছর হুগলি আন্তঃ জেলা হকি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়। একটা সময় ছিল যখন হুগলি জেলা কলকাতার হকি লিগে খেলার জন্য প্রচুর পরিমাণে খেলোয়াড় সরবরাহ করত। রাজ্যস্তরে এমন কি জাতীয় স্তরেও বহু খেলোয়াড় হুগলি জেলা থেকে সুযোগ করে নিয়েছেন। রঞ্জন পাল, তাপস পাল, অপূর্ব ভট্টাচার্য, অসিত দে, বিকাশ মল্লিক, কার্তিক বৈরাগী, প্রদীপ দত্ত এবং আরও অনেকে হকি খেলার মাধ্যমে তাঁদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজ বড় দুঃখের বিষয়, নতুন প্রজন্ম আর এই খেলাটির প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে না। চিনসুরা ইউনাইটেড ক্লাব বহু টাকা ব্যয় করে প্রতি বছর জাঁকজমকপূর্ণ হকি টুর্নামেন্ট করছে। তাদের ইচ্ছা হকি প্রশিক্ষণ শিবির চালু করার। দেখা যাক কি হয়। এই রকম ঐতিহ্যপূর্ণ খেলাতে হুগলির হকি লিগে মাত্র ৫টি দল অংশগ্রহণ করছে। অবশ্য আশার কথা রিষড়া অঞ্চলে এই খেলাটির বিশেষ প্রসার লক্ষ করা যাচ্ছে। এই খেলাটির প্রচার ও প্রসারের জন্য এখনই সর্বস্তরে প্রচেষ্টা নেওয়া দরকার। অন্য প্রায় সব বিষয়ের খেলাধুলাই বেশ উল্লেখযোগ্য এখানে। যেমন হয় অ্যাথলেটিক্সের চর্চা, তেমনই হয় সাঁতার, ভলিবল, জিমন্যাস্টিকস, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, কবাডি, খো-খো, রাইফেল স্যুটিং, তীরন্দাজি, বক্সিং ইত্যাদি আরও নানা বিষয়ের চর্চা এবং প্রায় প্রতিটি বিষয়ের আধুনিকতম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। এইসব বিষয়েই হুগলি জেলার খেলোয়াড়রা বিশেষ সুনামের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই খেলে চলেছেন। সাঁতারে বুলা চৌধুরীর ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম, সুচরিতা মান্নার ভারতীয় জিমন্যাস্টিকসে চ্যাম্পিয়ন হওয়া, ভোলানাথ গুঁইয়ের কবাডি এবং ভারোত্তোলনে অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্তি এরই সাক্ষ্য বহন করে। প্রায় সমস্ত খেলাতেই হুগলি জেলার খেলোয়াড়রা রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে প্রতি বছর সুযোগ করে নিচ্ছে। প্রতিভাবান খেলোয়াড় এবং উদ্যোগী পরিশ্রমী প্রশিক্ষকের অভাব এই জেলায় নেই। প্রয়োজন অর্থের। সুযোগ পেলে আমাদের জেলার খেলোয়াড়রাও দেশের সম্মান বৃদ্ধি করতে পারেন।

চুঁচুড়ায় সাঁতার প্রশিক্ষণ



হুগলি জেলার পৌরসভা

অমিয় নন্দী

সহযোগিতায় : অনন্তদেব মুখোপাধ্যায়

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে ভারত আর পাকিস্তান দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হল। পাকিস্তানে ছিল দুটি বিচ্ছিন্ন অংশ— পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান; তার মধ্যে স্বাধীন ভারতের অবস্থান। ফলে পশ্চিম ও পূর্ব—দুদিক থেকেই এল বাস্তুহারার দল। অসংখ্য বাস্তুহারা পূর্ব পাকিস্তান (যা এখন স্বাধীন বাংলাদেশরূপে স্বীকৃত) থেকে এসে ভিড় করেছে আয়তনে ক্ষীণ এই পশ্চিমবাংলায়। অনিয়মিতভাবে যত্রতত্র গজিয়ে উঠল সংখ্যাতীত অতিরিক্ত মানুষের বসতি। নিচু জমি, পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, কাঁচা নর্দমায় খাটা পায়খানার যত উপচে পড়া ময়লা। এসব নিয়ে পৌরসভাগুলির দায়িত্ব বাড়ল, আয় বাড়ল না।

বিদেশি ইংরেজের শাসনকাল থেকে অনুসৃত ১৯৩২-এর বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টে যে যে বিষয়ের উপর কর আদায় চলিত ছিল সেগুলি হল: (১) সম্পত্তির উপর কর; (২) পথে আলোর ব্যবস্থা বাবদে কর; (৩) পেশা/বৃত্তি প্রভৃতির উপর ধার্য ফি; (৪) জল সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য কর; (৫) পায়খানা ও আবর্জনা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা বাবদে কর; এবং (৬) পৌর এলাকার মধ্যে ফেরি বা পুল (সেতু) থাকলে টোল আদায়ের ব্যবস্থা।

১৯৯৪ সালের ১২ জুলাই পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সকল পৌরসভা ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় পৌর আইনে পরিচালিত হত। কিন্তু এই আইন স্বাধীনতার অনেক আগে তৈরি হয়েছিল তাই সময়ের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন হওয়ায় নতুন করে পৌর আইন রচনার প্রয়োজন দেখা দিল। ফলে ১৯৯৪ সালের ১৩ জুলাই থেকে পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন ১৯৯৩ কার্যকরী করা হয়। ১৯৩২ সালের পুরনো আইনে পৌরসভাগুলির উপর রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ অধিকতর ছিল যা বর্তমান আইনে অনেকাংশে শিথিল করা হয়েছে। পৌরসভাগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে নাগরিক পরিষেবা দিতে পারে এবং দ্রুত ও সুনিশ্চিতভাবে নগরায়নের পথে অগ্রসর হতে পারে সেদিকে বিশেষ লক্ষ রেখেই বর্তমান আইনটি রচিত হয়েছে।[১]

এ ছাড়া চন্দননগর পৌর আইন, ১৯৫৫-র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দু-একটি বিষয় ছাড়া চন্দননগর কর্পোরেশনের সাধারণ প্রশাসন অবশ্য বঙ্গীয় পৌর আইন, ১৯৩২ মোতাবেকই পরিচালিত হত। বিগত ১৮ বছর সময়সীমার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যে আইনগুলির প্রণয়ন ঘটেছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—(ক) কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন পর্ষৎ আইন, ১৯৭৮; (খ) চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আইন, ১৯৮০; (গ) পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন, ১৯৯৩ এবং (ঘ) পশ্চিমবঙ্গ পৌর নির্বাচন আইন, ১৯৯৪।[২]

ইতিমধ্যে ১৯৯২-এ ভারত সরকারের ৭৪তম সংবিধান সংশোধন গৃহীত হয়। এর মূল বিষয়গুলি হল: (ক) পৌরসভা গঠনের একটি সুনির্দিষ্ট নীতি-নিয়ম; (খ) নিয়মিত নির্বাচনের মাধ্যমে পৌরসভা গঠন; (গ) পৌরসভার কর, ফি ইত্যাদি আদায়ের ক্ষমতা; (ঘ) রাজ্যের অর্থভাণ্ডার থেকে পৌরসভাকে দেয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ; (ঙ) পৌরসভার বাধ্যতামূলক এবং ঐচ্ছিক কর্তব্যসমূহ (দ্বাদশ তফসিল); (চ) ওয়ার্ড কমিটি গঠন (ছ) রাজ্য পৌর অর্থ কমিশন গঠন; (জ) জেলা পরিকল্পনা কমিটি ও মেট্রোপলিটন পরিকল্পনা কমিটি গঠন; (ঝ) রাজ্য নির্বাচন কমিশন; এবং (ঞ) মহিলা, তফসিলি জাতি এবং উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণ। 'পশ্চিমবঙ্গের পৌর প্রশাসনে ৭৪তম সংবিধান সংশোধন আইনের প্রতিফলন' প্রসঙ্গে গত সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫-এ রাষ্ট্রমন্ত্রী, পৌরবিষয়ক দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন: 'স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে যে সসআ [সংবিধান সংশোধন আইন] পৌর-প্রশাসন ও সংগঠনকে বিকেন্দ্রীত ও গণতান্ত্রিক স্থানীয় সংস্থার রূপ দিতে যেসব বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক ব্যবস্থার অবতারণা করেছে তার মধ্যে অনেকগুলো পূর্বেই বামফ্রন্ট সরকার নিয়ে ফেলে থাকলেও, বেশ কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন এর মাধ্যমে হয়েছে বা হতে চলেছে। তা ছাড়া, রাজ্য সরকার যেসব ব্যবস্থা বা সংস্কার আগেই করেছে, সেগুলো সাংবিধানিক রূপ পেয়ে অনেক বেশি জোরদার হয়েছে। সর্বোপরি, সাংবিধানিক স্বীকৃতি পাওয়াটাই পৌর-সংস্থার পক্ষে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা, যার প্রতীক্ষায় বহু দশক কেটে গেছে।

আজ অবধি অন্যান্য যুগান্তকারী পরিবর্তনগুলির মধ্যে রয়েছে:

(১) রাজ্যস্তরে পুরসভাগুলিকে সাহায্যের জন্য
  (ক) মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেট এবং
  (খ) ডিরেক্টরেট অব লোকাল বডিজ সংগঠন
(২) পুরসভাগুলির আর্থিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধনের প্রচেষ্টায় মিউনিসিপ্যাল ফিনান্স কমিশন গঠন
(৩) পৌর প্রশাসনে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড আর্বান স্টাডিজ (ILGUS) প্রতিষ্ঠা
(৪) যথেষ্ট পরিমাণে অনুদান বৃদ্ধি ও তার উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য রিভাইজড্ গ্র্যান্ট স্ট্রাক্চার চালু করা (RGS)
(৫) পুর এলাকায় খাটা পায়খানা অবলুপ্তির পরিকল্পনা গ্রহণ (ILCS)
(৬) গ্রামীণ পরিবেশে বৃহত্তর কলকাতা বহির্ভূত পুরসভাগুলিকে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট অব স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম টাউনস (IDSMT) প্রজেক্ট অনুযায়ী ছোট পুরসভার প্রত্যেকটিকে অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য এবং জনসাধারণের সুখ-সুবিধা বাড়ানোর জন্য বড় মাপের অনুদান
(৭) বৃহত্তর কলকাতায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিটি পুরসভাকে ক্যালকাটা আর্বান ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (CUDP) অনুসারে বিশেষ অনুদান
(৮) গঙ্গাদূষণ প্রতিরোধ প্রকল্পে যাবতীয় বর্জ্য পদার্থ হুগলি (বা ভাগীরথী) নদীতে নিষ্কাশন নিবারণ
(৯) বস্তি উন্নয়ন (EIUS)
(১০) নেহরু রোজগার যোজনার (NRY) অধীন স্বনিযুক্তি, বাসগৃহ সম্প্রসার
(১১) দরিদ্রদের জন্য মৌল নগর পরিষেবা (UBSP)
(১২) পৌরাঞ্চলের সাধারণ উন্নয়নের জন্য অনুদান
(১৩) পানীয় জলের উৎস-নির্মাণে অনুদান
(১৪) অন্যান্য পৌর-উন্নয়ন কর্মসূচি (MDP)
(১৫) স্বাস্থ্যপ্রকল্প
(১৬) ভারতীয় জনসংখ্যা কর্মসূচি ৮ (IPP VIII)
(১৭) প্রাথমিক শিক্ষা
(১৮) সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ড গঠন
(১৯) সুনিয়মিত পৌর নির্বাচন অনুষ্ঠান
(২০) ডিস্ট্রিক্ট আর্বান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি গঠন।

এইসব উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুবন্দোবস্ত বৃহত্তর কলকাতার অন্তর্বর্তী ও বহিঃস্থ অন্যান্য পুরসভাগুলির মতো হুগলি জেলার পৌর সংস্থাগুলিও লাভ করেছে। সরকারি যেসব তথ্য পাওয়া গিয়েছে সেগুলি সারণির আকারে একে একে সাজিয়ে দেওয়া হল। এর থেকে এই জেলার বারোটি পৌর প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সামগ্রিক পরিস্থিতি ও তুলনামূলক অবস্থান কৌতূহলী পাঠক সমাজকে অবহিত করবে। প্রথমেই যে সমস্যা বহু সমস্যা সৃষ্টি ও বৃদ্ধির মূলে, সেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এই জেলায় কী আকার ধারণ করেছে তা সারণি-১ দেখে জানা যাবে। "দেশের জন-বিস্ফোরণ রোধের উদ্দেশ্যে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় IPP VIII এই কর্মসূচি পালিত হবে। জন্মহার কমানো এবং মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার মাধ্যমেই এই উদ্দেশ্য সাধিত হবে।.... মূলত বস্তি এলাকাতেই এই কর্মসূচি রূপায়িত হবে।

এই কর্মসূচিতে বস্তি অঞ্চলে স্থাপিত ছোট ছোট স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে উন্নততর চিকিৎসা-ব্যবস্থা বস্তিবাসীর হাতের কাছে পৌছে দেওয়া হবে।" ১৯৯১-এর জনগণনা অনুসারে এই জেলার চারটি শহর— হুগলি-চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর ও রিষড়ার জনসংখ্যা একলক্ষ ছাড়িয়ে গেছে।

হুগলি জেলার পুরসভাগুলির আয়-ব্যয় প্রসঙ্গে বলা যায় যে, এই পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলির আয়ের উৎস সীমিত। উৎসগুলি হল : (১) আবাস গৃহ, শিল্প প্রতিষ্ঠান, রেলপথ, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকেন্দ্র থেকে লভ্য সম্পত্তির কর; (২) অন্যান্য কর; (৩) কর বহির্ভূত আয়; (৪) রাজ্য সরকারের রাজস্ব থেকে

সারণি-১

এলাকা, জনসংখ্যা, জন ঘনত্ব এবং পৌর শহরাঞ্চলে জনসংখ্যার দশকগত পরিবর্তনের হার

ক্রমিক সংখ্যা	পৌর এলাকার নাম	জনসংখ্যা (.০০০ হাজার জন হিসাবে)				এলাকা (বর্গ কি.মি.)	জন ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি.তে জনসংখ্যা হিসাবে)	জনসংখ্যার দশকগত পরিবর্তন (শতকরা হিসাবে)		
		১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১	১৯৮১	১৯৯১	১৯৬১ থেকে ১৯৭১	১৯৭১ থেকে ১৯৮১	১৯৮১ থেকে ১৯৯১
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১।	বাঁশবেড়িয়া	৪৫	৬২	৭৭	৯৪	৯.০৭	১০৩৬৪	৩৫.৮২	২৪.১৯	২২.০৮
২।	হুগলি-চুঁচুড়া	৮৩	১০৫	১২৫	১৫২	১৬.৫৮	৯১৬৮	২৬.৬৪	১৯.০৫	২১.৬০
৩।	চন্দননগর পৌর কর্পোরেশন	৬৭	৭৫	১০২	১২০	৯.৭১	১২৩৫৮	১২.১২	৩৬.০০	১৭.৬৫
৪।	ভদ্রেশ্বর	৩৫	৪৫	৫৯	৭২	৬.৪৮	১১১১১	২৮.৪৫	৩১.১১	২২.০৩
৫।	চাঁপদানী	৪২	৫৮	৭৬	১০১	৬.৫০	১৫৫৩৮	৩৯.০৯	৩১.০৩	৩২.৮৯
৬।	বৈদ্যবাটী	৪৪	৫৪	৭০	৯০	১২.০৩	৭৪৮১	২২.১৬	২৯.৬৩	২৮.৫৭
৭।	শ্রীরামপুর	৯১	১০২	১২৭	১৩৭	৫.৮৮	২৩২৯৯	১১.৪৭	২৪.৫১	৭.৮৭
৮।	রিষড়া	৩৮	৬৩	৮১	১০৩	৬.৪৮	১৫৮৯৫	৬৪.৭৫	২৮.৫৭	২৭.১৬
৯।	কোন্নগর	২৯	৩৪	৫১	৬২	৪.৩৩	১৪৩১৯	১৬.৯২	৫০.০০	২১.৫৭
১০।	উত্তরপাড়া-কোতরং	৫২	৬৭	৭৯	১০১	৭.২৫	১৩৯৩১	২৯.৫৩	১৭.৯১	২৭.৮৫
১১।	আরামবাগ	১৬	২৫	৩৪	৪৫	১৯.৪৩	২৩১৬	৫২.৬৩	৩৬.০০	৩২.৩৫
১২।	তারকেশ্বর	৮	১২	১৬	২৩	৩.২৯	৬৯৯১	৪০.২৩	৩৩.৩৩	৪৩.৭৫

* শর্তাধীন প্রাথমিক হিসাবমতে

সংখ্যার বিচারে হুগলি-চুঁচুড়ার জনসংখ্যার ১৯৯১-এর লোকগণনা হিসাবে সব থেকে বেশি আর সব চেয়ে কম তারকেশ্বরে (যথাক্রমে ১ লক্ষ ৫২ হাজার ও ২৩ হাজার)। ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ এই দশকে কোন্নগরের জনচাপ সব থেকে বৃদ্ধি পেলেও পরবর্তী দশকে এর পরিবর্তন লক্ষণীয়। নবগঠিত পৌর এলাকা তারকেশ্বরে ১৯৮১ থেকে ১৯৯১ এই দশ বছরে জনচাপ সর্বাধিক (৪৩.৭৫%)। শিল্পাঞ্চল চাঁপদানী দ্বিতীয় স্থানে (৩২.৮৯%) থাকলেও বৃহত্তর কলকাতা থেকে দূরবর্তী আরামবাগ পৌর এলাকায় জনচাপ বৃদ্ধি পেয়েছে তারই কাছাকাছি (৩২.৩৫%)। তারকেশ্বর ও আরামবাগের নগরায়ন এই চিত্র পরিবর্তনের মূলে কাজ করেছে। শিল্পে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ও প্রত্যাশায় জনসংখ্যা ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে চাঁপদানী পৌর এলাকায়। [দ্রষ্টব্য : সারণি-১]

বরাদ্দকৃত অংশ; (৫) মূলধন অনুদান; (৬) ঋণ; (৭) অগ্রিম ও সঞ্চয়; (৮) বিবিধ। পৌর কর ও নিজস্ব খাতে আয়ের বিবরণে ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বছরের ছবিটি সারণি ২/৩-এ ধরা হল।

১৯৯২-৯৩ আর্থিক বছরের যে আয়ের হিসাব সারণি ২ ও ৩-এ দেখানো হল তার থেকে যে ব্যয়ের হিসাব ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড আর্বান স্টাডিজ "আর্বান ওয়েস্ট বেঙ্গল ১৯৯৪-৯৫" গ্রন্থে নিবদ্ধ করেছেন সেটিও সারণি-৪-এ নথিভুক্ত করা হল। এই আয়-ব্যয়ের হিসাবে ব্যয়ের পরিমাণ বেশি দেখা যায়। আরও দেখা যায় যে, সদ্য শেষ হয়েছে এমন বছরের হিসাব নানা কারণে নথিবদ্ধ হতে পারেনি। তবু যেটুকু মেলে তা থেকে সাম্প্রতিককালের গুরুত্বপ্রাপ্ত দিকগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সারণি-২

হাজার টাকা হিসাবে

ক্রমিক সংখ্যা	পুরসভা	কর থেকে আয় সম্পত্তি কর	অন্যান্য কর	মোট আয়	কর বহির্ভূত আয়	নিজস্ব খাতে সর্বমোট আয় (৫+৬)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	বাঁশবেড়িয়া	৩৮৯৩	২০৯	৪১০২	৯৩৩	৫০৩৫
২।	হুগলি-চুঁচুড়া	৪৪৯৫	১৪৪৪	৫৯৩৯	৯০৩	৬৮৪২
* ৩।	চন্দননগর মি. ক.	৫৬৬৭	১৫৫	৫৮২২	২৩০৯	৮১৩১
* ৪।	ভদ্রেশ্বর	১৮৫০	৩৬	১৮৮৬	৬৭৬	২৫৬২
* ৫।	চাঁপদানী	১৫৩২	২৩	১৫৫৫	৭১৭	২২৭২
৬।	বৈদ্যবাটি	২৬৮৪	৩৪	২৭১৮	১৪৯৯	৪২১৭
* ৭।	শ্রীরামপুর	২৩৮৫	৪১৬	২৮০১	৪৪৩০	৭২৩১
৮।	রিষড়া [তথ্য মেলেনি]	—	—	—	—	—
* ৯।	কোন্নগর	৩২২৯	৩০২	৩৫৩১	১৩৬৮	৪৮৯৯
১০।	উত্তরপাড়া-কোতরং	৩৩১৩	২২২৩	৫৫৩৬	৫৯৯	৬১৩৫
১১।	আরামবাগ	৮৯৪	৪৮	৯৪২	৪৪৬	১৩৮৮
১২।	তারকেশ্বর [তথ্য মেলেনি]		—	—	—	—

সারণি-৩

হাজার টাকা হিসাবে

ক্রমিক সংখ্যা	পুরসভা	চুঙ্গি কর প্রাপ্য অংশ	পরিবহন কর প্রাপ্য অংশ	প্রমোদ কর প্রাপ্য অংশ	বৃত্তি ও অন্যান্য কর প্রাপ্য অংশ	মোট আয়
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	বাঁশবেড়িয়া	৩১০৯	৬৮	৯৪৫	—	৪১২২
২।	হুগলি-চুঁচুড়া	৫০৫৬	২৫৮	১৫৩৭	—	৬৮৫১
৩।	চন্দননগর মি. ক.	৪০৫৬	১৬০	১২৫২	৩৫০	৫৮১৮
৪।	ভদ্রেশ্বর	২০০১	১২০	৭২২	—	২৮৪৩
৫।	চাঁপদানী	৩০৭৫	৩৮	৯৩৪	—	৪০৪৭
৬।	বৈদ্যবাটি	২৮৪৯	৭০	৮৬৫	১৪৬	৩৯৩০
৭।	শ্রীরামপুর	৫১৪১	১০০	১৫৬৪	৬০	৬৮৬৫
৮।	রিষড়া	৩২৭০	৮৪	৯৯৩	—	৪৩৪৭
৯।	কোন্নগর	২০৬৬	১৫১	৬২৭	—	২৮৪৪
১০।	উত্তরপাড়া-কোতরং	৩২১৩	৮৪	৯৭৭	২০৩	৪৪৭৭
১১।	আরামবাগ	৮৪১	৪৭	৪১৫	১৮০	১৪৮৩
১২।	তারকেশ্বর	৪১৮	২০	২০০	৬৬	৭০৪

সারণি-৪

হাজার টাকা হিসাবে

ক্রমিক সংখ্যা	পুরসভা	বেতন ও মজুরি	অন্যান্য পৌনঃপুনিক খরচ	মোট খরচ
১।	বাঁশবেড়িয়া	৭১৬৪	৩৬৮৯	১০৮৫৩
২।	হুগলি-চুঁচুড়া	১৪৩৮৯	৪৮১	১৪৮৭০
* ৩।	চন্দননগর মি.ক.	২৮৩২০	৩৮৮০	৩২২০০
* ৪।	ভদ্রেশ্বর	৭২২৬	১৩৭১	৮৫৯৭
* ৫।	চাঁপদানী	২৪৫০	৩১০৩	৫৫৫৩
৬।	বৈদ্যবাটি	৮৭৫২	২৮৮৮	১১৬৪০
* ৭।	শ্রীরামপুর	২০৭৮৮	৭৮৩৮	২৮৬২৬
৮।	রিষড়া [তথ্য মেলেনি]	—	—	—
* ৯।	কোন্নগর	৭৫৫৩	২৭০৫	১০২৫৮
১০।	উত্তরপাড়া-কোতরং	৬৮১৩	৪০৭৭	১০৮৯০
১১।	আরামবাগ	৫১৪৮	১৩১২	৬৪৬০
১২।	তারকেশ্বর [তথ্য মেলেনি]	—	—	—

শিক্ষার হারে যথেষ্ট তারতম্য নজরে পড়ার মতো। তবে সাক্ষরতায় এই জেলা পিছিয়ে নেই। পৌর অঞ্চলসহ সমগ্র হুগলি জেলা প্রয়োজনীয় পূর্ণ সাক্ষরতা অর্জনের স্বীকৃতি লাভ করেছে। ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বছরে জেলার পৌর সংস্থাগুলি যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করেছে সে সম্পর্কে তথ্যচিত্রটি সারণি ৫-এ দেওয়া হল। স্মরণ করা যেতে পারে যে শিক্ষাচর্চায় ও প্রসারে স্মরণযোগ্যকালে এই জেলার রামমোহন, বিদ্যাসাগর, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ (মাস্টার মশাই) প্রমুখের অবদানে অখণ্ড বাংলা বিশেষভাবে উদ্বোধিত।

সারণিটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে তারকেশ্বর এবং উত্তরপাড়া-কোতরং-এ কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয় সে এলাকার পৌর সংস্থার অধীনে নেই। পাঁচটি পৌর অঞ্চল, যথাক্রমে হুগলি-চুঁচুড়া, চাঁপদানী, বৈদ্যবাটি, রিষড়া ও কোন্নগর রাজ্য সরকারি অনুদান ছাড়াই পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিচালনায় আত্মনির্ভরশীল।

বৃহত্তর কলকাতার বাইরে অবস্থিত দুটি পৌরসভা আরামবাগ ও তারকেশ্বর 'পরিকল্পনা অনুদানে' যে টাকা পেয়েছে তার বিভিন্ন খাতে বণ্টন নিম্নরূপ (হাজার টাকা হিসাবে)।

ক্রমিক সংখ্যা	পুরসভা	উন্নয়নে নির্ণীত এলাকার পরিমাণ	খাটা পায়খানার স্যানেটারি পায়খানায় রূপান্তর	বস্তির পরিবেশ উন্নয়ন	IDSMT (হাজার টাকায়)	জল সরবরাহ	বিশেষ অনুদান	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
১।	আরামবাগ	২৪২	—	২২৮	৫০০	১০০	—	১০৭০
২।	তারকেশ্বর	১১৪	—	১১০	—	১০০	৫০০	৮২৪

সারণি-৫

হাজার টাকা হিসাবে

ক্রমিক সংখ্যা	পুরসভা	পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা	১৯৮৯-৯০-এ মোট শিক্ষার্থী	মোট শিক্ষক	মোট ব্যয় (হাজার টাকায়)	রাজ্য সরকারের অনুদান
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	বাঁশবেড়িয়া	৬	১১১৫	৩৬	৬১৬	২৬৮
২।	হুগলি-চুঁচুড়া	৫	৪৯৫	১৭	৪১৪	—
৩।	চন্দননগর মি. ক.	১৬	৭৭৭৩	২৭৭	৮২৭১	৬৯১৩
৪।	ভদ্রেশ্বর	৫	১৪৭২	৩৯	৮৭১	৪০২
৫।	চাঁপদানী	৩	—	৩২	৬৭	—
৬।	বৈদ্যবাটি	৮	—	৪৪	১০৫৯	—
৭।	শ্রীরামপুর	৪৩	৭৫৬১	২২৩	৩৬৫৪	৪৩৪৩
৮।	রিষড়া	৫	১৬৫৭	৩৮	৭০৬	—
৯।	কোন্নগর	৪	২৯০	১৩	২৮৮	—
১০।	আরামবাগ	২৩	৩৭৯৫	৯২	১৬৮৩	১৭৭৩

সারণি-৬

ক্র. সং.	পুরসভা	ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী মোট দৈর্ঘ্য	ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী গৃহ-সংযোগ সংখ্যা	খাটা পায়খানা পুরসভা পরিষেবিত	খাটা পায়খানা অন্যান্য	খাটা পায়খানা মোট	পয়ঃপ্রণালীযুক্ত পায়খানা সেপ্টিক ট্যাঙ্ক	পয়ঃপ্রণালীযুক্ত পায়খানা কুয়া পায়খানা	পয়ঃপ্রণালীযুক্ত পায়খানা ২-পিট পায়খানা	পয়ঃপ্রণালীযুক্ত পায়খানা অন্যান্য	পায়খানা-বিহীন মোট	পায়খানা-বিহীন হোল্ডিং
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
১।	বাঁশবেড়িয়া	—	—	২৪০	২৫০০	২৭৪০	১৯৬৪	৭৮৫	১৫০	২০৮৭	৪৯৮৬	১৮০৮
২।	হুগলি-চুঁচুড়া	—	—	৮০০	—	৮০০	১৪৬৫০	৫০০০	১৮৫০	৩০	২১৫৩০	৫০০০
৩।	চন্দননগর	—	—	১৪৩১	—	১৪৩১	১৪৭৪০	৮০৫	১৫১৭	২০৭	১৭২৬৯	১৫০৭
৪।	ভদ্রেশ্বর	—	—	—	—	—	৩৫০০	১২০০	১৫০০	৮০০	৭০০০	১১৪৩
৫।	চাঁপদানী	—	—	—	—	—	৪২৬১	—	৯৮৯	—	৫২৫০	২৩৯৯
৬।	বৈদ্যবাটি	—	—	১১৯০	—	১১৯০	৭০৪৫	—	—	—	৭০৪৫	৬৬৯৪
৭।	কোন্নগর	—	—	৩৫	—	৩৫	৫০০০	৪০০	৭৭৯	—	৬১৭৯	২৭৯১
৮।	উত্তরপাড়া-কোতরং	—	—	১৭	—	১৭	১১৬০০	৪০০	১৪৭৬	—	১৩৪৭৬	১২০৭
৯।	আরামবাগ	—	—	—	—	—	২৩২৪	—	১৭৩	—	২৪৯৭	—
১০।	তারকেশ্বর	—	—	—	৫৯	৫৯	৯৯০	১১০	২০৪	৭৫০	২০৫৪	১৪৪৯

অন্যান্য দশটি পুর এলাকায় খাটা পায়খানার অপসারণ (ILCS) কাজের ১৯৮৯-৯০ বছরের ছবি দেওয়া হল সারণি-৬-এ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত "নগরোন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ ১৮ বছর" পুস্তিকায় অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই লেখা হয়েছে : "বিংশ শতাব্দী শেষ হতে চলল, অথচ দেশে, বিশেষ করে পৌরাঞ্চলে খাটা পায়খানার অস্তিত্ব যেন একটি নির্মম প্রহসন। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে ৭০-এর দশকের শেষেই এই প্রথার অবসান ঘটাতে পৌরাঞ্চলে এই প্রকল্পের সূত্রপাত করে। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকারও এতে অংশগ্রহণ করেন। বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯৩ সালে 'এমপ্লয়মেন্ট অব ম্যানুয়েল স্ক্যাভেনজারস্ অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন অব ড্রাই ল্যাট্রিন (প্রোহিবিশন) আইন' নামে একটি আইন প্রণয়ন করে। দেশ থেকে খাটা পায়খানা উচ্ছেদ এবং মানুষের সাহায্যে মল সাফাই পদ্ধতির অবসানই এই আইনের লক্ষ্য। বামফ্রন্ট সরকারই সর্বপ্রথম এই আইনটির সমর্থনে রাজ্য বিধানসভায় প্রস্তাব গ্রহণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। অষ্টম পরিকল্পনার মধ্যে রাজ্যের সমগ্র পৌরাঞ্চল থেকে খাটা পায়খানা উচ্ছেদের প্রকল্পও রচনা করা হয়।" আশা করা যায় শ্রীরামপুর, রিষড়াসহ (যে দুটি পৌরসভার এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলি মুদ্রিত আকারে পাওয়া যায়নি) হুগলি জেলার সব কটি পৌরসভা এই প্রকল্পের দ্রুত রূপায়ণে সফল হবে এবং এ কারণে পরিবেশ দূষণ থেকে জেলার সমগ্র পৌরাঞ্চলকে মুক্ত করবে জনগণের সাগ্রহ সহযোগিতায় কারণ এই প্রকল্পে প্রতিটি সুবিধাভোগীকে নির্মাণ খরচের মাত্র ৫ শতাংশ বহন করতে হচ্ছে।

হুগলি জেলার পূর্বদিকের পৌরাঞ্চলের সর্বাংশ ভাগীরথী বা হুগলি নদী বিধৌত। নদী পরিবহণের সুযোগ থাকায় গড়ে ওঠে বিস্তৃত শিল্পাঞ্চল। বর্তমানে যে দ্রুত শিল্পায়নের কথা বলা হচ্ছে তার সঙ্গে পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার কথাও নানাভাবে ওঠে। নদীর নাব্যতা যেমন এখানে-ওখানে চর জেগে ওঠায় ক্ষতিগ্রস্ত তেমনই শেরশাহের আমলের গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডসহ অন্যান্য পাকা রাস্তাগুলি নানা কারণে পরিবহণে যথাযোগ্য হয়ে উঠতে পারছে না। জেলার পৌরাঞ্চলে পথ ও পয়ঃপ্রণালীর ১৯৮৯-৯০ বর্ষে যে অবস্থার কথা জানা গেছে তা অবগতির জন্য সারণি-৭-এ সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান পাকা রাস্তাগুলি কল-কারখানার সরঞ্জাম এবং উৎপন্ন দ্রব্য পরিবহণের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুপরিসর, সুরক্ষিত এমন দাবিও করা সম্ভবত যায় না।

পৌরব্যবস্থার অন্যতম প্রয়োজনীয় দিক হল পরিশ্রুত পানীয় জল প্রকল্প। জল সরবরাহের মাথাপিছু নির্ধারিত পরিমাণ হল ২০ গ্যালন। ১৯৮০-৯০-এর দশকটি আন্তর্জাতিক পানীয় জল দশক-রূপে উদ্‌যাপিত। নির্ধারিত লক্ষ্য অনুসারে পানীয় জল সরবরাহে পৃথিবীর প্রত্যন্ত কোণেরও স্বয়ম্ভর হয়ে ওঠার কথা। এই জেলার সম্পর্কে এ বিষয়ে যে শেষ মুদ্রিত পরিসংখ্যান পশ্চিমবঙ্গ সরকার গঠিত দ্বিতীয় মিউনিসিপ্যাল ফিনান্স কমিশন তাদের মার্চ, ১৯৯৩-এ প্রকাশিত রিপোর্টে দেখিয়েছে সেই অংশটুকু সারণি-৮-এ সাজিয়ে দেওয়া হল।

গভীর নলকূপের সংখ্যা ও গৃহে সংযোগের সংখ্যা বিচারে চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের স্থান জল সরবরাহে শীর্ষে; অন্যদিকে পাইপ লাইনের দৈর্ঘ্য বিচারে হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার স্থান শীর্ষে। নবগঠিত তারকেশ্বরের পৌরাঞ্চলে পাইপ লাইনের কাজ অনারব্ধ।

পৌরাঞ্চলের তথ্য প্রশাসনের প্রধান সমস্যাগুলিও জানা দরকার। প্রথমেই উল্লেখ্য যে প্রায় সব পৌর নগরই এই এলাকায় গড়ে উঠেছে পরিকল্পনা ছাড়া। দেশ বিভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু ভাগীরথী-তীরবর্তী এই পুর এলাকাগুলিতে এসে যত্র-তত্র বসতি স্থাপনে বাধ্য হয়েছেন। পরিণামে অপরিকল্পিত এই পৌরাঞ্চল বেড়ে

সারণি-৭

পয়ঃপ্রণালী (কি. মি. হিসাবে)

ক্রমিক সংখ্যা	পুরসভা	পথ (কিলোমিটার হিসাবে)											মোট	ভূগর্ভস্থ	মুক্ত পাকা	মুক্ত কাঁচা	মোট
		জাতীয় সড়ক	রাজ্য সড়ক	পাকা: মোটর যান যোগ্য	পাকা: মোটর যান অযোগ্য	পাকা: মোট	কাঁচা: মোটর যান যোগ্য	কাঁচা: মোটর যান অযোগ্য	কাঁচা: মোট	মোট মোটর যান যোগ্য	মোট মোটর যান অযোগ্য	মোট পৌর পথ					
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)
১।	বাঁশবেড়িয়া	—	২	৪০	—	৪০	—	৩৯	৩৯	৪০	৩৯	৭৯	৮১	৭	৬০	৫০	১১৭
২।	হুগলি-চুঁচুড়া	—	১০	২০	১৭০	১৯০	—	৬৫	৬৫	২০	২৩৫	২৫৫	২৬৫	২	১২৫	১৪৭	২৭৪
৩।	চন্দননগর মিউ. কর্পো	—	৪৫	৬৬	৪৪	১১০	৬	২৩	২৯	৭২	৬৭	১৩৯	১৮৪	৪	৫৭	১১৭	১৭৮
৪।	চাঁপদানী	৬	—	২৯	৯	৩৮	২০	২	২২	৪৯	১১	৬০	৬৬	—	৬৭	৩	৭০
৫।	বৈদ্যবাটি	১	৫	২৬	৬	৩২	২	৩৭	৩৯	২৮	৪৩	৭১	৭৭	—	২৭	৬৫	৯২
৬।	শ্রীরামপুর	—	৬	৩৫	—	৩৫	৮২	১৪	৯৬	১১৭	১৪	১৩১	১৩৭	১৭	৮৪	২৫	১২৬
৭।	রিষড়া	২	—	৫০	২৩	৭৩	—	২০	২০	৫০	৪৩	৯৩	৯৫	২	৮৭	৫	৯৪
৮।	কোন্নগর	৩	—	৭৯	০০	৭৯	১০	৬০	৭০	৮৯	৬০	১৪৯	১৫২	২	২৬	৫০	৭৮
৯।	উত্তরপাড়া-কোতরং	২	৪	৫৭	২৫	৮২	৩	১১	১৪	৬০	৩৬	৯৬	১০২	২	৫৬	৫২	১১০
১০।	আরামবাগ	—	৯	২৬	১২	৩৮	—	৫	৫	২৬	১৭	৪৩	৫২	০	৩	৩	৬
১১।	তারকেশ্বর	—	৩	২	৯	১১	১	৫	৬	৩	১৪	১৭	২০	—	—	৬	৬

(৩১.১২.৯০-এর হিসাব অনুসারে)

সারণি-৮

ক্রমিক সংখ্যা	পুরসভা	গভীর নলকূপের সংখ্যা	পাইপ লাইনের দৈর্ঘ্য (কি.মি. হিসাবে)	হাতে টানা নলকূপের সংখ্যা	গৃহে সংযোগের সংখ্যা	পাম্প চালকের সংখ্যা	পাম্প মিস্ত্রির সংখ্যা	সহকারীর সংখ্যা	মেকানিকের সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
১।	বাঁশবেড়িয়া	১৪	৮৯	১২৮	২১১২	১৩	৪	৪	৩
২।	হুগলি-চুঁচুড়া	২১	২০০	১৬	৯৬২৮	৪৩	৭	৪	২
৩।	চন্দননগর মিউ. কর্পোরেশন	২৫	৯০	৫২	১২৩০৫	৩৫	১২	১১	৩
৪।	ভদ্রেশ্বর	১২	২৮	১৫৯	১৯৪৩	১৫	—	৬	২
৫।	চাঁপদানী	১৯	৩৫	২৪১	১৮৭০	৩০	৩	৩	—
৬।	বৈদ্যবাটি	৭	৫৩	৩২৪	৫৫৪৩	১১	৩	৩	১
৭।	শ্রীরামপুর	১১	—	৬০০	৭৬৫০	৬	—	৩৬	১৫
৮।	রিষড়া	১৫	৩৪	৩১২	৫২৬৬	৩২	৮	২০	২
৯।	কোন্নগর	৮	৪০	৩৫০	৩০০০	১০	৯	৮	৭
১০।	উত্তরপাড়া-কোতরং	১০	৫০	৩১৭	৫৪৯৯	১৫	৫	২৩	৩
১১।	আরামবাগ	৪	২৫	৫৫৮	৪১০	—	—	৪	২
১২।	তারকেশ্বর	৩	—	—	—	—	—	৪	২

উঠেছে অপরিকল্পনীয়রূপে। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ১৯৭৯ সালে যে টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং অ্যাক্ট করা হল তাও গলদমুক্ত নয়। প্রশ্ন উঠছে : কার জমিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জমি ব্যবহারের মানচিত্র তৈরি হবে? ওই মানচিত্র অনুযায়ী জমি ব্যবহার করতে জমির মালিক বাধ্য কিনা বা তাকে বাধ্য করা যায় কি না? যে মুহূর্তে জমি পরিকল্পিত উপায়ে ব্যবহারের কথা উঠেছে সেই মুহূর্ত থেকেই জমি বিক্রি করার হিড়িক পড়েছে। বাসস্থানের কেনা-বেচা বা ভাড়ার মূল্য প্রচণ্ড বেড়েছে তাই মহানগরী কলকাতার লোক ক্রমশই চলে আসছে বৃহত্তর কলকাতার পৌরাঞ্চলগুলিতে। ফলে এসব অঞ্চলে জনসংখ্যা বাড়ছে হু-হু করে। সুযোগ নিচ্ছে জমির দালাল আর ফাটকাবাজেরা। জমির মালিক বা দালালেরা জমি যেন-তেনভাবে বিক্রি করেই খালাস। পরে রাস্তা-ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণের, জনস্বাস্থ্য রক্ষার সব দায়িত্বই গিয়ে পড়ে পৌর প্রশাসনের উপর। এই হিড়িকে ডাব্‌ল্ হোল্ডিং, জাল (ফিক্‌টিশাস্) হোল্ডিং ইত্যাদি প্রতারণামূলক লেন-দেন, বছরের পর বছর কর বকেয়া রেখে জমি কেনা-বেচা, চাষযোগ্য জমি বসতবাড়ির জন্য প্লট করে বিক্রি করা, নাম খারিজ না করে জমি হস্তান্তর, ঠাকুর-দেবতার নামে, নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের নামে অপরিমিত জমি কুক্ষিগত করে তা থেকে মুনাফা লোটা ইত্যাদির ফলে পৌর প্রশাসনে উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। অথচ সুপরিকল্পিত উপায়ে জমির ব্যবহারে পৌরপ্রচেষ্টায় আইনের সাহায্য মিলছে না। এ বিষয়ে পৌর প্রশাসনের সঙ্গে স্থানীয় সরকারি প্রশাসনের ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের সমন্বয় সাধনে নতুন ব্যবস্থা করা দরকার। পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন, ১৯৯৩-এ সময়োপযোগী কিছু পরিবর্তন যে কোনও সরকারেরই আধুনিকতা এবং জনগণমনস্কতার পরিচয়বাহী। এই নীতিতে আস্থাবান হয়েই প্রয়োজনীয় সংশোধন যেমন ইতিমধ্যেই করা হয়েছে, নতুন নতুন সংশোধনের প্রস্তাবও তেমনই বিবেচনাধীন রয়েছে। 'প্রশাসনের স্থবিরতা নয়, জঙ্গমতাই বামফ্রন্ট সরকারের উদ্দিষ্ট। স্থিতাবস্থা নয়, প্রগতিতেই তাদের আস্থা' আশা করা যায় উপরোক্ত অসহ অবস্থার অবসান ঘটবে অচিরে।

পরিচালনা-সংক্রান্ত আর্থিক সমস্যা নানা কারণে। এর মধ্যে বড় কারণ হল, পৌর কর অনাদায়ী থেকে যাচ্ছে বছরের পর বছর। পৌর সংস্থার বিরুদ্ধে নানা অজুহাতে আদালতে মামলা রুজু করা হচ্ছে। ২২৬ নং ধারায় কথায় কথায় ইন্‌জাংশন জারি হয়ে যাচ্ছে। আদালতে হাজিরা দেওয়াই পৌরসভার সব কাজ ফেলে একটা বড় কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বে-আইনি বাড়ি নির্মাণ বন্ধ করতে, সরকারি জমি (vested land) বেদখল বন্ধ করতে, পোড়ো বাড়ি ভাঙার অধিকার পৌরসভার এতদিন ছিল না যথেষ্ট আইনের অভাবে।

পৌর এলাকায় জল সরবরাহ ও আলোর জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজে উন্নতি সাধনের জন্য পৌরসভা ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের যৌথ দায়িত্ব আরও পরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট হওয়ার অপেক্ষা রাখে।

পুর কর নির্ধারণ ও সংগ্রহ পৌর সংস্থার মৌলিক দায়িত্ব। আগে প্যানেল অ্যাসেসর-এর মাধ্যমে যে অসঙ্গতিপূর্ণ ও দুর্নীতিগ্রস্ত পুর কর নির্ণয়ের ব্যবস্থা ছিল তার একটি উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর বিকল্প হিসেবে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যস্তরে কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন পর্ষদ (Central Valuation Board) গঠিত হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এই পর্ষদ-রচিত আইনের বেড়াজালে পড়ে পুরসভাগুলি পুর কর নির্ধারণের মৌলিক দায়িত্ব থেকে পুরোপুরি বিচ্যুত হচ্ছে।

কোনও একটি পুর-এলাকার সমস্যাগুলিকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা, চরিত্র, অভ্যাস, ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতির মান, তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সুবিধা ও অসুবিধাগুলি, অঞ্চলটির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিকগুলি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিচার-বিশ্লেষণ করার দায়িত্ব নিতে হবে। নির্দিষ্ট এলাকার লোকসংখ্যা গণনার রিপোর্ট, জরিপ রিপোর্ট, ভূমি-ব্যবস্থাসহ শিল্প-বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যকলাপের সামগ্রিক ছবিটি পরিকল্পনা-রচয়িতার সামনে যদি পরিষ্কাররূপে না থাকে তবে পরিকল্পনা রচনা সার্থক হতে পারে না। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী, মুখ্য ও গৌণ সমস্যাগুলি সুনির্দিষ্ট করে গুরুত্ব অনুসারে সিদ্ধান্ত ও সেইমতো উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণেই একটি পৌরসভা সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে এবং তার ফলে জনসাধারণ ও নাগরিক করদাতাদের আস্থাভাজন হতে পারে।

রাজ্যের বর্তমান সরকার নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন, ফিনান্স কমিশনের রিপোর্ট অনেকটা কার্যকরী হয়েছে, সরকারের কাছে পুর প্রতিষ্ঠানগুলির ঋণবাবদ যে টাকা দেয় ছিল তা সম্পূর্ণ মকুব করে দেওয়া হয়েছে, ঘাটতি পূরণ করার জন্য যথাযথ টাকা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রিভাইজ্‌ড্ গ্র্যান্ট স্ট্রাকচার অনুসারে (RGS) চুঙ্গি কর, মোটরযান কর, প্রমোদ করের থেকে আংশিক বরাদ্দের ব্যবস্থা হয়েছে। ক্যালকাটা আরবান ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (CUDP) এবং ইনটিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট অব স্মল অ্যান্ড মিডিয়ম টাউনস্ (IDSMT) প্রভৃতি পরিকল্পনা অনুসারে সরকারি ও অন্যান্য অনুদানে পুরসভাগুলির আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটেছে। সুতরাং শুধু আর্থিক অনটনের জন্য পরিচালনা সফল হচ্ছে না—এ কথা বলা যায় কিনা বিবেচ্য। প্রকৃতপক্ষে পৌর প্রতিনিধিদের দায়িত্ব বেড়েছে; দায়বদ্ধতা আরও নিবিড় হওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। সমাজবিজ্ঞানে সচেতন থেকে পৌর প্রতিনিধিদের পুরসভার আয় ও ব্যয়ের সমতা ঠিক রেখে, নির্দিষ্ট খাতে যুক্তিসম্মত অর্থ খরচ করে উন্নয়নের পথ সুগম করতে হবে। সহানুভূতি নিয়ে করদাতাদের কাছে পৌঁছতে হবে। না হলে বামফ্রন্ট সরকার গত ১৮ বছরে নগরোন্নয়নে ও 'পৌরীকরণে' যে দ্রুততর হারে অগ্রগতি অর্জন করেছে সেই গতি ব্যাহত হবে।

বর্তমান মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং পৌরসভাগুলির সীমানা প্রসারণও বামফ্রন্ট সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি। এভাবেই প্রসারিত হয়েছে কলকাতা, হাওড়া, শিলিগুড়ি ও আসানসোলসহ চন্দননগর পৌরনিগমের পরিসীমা। এই পরিসীমা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জনগণের দাবি এবং নগর বৃদ্ধির পরিসংখ্যানকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। হুগলি জেলার আরও অনেক নগরাঞ্চল যেমন নবগ্রাম, সিঙ্গুর, পাণ্ডুয়া পৌর পরিষেবা পৌঁছে দেবার জন্য পৌরীকরণ একটি অপরিহার্য শর্ত। তবে পৌরীকরণের ক্ষেত্রে যে আর্থিক দায়-দায়িত্ব থাকে তা এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের নিজস্ব

ব্যাপার। ৭৪তম সংবিধান সংশোধন করেও এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের হাত প্রসারিত হয়নি।

নিয়মিত নির্বাচন গণতন্ত্রের প্রাণ। নির্বাচন ছাড়া স্বায়ত্তশাসন নিরর্থক। ১৯৭৭-এর পর থেকেই এ বিষয়ে বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগ সর্বভারতীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। পৌর নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে প্রথমে নির্বাচনের নিম্নতম বয়স ২১ থেকে কমিয়ে ১৮ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সত্তরের দশকের শেষে। পরবর্তীকালে সর্বভারতীয় নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন এই বয়সটিকেই "নির্বাচকের ন্যূনতম বয়স" রূপে গ্রহণ করেন। ওই কমিশন এভাবেই বলা যায় "বামফ্রন্ট সরকারের গণতান্ত্রিক দূরদৃষ্টি এবং অগ্রণী ভূমিকাকেই পরোক্ষ অভিবাদন জানিয়েছেন।" ১৯৯৫ সালের মে থেকে জুলাই পর্যন্ত হুগলি জেলার ১২টি পৌর সংস্থাসহ সারা পশ্চিমবাংলার পুর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর ফলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াই শক্তিশালী হয়েছে।

ভারত সরকারের ৭৪তম সংবিধান সংশোধনের সর্বভারতীয় পৌর প্রশাসনে সমগ্র দেশের পৌরসংস্থার দীর্ঘকালের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি পূর্ণ হয়েছে। "একটি সর্বভারতীয় মডেলও" উপস্থাপিত হল। এই সংশোধনে "যেসব পৌরসংস্থায় জনসংখ্যা তিন লক্ষ বা তার বেশি, সেখানে প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে ওয়ার্ড কমিটি গঠনের কথা" বলা হয়েছে। হুগলি জেলার পুর সভাগুলিতেও প্রযোজ্য এই নির্দেশের গণতান্ত্রিক ঝোঁকটি সুস্পষ্ট।......বরো কমিটির সহায়করূপে এই কমিটিগুলি কেবলমাত্র পৌরসভার সঙ্গে প্রত্যক্ষ গণসংযোগই রক্ষা করবে না, সেই সঙ্গে তৃণমূলস্তরে উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা ও তা রূপায়ণে সহায়তা ছাড়াও প্রকৃত অর্থেই অণু পৌরসভার ভূমিকাও পালন করবে অনধিক ১৪ জন নিয়ে গঠিত এই কমিটি।

৭৪তম সংবিধান সংশোধন অনুসারে ১৯৯৪ সালে যে নতুন রাজ্য অর্থ কমিশন গঠিত হয়েছে তা আশা করা যায় হুগলি জেলার পৌর সংস্থাগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য সমানভাবে অর্থ আবন্টনের ব্যবস্থা নেবেন। ১৯৯৪-৯৫ সালে হুগলি জেলার সি এম ডি এ এলাকাভুক্ত পৌরাঞ্চলে মাথাপিছু উন্নয়ন ব্যয় ছিল ৭৬ টাকা আর সি এম ডি এ এলাকা বহির্ভূত পৌরাঞ্চলে ছিল ৫৮ টাকা। "১৯৯৫-৯৬ সালে এই অঙ্ক যথাক্রমে ১১২ টাকা ও ১০১ টাকায় উন্নীত করার প্রয়াস চলছে।" শহরভুক্ত পৌরাঞ্চলে কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ উদ্যোগে যে NRY প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে তার চারটি অংশ যথাক্রমে স্বনিযুক্তি (SUWE), কর্মসংস্থান (SWME), বাসগৃহ সংস্কার (SHASU), এবং প্রশিক্ষণ হুগলি জেলার পৌর সংস্থাগুলিতে সক্রিয় রয়েছে। এ ছাড়া দরিদ্রদের জন্য মৌল নগর পরিষেবা (UBSP), আশির দশক থেকে রাজ্য পরিকল্পনা বাজেটে "পৌরাঞ্চলের সাধারণ উন্নয়নের জন্য অনুদান" দিয়ে হুগলি জেলার পৌরাঞ্চলেও বহু উল্লেখযোগ্য সম্পদ নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। L.I.C ও HUDCO-র ঋণ এবং রাজ্য সরকারের অনুদান নিয়ে পানীয় জলের জন্য নলকূপ, কুয়া ইত্যাদি নির্মাণ বা মেরামতের জন্য যে পরিকল্পনা সারা পশ্চিমবাংলার জন্য রচিত তার কাজ এই জেলাতেও চলেছে। HUDCO-র ঋণে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের জন্য ফ্ল্যাট বাড়ি নির্মাণ করে স্বল্পমূল্যে বিক্রির জন্যও হুগলি জেলার পুরসভা উদ্যোগী। এ রকম একটি প্রকল্প তারকেশ্বর পৌরাঞ্চলে সমাপ্তপ্রায়।

সি এম ডি এ এলাকাভুক্ত পৌরাঞ্চলে CUDP বা সম্প্রতি গৃহীত 'মেগাসিটি' প্রকল্পে কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থের পরিকল্পিত আধুনিক ব্যবস্থাপনার জন্য নানা ব্যবস্থা ইতিপূর্বে সংগঠিত এবং ওই এলাকা বহির্ভূত পৌরাঞ্চলের জন্যও অনুরূপ একটি পরিকল্পনার খসড়া রচিত হয়েছে। জলনিকাশি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য জি টি রোড ও চন্দননগরের বিভিন্ন স্থানে গুচ্ছ প্রকল্পের মাধ্যমে জলজমা নিয়ন্ত্রিত করা গেছে। CUDP, MDP, GAP IPP VIII প্রভৃতি প্রকল্পের কাজও হুগলি জেলার পৌরাঞ্চলে কাজ করে চলেছে। কলকাতা সন্নিহিত হুগলি জেলার সি এম ডি এলাকাভুক্ত ও এলাকা বহির্ভূত পৌরাঞ্চলে "মেগাসিটি" প্রকল্পের কাজে প্রথম পর্যায়ে একাধিক জল সরবরাহ প্রকল্প, পয়ঃপ্রণালী ও জলনিকাশি প্রকল্প, পথ ও পরিবহণ, কঠিন বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনা এবং এম ডি পি প্রকল্পের কাজ চলেছে। আগামী শতকের প্রয়োজনকে মাথায় রেখেই এই প্রকল্পের রূপরেখা অঙ্কিত।"

শ্রীরামপুর গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডে পূর্ব রেলপথ অতিক্রমী উড়াল পুল এবং বাঁশবেড়িয়া-কল্যাণীর সংযোজক ভাগীরথীবক্ষে "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত" সেতু উল্লেখযোগ্য নির্মাণ। এ ছাড়া বিভিন্ন পৌরাঞ্চলে বহুসংখ্যক নতুন রাস্তা, বাস টার্মিনাল ও বর্তমান রাস্তার সংস্কারও প্রসারণের কাজ হচ্ছে বা হয়ে গেছে।

বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগেই সি ইউ ডি পি ২য় ও ৩য় পর্যায়ে স্বাস্থ্য প্রকল্প রচনায় (ক) "প্রতিটি বস্তিবাসীর ঘরের দরজায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া; (খ) পৌরসভা এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে প্রকল্প-রূপায়ণে অন্তর্ভুক্ত করা; (গ) প্রকল্প রূপায়ণে স্থানীয় সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার। (ঘ) স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করে ২০০০ সালে 'সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য'—এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছনো; এবং (ঙ) সুষ্ঠু পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে উপযুক্ত পরিকাঠামো নির্মাণ" বিষয়গুলি অগ্রাধিকার পেয়েছে।

সপ্তম পরিকল্পনায় গৃহীত গঙ্গাদূষণ রোধের কর্মসূচি অনুসারে (১) সুয়েজ ইন্টারসেপসান ও ডাইভারসান। (২) সুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট; (৩) বৈদ্যুতিক চুল্লি। (৪) স্বল্পমূল্যের শৌচালয়; (৫) নদী-পাড় সংস্কার ও উন্নয়ন এবং বিবিধ সংশ্লিষ্ট কাজের সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশানুসারে 'এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট' বসানোর কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে চলেছে।

"উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ল্যান্ড ইউজ ম্যাপ ও আউটলাইন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানের খসড়া ইতিমধ্যেই প্রকাশিত।" হুগলি-চুঁচুড়ার জন্য এই প্ল্যান চূড়ান্তকরণের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

"নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নতুন বিকেন্দ্রীকরণ পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে" যে কাজ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শুরু হয়েছে তার লক্ষ্য হল প্রধানত (ক) স্থানীয় মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রকল্পগুলিকে বাস্তবমুখী করে তোলা; (খ) প্রকল্পগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা; (গ) কতকগুলি প্রকল্প, যেমন : জলনিকাশি, আবর্জনা পরিষ্কার, পাইকারি বাজার গঠন ইত্যাদির ফল আরও ভালোভাবে পাওয়ার জন্য একাধিক পৌরসভার সংযুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকল্প

রচনা; (ঘ) শহরের মোট বরাদ্দ যান্ত্রিকভাবে বিভিন্ন ওয়ার্ডের ভেতর ক্ষতিকর সমান ভাগাভাগি না করে পুর এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের সুস্পষ্ট ছবিটি পুর পরিচালকদের সামনে থাকা দরকার। এই জন্য সংশ্লিষ্ট পৌরসভা, সি এম ডি এ-র প্রতিনিধিরা এবং রাজ্যস্তরের অন্যান্য সম্পর্কিত দপ্তরের প্রতিনিধিরা এই জেলাতেও একত্র আলোচনা করে নানা ধরনের সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছেন। প্রকল্পগুলির রচনা ও তার হিসাব-নিকাশ পৌরসভার প্রযুক্তিবিদেরা করে থাকেন। প্রয়োজনে এ সব ব্যাপারে সি এম ডি এ-র প্রযুক্তিবিদেরা সাহায্য করে থাকেন। অষ্টম পরিকল্পনার কাজ যখন শুরু হয় তখন "প্রতি শহরের জন্য বরাদ্দ কতটা হয়েছে তা জানিয়ে দেওয়া" হয়; তার ভিত্তিতে "বিভিন্ন প্রকল্পে পৌরবোর্ডের আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত পরিকল্পনার কাজ চলছে।"

পৌর উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়নে সহায়তার জন্য সি এম ডি এ-র পাঁচটি বিভাগীয় দপ্তর আছে। "জেড সি এম সি-৫" দপ্তরটি বাঁশবেড়িয়া, হুগলি-চুঁচুড়া, চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর, চাঁপদানী, বৈদ্যবাটি, শ্রীরামপুর ও রিষড়া পৌরসভাগুলিকে উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণে সহায়তা করছে। এ ছাড়াও "পৌর প্রশাসনকে মদত দেবার জন্য 'ডাইরেক্টরেট অব লোকাল বডিজ' প্রতিষ্ঠা, প্রতিটি পৌরসভায় এই জেলায় সরকারি খরচে ১৯৮০ সাল থেকে চারজন অফিসার— এগজিকিউটিভ অফিসার, ফিনান্স অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার এবং হেলথ্ অফিসার নিয়োগের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকারের প্রচেষ্টার ফল। এগুলি ছাড়াও বর্তমান শতকের সত্তরের দশক থেকে পুরব্যবস্থাপনায় প্রশাসনে নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনায় যে যুগান্তর ঘটতে চলেছে সংক্ষেপে তার দিক নির্দেশ করছে :

(১) সি ইউ ডি পি-৩ প্রকল্পে, কলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকায় পুরসভাগুলির জন্য 'মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম' রূপায়ণের জন্য টাকা বরাদ্দ (১৯৮৩-৮৪) এবং পৌরসভা বিশেষকে তার বরাদ্দের সীমার মধ্যে পরিকল্পনা রচনা ও তার রূপায়ণ করা পূর্ণ স্বাধীনতা দান। অন্যান্য পুর এলাকার জন্যও অনুরূপ পরিকল্পনা খাতে শর্তবিহীনভাবে অনুদান দেওয়া শুরু।

(২) পৌর প্রশাসনে সম্পূর্ণ নতুন আইন তৈরি করে ১৯৮০ সাল থেকে আমলাতন্ত্রকে বিদায় দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রথাকে দৃঢ়ভাবে কায়েম করা।

(৩) ১৯৩২ সালের আইন বাতিল করে ১৯৯৩ সালের নতুন আইনের মাধ্যমে মেয়র-ইন-কাউন্সিল-এর অনুরূপ চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিল প্রথা স্থাপন।

(৪) ১৪ বছরের মধ্যে তিনটি (১৯৮০, ১৯৯০ ও ১৯৯৪) পৌর অর্থ কমিশন নিয়োগ।

(৫) রাজ্যে সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে পৌরকর্মীদের কল্যাণে বেতন-কাঠামোতে সমতা এবং মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির হারেও সমতা বিধান। এর ফলে পৌর অর্থ ভাণ্ডারের ওপর সৃষ্ট অতিরিক্ত চাপ লাঘব করার জন্য মহার্ঘভাতার শতকরা আশি ভাগ বামফ্রন্ট রাজ্য সরকার কর্তৃক বহন। এ ছাড়াও পৌর কর্মীদের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও পেনসনও চালু করা হয়েছে।

(৬) বিকেন্দ্রীকরণ ও গণতন্ত্রীকরণের নীতি অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গেই পৌর প্রশাসনের সাহায্যের জন্য কয়েকটি বিশেষ সংস্থা গঠন। এ ব্যাপারেও বামফ্রন্ট সরকার হুগলি জেলাসহ অন্যান্য পুর এলাকায় সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

বর্তমান পরিবর্তনমুখী আর্থিক পরিবেশে পুরসভাগুলির দায়িত্ব বহুগুণ বেড়ে চলেছে। সারা দেশে এবং রাজ্যে শিল্প ও বাণিজ্য বিস্তারের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাকে কার্যকরী করে তোলার জন্য পুর পরিকাঠামো ও পৌর পরিষেবার মানের ক্রমিক উন্নয়ন ও বিস্তারের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত। অপরদিকে বেকার বা আধা বেকারের সংখ্যা জনসংখ্যার মতোই দ্রুতহারে বাড়বার সম্ভাবনা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর। গরিব পুরবাসীর সংখ্যা বাড়বে দ্রুততর হারে। ফলে বাড়বে জেলাগুলিসহ হুগলি জেলার পৌরসংস্থাগুলির দায়িত্ব। প্রয়োজনীয় পরিষেবার সঙ্গে স্বনিযুক্তির সুযোগ বৃদ্ধির জন্য বহুমুখী প্রকল্প রচনা ও রূপায়ণে অব্যর্থ হতে হবে।

উন্নয়নের স্তর পরিমাপ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। একটি সমগ্র "দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির মূল্যায়ন মাথাপিছু জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির হারের মাধ্যমে করার পদ্ধতির ব্যর্থতা এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। এই মূল্যায়নের একমাত্র মাধ্যম বিভিন্ন সামাজিক নির্দেশিকা (Indicators), যেমন : (১) সাক্ষরতার হার, (২) মা ও শিশুর স্বাস্থ্য; (৩) গরিব মানুষের বাসস্থানের মান, (৪) গরিব পুরবাসীদের জন্য পানীয় জল, পয়ঃপ্রণালী ও শৌচালয় ব্যবস্থাগুলির মান ইত্যাদি। 'ইন্টিগ্রেটেড লো কস্ট স্যানিটেশন', 'বস্তি উন্নয়ন', মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান, স্বনিযুক্তি কর্মসূচি, গরিব পুরবাসীদের বাসস্থানের এবং পৌর অন্যান্য পরিষেবার মান উন্নয়নে প্রকল্পগুলি দারিদ্র্য কমানোর জন্য রূপায়িত হচ্ছে। সি ইউ ডি পি ৩-এর সময়ে পরিকল্পিত সমষ্টিভিত্তিক স্বাস্থ্য প্রকল্প এখন চলেছে এগিয়ে। এর পরিপূরক প্রকল্প হিসেবে এসেছে বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় 'ইণ্ডিয়া পপুলেশন প্রজেক্ট-৮'। পুর অঞ্চলের পরিকাঠামো উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বৃহত্তর কলকাতার জন্য 'মেগাসিটি' পরিকল্পনার কাজ যেমন হাতে নেওয়া হয়েছে তেমনই বৃহত্তর কলকাতার বাইরের পৌর এলাকাগুলির জন্যও রচনা করা হয়েছে 'পারস্পেক্টিভ প্ল্যান'-এর। এই প্ল্যানটি পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন লাভে অচিরে কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায়।

বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, "১৯৭৭ সাল থেকে বামফ্রন্ট সরকার পৌর আইনভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবার উদ্দেশ্যে পৌরসভার হাত শক্ত করার চেষ্টা করেছেন। বে-আইনি নির্মাণ (কনস্ট্রাকশন) ও এই ব্যাপারে পৌর আইন লঙ্ঘন করার প্রবণতা, এক শ্রেণীর মুনাফাখোরদের মধ্যে ব্যাপকতর হয়ে উঠছে। এই সামাজিক অপরাধ রোধ করার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার পৌরসভাকে আইনের মাধ্যমে 'ক্যুয়াসি জুডিসিয়াল' ক্ষমতা প্রদান করেছে যাতে পৌরসভা এই অপরাধ ঘটলেই বা ঘটবার ইঙ্গিত পেলেই অনতিবিলম্বে তা রোধ করার ব্যবস্থা করতে পারে।"

এ কথাও উল্লেখ করার দরকার যে সমকালীন কিংবা একেবারে সাম্প্রতিক পৌর কার্যক্রমের অর্জিত অগ্রগতির আলোচনা বা বিশ্লেষণমূলক রচনা যত বেশি পরিমাণে সাধিত হয় ততই অগ্রগতির ধারা শক্তিশালী, অব্যাহত ও সুনিশ্চিত হতে পারে। এ কারণে পরিকল্পনা ও তার আধুনিকতম পরিসংখ্যানগুলি পরিবেশনের বা প্রকাশনার অত্যাধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন যতো দ্রুত সম্ভব করা দরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত Report of the second Municipal Finance Commission (March 1993)-এর পৃষ্ঠা ১০-এ এ বিষয়ে সঠিকভাবেই বলা হয়েছে : "Before setting up the next Municipal Finance Commission, the State Government may take advance action so that when constituted, the commission readily gets to know the true financial situation in each ULB and thus does not have to spend most of its time simply on data collection exercise."

তাই কমিশনের রিপোর্ট অপেক্ষা বামফ্রন্ট সরকার দ্বারা প্রকাশিত শ্বেতপত্রগুলি এবং ILGUS-এর বার্ষিক সঙ্কলন এই জাতীয় কাজে অনেক নির্ভরযোগ্য এবং গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে। সময়োচিত প্রতিবেদনের অনিচ্ছাকৃত অভাব ওই রিপোর্টে দেখা দেয়।

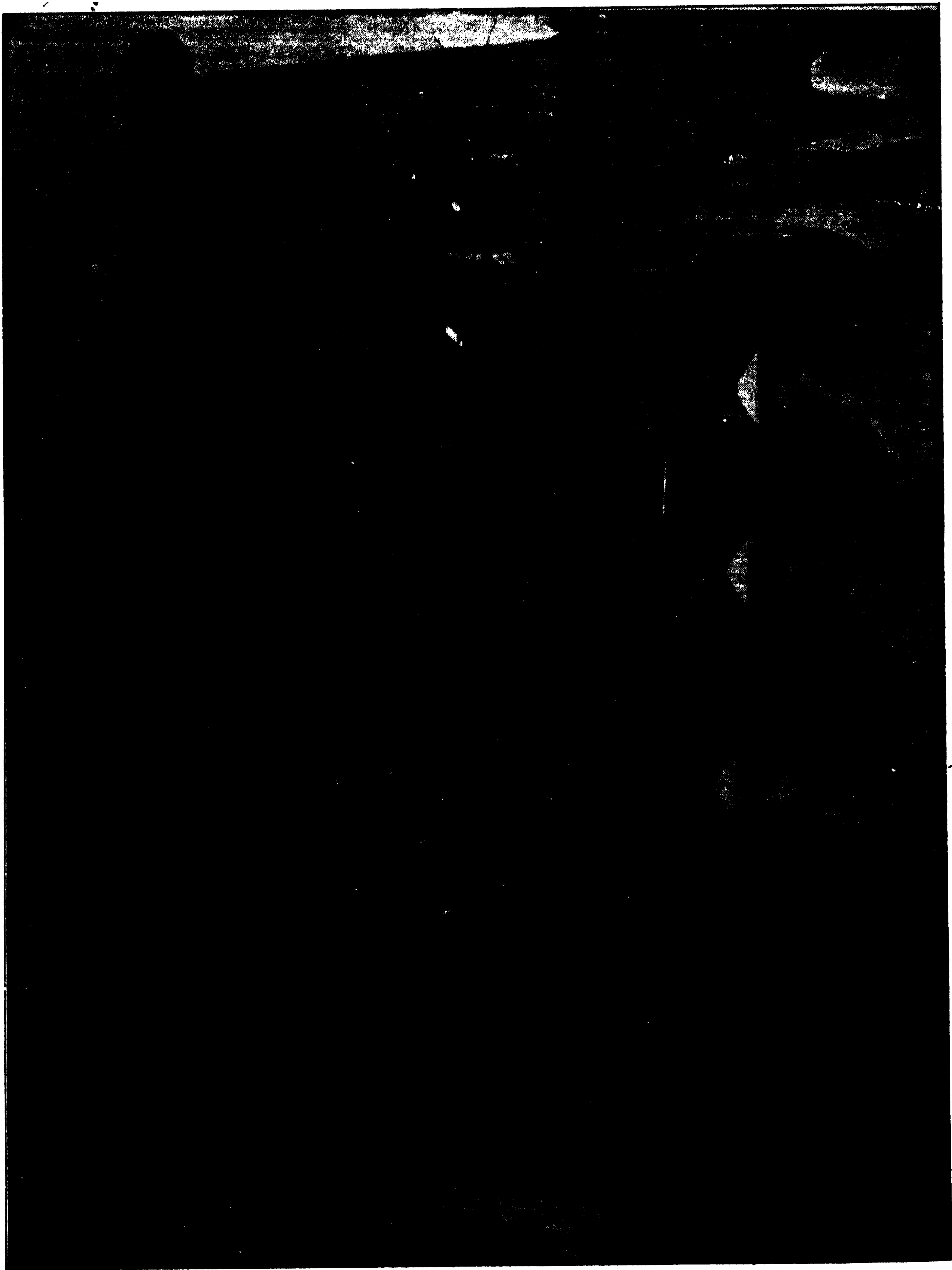
আইনের সুযোগ-সুবিধা, অনুদান ও করের পরিমাণ বাড়ালেই পুরপ্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতি ঘটবে না। অনাদৃত অবহেলিত পৌর অঞ্চলগুলির সার্বিক উন্নয়ন বাস্তবায়িত করার জন্য সরকারি বহুমুখী প্রচেষ্টার সঙ্গে হুগলি জেলার পুর সংস্থাগুলির ঐকান্তিক সহযোগিতা অপরিহার্য। উন্নয়নমূলক কাজগুলির সফল রূপায়ণে পুরকর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন যে যথাযথভাবে করা দরকার—এ কথার উল্লেখ বোধ করি অনাবশ্যক। কেবলমাত্র তাঁদের আন্তরিক পরিশ্রমী সহযোগিতায় পুর শাসন ব্যবস্থার যুগান্তর ঘটতে পারে।

পশ্চিমবাংলায় পুর প্রশাসন সম্পর্কে এক সামগ্রিক বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যা বোধ করি ভারতের অন্যত্র নেই। পৌর প্রশাসনে ৭৪তম সংবিধান সংশোধন আইনের প্রতিফলনে পশ্চিমবাংলা অন্যান্য রাজ্যের পথপ্রদর্শক হতে পারে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং পুরসভাকে আত্মস্তর করে তোলার জন্য যথাযথ অধিকার দান এই দৃষ্টিভঙ্গির মূল কথা। ইতিহাসের ধারায় লব্ধ এই অধিকার হুগলি জেলার পুরবাসীদেরই সদাসচেতন থেকে রক্ষা করতে হবে। হুগলি জেলাতে শিক্ষার, সভ্যতার ও সংস্কৃতির অনেক কিছুরই সারা ভারতের মধ্যে প্রথম উন্মেষ ঘটেছে। সেই ঐতিহ্য বহন করে অখণ্ড বঙ্গে পৌর প্রশাসন প্রবর্তনায় প্রথম সারিতে আছে এই জেলা। তাই আশা করা যায় যে যুগান্তকারী প্রগতিশীল চেতনায় সমৃদ্ধ বর্তমান পৌর ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক গড়ে তুলে এই জেলার পুরবাসীবৃন্দ, পৌরকর্মী ও পুর প্রতিনিধিমণ্ডলী সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এমন একটি বলিষ্ঠ, সুস্থ পৌর-সংস্কৃতি পরিচালনা করবেন—যা শুধু পশ্চিমবাংলার নয়, ভারতের অন্যান্য রাজ্যের পৌর ব্যবস্থায় অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

তথ্যসূত্র :

১। ১৯৯৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ/সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫/ইনস্টিটিউট অফ লোকাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড আর্বান স্টাডিস/পৌর-বিষয়ক বিভাগ/পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

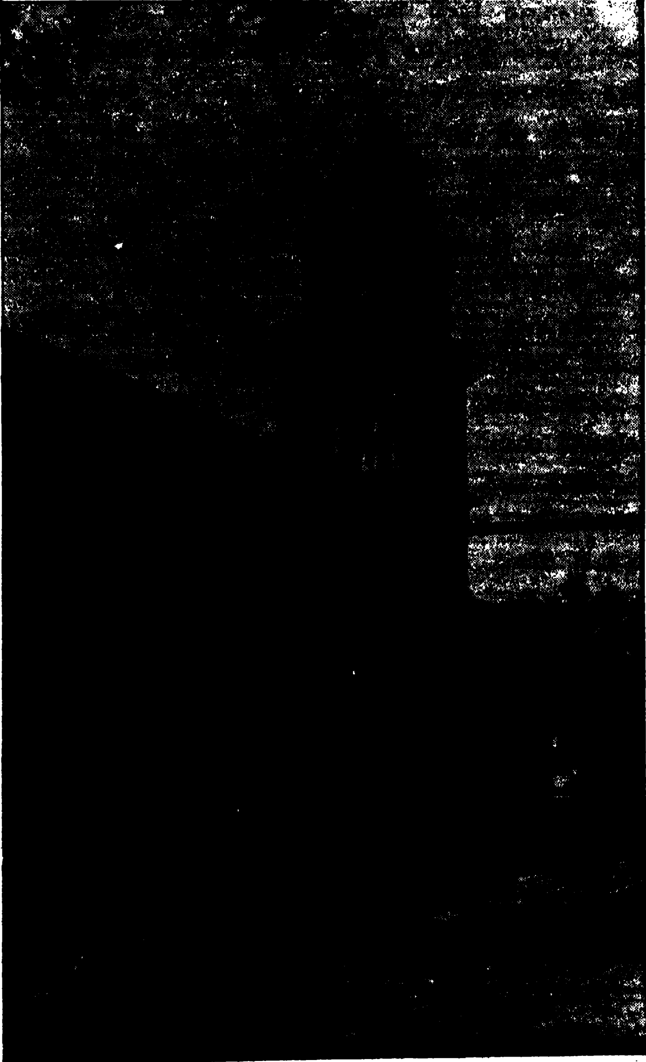
২। নগরোন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ/১৮ বছর/পশ্চিমবঙ্গ সরকার।



মনীষার শ্রীক্ষেত্র হুগলি জেলা ও গ্রন্থপঞ্জি

অসিতাভ দাশ

আর্মেনিয় গির্জা ছবি শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়



বিদ্বজ্জনেরা হুগলি জেলাকে 'মনীষার শ্রীক্ষেত্র' বলে অভিহিত করেছেন। কারণ, অবিভক্ত বঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে এর চেয়ে উন্নত আর কোনও জেলা ছিল না। সর্বপ্রথম ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এই জেলার অধিবাসীগণ উনবিংশ শতাব্দী থেকে বঙ্গদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পথপ্রদর্শক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, কুসংস্কার-বিরোধী আন্দোলন প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাপারেও হুগলি জেলার অধিবাসীরা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দ বঙ্গদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতের ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় বছর। এই বছরেই হুগলি জেলাতে প্রথম সঞ্চালনযোগ্য বাংলা মুদ্রাক্ষরের জন্ম হয়। জনৈক জন এন্ড্রুসের মালিকানাধীন হুগলিস্থিত ছাপাখানা থেকে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড রচিত 'A Grammar of the Bengal Language' গ্রন্থে সর্বপ্রথম ওই সঞ্চালনযোগ্য বাংলা হরফ ব্যবহার করা হয়। সেদিন অনেকেরই অজানা ছিল যে, হুগলির ওই ছাপাখানার মধ্য দিয়ে বাংলা মুদ্রণের জগতে কতবড় সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটেছিল, যার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের সামনে উন্মোচিত হয়েছিল বঙ্গ সংস্কৃতির এক নতুন দিগন্ত। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলা সাহিত্য ও মুদ্রণের ইতিহাসে যে নতুন যুগের সূচনা ঘটেছিল, তার পথিকৃৎ ছিল এই হুগলি জেলা।

বাংলা মুদ্রণের এই যুগান্তকারী ঘটনা যাঁদের জন্য সম্ভব হয়েছিল তাঁরা হলেন নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড, চার্লস উইলকিন্স, পঞ্চানন কর্মকার, হুগলির ছাপাখানার মালিক জন এন্ড্রুস এবং সর্বোপরি তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, হালহেডের ব্যাকরণটি ছাপা হয়েছিল হুগলির জন এন্ড্রুসের ছাপাখানায়। এই বইটি প্রমাণ করে এর সাজ-সরঞ্জাম ও মুদ্রণ কুশলতা যথেষ্ট উন্নত ছিল। যদিও পরবর্তী পর্যায়ে এই ছাপাখানার আর কোনও ছাপার নিদর্শন গবেষকরা সন্ধান পাননি। এর পূর্বে ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম বোলটসের উদ্যোগে কলকাতায় প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা ও সংবাদপত্র প্রকাশনের চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। হুগলির ছাপাখানাটিই প্রথম। এইটিই ছিল অবিভক্ত বঙ্গের বা বাংলার প্রথম ছাপাখানা।

হালহেডের আটপেজী বাংলা ব্যাকরণের মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৯ + ২১৬। এটি মূলত ইংরেজিতে রচিত হলেও সারা বইয়ের বিভিন্ন অংশে যেসব মূল বাংলা উদ্ধৃত ছাপা রয়েছে, সেগুলিকে একত্র করলে বইটির প্রায় এক-চতুর্থাংশ ভরে যাবে। প্রয়োজনের তাগিদে বইটি প্রকাশিত হলেও বাংলা ভাষার প্রতি হালহেডের ঐকান্তিক অনুরাগ ও প্রকাশিত সাধনার ফল এই গ্রন্থটি। অল্প সময়ের মধ্যে এর সমুদয় খণ্ড শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বইটির কোনও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ হয়নি।

এই প্রথম মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থটি কলিকাতায় অবস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, শ্রীরামপুর কলেজ প্রভৃতি গ্রন্থাগারে সযত্নে রাখা আছে।

বাংলা হরফ তৈরি ও ছাপার কাজ পুরোপুরি হুগলিতে হয়েছিল। তবে এর জন্যে প্রয়োজনীয় কাগজ বিলেত থেকে আমদানি করা হয়েছিল। আনন্দের কথা যে, আধুনিক বাংলা মুদ্রণ প্রবর্তনের ত্রয়ী—উইলকিন্স, হালহেড ও পঞ্চানন কর্মকারের যোগাযোগ ঘটেছিল হুগলির মাটিতে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরির সূত্রে উইলকিন্স ও হালহেড উভয়েই তখন হুগলিতে বসবাস করছেন এবং তারই অদূরে হুগলি জেলার বর্ধিষ্ণু স্থান বাঁশবেড়িয়া থেকে সন্ধান করে নিয়ে আসা হয়েছিল পঞ্চানন কর্মকারকে। প্রথমোক্ত দুজনের প্রাচ্য ভাষার প্রতি অনুরাগ ও সৃষ্টির সংকল্প এবং শেষোক্ত ব্যক্তির শিল্পীমনের রূপায়ণ—এই ত্রিবেণী সঙ্গমের ফলেই উন্মোচিত হয়েছিল বাংলা মুদ্রণের ঐতিহাসিক প্রারম্ভ এবং তার বাস্তব রূপ পাওয়া সম্ভব হয়েছিল ওই একই স্থানে জন এন্ড্রুসের ছাপাখানার প্রতিষ্ঠার ফলে। এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই, হালহেডের ব্যাকরণ রচিত ও মুদ্রিত হয়েছিল প্রয়োজনের তাগিদে, কিন্তু এটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে, হুগলির মাটিতে এঁদের শুভ যোগাযোগ ও একত্র সমাবেশ না ঘটলে বাংলা মুদ্রণ এবং প্রকাশনার অভিষেক এত ত্বরান্বিত হত কিনা সন্দেহ।

হুগলি জেলায় অবস্থিত ত্রিবেণীর নিকটবর্তী বাঁশবেড়িয়ায় বাস করতেন পঞ্চানন কর্মকার। পঞ্চাননের 'মল্লিক' উপাধিধারী পূর্বপুরুষরা বৃত্তিতে ছিলেন লিপিকর। তাম্রপট অথবা অস্ত্রশস্ত্র অলঙ্করণ অথবা নামাঙ্কন প্রভৃতি কাজে এঁরা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। পরবর্তী যুগে এঁরা পরিচিত হন কর্মকাররূপে। পঞ্চাননের কর্মজীবন তিন পর্বে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্ব রচিত হয়েছিল হুগলিতে উইলকিন্স-পঞ্চানন সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে। দ্বিতীয় পর্বের সূচনা কলকাতায়। পঞ্চাননের তৃতীয় ও শেষ পর্বের কর্মক্ষেত্র ব্যাপটিস্ট মিশনারি উইলিয়াম কেরী এবং সহচরদের আস্তানা শ্রীরামপুরে। হুগলি জেলার এই কৃতী সন্তানের জীবনাবসান ঘটেছিল ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে। বাংলাভাষীদের কাছে পঞ্চানন কর্মকার তাঁর ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য মর্যাদার আসনে আজও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি—এ কথা অপ্রিয় হলেও অসত্য নয়।

হুগলি জেলা থেকে প্রথম বাংলা গ্রন্থ প্রকাশ হবার পর কিছু বিক্ষিপ্ত প্রকাশন ছাড়া দেশজোড়া কোনও অখণ্ড মুদ্রণ পরিমণ্ডল গড়ে ওঠেনি। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা পরিলক্ষিত হয় না।

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই বাংলা মুদ্রণের রঙ্গমঞ্চে যে নতুন দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল, সেই দৃশ্যের প্রধান নায়ক ছিল হুগলি জেলার শ্রীরামপুর মিশন। এর সঙ্গে অবশ্যই ছিল কলকাতায় অবস্থিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ।

শ্রীরামপুর মিশন ছিল সমকালীন বাংলা মুদ্রণের বৃহত্তম কেন্দ্র। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি একটিমাত্র কাঠের মুদ্রাযন্ত্র নিয়ে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের যাত্রা শুরু হয়। ধর্মপ্রাণ উডনি বিদেশাগত এই মুদ্রণ যন্ত্রটি কলকাতায় নিলামে কিনে কেরীকে উপহার দিয়েছিলেন। এই বছরেই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলির উদ্যোগে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ কর্মচারীদের ভারতীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া।

শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানার প্রস্তুতি, প্রতিষ্ঠা, কর্মনীতির একটাই উদ্দেশ্য ছিল—খ্রিস্টের বাণী প্রচার। শুধু বাংলা ভাষায় নয়, ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষায়, এমন কি ভারতবর্ষের বাইরেও অন্যান্য অখ্রিস্টান মানুষের মুক্তির জন্য নানা ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ, খ্রিস্টধর্মের মহত্ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে রচিত নানা পুস্তিকার প্রকাশ। পাঁচ বছরের মধ্যেই আরবি, ফরাসি, নাগরী, বাংলা, গুরমুখী, মারাঠি, ওড়িয়া, কানাড়ি, বর্মি, এমন কি চীনা ভাষাতেও শ্রীরামপুর মিশনে ছাপার কাজ শুরু হয়েছিল।

খ্রিস্টধর্মের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা হলেও আধুনিককালে যে বাংলা-বিদ্যা গড়ে উঠেছে, তার ভিত্তি প্রস্তুত হয়েছিল মিশনের প্রাণপুরুষ উইলিয়াম কেরী ও শ্রীরামপুর মিশন কর্মীদের হাতে। ছাপাখানা যে শক্তির উৎস, এই বোধ বাঙালির মনে জাগিয়ে তুলেছিল এই প্রেস।

বিভিন্ন সময়ে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ছাপা বাংলা বইয়ের তালিকা

সাল	পুস্তক তালিকা	লেখক
১৮০০	মঙ্গল সমাচারের দূত	রামরাম বসু
১৮০০	জ্ঞানোদয়	রামরাম বসু
১৮০০	লক্ষরের চিঠি	উইলিয়াম কেরী

সাল	পুস্তক তালিকা	লেখক
১৮০০	টেন কম্যাণ্ডমেন্টস্	উইলিয়াম কেরী
১৮০০	গসপেল অফ সেন্ট ম্যাথু	উইলিয়াম কেরী
১৮০১	সারমন অন দি মাউন্ট	
১৮০১	নিশ্চিত আশ্রয়	দীগম্বর
১৮০১	হিন্দুদের উদ্দেশ্যে	উইলিয়াম কেরী
১৮০১	শিশুর জ্ঞানের পুস্তক	
১৮০১	রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	রামরাম বসু
১৮০১	বাংলা ব্যাকরণ	উইলিয়াম কেরী
১৮০১	কথোপকথন	উইলিয়াম কেরী
১৮০১	নিউ টেস্টামেন্ট	উইলিয়াম কেরী
১৮০১	শিশুর গানের পুস্তক	উইলিয়াম কেরী
১৮০২	বত্রিশ সিংহাসন	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
১৮০২	হিতোপদেশ	গোলক নাথ
১৮০২	লিপিমালা	রামরাম বসু
১৮০২	মহাভারত—৩ খণ্ড	
	পেন্টাটিউচ	উইলিয়াম কেরী
	রামায়ণ— ৩ খণ্ড	
	সংক্ষিপ্ত মঙ্গল সমাচার	উইলিয়াম কেরী
	ভালো সমাচার গীত	
	(খ্রিস্টমণ্ডলীর) উত্তর-প্রত্যুত্তর	
	ধর্মপুস্তকের দূত	রামরাম বসু
১৮০৩	সলোমনের গান	
	দাউদের গান	উইলিয়াম কেরী
১৮০৪	ওল্ড টেস্টামেন্টের কিছু অংশ	উইলিয়াম কেরী
	আশ্রয় নিরাশ্রয়	
	গীত (মণ্ডলীর)	
১৮০৫	বাংলা ব্যাকরণ (২য়)	উইলিয়াম কেরী
১৮০৫	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র	রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়
১৮০৫	তোতা কাহিনী	চণ্ডীচরণ
১৮০৫	দায় রত্নাবলী	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
	ক্রীশ্চানদের মত কি?	
১৮০৬	কথোপকথন (২য়)	উইলিয়াম কেরী
১৮০৬	নিউ টেস্টামেন্ট	উইলিয়াম কেরী
১৮০৬	ধর্মপুস্তকের ধারা	উইলিয়াম কেরী
	উপদেশ নিস্তার	
	রত্নাকর ধর্মপুস্তকের দূত	
১৮০৭	লুক, অ্যাক্টস, রোমান্স	উইলিয়াম কেরী
	প্রফেটিক বুক	উইলিয়াম কেরী
	হিন্দুধর্মের প্রার্থনা	তারাচাঁদ
১৮০৭	ভেদাভেদ	মার্শম্যান

সাল	পুস্তক তালিকা	লেখক
১৮০৭	ওয়াটের উত্তর প্রত্যুত্তর	চেম্বারলেন
	ধর্ম পুস্তকের দূত	
১৮০৮	হিতোপদেশ	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
১৮০৮	রাজাবলী	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
	বত্রিশ সিংহাসনে	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
	অনুশোচনা বিষয়ে	উইলিয়াম কেরী
	নিবেদন	কেরী মার্শম্যান
১৮০৯	হিস্টরিক্যাল বুকস্	উইলিয়াম কেরী
	জশুয়া এস্থার	উইলিয়াম কেরী
	সমগ্র বাইবেল—৫ খণ্ড	উইলিয়াম কেরী
১৮১০	গীত	চেম্বারলেন
	খ্রিস্ট বিবরণীমৃতম্	রামরাম বসু
	যীশুখ্রিস্ট সম্পর্কে পত্রাদি	
	ভার্জিলের প্রথম মাইনড্	
১৮১১	নিউ টেস্টামেন্ট	উইলিয়াম কেরী
	ধর্ম পুস্তকের নামের উত্তর প্রত্যুত্তর	চেম্বারলেন
	মনের চেতনা	
	উত্তর প্রত্যুত্তর বালকের কারণ	
১৮১২	ইতিহাসমালা	উইলিয়াম কেরী
১৮১৩	পেন্টাটিউচ	উইলিয়াম কেরী
	আশ্রয় নিরাশ্রয়	
১৮১৪	হিতোপদেশ	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
	রাজাবলী	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
১৮১৫	বাংলা অভিধান—১ম	উইলিয়াম কেরী
	বাংলা ব্যাকরণ	উইলিয়াম কেরী
	পুরুষ পরীক্ষা	হরপ্রসাদ
১৮১৬	জ্যোতিষ্ক	
	লিপিধারা	
	নিউ টেস্টামেন্ট	উইলিয়াম কেরী
১৮১৭	চুক্তিপত্র ইত্যাদি	
	কথোপকথন	উইলিয়াম কেরী
	বাংলা অভিধান (১ম)	
	দিগ্‌দর্শন	জন মার্শম্যান
	গুরুদক্ষিণা	মথুরামোহন
	মুগ্ধবোধ	মথুরামোহন
	বাংলা ব্যাকরণ	উইলিয়াম কেরী
	হিন্দু উত্তরাধিকার আইন	
১৮১৮	সমাচার দর্পণ	জন মার্শম্যান
	নীতিবাক্য১—৩	
	ধর্মগ্রন্থের চুম্বক	
	শিক্ষাসার	জয়গোপাল
	বত্রিশ সিংহাসন	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

সাল	পুস্তক তালিকা	লেখক
১৮১৯	ম্যাথু মার্ক	উইলিয়াম কেরী
১৮২০	বৃটিশ দেশীয়দের বিবরণ	ফেলিক্স
	দিগ্‌দর্শন (ইংরাজি-বাংলা)	জন মার্শম্যান
	হিতোপদেশ	রামকমল সেন
১৮২১	হিতোপদেশ	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
	বাক্যবলী	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
	পত্রধারা	জয়গোপাল
	পদার্থ	কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়
	যাত্রীদের অগ্রসরের বিবরণ (২য়)	ফেলিক্স
	কর্মলোচন	কালিদাস সভাপতি
	পেন্টাটিউচ	উইলিয়াম কেরী
১৮২৩	বাংলা অভিধান	মেন্ডিস
১৮২৪	ম্যাথু মার্ক	উইলিয়াম কেরী
১৮২৫	বাংলা অভিধান (২য় খণ্ড)	উইলিয়াম কেরী
	কবিতা রত্নাকর	নীলরতন
	পেন্টাটিউচ	উইলিয়াম কেরী
১৮২৬	বহুদর্শন	নীলরতন
	আইন	ফস্টার
১৮২৭	সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান	মার্শম্যান
১৮২৮	আইন ২য় অংশ	ফস্টার
	দেওয়ানী আইন	
	বাংলা অভিধান সংক্ষিপ্ত	
	কোন্ শাস্ত্র মান্য?	টাউনলে
	ম্যাথু	উইলিয়াম কেরী
১৮২৯	মার্ক	উইলিয়াম কেরী
	সদগুণ ও বীর্য	মার্শম্যান
	ওল্ড টেস্টামেন্ট	উইলিয়াম কেরী
১৮৩০	নীলের আইন	
	জমিদারী আইন	
	স্টাম্পের আইন	
	কবিতা রত্নাকর	নীলরতন
	পত্রধারা	জয়গোপাল
	দেওয়ানী খালসা	
	ভারতবর্ষীয় ইতিহাস	মার্শম্যান
	কিমিয়া বিদ্যারসার	ম্যাক
	নিউ টেস্টামেন্ট	উইলিয়াম কেরী
	ওল্ড টেস্টামেন্ট	উইলিয়াম কেরী
	সামস্	উইলিয়াম কেরী
	প্রবোধচন্দ্রিকা	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের প্রকাশনগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এর প্রকাশনগুলির মধ্যে স্পষ্ট দুটো ভাগ রয়েছে। একটি হল খ্রিস্টধর্ম বিষয়ক, অন্যটি স্বতন্ত্র একটি ধারা। সেই ধারাটির একটি পুরনো রচনার প্রকাশ ও আর একটি মূলত নতুন পাঠ্যপুস্তক।

শ্রীরামপুর মিশনের ঢালাইখানার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন পঞ্চানন কর্মকারের প্রিয় শিষ্য ও জামাতা হুগলি জেলার ত্রিবেণীর বাসিন্দা মনোহর কর্মকার। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ফলে মনোহর শিল্পনৈপুণ্যে পঞ্চাননকে অতিক্রম করেছিলেন।

এদেশের মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসে শ্রীরামপুরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শ্রীরামপুর মিশনের আরেকটি বড় অবদান যন্ত্রচালিত আধুনিক কায়দায় বাংলাদেশে প্রথম কাগজ উৎপাদন শুরু। শ্রীরামপুরে কাগজকল প্রবর্তনের পূর্বে অবশ্য এদেশে যথেষ্ট পরিমাণ হাতে তৈরি কাগজ উৎপাদন হত। পুঁথিপত্র থেকে শুরু করে চিঠিপত্র, দলিল, দানপত্র ইত্যাদি এই কাগজেই লেখা হত।

শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে সঙ্গে মিশনারিদের প্রথম থেকেই তাঁদের নিজস্ব কাগজ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার ইচ্ছা ছিল। কেননা, বিদেশ থেকে আমদানি করা কাগজের অত্যধিক দাম ও অনিশ্চিত সরবরাহের জন্যে তাঁরা নিজেদের প্রয়োজনমতো অল্প ব্যয়ে মুদ্রণের কাগজ প্রস্তুত করতে উদ্যোগী হন। তারই ফলস্বরূপ শ্রীরামপুরে কাগজকলের পত্তন হয়।

এটা ঠিক যে, শ্রীরামপুরে কাগজকল স্থাপনের অনেক আগেই অষ্টাদশ শতকে দক্ষিণ ভারতে ত্রাঙ্কবরে ভারতের প্রথম কাগজকল স্থাপন হলেও প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় কাগজশিল্পে আধুনিক যান্ত্রিকতার প্রবর্তন শ্রীরামপুরে থেকেই। এখানকার কাগজকলের ধারা অনুসরণ করেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে কাগজকল প্রসারিত হয়েছিল। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীরামপুরের এই কাগজকলটি ভারতবর্ষের আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাগজ নির্মাণের একমাত্র উৎস ছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বন্দুকের টোটা তৈরির কাজে ব্যবহৃত যে চর্বিযুক্ত কাগজকে উপলক্ষ করে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল, সেই বিতর্কিত কাগজও তৈরি হত শ্রীরামপুরের এই কাগজকলে।

সুতরাং ভারতবর্ষে আধুনিক কাগজশিল্পেরও সূত্রপাত ঘটেছিল হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে। শুধু তাই নয়, মুদ্রণ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের মতো এদেশে আধুনিক পদ্ধতিতে এবং বৃহৎ আকারের কালি তৈরির ব্যবস্থাও হুগলি জেলার শ্রীরামপুর মিশন প্রেসেই প্রথম প্রবর্তিত হয়।

বাংলাদেশের শিক্ষা বিস্তারেও হুগলি জেলার দান অপরিসীম। শ্রীরামপুরে উইলিয়াম কেরী শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসেবে জশুয়া মার্শম্যান ও হানা মার্শম্যানকে পাওয়ার ফলে ১৮০০ সালে প্রথমে ইংরেজ ছেলেমেয়েদের জন্য দুটি বোর্ডিং স্কুল খোলা হলেও পাশাপাশি দেশীয় ছেলেমেয়েদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল অবৈতনিক পাঠশালা। এইখানে দেশীয় ছেলেদের বাংলায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হল। মিশানারিরা বুঝেছিলেন মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া আশু কর্তব্য।

মাতৃভাষায় শিক্ষাদান বিষয়টি প্রবর্তন করেই শুধু থেমে থাকেননি তাঁরা, স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারেও চিন্তা করেছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়ে শ্রীরামপুর মিশন ১৮১৬-১৭ সালে বাংলাদেশে প্রথম নারীশিক্ষা দেবার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়। মিশনারি পরিচালিত একটি ছেলেদের স্কুলের মাপে মাদুরের বেড়া দিয়ে পৃথক করে ক্লাসে কয়েকজন বালিকাকে পড়াবার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল, স্বতন্ত্র কোনও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেনি।

শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা বালিকাদের জন্যে স্বতন্ত্র বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারলেও; 'বন্দিনী বামাকুলের' শৃঙ্খলা মোচন করার গৌরব এই হুগলি জেলারই। লণ্ডন মিশনারি সোসাইটির যাজক রবার্ট মে, যিনি হুগলি জেলায় একজন সার্থক শিক্ষক তথা শিক্ষা পরিচালক হিসেবে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ১৪জন ছাত্রী নিয়ে চুঁচুড়ায় স্বতন্ত্র বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষার ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কেননা, বঙ্গদেশে এটিই প্রথম স্বতন্ত্র বালিকা বিদ্যালয়। স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে হুগলি জেলার এই গৌরবে আমরাও গরীয়ান। মহান শিক্ষাব্রতী রবার্ট মে'র অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটেছিল ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্ট তারিখে। মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষে যে দুজন মনীষী স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, সেই দুজন মহান ব্যক্তিও হুগলি জেলারই কৃতী সন্তান। এই দুজন হলেন ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায় ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্রতী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১৮১৮ সালের জুলাই মাস ভারতে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল দিন। এই সময়ে জন্ম হয়েছিল শ্রীরামপুর কলেজের, যে কলেজ ১৭৫ বৎসর বয়স অতিক্রম করে আজও স্বগৌরবে মহীয়ান।

কিন্তু এর কিছুদিন আগে বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে নিঃশব্দে বিপ্লব ঘটিয়েছে হুগলি জেলার শ্রীরামপুর। শ্রীরামপুর মিশন থেকে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয় প্রথম বাংলা মাসিকপত্র দিগ্‌দর্শন। এই পত্রিকায় 'আমেরিকার প্রথম দর্শন', 'চুম্বক পাথরের প্রথম অনুভব', 'মহম্মদ ও কোরানের বিবরণ', 'পৃথিবীর আকর্ষণের বিষয়' প্রভৃতি প্রকাশিত হত। খ্রিস্টধর্মের মহিমা ও পরধর্মের নিন্দা প্রচার এর উদ্দেশ্য ছিল না।

১৮১৮ সালের ২৩ মে, শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ'। জন ক্লার্ক মার্শম্যান ও ফেলিক্স কেরীর উদ্যোগে বাংলা সংবাদপত্রের সূচনা একটি স্মরণীয় ঘটনা। বাঙালি পাঠককে 'আত্মকেন্দ্রিকতার বন্ধন থেকে বর্হির্জগতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে বাঙালি পাঠককে সহায়তা করেছিল 'সমাচার দর্পণ'। 'সমাচার দর্পণ' তথা হুগলি জেলার শ্রীরামপুর মিশনের কৃতিত্ব এইখানে যে, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম ইত্যাদি সব বিষয়েই, বিশেষ করে সময়োচিত সমস্যার ব্যাপারে মানুষের বক্তব্য, প্রচারের ইচ্ছা, সমালোচনার আকাঙ্ক্ষা, জনমত গঠনের এবং জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টার অতি শক্তিশালী একটি মাধ্যমকে বাঙালির জীবনে প্রতিষ্ঠা করা। বাংলা মুদ্রণ এবং প্রকাশনের বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতার ইতিহাসে এই সংবাদপত্র সর্বদাই স্মরণযোগ্য।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে শ্রীরামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠার কথা। এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম কেরী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত থাকার সময়ে ভারতীয়দের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য একটি পরিকল্পনা কোম্পানি সরকারের কাছে পেশ করেন। এই পরিকল্পনা সরকারের কাছে অনুমোদন লাভ করেনি। তখন কেরী নিজেই শ্রীরামপুর মিশনে ভারতীয়দের জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হন। ১৮১৮ সালের ১৫ জুলাই শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা বিষয়ক প্রসপেক্টাস প্রচারিত হয়। এই প্রসপেক্টাসে বলা ছিল—'A College for the instruction of Asiatic Christian and other youth in Eastern Literature and European Science'.

এই কলেজ মূলত এশিয়ার খ্রিস্টান যুবকদের জন্য প্রতিষ্ঠা হলেও, অখ্রিস্টান যুবকরাও শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়নি। এই কলেজে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, আরবি, সংস্কৃত ও ইংরাজি বিষয় পড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ছাত্র ও অভিভাবকদের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে বাংলার পরিবর্তে ইংরেজিতে পাঠদান শুরু হয়। এখানে কৃষি ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ে ক্লাস নিতেন স্বয়ং উইলিয়াম কেরী।

ডেনমার্কের রাজা ষষ্ঠ ফ্রেডারিকের কাছ থেকে ১৮২৭ সালে শ্রীরামপুর কলেজ ডিগ্রি প্রদান করার অধিকার লাভ করে এবং সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করেছিল। ১৭৫ বছর অতিক্রম করেও এই কলেজ সগৌরবে এগিয়ে চলেছে শিক্ষাদানের অন্যতম পীঠস্থান হিসেবে।

উইলিয়াম কেরীর নানা বিষয়ে আগ্রহ ছিল। ধর্ম, ভাষাতত্ত্ব, সমাজ, ইতিহাস, বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক বই সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ছাপা বইগুলির কপি সংগ্রহ থাকত তাঁর। সুতরাং কলেজ গ্রন্থাগারটির ঐশ্বর্য অনুমেয়। কলেজ লাইব্রেরি পুরানো বইপত্র থেকে পৃথক করে বর্তমান শতকের প্রথম ভাগে গড়ে উঠেছে অমূল্য সংগ্রহে পরিপূর্ণ কেরী লাইব্রেরী।

বাংলা নবচেতনার প্রথম পর্বে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে দানবীর হাজি মহম্মদ মহসীনের টাকায় হুগলি মহসীন কলেজ চুঁচুড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মহম্মদ মহসীন হুগলি নিবাসী একজন নিঃসন্তান জমিদার ছিলেন। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করেন। তাঁর উইলে এই মর্মে লেখা ছিল যে, তাঁর সকল সম্পত্তি গভর্নমেন্টের অধীনে থাকবে ও একটি অবৈতনিক কলেজ স্থাপন করতে হবে।

১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১ আগস্ট তারিখে কমিটি মহসীনের দানের কথা স্মরণ রেখে 'দি কলেজ অফ মহম্মদ মহসীন' প্রতিষ্ঠা করলেও শিক্ষায়তনটি হুগলি কলেজ' নামে জনসাধারণের কাছে পরিচিত হয়েছিল। কলেজের ছিল দুটি বিভাগ—ইংরেজি ও প্রাচ্যবিদ্যা। প্রথমে কলেজ ছিল অবৈতনিক। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি বিভাগের ছাত্রদের থেকে বেতন নেওয়া শুরু হয়। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের শেষে ইংরেজি বিভাগের পুনর্বিন্যাস করে কলেজ ও বিদ্যালয়ে ভাগ করা হয়। শেষোক্ত বিদ্যালয়টি পরবর্তীকালে 'হুগলি কলেজিয়েট স্কুল' নামে পরিচিত হয়েছিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হলে ওই বৎসর ২ মে হুগলি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি ও অনুমোদন লাভ করে। ১৮৬৫ সাল থেকে এখানে আইন বিভাগ শুরু হয়। এখানে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কিছু ছাত্র উদ্ভিদবিদ্যা, ইতিহাস, দর্শন, গণিত বা ইংরেজি সহ হুগলি কলেজ থেকে এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে এই কলেজের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে হাজি মহম্মদ মহসীনের অবদানের কথা মনে রেখে কলেজের নামের সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত করে কলেজটির নতুন নামকরণ করা হয় 'হুগলি মহসীন কলেজ'। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ এই কলেজ বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম এ এবং আইন শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। এই প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি ছাত্রগৌরবে ধন্য। প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে আছেন—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ প্রথিতযশা সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক দ্বারকানাথ মিত্র, বিজ্ঞানসাধক উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, বিপ্লবী ও স্বদেশপ্রেমিক চারুচন্দ্র রায়, কানাইলাল দত্ত, ভূপতি মজুমদার, মুজফ্‌ফর আহমেদ প্রমুখ।

উনিশ শতকের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ সকল ক্ষেত্রে এক নবীন চেতনার উদ্বোধনে হুগলি জেলার যে অনন্য ভূমিকা ছিল, সেই পথ ধরেই প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৪ সালে হুগলি পাবলিক লাইব্রেরি। গ্রন্থাগার আনে চেতনা, চেতনা গড়ে তোলে মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস আর মানুষকে নির্দেশ করে প্রকৃত সত্যের পথ। একই পথ ধরে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৮ সালে মহারাজা শিবচন্দ্র দেবের আর্থিক আনুকূল্যে কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরি। বর্তমানে এটি একটি সরকার পোষিত গ্রন্থাগার। কিন্তু এই দশকে সবচেয়ে উজ্জ্বল কীর্তি উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি (বর্তমান নাম জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার) প্রতিষ্ঠা।

উনিশ শতকের নবজাত চেতনার অন্যতম রূপকার উত্তরপাড়া নিবাসী জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পর আগ্রহী শিক্ষার্থীদের মনের খোরাক মেটাবার জন্য উত্তরপাড়ায় একটি সাধারণ পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৮৫৪ সালের ২৩ আগস্ট বর্ধমান বিভাগের রেভেনিউ কমিশনারের কাছে আবেদন জানান। ওই সময়ে সরকারের পঠনালয়ে মাসিক অর্থ সাহায্য করার ব্যবস্থা থাকলেও জানানো হয় সরকার সাধারণ গ্রন্থাগারে সাহায্য করার প্রথা রহিত করে দিয়েছে। আত্মবিশ্বাসী সমাজ সংস্কারক জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নিজেই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করলেন। ১৮৫৬ সালে গঙ্গাতীরে জয়কৃষ্ণের উদ্যানভূমিতে গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং ১৮৫৯ সালের ১৫ এপ্রিল গ্রন্থাগারের উদ্বোধন হয় নবনির্মিত গৃহে।

বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত বই ও পত্রিকা এবং জয়কৃষ্ণের ব্যক্তিগত সংগ্রহ দিয়ে শুরু হয়েছিল এই গ্রন্থাগারের জয়যাত্রা। এই গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য কোনও চাঁদা দিতে হত না। সেই হিসেবে এই সাধারণ গ্রন্থাগার ভারতবর্ষে প্রথম স্থাপিত নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার। ১৯৮৪ সালে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়েছে বহু দুর্মূল্য গ্রন্থের সংগ্রহে পরিপূর্ণ উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরির ১২৫ বৎসর উদ্‌যাপন।

এর পরে প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৬০ সালে জনাই পাবলিক লাইব্রেরি। একই ধারা বজায় রেখে প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৬৯ সালে শ্রীরামপুরের নিকটে মাহেশ পাবলিক লাইব্রেরি অ্যাণ্ড ফ্রি রিডিং রুম। জেলার জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার ধারা অব্যাহত রাখতে প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৭১ সালে শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরি। এই গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পরবর্তী পর্যায়ে অবিভক্ত বঙ্গের তৎকালীন প্রখ্যাত বাগ্মী, শিক্ষাবিদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামী তুলসীচরণ গোস্বামী। শতবর্ষ অতিক্রমকারী এই গ্রন্থাগার আজও জনসাধারণের সেবা করে চলেছে। এর দুইবৎসর পরেই প্রতিষ্ঠা হয় হুগলি জেলার অন্যতম গৌরব চন্দননগর পুস্তকাগার। ১৮৭৩ সালে এই পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা হয় ফরাসি সরকারের অনুমতিসাপেক্ষে।

প্রথমাবস্থায় এই পুস্তকাগারের স্থিতিশীলতা না থাকলেও পরবর্তী পর্যায়ে বিপ্লবী চারুচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে ও হুগলি জেলার গৌরব হরিহর শেঠের পৃষ্ঠপোষকতায় এই গ্রন্থাগার হুগলি জেলার অন্যতম গৌরব বলে চিহ্নিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের কাছে হুগলি জেলার অন্যতম পীঠস্থান বলে চিহ্নিত এই ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রন্থাগার এখনও নীরবে দেশের সেবা করে চলেছে।

এর পরে হুগলি জেলার শিক্ষাজগতে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৮৮৭ সালে উত্তরপাড়া কলেজের প্রতিষ্ঠা। ১৮৪৬ সালে উত্তরপাড়া হাই স্কুল (বর্তমানে সরকারি বিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠার পর থেকেই জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল স্বগ্রামে একটি কলেজ স্থাপন করবার। ১৮৫৩ সাল থেকে তিনি সরকারের কাছে আবেদন জানাতে থাকেন উত্তরপাড়ায় একটি কলেজ স্থাপন করবার জন্য। তিনি হাই স্কুলকে কলেজ উন্নীত করবার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন ও প্রাথমিক খরচের হিসাবের অর্ধেক পঁচিশ হাজার টাকা সাহায্য করতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব বিবেচিত হয়নি। তথাপি তিনি বারবার প্রস্তাব পেশ করতে থাকেন।

উত্তরপাড়া কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত জয়কৃষ্ণের জীবনের এক দীর্ঘ সংগ্রামের স্মারক। অবশেষে ১৮৮৭ সালের ২০ জুন উত্তরপাড়া কলেজের জন্ম হয়। কিন্তু এর প্রতিষ্ঠা উৎসব স্বচক্ষে তাঁর পক্ষে দেখা সম্ভব হয়নি। এর আগেই তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান। জয়কৃষ্ণের পর রাজা প্যারীমোহন এই কলেজের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্যারীমোহন এই কলেজের জন্য এক লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেন। অবশেষে ১৯৫৩ সালে উত্তরপাড়া কলেজের নতুন নাম হয় 'প্যারীমোহন কলেজ'।

এক স্মরণীয় মুহূর্তে বাঁশবেড়িয়ার কয়েকজন নব্যশিক্ষিত উৎসাহী তরুণ ১৮৯১ সালে একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করেন। এর পূর্বে এই অঞ্চলে রক্ষণশীল পণ্ডিতদের প্রবল বিরোধিতায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা আলেকজাণ্ডার ডাফ স্থাপিত উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় কিছুদিন চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। ডাঃ তিনকড়ি আঢ্য, বিপিনবিহারী দে, অনুকূল চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপেশচন্দ্র মিত্র, হরিহর ঘোষ

প্রমুখ ব্যক্তির উদ্যোগে সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যম হিসাবে পাঠাগারকে বিকল্পরূপে গড়ে তোলা হয়। আনন্দময়ী মন্দিরের পশ্চিমদিকে ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা সভাগৃহে ১২৯ খানি পুস্তক ও ১২ জন সভ্য নিয়ে বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরির জয়যাত্রা শুরু হয়।

শতবর্ষ অতিক্রান্ত এই পাঠাগারটির যাত্রাপথ প্রথমদিকে সহজ সরল কুসুমাস্তীর্ণ ছন্দময় না হলেও পরবর্তী পর্যায়ে পাঠাগারের গৌরবময় ভূমিকা সমগ্র হুগলি জেলার গৌরব। এই গ্রন্থাগারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন বাঁশবেড়িয়ার কৃতী সন্তান অবিভক্ত তথা ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয় ও তিনকড়ি দত্ত।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হুগলি জেলার গৌরবময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান Dupliex College-এর (বর্তমানে চন্দননগর কলেজ) সূচনা ঘটেছিল। এই কলেজের গোড়াপত্তনের ইতিহাস সন্ধান করলে দেখা যাবে ১৮৬২ সালে চন্দননগরের ফরাসি মিশনারিদের উদ্যোগে সেন্ট মেরিজ ইনস্টিটিউশন নামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পত্তন করা হয়। এই বিদ্যালয় পত্তনের উদ্দেশ্য ছিল ফরাসি সংস্কৃতি চন্দননগরের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচার করা ও প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে যে দৈনন্দিন সমস্যার উদ্ভব হয়, সেই সমস্যা সমাধানে জনসাধারণের সহযোগিতা লাভ করা। কিন্তু ফরাসি শিক্ষাব্যবস্থা জনসাধারণকে আকৃষ্ট করতে না পারার ফলে চন্দননগরের অধিবাসীরা ব্রিটিশ চন্দননগর ও চুঁচুড়ায় তাঁদের সন্তানদের ইংরেজি শিক্ষালাভের জন্য প্রেরণ করত। ফলে সকালের দাবি ছিল সেন্ট মেরিজ ইনস্টিটিউশনে ইংরেজি বিভাগ চালু করতে হবে। ১৮৯৩ সালে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কলকাতা ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষায় বসার অনুমতি পায়। ১৯০১ সালে ফরাসি গভর্নর ডুপ্লের সম্মানার্থে সেন্ট মেরিজ ইনস্টিটিউশনের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ডুপ্লে কলেজ। তখন এই কলেজের শিক্ষক ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী চারুচন্দ্র রায়। নানা কারণে ফরাসি সরকার পরে কলেজটিকে দীর্ঘদিন বন্ধ রাখার প্রচেষ্টা চালালেও দেশব্রতী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী চারুচন্দ্র রায়ের দীর্ঘ অনলস সংগ্রামের ফলে ১৯৩১ সালের ৪ জুলাই কলেজটি চালু হয়।

১৯৪৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর কলেজের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় College De Bussy। ১৯৪৭ সালে চন্দননগর পণ্ডিচেরীর শাসন থেকে মুক্তি পেলে এই সুযোগ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ও শিক্ষানুরাগীরা প্রস্তাব করেন কলেজের নাম পরিবর্তন করার। ১৯৪৮ সালে কলেজটির নাম পরিবর্তন করে চন্দননগর কলেজ নামকরণ করা হয়, যে নামে শিক্ষাজগতে আজ সকলের কাছে পরিচিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে হুগলি জেলায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে যে অভ্যুত্থান ঘটেছিল, বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে এসে আজও তা বিদ্যমান। হুগলি জেলার পত্তন থেকে শুরু করে বিভিন্ন দিক নিয়ে রচনা করা হয়েছে হুগলি জেলা বিষয়ক বহু মূল্যবান গ্রন্থ। এই সমস্ত গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন করা হল এখানে। এই গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন করতে গিয়ে চন্দননগর পুস্তকাগার, শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরি, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার, চন্দননগর সরকারি কলেজ গ্রন্থাগার, কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরি, বাঁশবেড়িয়া সাধারণ গ্রন্থাগার, রিষড়া রামকৃষ্ণ আশ্রম গ্রন্থাগার, রিষড়া রেল পার্ক সাধারণ গ্রন্থাগার, বৈদ্যবাটী ইয়ংমেন্স অ্যাসোসিয়েসন গ্রন্থাগার, কলকাতা নগর গ্রন্থাগার ও জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা ব্যবহার করেছি। এই সমস্ত গ্রন্থাগারের কর্মীদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থপঞ্জী :

১ **অনিলকুমার দত্ত ও নির্মলচন্দ্র চৌধুরী, সম্পাদক**
ইউনিয়ন ক্যাটালগ অব বেঙ্গলি বুকস অ্যাণ্ড পিরিয়ডিক্যালস : হুগলি জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তক ও পত্রিকার যৌথ তালিকা। চুঁচুড়া, পঃ বঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি : হুগলি জেলা শাখা, ১৯৮৬। ৬৩ পৃঃ।
(এই গ্রন্থটি প্রথম খণ্ড হিসেবে চিহ্নিত। হুগলি জেলার বিভিন্ন সাধারণ গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১৭৭৬ থেকে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকার যৌথ তালিকা।)

২ **অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়**
উত্তরপাড়া বিবরণ। উত্তরপাড়া, লেখক, ১৯২০। ৬৮ পৃঃ।
(হুগলি জেলায় অবস্থিত উত্তরপাড়ার স্থান পরিচয়, বংশ পরিচয়, বঙ্গের বাহিরে অবস্থানকারী উত্তরপাড়ার কৃতী সন্তানদের পরিচয়, উত্তরপাড়ার গ্রন্থকার ও সাহিত্যসেবক, বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, সাময়িক পত্রিকা সম্বন্ধে বিবরণ এই গ্রন্থে বর্ণনা করা আছে।)

৩ **অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**
ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার : হুগলি, কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, ১৯৭২। ৮২৫ পৃঃ।
(এই গ্রন্থে হুগলি জেলার অবস্থান, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক সম্বন্ধে পরিসংখ্যান দেওয়া আছে।)

৪ **অম্বিকাচরণ গুপ্ত**
জয়কৃষ্ণ চরিত। কলকাতা, বিভূতিভূষণ গুপ্ত, ১৩০৮। ১৬৬ পৃঃ।
(উত্তরপাড়ার কৃতী সন্তান জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ। তাঁর শিক্ষাচর্চা, কর্মজীবন, লোকহিতব্রত, রাজনৈতিক চিন্তা প্রভৃতি এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।

৫ **অম্বিকাচরণ গুপ্ত**
হুগলি বা দক্ষিণ রাঢ় (প্রথমার্ধ)। কলকাতা, ললিতমোহন পাল, ১৩২১ ব।

(হুগলি জেলার প্রারম্ভিক ইতিহাস এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।)

৬ ———।
হুগলি বা দক্ষিণ রাঢ়, কলকাতা, বিভূতিভূষণ গুপ্ত, [ ]।
(এই গ্রন্থে রাঢ় বা হুগলি জেলার ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। সুহ্ম ও রাঢ়, হিন্দু রাজত্বে রাঢ়, পাঠান রাজত্বে রাঢ় ও মোগল রাজত্বে রাঢ়—এই কয়েকটি অধ্যায়ে হুগলি জেলার ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।)

৭ **অমৃতলাল সরকার**
শ্রীরামপুরে : ভারতবন্ধু উইলিয়াম কেরী। ২য় সংস্করণ, ১৯৩৬।
(উইলিয়াম কেরীর হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে দিনযাপনের কথা।)

৮ **অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়**
হুগলি জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিহাস। চুঁচুড়া, নবকুমার প্রকাশনী, ১৯৯৩। ১৯৮ পৃঃ।
(হুগলি জেলার ২৭ জন বরেণ্য ব্যক্তির জীবনী এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। পরিশিষ্টে হুগলি জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের একটি বিস্তারিত তালিকা।)

৯ **অশোক মিত্র, সম্পাদক**
পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা। কলকাতা,
খ ২: পৃঃ ৫১৩—৬৮৫, ৭১৭—৭২৫।
(হুগলি জেলার অন্তর্গত সমস্ত থানার নাম , তার অন্তর্গত গ্রামগুলির পরিচয় এবং সেই সমস্ত এলাকায় যে সমস্ত উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ। এই গ্রন্থ থেকে হুগলি জেলায় অনুষ্ঠিত মেলা ও ধর্মীয় উৎসব সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাবে।)

১০ **আশিসকমল সরকার**
পূর্ব রেলের পথে পথে। কলকাতা, পূর্ব রেল জনসংযোগ বিভাগ, [তারিখ নেই] ৯৭ পৃঃ।
(১৮৫৪ সালের ১৫ আগস্ট পূর্ব রেলপথে হাওড়া থেকে হুগলি ট্রেন প্রথম যাত্রা শুরু করেছিল। তার ইতিহাস এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত পূর্ব রেলপথের অন্তর্গত বিভিন্ন জেলার মধ্যে হুগলি জেলায় অবস্থিত বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশন ও তার স্থান মাহাত্ম্য এবং হুগলি জেলার রেলপথের বিবরণও এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।)

১১ **ইভস, এডওয়ার্ড**
এ ভয়েজ ফ্রম ইংল্যান্ড টু ইন্ডিয়া, ইন্ দি ইয়ার ১৭৫৪ অ্যান্ড অ্যান হিস্টোরিক্যাল ন্যারেটিভস্ অফ্ দি স্কোয়াড্রন অ্যান্ড আরমি ইন ইন্ডিয়া, আনডার দি কম্যান্ড অফ্ ভাইস অ্যাডমিরাল ওয়াটসন অ্যান্ড কর্নেল ক্লাইভ ইন্ দি ইয়ারস্ ১৭৫৫, ১৭৫৬, ১৭৫৭ লন্ডন, এডওয়ার্ড অ্যান্ড চার্লস ডিলি, ১৭৭৩।
(এই গ্রন্থে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে হুগলি দখল ও মার্চ মাসে চন্দননগর দখলের আনুপূর্বিক বিবরণ। লেখক সৈন্যদলের একজন সদস্য হিসেবে এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।)

১২ **ইন্ডিয়া। ন্যাশনাল লাইব্রেরি, কলকাতা**
দি কেরী এগ্জিবিশন অফ আরলি প্রিন্টিং অ্যান্ড ফাইন প্রিন্টিং। কলকাতা, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, ১৯৫৫। ৪১ পৃঃ।
(শ্রীরামপুরের মুদ্রণ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া আছে।)

১৩ **(দি) ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া**
অক্সফোর্ড, এইচ এম এস অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া, ১৯০৮। খ ১৩, পৃঃ ১৬২—১৭১।
(হুগলি জেলার অবস্থান, কৃষি, প্রশাসন, মহকুমা প্রভৃতি সম্বন্ধে পরিসংখ্যান সহ বিবরণ আছে। ফরাসি অধিকৃত চন্দননগর শহরের কোনও উল্লেখ নেই।)

১৪ **ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া**
বেঙ্গল (প্রভিন্সিয়াল সিরিজ)। কলকাতা, সুপারিনটেন্ডেন্ট অব গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং, ১৯০৯। খ ১, পৃঃ ৩১৮—৩৩৮।
(উপরোক্ত পৃষ্ঠাসমূহে হুগলি জেলার সীমানা, বনজ সম্পদ, উদ্ভিজ, আবহাওয়া, জাতি, কৃষি, পশুপালন, সম্পদ, বিচার ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে পরিসংখ্যান সহ বিবরণ।)

১৫ ———।
কলকাতা, সুপারিনটেন্ডেন্ট অব গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং, ১৯০৯। খ ২, পৃঃ ৪৯৭—৫০২।
(ফরাসি অধিকৃত এলাকা বলে চিহ্নিত হুগলি জেলার চন্দননগর সম্বন্ধে বিবরণ।)

১৬ **ইলিয়ট, এইচ এম**
দি হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, অ্যাজ টোল্ড বাই ইটস ওন হিস্টোরিয়ানস, দি মহমেডান পিরিয়ড। লন্ডন, ট্রাবনার অ্যান্ড কোং, ১৮৬৭—১৮৭৭। ৮ খণ্ড।
(১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে হুগলিতে পর্তুগীজদের মোগল দ্বারা পরাজিত হওয়ার আনুপূর্বিক বিবরণ এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।)

১৭ **উইলসন, সি আর**
দি আর্লি অ্যানালস অব দি ইংলিশ ইন বেঙ্গল। লন্ডন, ডব্লিউ থ্যাচার অ্যান্ড কোং, ১৮৯৫—১৯০০। ২ খণ্ড।
(সপ্তদশ শতাব্দীতে হুগলি জেলার ইতিহাস এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।)

১৮ ———।
লিস্ট অব ইনক্রিপশানস্ অন্ টমবস অর মনুমেন্টস ইন বেঙ্গল পজেসিং হিস্টোরিকাল অ্যান্ড আরকিওলজিক্যাল ইনটারেস্ট। কলকাতা, গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, ১৮৯৬।
(হুগলি জেলায় অবস্থিত বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধগুলির বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।)

১৯ উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার : ১২৫তম বর্ষপূর্তি স্মরণিকা। উত্তরপাড়া, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার, ১৯৮৪। ২৩ + ৬৬ + ৬০ পৃঃ।
(জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার, উত্তরপাড়ার আঞ্চলিক ইতিহাস, সাংস্কৃতিক জীবন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাস সম্বন্ধে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ এ স্মরণিকার বিশেষ আকর্ষণ।)

২০ **ওম্যালে, এল এস এস ও মনমোহন চক্রবর্তী**
বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার : হুগলি। কলকাতা, দি বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপো, ১৯১২। ৩৩০ পৃঃ।
(হুগলি জেলার ইতিহাস, এই জেলায় ইউরোপিয়ানদের আগমন এবং জেলার জনসংখ্যা, অবস্থান, কৃষি, ভূমিব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে তৎকালীন পরিসংখ্যানগত বিবরণ এই গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু।)

২১ **কল্যাণ ব্রহ্মচারী**
ভারত পথিক রামমোহন ও রাধানগর। কলকাতা, সদানন্দ প্রকাশনী, ১৯৯৩। ৯৬ পৃঃ।
(হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামের অবস্থান, ঐতিহাসিক বিবরণ, ওই স্থানে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিবরণ ও রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁর জন্মস্থান রাধানগরের সম্পর্ক এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।)

২২ **ক্যারভ্যালহো, এস এ**
দি ব্যান্ডেল চার্চ অ্যান্ড হুগলি। কৃষ্ণনগর, লেখক, ১৯৭২।
(হুগলি জেলার ব্যাণ্ডেল গির্জা সম্বন্ধে বিবরণ।)

২৩ ————।
দি সিজ অফ হুগলি, এ হিস্টোরিক্যাল নভেল। কৃষ্ণনগর, পি কে জয়, ১৯৯১। ২১৬ পৃঃ।
(ব্যাণ্ডেলে পর্তুগীজদের আগমন ও ব্যাণ্ডেল গির্জার ইতিহাস উপন্যাসাকারে বিবৃত করা হয়েছে।)

২৪ **কালেকসান অব পেপারস রিলেটিং টু দি হুগলি ইমামবাড়া**
কলকাতা, বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়েট প্রেস, ১৯১৪।
(ফুলস্ক্যাপ ফোলিও সাইজে মুদ্রিত সুবিশাল গ্রন্থ। দুষ্প্রাপ্য ছবি ও তথ্যসংবলিত ঐতিহাসিক দলিল।)

২৫ **কুণাল সিংহ**
প্রাচীন গ্রন্থসংগ্রহ : পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। কলকাতা, ওয়ার্ল্ড প্রেস, ১৯৭২। ১৯৯ পৃঃ।
(এই গ্রন্থে হুগলি জেলার কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থাগারের ইতিহাস, পুঁথিপুস্তক ও পত্রপত্রিকা সম্বন্ধে বিবরণ পাওয়া যায়।)

২৬ **কৃষ্ণগোপাল পাকড়াশী**
তিন শতকের রিষড়া ও তৎকালীন সমাজচিত্র। রিষড়া, রিষড়া সাংস্কৃতিক উন্নয়ন পরিষদ, ১৩৮২। ২ খণ্ড।
(প্রথম খণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীর এবং দ্বিতীয় খণ্ডে বিংশ শতাব্দীর রিষড়ার ইতিহাস ও বিভিন্ন কার্যক্রমে রিষড়ার অধিবাসীদের ভূমিকার কথা বিবৃত করা হয়েছে।)

২৭ **ক্যাম্পোস, জে জে এ**
হিস্ট্রি অব দি পর্তুগীজ ইন বেঙ্গল উইথ ম্যাপস অ্যান্ড ইলাস্ট্রেশনস। পাটনা, জানকী প্রকাশন, ১৯৭৯। ২৮৩ পৃঃ।
(বইটি পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে। অবিভক্ত বঙ্গে পর্তুগীজদের আগমন ও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক জীবনের চিত্র এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। পর্তুগীজদের হুগলি জেলায় আগমন, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, ধর্ম প্রভৃতি এই গ্রন্থটির মুখ্য অংশ।)

২৮ ————।
হিস্ট্রি অব দি ব্যাণ্ডেল কনভেন্ট অ্যান্ড চার্চ উইথ নিউমারেস ইলাস্ট্রেশনস। কলকাতা, ক্যাথলিক অরফ্যান প্রেস, ১৯২২। ৯৫ পৃঃ।
(প্রচ্ছদপত্রে কিন্তু মুদ্রিত আছে ব্যাণ্ডেল : হিস্ট্রি অব দি অগাস্টিয়ান কনভেন্ট অ্যান্ড অব দি চার্চ অব আওয়ার লেডি।)
(পর্তুগীজদের বাংলায় আগমন, ব্যাণ্ডেলের পত্তন, ব্যাণ্ডেল কনভেন্ট ও গির্জার ইতিহাস এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।)

২৯ **কেরী, এস পিয়ার্স**
উইলিয়াম কেরী। ৮ম সং। লন্ডন, কেরী প্রেস, ১৯৩৪। ৪৪৭ পৃঃ।
(শ্রীরামপুরে কেরীর জীবনের ঘটনাবলীর সঙ্গে তাঁর জীবনী এই গ্রন্থে দেওয়া আছে।)

৩০ **কেরী, ইউসটেস**
মেমোয়ার অব উইলিয়াম কেরী, ডি ডি, লেট মিশনারি টু বেঙ্গল। লন্ডন, জ্যাকসন অ্যান্ড ওয়ালফোর্ড, ১৮৩৬। ৬৩০ পৃঃ।
(শ্রীরামপুরে উইলিয়াম কেরীর দিনগুলির সম্বন্ধে জানতে পারা যায় এই গ্রন্থে।)

৩১ **ক্রফোর্ড, ডি জি**
এ রিপোর্ট অন দি এপিডেমিক অব প্লেগ ইন হুগলি—চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটি, জানুয়ারি টু মে, ১৯০৫: এব্রিজড্ ফর্ম অ্যান অফিসিয়াল রিপোর্ট। কলকাতা, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট, ১৯০৫। ২০ পৃঃ।
(এই পুস্তিকায় হুগলি জেলায় কোন্ বর্ষ থেকে প্লেগ রোগ সংক্রামক আকার ধারণ করেছে এবং তার পরিসংখ্যান দেওয়া আছে। ১৮৯৯ থেকে ১৯০৪ পর্যন্ত প্রতি বৎসর হুগলি জেলার মহকুমাগুলিতে প্লেগ রোগে আক্রান্ত মৃত ও সুস্থ ব্যক্তির পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে ফরাসি অধিকৃত চন্দননগরে প্লেগ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদেরও একটি পরিসংখ্যান দেওয়া আছে।)

৩২ ————————।
এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব দি হুগলি ডিস্ট্রিক্ট, কলকাতা, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস, ১৯০২। ৮০ পৃঃ।
(লেখক হুগলি জেলার প্রাচীন ইতিহাস বিবৃত করা ছাড়াও এই জেলায় পর্তুগীজ, ইংরেজ, ডাচ, ড্যানিশদের আগমন এবং অন্যান্য বিদেশি কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাও বর্ণনা করেছেন। এর সঙ্গে হুগলি জেলার বেশকিছু স্থানের ওপর জোর দিয়েছেন, যেখানে ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকেরা সংখ্যাধিক্য।)

৩৩ ————————।
হুগলি মেডিক্যাল গেজেটিয়ার। কলকাতা, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস, ১৯০৩। ৫৩৬ পৃঃ।
(এই গ্রন্থটিতে হুগলি জেলার চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ থাকলেও, সঙ্গে সঙ্গে এই জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।)

৩৪ **গীতা দত্ত ও মৃণাল দত্ত**
ভ্রমণসঙ্গী: উইক অ্যান্ড ট্যুর। কলকাতা, এশিয়া, ১৯৮৯। ২৮২ পৃঃ।
(হুগলি জেলার কামারপুকুর-জয়রামবাটী, ব্যান্ডেল সম্বন্ধে পর্যটকদের উপযোগী বিবরণ এই গ্রন্থে।)

৩৫ **গোপাল বসাক**
পর্যটকের দৃষ্টিতে এই বাংলা। কলকাতা, লেখক, ১৩৯০। ১৫৯ পৃঃ।
(পশ্চিমবঙ্গের দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে হুগলি জেলায় অবস্থিত ব্যাণ্ডেল, ত্রিবেণী, বাঁশবেড়িয়া, দেবানন্দপুর, চন্দননগর, রাধানগর, তারকেশ্বর, কামারপুকুর, জয়রামবাটী সম্বন্ধে পর্যটনমূলক বিবরণ দেওয়া আছে।)

৩৬ **গ্রিয়ার্সন, দি আর্লি গ্রেগরি আব্রাহাম**
পাবলিকেশনস অব দি শ্রীরামপুর মিশনারিজ : এ কন্ট্রিবিউশন ট্যু ইন্ডিয়ান বিব্লিওগ্রাফি। বোম্বে, ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি, খ ৩২, পৃঃ ২৪১—২৫৪।
(বাংলা মুদ্রণ জগতে শ্রীরামপুর মিশনের মিশনারিদের অবদান এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।)

৩৭ চন্দননগর পুস্তকাগারের জীবনকথা (১৮৭৩—১৯৫২)। চন্দননগর, [ ] ১৯৫৩।
(১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে চন্দননগরে পুস্তকাগারের পত্তন থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পুস্তকাগারের ইতিহাস পুস্তিকার মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে।)

৩৮ **চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়**
দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন। কলকাতা, আনন্দ, ১৯৮১। ৫০৫ পৃঃ।
(বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে হুগলি জেলা, শ্রীরামপুর, শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে।)

৩৯ **চুনীলাল বসু**
আরামবাগের ইতিকথা। কলকাতা, ভারতী বুক স্টল, ১৯৫৭। ১১৪ পৃঃ।
(আরামবাগের বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখা একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ)

৪০ **জগদীশ ভট্টাচার্য**
কবিমানসী: জীবন ভাষ্য। কলকাতা, ডি এম লাইব্রেরি, ১৩৬৯। ৫১০ পৃঃ।
(হুগলি জেলায় অবস্থিত ফরাসি অধিকৃত চন্দননগরে রবীন্দ্রনাথ মোরান সাহেবের বাড়িতে যে দিনগুলি কাটিয়েছিলেন। সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।)

৪১ **জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার**
বংশ পরিচয়। কলকাতা, লেখক, ১৯২৮—১৯৩৯। ২০ খণ্ড।
(গ্রন্থটি মূলত অবিভক্ত বঙ্গের বিভিন্ন জেলার খ্যাতনামা বংশগুলির ইতিহাস বা কোনও বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনী, যাঁর সুবাদে সেই বংশ বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ, বিংশতম খণ্ডে হুগলি জেলার বিখ্যাত বংশগুলির পরিচয় বা খ্যাতনামা ব্যক্তিদের জীবনী দেওয়া আছে।)

৪২ **জি সি রায়**
বর্ধমান ফিভার, অর দি এপিডেমিক ফিভার অব লোয়ার বেঙ্গল: ইটস্ কজেস্, সিমপটমস্ অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট। লন্ডন, জে অ্যান্ড এ চার্চিল, ১৮৭৬।
(হুগলি জেলাতে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান জ্বর নামে এক ধরনের ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। এই জ্বর মহামারী আকার ধারণ করেছিল এবং এর প্রকোপ ছিল ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। সেই সম্বন্ধে বিবরণ।)

৪৩ **জেমস্, এইচ ই এম, পোস্টমাস্টার জেনারেল অব বেঙ্গল, সঙ্কলক**
ভিলেজ ডাইরেক্টরি অব দি প্রেসিডেন্সি অব বেঙ্গল: হুগলি। কলকাতা, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস, ১৮৮৪। ৫৮ পৃঃ।
(এই সিরিজের চতুর্থ খণ্ডে হুগলি জেলায় অবস্থিত গ্রামের নামগুলি বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো আছে। তার ডানদিকে মৌজা ও থানার নাম দেওয়া আছে। সর্বশেষে ডানদিকে ডাকঘরের নাম দেওয়া আছে, অর্থাৎ গ্রামগুলি কোন্ ডাকঘরের অধীনে এই তালিকা দেখে বোঝা যাবে।)

৪৪ **জেলার মানচিত্র ঃ হুগলি**
কলকাতা, ডি পি পাবলিকেশন অ্যান্ড সেলস্ কনসার্ন, [ ]
রঙিন পৃষ্ঠা।
(হুগলি জেলার প্রাকৃতিক মানচিত্র।)

৪৫ **জ্যাকেরিয়া, কে**
গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল: হিস্ট্রি অব হুগলি কলেজ, ১৮৩৬—১৯৩৬। কলকাতা, সুপারিনটেন্ডেন্ট : বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস, ১৯৩৬।
(হুগলি কলেজের [বর্তমানে হুগলি মহসীন কলেজ] প্রতিষ্ঠাবর্ষ থেকে ১৯৩৬ অবধি কলেজের শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলেজের ইতিহাস রচনা করা হয়েছে।)

৪৬ **টয়েনবি, জর্জ**
এ স্কেচ অন্ দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব্ দি হুগলি ডিস্ট্রিক্ট ফর্ম ১৭৯৫ টু ১৮৪৫ উইথ সাম অ্যাকাউন্ট অব দি আর্লি ইংলিশ, পর্তুগীজ, ডাচ, ফ্রেম অ্যান্ড ড্যানিশ সেটেলমেন্ট। কলকাতা, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস, ১৮৮৮। ১৭৭ পৃঃ।
(হুগলি জেলায় বিভিন্ন বিদেশি শক্তি আগমনের সঙ্গে সঙ্গে হুগলি জেলার বিচারব্যবস্থা, অপরাধমূলক কার্যকলাপ, পুলিশী ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাস্তাঘাট, শিক্ষা ইত্যাদি ঐতিহাসিক তথ্যসহ বর্ণনা করা হয়েছে।)

৪৭ **ডানভারস, এফ সি**
দি পর্তুগীজ ইন ইন্ডিয়া, বিইং এ হিস্ট্রি অব দি রাইজ অ্যান্ড ডেক্লাইন অব দেয়ার ইস্টার্ন এম্পায়ার। লন্ডন, ডব্লিউ এইচ অ্যালেন অ্যান্ড কোং, ১৮৯৪। ২ খণ্ড।
(হুগলি জেলায় প্রথম পর্তুগীজ উপনিবেশ স্থাপন সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়া আছে।)

৪৮ **ডিহেল, ক্যাথরিন স্মিথ**
আর্লি ইন্ডিয়ান ইম্প্রিন্টস্: অ্যান এগ্জিবিশন ফর্ম দি উইলিয়াম কেরী হিস্টোরিকাল লাইব্রেরি অফ শ্রীরামপুর। শ্রীরামপুর, দি কাউন্সিল অব শ্রীরামপুর কলেজ, ১৯৬২। ৩৫ পৃঃ।
(শ্রীরামপুরের কেরী লাইব্রেরিতে রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য বইয়ের তালিকা।)

৪৯ **ডেভিডসন, ক্যাপ্টেন আর ই এডওয়ার্ড**
দি রেলওয়েজ অব ইন্ডিয়া, উইথ অ্যান অ্যাকাউন্ট অব দেয়ার রাইজ, প্রোগ্রেস অ্যান্ড কনেস্ট্রাকসান রিটিন উইথ দি এইড অব রেকর্ডস অব দি ইন্ডিয়া অফিস। লন্ডন, ই অ্যান্ড এফ স্প্যান, ১৮৬৮।
(হুগলি জেলার বিভিন্ন রেলপথের বর্ণনা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।)

৫০ **তারকনাথ ঘোষ, সম্পাদক**
শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরি: সেন্টেনারি সেলিব্রেশন, ১৮৭১—১৯৭১। শ্রীরামপুর, শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরি, ১৯৭২। ৬০ পৃঃ।
(শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরির শতবর্ষ উপলক্ষে একটি স্মারক গ্রন্থ।)

৫১ **তুষার চট্টোপাধ্যায়**
স্বাধীনতা সংগ্রামে হুগলি জেলা। কলকাতা, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৮৩। ১৯৬ পৃঃ।
(স্বাধীনতা সংগ্রামে হুগলি জেলার অবদানের সামগ্রিক পরিচয়। এই জেলার অধিবাসী যে সব ব্যক্তি শহিদ হিসেবে খ্যাত এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যাঁরা বর্তমানে প্রয়াত, তাঁদের নাম ও পরিচয়।)

৫২ **দীপ্তিময় রায়**
পশ্চিমবঙ্গের কালী ও কালীক্ষেত্র। কলকাতা, মণ্ডল বুক হাউস, ১৩৯৩। ২৭৪ পৃঃ।
(হুগলিতে অবস্থিত বৈদ্যবাটীর ভদ্রকালী, চুঁচুড়ার দেবী দয়াময়ী ও কনেবউয়ের মন্দির এবং শেওড়াফুলির শ্রীশ্রী নিস্তারিণীদেবীর মন্দিরের ইতিহাস ও বর্ণনা পাওয়া যায়।)
নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

৫৩ **হুগলি জেলার পুরাকীর্তি**
সম্পাদনা—দেবলা মিত্র
প্রকাশক : প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

৫৩ক **নিতাই ঘোষ**
সপ্তগ্রামের ইতিকথা। কলকাতা, সুমতি পাবলিশার্স, ১৯৯৫। ৭৯ পৃঃ।
(হুগলি জেলার সেকালের বন্দরনগর সপ্তগ্রামের ইতিহাস, সপ্তগ্রামের সঙ্গে বহির্দেশীয় বাণিজ্যিক সম্পর্ক, ওই অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক, ধর্ম, শিক্ষা, পেশা ও যোগাযোগ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। সপ্তগ্রামের মুখ্য জনপদ বংশবাটি ও ত্রিবেণী সম্পর্কে বিশদ বিবরণও পাওয়া যায়।)

৫৪ **নীলমণি মুখার্জি**
এ বেঙ্গল জমিনদার: জয়কৃষ্ণ মুখার্জি অব উত্তরপাড়া অ্যান্ড হিজ টাইমস্, ১৮০৮—১৮৮৮। কলকাতা, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৫। ৫৮৯ পৃঃ।
(উত্তরপাড়ার কৃতী সন্তান, সমাজ সংস্কারক ও জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য পূর্ণাঙ্গ জীবনী।)

৫৫ **নীহাররঞ্জন চাকী**
ব্যাণ্ডেল গির্জার ইতিহাস। ব্যাণ্ডেল, অ্যালবার্ট ডি ডি'সুজা, ১৯৬৮। ৩৮ পৃঃ।
(ব্যাণ্ডেল গির্জার ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ধর্মীয় অলৌকিক ঘটনা সন্নিবেশিত করা হয়েছে এই গ্রন্থে।)

৫৬ **পটস ই ড্যানিয়েল**
ব্রিটিশ ব্যাপটিস্ট মিশনারিজ ইন ইন্ডিয়া, ১৭৯৩—১৮৩৭ : দি হিস্ট্রি অব শ্রীরামপুর অ্যান্ড ইটস মিশন। কেম্ব্রিজ, কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস,১৯৬৭।
(এই গ্রন্থে শ্রীরামপুরের ইতিহাস ও মিশনারিদের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামপুরের ত্রয়ী মার্শম্যান, কেরী ও ওয়ার্ড-এর বিস্তারিত কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ আছে।)

৫৭ **পশ্চিমবঙ্গ। ডাইরেক্টরেট অব সেন্সাস অপরেশনস**
ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক: হুগলি। ১৯৭১, কলকাতা, সুপারিন্টেন্ডেন্ট ; গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ১৯৭৪। ১৭৯ + ১৭৫ পৃঃ।
(হুগলি জেলার অন্তর্গত গ্রাম ও শহরের নামের বর্ণানুক্রমিক তালিকা এবং এই সমস্ত জায়গার প্রাথমিক ও জনসংখ্যার পরিসংখ্যান গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত।)

৫৮ ————————।
প্রচার বিভাগ। হুগলি, কলকাতা, প্রচার অধিকর্তা: পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৫৯। ৯৩ পৃঃ।
(গ্রন্থটি মূলত একটি হ্যান্ডবুক। হুগলি জেলার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিবরণ।)

৫৯ ————————।
ব্যুরো অব অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক অ্যান্ড স্ট্যাটিস্‌টিক্স। ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যান্ডবুক: হুগলি, ১৯৯৩। কলকাতা, ব্যুরো অব অ্যাপ্লায়েড ইকনমিকস্ অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস্: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, [তারিখ নেই]। ১৪৮ পৃঃ।
(পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হুগলি জেলা সম্বন্ধে ১৯৯৩ সালের পরিসংখ্যান।)

৬০ **পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়**
শ্রীরামপুরের আশপাশে গৌরাঙ্গযুগের ইতিহাস। শ্রীরামপুর, শ্রীরামপুর শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গদেব জীউ সেবায়েত সমিতির সভ্যবৃন্দ, ১৩৮৯। ৮৪ পৃঃ।
(হুগলি জেলার শ্রীরামপুর ও তার নিকটবর্তী স্থানে গৌরাঙ্গর আগমন এবং তার ইতিহাস।)

৬১ **(রেভারেন্ড) পি এন নাগ**
ডাফ হাই স্কুল, চুঁচুড়া: পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট। চুঁচুড়া, ১৯৩৬।
(চুঁচুড়ায় অবস্থিত ডাফ হাই স্কুলের ইতিহাস।)

৬২ **পূর্ণচন্দ্র দে**
মৃত্যুঞ্জয়ী কানাইলাল। চন্দননগর, লেখক, ১৯৬২। ১২০ পৃঃ।
(মূলত কানাইলালের জীবনী ও হুগলি জেলায় তাঁর বিভিন্ন কার্যকলাপের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।)

৬৩ **প্যারাপুল্লি, জোস**
হিস্টোরিক্যাল স্কেচ। কলকাতা, হেনরি ডি'সুজা, [ ]। ১২ পৃঃ।
(ব্যান্ডেল গির্জার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।)

৬৪ **প্রফুল্ল চক্রবর্তী**
সোস্যাল প্রোফাইল অব তারকেশ্বর। কলকাতা, ফার্মা কে এল এম, ১৯৮৪। ২৩২ পৃঃ।
(ধর্মীয় স্থান তারকেশ্বরের ধর্মমাহাত্ম্য আলোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে এই স্থানের আর্থ-সামাজিক দিক এবং সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।)

৬৫ **প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়**
রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক। চতুর্থ সংস্করণ। কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৭৭। খণ্ড ১।
(১৮৮১ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হুগলি জেলার চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাড়িতে বর্ষাযাপন করেছিলেন। সেই সময়কার ঘটনা সম্বন্ধে একটি অধ্যায় এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।)

৬৬ **প্রভাস পাল**
পাণ্ডুয়ার ইতিহাস। [ ], লেখক, ১৩৮৭ ব।
(এই গ্রন্থে হুগলি জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া জেলার ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।)

৬৭ **প্রলয় সেন**
পশ্চিমবাংলার তীর্থ। ২য় সংস্করণ। কলকাতা, মডেল পাবলিশিং হাউস, ১৩৮৬।
(হুগলির বেশ কিছু তীর্থস্থানের বিবরণ এই গ্রন্থে দেওয়া আছে।

৬৮ **প্রশান্তকুমার পাল**
রবিজীবনী। কলকাতা, ভূর্জপত্র, ১৩৯১। খণ্ড ২।
(এই গ্রন্থটির ২য় খণ্ডে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চন্দননগরে দিনযাপন ও সাহিত্যচর্চার কথা পাওয়া যায়।)

৬৯ **বরুণকুমার মুখোপাধ্যায়**
বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাস, ১ম খণ্ড: আদি যুগ, ১৬৬৭—১৮৩৪। কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫। ৪৮৬ পৃঃ।
(বাংলা মুদ্রণে হুগলি জেলার উজ্জ্বল ভূমিকার কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। বাংলা মুদ্রণ সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত ও প্রামাণ্য গ্রন্থ।)

৭০ **বসন্তকুমার বসু**
শ্রীরামপুর মহকুমার ইতিহাস। শ্রীরামপুর, লেখক, ১৩২৪। ২৯২ পৃঃ।
(শ্রীরামপুরের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। শ্রীরামপুর মহকুমার ভৌগোলিক বিবরণ ও বিস্তৃত ইতিহাস এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।)

৭১ **বসন্তকুমার সামন্ত, সম্পাদক**
অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব অ্যান ইনস্টিটিউশন অব হায়ার এড়ুকেশন: এ হিস্ট্রি অব হুগলি মহসীন কলেজ। চুঁচুড়া, হুগলি মহসীন কলেজ, ১৯৯১। ১৮৪ পৃঃ।
(এই গ্রন্থে কে জ্যাকারিয়ার হিস্ট্রি অব হুগলি কলেজ পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ১৯৩৭ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত কলেজের ইতিহাস এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।)

৭২ ————————।
জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। উত্তরপাড়া, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার, ১৯৮৩। ৮৪ পৃঃ।
(হুগলি জেলার উত্তরপাড়া নিবাসী বাংলার কৃতী সন্তান ও উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী ও কর্মজীবন।)

৭৩ ——————।

বিদ্যাসাগর: প্রসঙ্গ হুগলি জেলা। ভদ্রেশ্বর, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি : হুগলি জেলা কমিটি, ১৯৯৩। ১১৮ পৃঃ।
(এই গ্রন্থে হুগলি জেলায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যে বিদ্যাসাগরের ভূমিকার কথা আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনকথাও এই গ্রন্থে পরিবেশন করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, বিদ্যাসাগর ছিলেন হুগলি জেলারই সন্তান।)

৭৪ ——————।

শহিদ কানাইলাল : নূতন তথ্যের আলোকে। কলকাতা, সাহিত্যলোক, ১৯৯০। ১৯০ পৃঃ।
(কানাইলালের কিশোরজীবন এবং দ্যুপ্লেক্স কলেজ [বর্তমানে চন্দননগর কলেজ] এবং হুগলি কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি যে বিপ্লবীজীবনের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।)

৭৫ ——————।

হিতকরী সভা স্ত্রী-শিক্ষা ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। কলকাতা, সাহিত্যলোক, ১৯৮৭। ১৬০ পৃঃ।
(লেখক এই গ্রন্থে উত্তরপাড়া হিতকরী সভার ইতিহাস ও তার গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির কথা বর্ণনা করেছেন।)

৭৬ ——————, **সম্পাদক**

হুগলি মহসীন কলেজ সার্ধশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ। চুঁচুড়া, হুগলি মহসীন কলেজ, ১৯৮৮। ১২৮ + ১০৪ পৃঃ।
(বইটি দুটি অংশে বিভক্ত। একটি অংশ বাংলায় ও অপরটি ইংরেজিতে লেখা। গ্রন্থটি মূলত হুগলি মহসীন কলেজের ইতিহাস ও হুগলি জেলার বিভিন্ন দিক নিয়ে কিছু প্রবন্ধ।)

৭৭ **বাওয়ার, এ জি**

(দি) ফ্যামিলি হিস্ট্রি অব দি বাঁশবেড়িয়া রাজ। কলকাতা, ডব্লিউ নিউম্যান অ্যান্ড কোং, ১৮৮৬।
(হুগলি জেলায় অবস্থিত বাঁশবেড়িয়ার রাজপরিবারের ইতিহাস।)

৭৮ ——————।

বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরি, ১৮৯১—১৯৯০: শতবর্ষ স্মারক সংখ্যা। বাঁশবেড়িয়া, বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরি, ১৯৯০।
(এই স্মারকগ্রন্থে বাঁশবেড়িয়ার ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক দিক বিভিন্ন প্রবন্ধের সাহায্যে তুলে ধরা হয়েছে।)

৭৯ **বাস্টিড, এইচ ই**

ইকোস ফর্ম ওল্ড ক্যালকাটা বিইং চিফলি রেমিনিসেন্সেস অব দি ডেজ অব ওয়ারেন হেস্টিংস, ফ্রান্সিস অ্যান্ড ইম্পে। ৩য় সংস্করণ। কলকাতা, থ্যাকার, স্পিঙ্ক অ্যান্ড কোং, ১৮৯৭।
(অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হুগলি ও চুঁচুড়ার অবস্থা সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বহু তথ্য সন্নিবেশিত আছে।)

৮০ **বি রায়**

সেন্সাস ১৯৬১, ওয়েস্ট বেঙ্গল : ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক, হুগলি। কলকাতা, সরকারি মুদ্রণালয় : পশ্চিমবঙ্গ, ৪৩৫ + ১১৯ পৃঃ।
(হুগলি জেলা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের পরিসংখ্যান এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।)

৮১ **বিজয়চন্দ্র কর্মকার**

ইতিহাসে বাঁশবেড়িয়া। বাঁশবেড়িয়া: হুগলি, হেমন্তকুমার ঘোষ, ১৩৯৬ ব। ১৫৯ পৃঃ।
(বাঁশবেড়িয়ার পত্তন থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।)

৮২ **বিধুভূষণ ভট্টাচার্য**

হুগলি ও হাওড়ার ইতিহাস। কলকাতা, গ্রন্থকার, ১৩৩২ ব। খণ্ড ১, ২৮৭ পৃঃ।
(এই খণ্ডে বৈদিক যুগ থেকে মুসলমান যুগের পূর্ব পর্যন্ত হুগলি জেলার ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।)

৮৩ ——————।

হুগলি ও হাওড়ার ইতিহাস। কলকাতা, কুমারনাথ ভট্টাচার্য, ১৩৩৫ ব। খণ্ড ২, ২৫৫ + ৫ পৃঃ।
(এই খণ্ডে মুসলমান যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত হুগলি জেলার ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।)

৮৪ **বিধুভূষণ ভট্টাচার্য ও বাণীকুমার ভট্টাচার্য**

হুগলি ও হাওড়ার ইতিহাস। পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, অশোক পুস্তকালয়, [ ]।
(পরিবর্ধিত আকারে হুগলি জেলার ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।)

৮৫ **বিনয় ঘোষ**

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। কলকাতা, প্রকাশ ভবন, ১৯৭৮। খণ্ড ২।
(এই গ্রন্থের ২য় খণ্ডে হুগলি জেলার বিভিন্ন এলাকার সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস ও দর্শনীয় স্থানের বিবরণ।)

৮৬ **বিভূদন রায়**

ছোটদের হুগলি। চুঁচুড়া, আলোককুসুম রায়, ১৯৪০। ১ + ৪ + ৪৬ পৃঃ।
(এই গ্রন্থে ছোটদের উপযোগী হুগলি জেলার ভৌগোলিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে।)

৮৭ **বিমলচন্দ্র দত্ত**

বাংলার খেতাবী রাজ-রাজড়া। কলকাতা, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড কালচার, ১৯৯২। ৩৩৪ পৃঃ।
(অবিভক্ত বঙ্গের নবাব, রাজপরিবারের ও তাঁদের বর্তমান বংশধরদের পরিচয় এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। হুগলি জেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়ার রায় রাজপরিবার, শেওড়াফুলির রায় রাজপরিবার, বলাগড়ে রাজা রামচন্দ্র সেন, উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় রাজপরিবার ও শ্রীরামপুরের

গোস্বামী রাজপরিবার সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য এই গ্রন্থে দেওয়া আছে।)

৮৮ **বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়**
বিপ্লবতীর্থ চন্দননগর। চন্দননগর, শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৪।
(চন্দননগরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে চন্দননগরের অধিবাসী বিপ্লবীদের জীবনী এই গ্রন্থের মূল আকর্ষণ।)

৮৯ **বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন : চন্দননগরে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলন।** চন্দননগর, নারায়ণচন্দ্র দে, ১৩৪৩ ব। বিভিন্ন পৃষ্ঠা।
(বইটির প্রথম অংশে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিবরণ এবং চন্দননগরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।)

৯০ **বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার : বি ভল্যুম**
হুগলি ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিকস, ১৯১১—১৯১২ টু ১৯২০—১৯২১। কলকাতা, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপো, ১৯২৩। ৪৭ পৃঃ।
(১৯১১-১২ সাল থেকে ১৯২০-২১ সাল অবধি হুগলি জেলার জনসংখ্যা, শহর, ধর্মাবলম্বী লোক, আবগারি, অর্থ, পুলিশ, বিচারব্যবস্থা, পৌরসভা প্রভৃতি সম্বন্ধে পরিসংখ্যান।)

৯১ **বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার : বি ভল্যুম :**
হুগলি ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিস্‌টিকস্‌, ১৯২১-১৯২২ টু ১৯৩০-৩১। কলকাতা, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপো, ১৯৩৩। ২৬ পৃঃ।
(হুগলি জেলার সীমানা, জনসংখ্যা, বিচারালয়, ভূমিসংস্কার, আবগারি, শিক্ষা, রেলওয়ে স্টেশন, ডাকঘর, রাস্তা প্রভৃতি সম্বন্ধে ১৯২১-২২ থেকে ১৯৩০-৩১ সাল অবধি পরিসংখ্যান।)

৯২ **ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য**
বাঙ্গালার তীর্থ। কলকাতা, মডেল পাবলিশিং, ১৩৬২। ১৪৮ পৃঃ।
(হুগলি জেলার অন্তর্গত বেশকিছু তীর্থস্থানের বিবরণ এই গ্রন্থে।)

৯৩ **ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। ২য় সংস্করণ। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৪৯। ২৪ পৃঃ।
(হুগলি জেলার শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী বহেরা গ্রামের অধিবাসী গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের জীবনী, যিনি বাংলার মুদ্রণ জগতে অন্যতম অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।)

৯৪ ——————।
সংবাদপত্রে সেকালের কথা। ৩য় সংস্করণ। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫৬। ২ খণ্ড।
(উইলিয়াম কেরী, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, পঞ্চানন কর্মকার, শ্রীরামপুর মিলন ইত্যাদি বিষয়, যে বিষয়গুলি হুগলি জেলার ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত।)

৯৫ **ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস**
ক্যাপ্টেন জেমস স্টিওয়ার্ড: ফেলিক্স কেরী। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫৮ ব। ৫৭ পৃঃ।
(হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে বাংলা মুদ্রণ জগতে এঁদের অবদানের কথা আলোচনা করা হয়েছে।)

৯৬ **ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায়**
উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি প্রসঙ্গে। উত্তরপাড়া, উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি উন্নয়ন আন্দোলন সমিতি, ১৯৬৪।
(উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও জয়কৃষ্ণের জীবনকথা এই পুস্তিকায় রচিত হয়েছে।)

৯৭ **ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়**
বংশাবলী গ্রন্থ অর্থাৎ উত্তরপাড়া নিবাসী মহামহিমদিগের বংশাবলী। শ্রীরামপুর, শ্রীরামপুরের তমোহর যন্ত্র, ১৮৫৭। ৬৬ পৃঃ।
(উত্তরপাড়ার বিখ্যাত বংশগুলির ইতিহাস।)

৯৮ **ভয়েট, জে ও**
হর্টাস সুর্বাবনস্ ক্যালকাটানসিস্: এ ক্যাটালগ্ অব দি প্ল্যান্টস্ কাল্‌টিভেটেড ইন দি এইচ ই আই কোম্পানিস বোটানিক্যাল গার্ডেন অ্যান্ড ইন দি শ্রীরামপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন ফ্রম 1786 টু 1841। লন্ডন, রয়াল হর্টিকালচারাল সোসাইটি, ১৮৪৫।
(উইলিয়াম কেরীর উদ্যোগে শ্রীরামপুরে ১৫ বিঘা জমির উপর উদ্ভিদ উদ্যান গড়ে উঠেছিল। কলকাতায় কোম্পানি বাগানের পরেই বিশালতায়, বৈচিত্র্যে ছিল এর স্থান। শ্রীরামপুরের উদ্ভিদ উদ্যানে সংরক্ষিত দেশি ও বিদেশি গাছের তালিকা এই গ্রন্থে দেওয়া আছে।)

৯৯ **ভূপতিরঞ্জন দাস**
পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণ ও দর্শন। কলকাতা শরৎ পাবলিশিং হাউস, ১৩৮৫। ২ খণ্ড।
(হুগলি জেলার দর্শনীয় স্থান সম্বন্ধে বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।)

১০০ ——————।
ভারতের তীর্থপথ নির্দেশ। কলকাতা, শরৎ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৯। ২৪৮ পৃঃ।
(হুগলি জেলার বেশকিছু খ্যাতনামা স্থানের নাম ও বিবরণ, যেগুলি তীর্থক্ষেত্র হিসেবে সারা দেশে পরিচিতি লাভ করেছে।)

১০১ **ভোলানাথ চন্দ্র**
দি ট্রাভেলস্ অব হিন্দু ইন ভেরিয়াস পার্টস অব বেঙ্গল অ্যান্ড আপার ইন্ডিয়া। লন্ডন, এন টায়নবার অ্যান্ড কোং, ১৮৬৯। ২ খণ্ড।
(হুগলি জেলার বিভিন্ন স্থান সম্বন্ধে বিবরণ।)

১০২ **ভৈরবপ্রসাদ হালদার**
শহর শ্রীরামপুরের ইতিকথা। শ্রীরামপুর, সাপ্তাহিক পল্লী—ডাক প্রকাশন, ১৯৬৫। ৫২ পৃঃ।
(শ্রীরামপুর পৌরসভার শতবার্ষিকী উপলক্ষে এই পুস্তিকাটি প্রকাশিত। শ্রীরামপুরের পত্তন থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত শ্রীরামপুরের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। শহর শ্রীরামপুরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা সাল ও তারিখ অনুযায়ী পরিশিষ্টে সাজানো আছে।)

১০৩ **মতিলাল রায়**
কানাইলাল। চন্দননগর, প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, ১৩৩০ব। ৭৫ পৃঃ।
(হুগলি জেলায় কানাইলালের বিভিন্ন কার্যকলাপ ও তাঁর জীবনী এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।)

১০৪ **মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়**
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পৌরব্যবস্থার ক্রমবিকাশ : সুবে বাংলা, মার্চ ১৯১২ সাল পর্যন্ত। কলকাতা, অমিয়কুমার ভট্টাচার্য, ১৯৯১। ৫৭৬ পৃঃ।
(সমগ্র সুবে বাংলার মধ্যে হুগলি জেলার শ্রীরামপুরের প্রথম পৌরসংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই পৌরসংস্থার ইতিহাস এবং সঙ্গে সঙ্গে হুগলি জেলার অন্যান্য পৌর প্রতিষ্ঠানের পত্তনের ইতিহাস এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।)

১০৫ **মণীন্দ্রনাথ কুণ্ডু**
কৃতীজন। চন্দননগর, বর্তমান, ভারত, ১৯৮৪। ২ খণ্ড।
(চন্দননগরে বসবাসকারী স্ব-স্ব ক্ষেত্রে কৃতী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার ও জীবনী এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ১ম খণ্ডে নয়জন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার ও ২য় খণ্ডে একুশজন ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনী স্থান পেয়েছে।)

১০৬ **মসউদ-আর-রহমান**
বন্দিপুর পল্লী—পাঠাগারের ইতিকথা বন্দিপুর : হুগলি জেলা, লেখক, ১৯৯২। ৩২ পৃঃ।
(হুগলি জেলায় অবস্থিত বন্দিপুর পল্লী পাঠাগারের ইতিহাস। পাঠাগারের পঁচাত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে এই পুস্তিকাটি রচনা করা হয়েছে।)

১০৭ ——————।
মুসলিম তীর্থ পাণ্ডুয়া শরীফ। বন্দিপুর : হুগলি, লেখক, ১৯৮৬। ৫৯ পৃঃ।
(হুগলি জেলায় অবস্থিত পাণ্ডুয়ার বিভিন্ন ধর্মস্থানের বিবরণ, যেগুলি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।)

১০৮ **মহাদেব ঘোষ**
সুহ্মভূমির বন্দরমালা ও আধুনিকতা। কলকাতা, জি এ ই পাবলিশার্স, ১৯৯৫। ১২০ পৃঃ।
(১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে সরকারিভাবে এদেশে ইংরেজি শিক্ষাদানের ঘোষণার কাল ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকাশ হুগলিতে কিভাবে সংঘটিত হয়েছিল সেকথা এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।)

১০৯ **মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী**
আদর্শচরিত, কিম্বা কেরী, ওয়ার্ড এবং মার্শম্যান চরিত। কলকাতা, ১৮৮০।
(শ্রীরামপুরে থাকাকালীন মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরী, ওয়ার্ড এবং মার্শম্যানের অবদানের কথা জানা যায়।)

১১০ **মার্শম্যান, জন ক্লার্ক**
দি লাইফ অ্যান্ড টাইমস্ অব কেরী, মার্শম্যান অ্যান্ড ওয়ার্ড এমব্রেসিং দি হিস্ট্রি অব দি শ্রীরামপুর মিশন। লন্ডন, লংম্যান, ১৮৫৯। ২ খণ্ড।
(শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের অবদান।)

১১১ **মুনীন্দ্রদেব রায়**
বাঁশবেড়িয়া বা বংশবাটী। কলকাতা, ভারতবর্ষ, ১৩৩১। ১৬ পৃঃ।
(হুগলি জেলায় অবস্থিত বাঁশবেড়িয়ার সচিত্র ইতিহাস।)

১১২ **মুহম্মদ সিদ্দিক খান**
বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরীযুগ। ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২। ১১৬ পৃঃ।
(শ্রীরামপুর মিশন প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত [১৮০০ থেকে ১৮৩৪-৩৫ খ্রিঃ] বিভিন্ন ভাষার পুস্তকের তালিকা-সহ বিবরণ।)

১১৩ **মৃণাল ঘোষ**
চন্দননগরে বিশ্বকবি। চন্দননগর, লেখক, ১৯৬০। ১৮ পৃঃ।
(বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ফরাসি অধিকৃত চন্দননগরে বিভিন্ন সময়ে এসে যে দিনগুলি অতিবাহিত করেছিলেন তারই বিবরণ।)

১১৪ **মেম্বারস অব দি কলেজ স্টাফ**
হুগলি কলেজ রেজিস্ট্রার, ১৮৩৬-১৯৩৬। কলকাতা, বি জি প্রেস ; আলিপুর, ১৯৩৬। ১০, ২১৯ পৃঃ।
(হুগলি মহসিন কলেজের ছাত্রদের নামের তালিকা।)

১১৫ **রথীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**
শ্রীঅরবিন্দ ও হুগলি জেলা। উত্তরপাড়া, শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী সমিতি, [ ]। ১৩ পৃঃ।
(হুগলি জেলার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের যোগাযোগ এই পুস্তিকার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।)

১১৬ **রামকৃষ্ণ সরকার**
কোন্নগরের ইতিহাস। কোন্নগর, বাণী সরকার, ১৩৮৭ ব। ৯০ পৃঃ।
(১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে কোন্নগরের ইতিহাস শুরু করলেও এই অঞ্চলের প্রাচীনত্ব ও নামের উৎপত্তির ইতিহাস এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। এই অঞ্চলের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান,

কৃতী সন্তান এবং বিংশ শতাব্দীর সাংবাদিকগণ ও পত্রিকার পরিচয় দেওয়া আছে।)

১১৭ **রামরঞ্জন দাস**
পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তি। কলকাতা, ফার্মা কে এল এম, ১৯৮০। ২৭২ পৃঃ।
(এই গ্রন্থে ১৯০ থেকে ২১১ পৃষ্ঠায় হুগলি জেলার পুরাকীর্তিসমূহের পরিচয় দেওয়া আছে।)

১১৮ **লেয়ার্ড এম এ**
মিশনারিজ অ্যান্ড এডুকেশন ইন বেঙ্গল, ১৭৯৩-১৮৩৭। অক্সফোর্ড, ক্যালেরডন প্রেস, ১৯৭২। ৩০০ পৃঃ।
(শ্রীরামপুর কলেজের ইতিহাস এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।)

১১৯ **শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়**
ভদ্রেশ্বর অঞ্চলের ইতিবৃত্ত। ভদ্রেশ্বর, ভদ্রেশ্বর পুরসভা, ১৯৯৪। ২৮৭ পৃঃ।
(ভদ্রেশ্বরের ইতিহাস, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি সাহিত্য-সংস্কৃতি, খেলাধূলা ইত্যাদি বিভিন্ন দিক নিয়ে এই অঞ্চলের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

১২০ **শম্ভুচন্দ্র দে**
দি বাঁশবেড়িয়া রাজ। ২য় সংস্করণ। কলকাতা বি বি মুন্সী, ১৯১৭। ৮০ পৃঃ।
(হুগলি জেলায় অবস্থিত বাঁশবেড়িয়ার জমিদার বংশ রায় পরিবারের ইতিহাস ও তাঁদের বিভিন্ন মহৎ কার্যের কথা এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।)

১২১ ——————।
হুগলি ; পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট। হুগলি, এম এম বে, ১৯০৬। ৫১০ পৃঃ।
(হুগলি শহরের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।)

১২২ **শিবনারায়ণ মুখার্জি**
জয়কৃষ্ণ মুখার্জি; অ্যান অ্যাপ্রিসিয়েসন। কলকাতা, দি আর্ট প্রেস, ১৯১২।
(উত্তরপাড়ার জমিদার ও সমাজ-সংস্কারক জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জীবন পর্যালোচনা।)

১২৩ **শিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রী**
বাঙ্গালার পারিবারিক ইতিহাস ; প্রথম খণ্ড ; হুগলি জেলা। কলকাতা, কর্মকর্তা; বাঙ্গালার পারিবারিক ইতিহাস, ১৯৩৪। ২২৬ পৃঃ।
(হুগলি জেলার বিখ্যাত বংশগুলির পরিচয় ও ইতিহাস এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

১২৪ ——————।
বাঙ্গালার পারিবারিক ইতিহাস ; দ্বিতীয় খণ্ড ; হুগলি ও হাওড়া। কলকাতা, কর্মকর্তা, বাঙ্গালার পারিবারিক ইতিহাস, ১৯৩৫, ৩২০ পৃঃ।
(এই গ্রন্থে হুগলি জেলার গ্রামসমূহের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্যাদির সঙ্গে এই জেলার বিখ্যাত বংশগুলির বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।)

১২৫ ——————।
বাঙ্গালার পারিবারিক ইতিহাস : পঞ্চম খণ্ড ; কলকাতা ও চব্বিশ পরগনা—হুগলি ও হাওড়া। কলকাতা, কর্মকর্তা ; বাঙ্গালার পারিবারিক ইতিহাস, ১৯৪০। ২৪৪ পৃঃ।
(এই খণ্ডে হুগলি জেলার যে সমস্ত বংশগুলির বিবরণ পূর্ব খণ্ডগুলিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি, সেই সমস্ত বংশগুলির বিবরণ।)

১২৬ **শ্রীশ্রাদ্ধানন্দ দেবশর্মা**
মাহেশ মঙ্গল বা মাহেশ পরিচয়। মাহেশ, সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৩৫৪ব, ৯৯ পৃঃ।
(শ্রীরামপুরের নিকট অবস্থিত মাহেশের ইতিহাস।)

১২৭ **সজনীকান্ত দাস**
উইলিয়াম কেরী। ৫ম সংস্করণ। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৩। ৫৬ পৃঃ।
(হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে থাকাকালীন উইলিয়াম কেরীর অবদানের কথা জানা যায়।)

১২৮ **সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায়**
ভারতের মুক্তিযজ্ঞে বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা, আই এ পি, ১৩৯২। ২৯৬ পৃঃ।
(হুগলি জেলার উত্তরপাড়ার বিখ্যাত চট্টোপাধ্যায় পরিবারের সন্তানের হুগলি জেলায় বিপ্লবী কার্যকলাপের বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।)

১২৯ **সলিল মিত্র**
হুগলির গৌরব কাহিনী। হুগলি, সঞ্জয়কুমার ঘোষ, ১৯৮৬। ৭৪ পৃঃ।
(ছোটদের উপযোগী হুগলি জেলার ইতিহাস।)

১৩০ **সীতিশচন্দ্র বসু**
এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব চন্দননগর কলেজ। চন্দননগর, লেখক, ১৯৫৫। ৩৮ পৃঃ।
(১৮৬২ সাল থেকে বইটির প্রকাশকাল পর্যন্ত চন্দননগর কলেজের তথ্যবহুল ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।)

১৩১ **সুকুমার সাহা**
উত্তরপাড়া ঃ কিছু জানা কিছু অজানা। উত্তরপাড়া, লেখক, ১৯৯২। ২৪ পৃঃ।
(উত্তরপাড়া অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ওই অঞ্চলের কিছু বিবরণ।)

১৩২ **সুধীরকুমার মিত্র**
হুগলি জেলার ইতিহাস। কলকাতা, শিশির পাবলিশিং হাউস, ১৩৫৫ব। ৯৯৭ পৃঃ।
(হুগলি জেলার বিভিন্ন দিক যথা—অবস্থান, প্রকৃতি পরিচয়, যাতায়াত, শিক্ষা, সাহিত্য ইত্যাদি সম্বন্ধে বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।)

১৩৩ ——————।
হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ। ২য় সংস্করণ। কলকাতা, মিত্রাণী প্রকাশন, ১৩৭০ব।
('হুগলি জেলার ইতিহাস' গ্রন্থটি পরবর্তী পর্যায়ে উপরোক্ত নামে পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়। লেখকের মত অনুযায়ী এই গ্রন্থে হুগলি জেলাকে কেন্দ্র করে প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের অনেক কথাই আলোচিত হয়েছে।)

১৩৪ হুগলি জেলার দেবদেউল। কলকাতা, অপর্ণা, ১৯৯১। ১৮৯ পৃঃ।
(বঙ্গসংস্কৃতির ক্ষয়িষ্ণু পুরাকীর্তি ও প্রাচীন ভাস্কর্য এবং হুগলি জেলার ছোট-বড় প্রায় ২ হাজার মন্দির-মসজিদ অথবা গির্জা সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে।)

১৩৫ **সুনীল চট্টোপাধ্যায়**
উইলিয়াম কেরী অ্যান্ড হিজ অ্যাসোসিয়েটস ইন দি অ্যাওয়কেনিং অব বেঙ্গল। কলকাতা, রচনা প্রকাশন, ১৯৭৪।
(উইলিয়াম কেরী ও তার সহযোগীরা বাংলা মুদ্রণের প্রসারে হুগলি জেলায় যে গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছিল, তার বিবরণ এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।)

১৩৬ **সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়**
উইলিয়াম কেরী অ্যান্ড শ্রীরামপুর। কলকাতা, ঘোষ পাবলিশিং, ১৯৮৪। ৯২ পৃঃ।
(উইলিয়াম কেরীর অবদান ও শ্রীরামপুর মিশন এবং মিশনারীদের বিভিন্ন কার্যাবলী, রামমোহন রায়ের সঙ্গে শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি এই গ্রন্থটির মুখ্য বিষয়।)

১৩৭ ——————।
বড় সাধ বড় সেবা ; মহাত্মা উইলিয়াম কেরী। শেওড়াফুলি, লেখক, ১৯৮৯। ১৮১ পৃঃ।
(উইলিয়াম কেরীর জীবন আলেখ্য নিয়ে এই গ্রন্থ। শ্রীরামপুরে তাঁর জীবন ও শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে তাঁর কর্মধারা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।)

১৩৮ ——————।
বাংলার নবজাগরণে উইলিয়াম কেরী ও তাঁর পরিজন। কলকাতা, রত্না প্রকাশন, ১৯৭৪। ১৮২ পৃঃ।
(শ্রীরামপুর মিশনের প্রাণপুরুষ উইলিয়াম কেরী ও অন্যান্যদের সম্বন্ধে আলোচনা।)

১৩৯ **সুশীলকুমার দে**
বেঙ্গলি লিটারেচার ইন দি নাইন্টিথ সেঞ্চুরি ; ১৭৫৭-১৮৫৭। কলকাতা, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, ১৯৬২। ৬৫০ পৃঃ।
(এই গ্রন্থে উইলিয়াম কেরীর শ্রীরামপুরের দিনগুলি, শ্রীরামপুর প্রেসে মুদ্রিত বাংলা আদি মুদ্রণ, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রের সম্বন্ধে বিবরণ জানা যায়।)

১৪০ **স্ট্যাভোরনিয়ার্স, জে এস**
ভয়েজেস্ টু দি ইস্ট ইন্ডিস। লন্ডন, জি জি অ্যান্ড জে রবিনসন, ১৭৯৮। ৩ খণ্ড।
(এই বইটি ডাচ্ ভাষা থেকে ইংরেজি অনুবাদ। ১৭৬৯-৭০ খ্রিস্টাব্দে চুঁচুড়া ও হুগলি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে।)

১৪১ **স্টুয়ার্ট, ডব্লিউ**
দি প্ল্যান অ্যান্ড দি সিকোয়েল; দি মিশনারি পারপাস অ্যান্ড লিগ্যাসি অব উইলিয়াম কেরী অ্যান্ড আলেকজান্ডার ডাফ্। শ্রীরামপুর, কাউন্সিল অব শ্রীরামপুর কলেজ, ১৯৮০।
(হুগলি জেলায় অবস্থানকালীন উইলিয়াম কেরীর খ্রিস্টিয় ধর্মপ্রচারের উদ্যোগ সম্বন্ধে বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়)

১৪২ **স্বামী তেজসানন্দ**
শ্রীধাম কামারপুকুর। কলকাতা, উদ্বোধন, ১৯৫৮। ৩০ পৃঃ।
(হুগলি জেলায় অবস্থিত রামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান কামারপুকুর সম্বন্ধে বিবরণ।)

১৪৩ **হরিহর শেঠ**
পুরাতনী। চন্দননগর, রামেশ্বর দে, ১৩৩৫ব। ২৯৪ পৃঃ।
(ভারতবর্ষের ও অবিভক্ত বঙ্গের পুরাতন ঐতিহাসিক তথ্যের মধ্যে হুগলি জেলার বিভিন্ন স্থানের ঐতিহাসিক তথ্য ও বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।)

১৪৪ ——————।
মুক্তিসাধনায় চন্দননগর। কলকাতা, প্রবর্তক পাবলিশিং, ১৩৫৭ব। ১৫৫ পৃঃ।
(বিদেশি শক্তি অর্থাৎ ফরাসিদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য চন্দননগরের জনগণ যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, যে সকল বাধাবিপত্তির মধ্যে নেতৃবৃন্দ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন, তারই বর্ণনা এই গ্রন্থে লেখক দিয়েছেন।)

১৪৫ ——————।
রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর; জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ। চন্দননগর, চন্দননগর পুস্তকাগার, ১৯৬২। ২৭৫ + ১৫ পৃঃ।
(ফরাসি অধিকৃত চন্দননগরের সঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। সেই সমস্ত সম্পর্ক ও ঘটনাবলীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে।)

১৪৬ ————, **সঙ্কলক**
সংক্ষিপ্ত চন্দননগর পরিচয়। চন্দননগর, চন্দননগর পুস্তকাগার, ১৩৭০ব। ২৫২ পৃঃ।
(চন্দননগরের ইতিহাস ও বিস্তৃত পরিচয় এই গ্রন্থের মূল আকর্ষণ। চন্দননগরের ভৌগোলিক পরিচয়, সেবা ধর্ম, শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা, সাহিত্য, গীত-বাদ্যাদি, খেলাধূলা, ফরাসি অধিকৃত অবস্থায় উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জি এই গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু।)

১৪৭ **হাইড, রেভারেন্ড এইচ বি**
(দি) প্যারিশ অব বেঙ্গল, ১৬৭৮-১৭৮৮। কলকাতা, থ্যাকার, স্পিঙ্ক অ্যান্ড কোং, ১৮৮৯।

(সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সমস্ত ধর্মযাজক হুগলি জেলায় অবস্থান করেছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধে তথ্য এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।)

১৪৮ **হান্টার, ডব্লিউ ডব্লিউ**
(দি) ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া। লন্ডন, ট্রাবনার অ্যান্ড কোং, ১৮৮১। খণ্ড ২।
(এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে পৃঃ ৩৯১-৯২তে ফরাসি অধিকৃত চন্দননগর সম্বন্ধে বিবরণ।)

১৪৯ ——————।
(দি) ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া। লন্ডন, ট্রাবনার অ্যান্ড কোং, ১৮৮১। খণ্ড ৪।
(এই গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের ১১২-১২০ পৃষ্ঠায় হুগলি জেলা সম্বন্ধে বিবরণ ও পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। হুগলি শহরের ইতিবৃত্তও দেওয়া আছে। এই সময়ে হুগলি জেলায় চারটি মহকুমা ছিল যথাক্রমে—হুগলি সদর, শ্রীরামপুর, হাওড়া ও মাহেশরাখা।)

১৫০ ——————।
(দি) ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া। লন্ডন, ট্রাবনার অ্যান্ড কোং, ১৮৮৫-৮৭। খণ্ড ১৪।
(চতুর্দশ খণ্ডে চুঁচুড়া, হুগলি ও শ্রীরামপুর সম্বন্ধে বিবরণ আছে।)

১৫১ ——————।
এ স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল; ডিস্ট্রিক্টস অব মেদিনীপুর অ্যান্ড হুগলি (ইনক্লুডিং হাওড়া)। লন্ডন, ট্রাবনার অ্যান্ড কোং, ১৮৭৬। খণ্ড ৩।
(এই খণ্ডের ২৫১-৪৪০ পৃষ্ঠায় হুগলি জেলার বিভিন্ন দিকের পরিসংখ্যান-সহ বর্ণনা দেওয়া আছে। বর্তমানে এর ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে।)

১৫২ **হেসেজ উইলিয়াম**
দি ডাইরি অব উইলিয়াম হেজেস ডিউরিং হিজ এজেন্সি ইন বেঙ্গল: অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিজ ভয়েজ অ্যান্ড রিটার্ন ওভারল্যান্ড (১৮৬১-১৮৬৭)। লন্ডন, হ্যাকলুৎ সোসাইটি, ১৮৮৭-১৮৮৯। ৩ খণ্ড।
(সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে হুগলির অবস্থা সম্পর্কে একটি চিত্র এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।)

১৫৩ **হ্যামিলটন, ক্যাপ্টেন আলেকজান্দার**
এ নিউ অ্যাকাউন্ট অব দি ইস্ট ইন্ডিজ। লন্ডন, সি হিচ অ্যান্ড এ মিলার, ১৭৪৪। খণ্ড ২।
(১৭০৬ সালে চুঁচুড়া, হুগলি ও চন্দননগরের তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্র এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।)

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্মভিটা

